পাতা মুড়িবেন না.

আলোচনা।

দ্বিতীয় খণ্ড

উদ্বোধন।

এক বর্ষ গেল চলি, যাবে শত বর্ষ ভাগি,
তোমার করুণা, বিভো! রয়েছে, রহিবে জাগি।
রসো-বৈ তুমি পিতঃ! তব রসে পূর্ণ ধরা,
প্রাণ তুমি—প্রাণে প্রাণে সকলি রয়েছে ভরা।
যেখানে সকলি আছে সেখানে তোমার বাস,
যেখানে কিছুই নাই সেখানে তোমার ভাস।
সকলি অপূর্ণ হেথা—পূর্ণ তুমি; তাই মোরা
পূর্ণতার আশে বেঁচে, কাটা'য়ে দিনু এ ফেরা।
যদিও দুর্ব্বল মোরা তবু কি নিরাশ হব?
তব আলোচনা লয়ে তোমাতে মজিয়ে রব।
তোমার এ মহাবিশ্ব, তোমার এ আলোচনা,
জীবনের গত বর্ষ ইহাতে পড়েছে গণা।
দেও বল দেও বীর্য্য, আসিছে যে বর্ষ শত,
তব আলোচনা ল'য়ে তাহাও করিব গত।
বিষয় বাড়িছে নিত্য দেশ পূর্ণ করিবারে,
দিন পরে চলে দিন উতরিতে কাল পারে।
দেশ কাল মিলি জুলি লিখিছে যাঁহার তত্ত্ব,
তাঁরি আলোচনা ল'য়ে মরি—দেও এ মহত্ত্ব।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

আত্ম-প্রকাশ ও ভগবৎস্ফূর্ত্তি।

অহং-জ্ঞান জীবের স্বাভাবিক। যে সময় হইতে বাহ্য বস্তুর সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, সেই সময় হইতে কার্য্যের কর্ত্তা আমি, ইহা বুঝিয়াছি। দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মূলে আমি, পান ভোজন প্রভৃতি কার্য্যের মূলে আমি, ক্ষুদ্র শিশুও ইহা বুঝে। আপনার শক্তি সামর্থ্যের যত অনুভব হয়, আপনার কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য তত চেষ্টা হইয়া থাকে। বালক ক্ষুদ্র হস্তে এক গাছি যষ্টি পাইলে, সকল বস্তুর উপরে তাহার আধিপত্য প্রদর্শনের প্রয়াস পাইবে। এই অহঙ্কার, আমিত্ব ও কর্তৃত্বাভিমান কি লইয়া?—আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছাই ইহার ভিত্তিভূমি। শিশু আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, যুবক যুবতী আপন আপন রূপ লাবণ্য, গুণ গরিমা প্রকাশে ব্যস্ত রহিয়াছে, অশীতিপর বৃদ্ধও যমদ্বারের নিকটবর্ত্তী, তথাপি আপনার কৃতিত্বের শ্লাঘা করিতে বিমুখ নহেন! রূপবান, ধনবান, বিদ্বান, পদস্থ, পরোপকারী এবং উগ্র-তপশ্চারী ধার্ম্মিক সকলেই আপনার শক্তি প্রকাশে ও ক্ষমতার পরিচয় দানে যথাসাধ্য ব্যগ্র!

জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার অধিবাস; কিন্তু যেখানে আত্ম-প্রকাশ প্রবল, সেখানে ভগবৎস্ফূর্ত্তি মলিন, এই জন্য তাঁহার সত্তা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া ভার। একস্থানে দুই বস্তু এক সময়ে অবস্থিতি করিতে পারে না, ইহা যেমন একটী অমোঘ বৈজ্ঞানিক সত্য; এক সময়ে এক ঘটে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের কর্তৃত্ব স্থান পায় না, ইহা সেইরূপ এবটী অমোঘ আধ্যাত্মিক সত্য। অহং কর্ত্তা প্রবল, ভগবান্ নিষ্প্রভ; অহং কর্ত্তা নিস্তেজ, ভগবানের স্ফূর্ত্তি প্রবল। অহং ভাবের পূর্ণাধিকার যে পরিমাণে খর্ব্ব হইবে, ভগবানের প্রভাব তত প্রকাশিত হইবে। যে ব্যক্তি অহং ভাবকে সঙ্কুচিত করিয়া ভগবানের জন্য একটু স্থান করে, ভগবান্ তাহাতে প্রকাশিত হন। সেই ভগবৎস্ফূর্ত্তিকে যিনি পোষণ করেন, তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়া নিজে যিনি পশ্চাতে থাকেন, তাঁহাকে কর্ত্তারূপে বরণ করিয়া নিজে যিনি তাঁহার সেবাকে জীবনের মহৎ কার্য্য বলিয়া অবলম্বন করেন, তাঁহাতেই ভগবানের স্থিতি ও বিহার হয়।

ভগবৎ প্রকাশের অর্থ জীবনে সত্য, ন্যায়, প্রেম, পুণ্যের জয় স্থাপন করা—আত্ম-প্রকাশের অর্থ আপনার গৌরব, বিদ্যা বুদ্ধি, ক্ষমতা, এবং স্বার্থ-সর্ব্বস্বতার পরিচয় দান। সাধারণ শ্রেণীর মনুষ্য শেষোক্ত লক্ষ্য লইয়াই ব্যস্ত—অতি অল্প

সংখ্যক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। "আমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার কর্তৃত্ব স্থাপিত হউক, আমার সুখ বর্দ্ধিত হউক," সাধারণতঃ ইহার অপেক্ষা জীবনের পক্ষে সুখকর আর কিছুই নাই। "আমার ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, আমার সুখ বিনষ্ট হইয়া তোমার সুখ বর্দ্ধিত হউক," ইহার অপেক্ষা প্রেমিকের পক্ষে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই।

সমাজ-শক্তি।

একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বীজ, তাহার উপর কত বস্তুই না কার্য্য করিয়া থাকে! ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম,—ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র; পৃথিবীর জল, বায়ু, মাটী—ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার ফুল ফুটায়, ফল দোলায়; তাহার পাতায় রঙ্, ফুলে সৌরভ, ফলে মধু ঢালিয়া দেয়। এক জাতীয় বৃক্ষ, তাহারই ফল একটা বা অম্ল, আর একটা বা মিষ্ট হয়—কেবল ইহাদের শক্তি প্রভাবে। তাহার পাতায় পাতায় বেশী কম, ফুলে ফুলে বেশী কম, ফলে ফলে বেশী কম, কেবল ইহাদের কার্য্যের তারতম্য নিবন্ধন।

একটী ক্ষুদ্র সদ্যোজাত শিশু, তাহার মুখে কত যুগের ইতিহাসই না লিখিত থাকে! তাহার কোমল অঙ্গে কত লোকের দৈনন্দিন লিপির কত গোপনীয় অংশই না খুঁজিয়া পাওয়া যায়! ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই কত অসংখ্য শক্তি মিলিয়া তাহার জীবনের ভাগ্য-লিপি নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়! কত অগণিত শক্তি নিচয় তাহার কোমল দেহ মনের বিকাশ সাধন করিয়া থাকে!

একটী মনুষ্য সমাজ,—সেখানেও এইরূপ অসংখ্য শক্তির কার্য্য। এই সকল শক্তি রাশিই সমাজ-চরিত্রকে গঠিত, সমাজের জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার সভ্যতা স্রোতকে প্রতিনিয়ত নিয়মিত করিতেছে।

একখানি সামান্য চিত্রপট প্রভাবে একটী মার্কিন পরিবারের সমুদায় বালকগণের জীবন-গতি নিয়মিত ও পরিচালিত হইয়াছিল। এই পরিবারের বাস-গৃহের ছাদে সুনীল, সুগভীর, তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রে নৃত্যশীল এক খানি অর্ণব পোতের ছবি অঙ্কিত ছিল; এবং তাহারই প্রভাবে এই পরিবারের বালকেরা

সকলে পিতা মাতার সমুদায় চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া, আদেশ অমান্য করিয়া ও সস্নেহ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া নৌ-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। এক খানি সামান্য ছবিতে কতগুলি মনুষ্যের জীবনগতি নির্ণিত হইয়াছে!

মানব সমাজেও অহর্নিশ তাহাই ঘটিতেছে। সমাজ গৃহের ছাদে, প্রাচীরে এবং ভিত্তিতে যে সকল চিত্রপট স্বর্গের তুলিকায় অঙ্কিত থাকে, সমাজের জীবনগতি নির্ণয়ে তাহাদের শক্তি অপরিমেয়। সমাজ শরীরের উপর সর্ব্ব প্রথমেই তাহাদের কার্য্য আরম্ভ হয়।

যে দেশেই প্রকৃতিদেবী বসুন্ধরার ধনরাশি বণ্টনে মুক্তহস্ত,—যে স্থানেই প্রকৃতি সতী আপনার বিচিত্র রূপের হাট খুলিয়া বসিয়াছেন,—যে খানেই যুগপৎ তাঁহার রৌদ্রভাব ও স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশিত,—সেই দেশেই সভ্যতার বিমল আলোক সর্ব্বাগ্রে দীপ্ত হইয়াছে। জগতের প্রধানতম প্রাচীন জাতি সমূহের ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

এক আর্য্য-শক্তি ভারতে যে ফল প্রসব করিয়াছিল অন্যত্র তাহা করিতে পারে নাই, কেবল বাহ্য প্রকৃতির গুণে। আর ভারতের এই আশ্চর্য্য অভ্যুত্থানের পর যে এই শোচনীয় অধঃপতন, তাহাও কেবল ভারতের এই বাহ্য প্রকৃতিরই কৃপায়।

ভারতের প্রকৃতি আদিম সভ্যতার শৈশব-দোলা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা ছিল। তাঁহার জগজন-বিমোহনকারিণী মুখচ্ছবি দেখিয়াই ভারত জাগিয়া উঠিয়াছিল। ভারতের শীর্ষদেশব্যাপী অভ্রভেদী শুভ্রকেশ, গিরিরাজ; তাহার পাদদেশধৌতকারী সুনীল তরঙ্গায়িত মহাসাগর; তাহার পবিত্রসলিলা কলনাদিনী স্রোতস্বিনীগণ; তাহার "সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা" ধরা; তাহার এক চন্দ্র অসংখ্য নক্ষত্ররাজি শোভিত সুনীল, সুস্নিগ্ধ, আকাশ; তাহার নিত্য নব-ভাবপ্রকাশক ঋতুচয়;—ইহারা সকলে ভারতের জাতীয় জীবনের শৈশবকালে তাহার নিদ্রিত প্রাণকে জাগ্রত করিয়াছিল। প্রকৃতি সতীর রূপমোহে মোহিত হইয়াই ভারত এ জগতে এই অলৌকিক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

সভ্যতার অর্থ—জ্ঞানের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি, নীতির উন্নতি, রাজনীতির উন্নতি। ইহাদের সকলই গভীর আলোচনা, গভীরতর গবেষণা ও গভীরতম চিন্তার ফল। আলোচনা, গবেষণা, চিন্তা—আত্মোৎকর্ষ—অবসর সাপেক্ষ। অবসর অর্থ-সাপেক্ষ। যাহার ঊষাকাল হইতে প্রদোষকাল পর্য্যন্ত সমুদায় সময় পরিচয় দান। সাধারণ শ্রেণীর মনুষ্য [illegible]

উদর চিন্তাতেই অতিবাহিত হয়, সে আর অন্য চিন্তা করিবে কখন? এইরূপ ব্যক্তির জ্ঞান পিপাসা জন্মিতে পারে না, জন্মিলেও তাহা চিরকালই অতৃপ্ত থাকিবে। ভারতে সামান্য চেষ্টায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত, অন্ন মুষ্টির জন্য প্রাচীনকালে ভারতবাসীর ললাট-নিস্থত ঘর্ম্মবিন্দু কদাপি পাদোপরি বিলুণ্ঠিত হয় নাই। জ্ঞানালোচনার অবসর প্রাচীন ভারতে সহজ-লভ্য ছিল। সুধু তাহাই নহে; ভারতের প্রকৃতি চিরদিনই আধ্যাত্মিক ভাবের উত্তেজিকা; কল্পনার সুস্নহময়ী জননী। তাহাতেই প্রাচীন ভারতে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, অতি দ্রুত গতিতে, কল্পনা এবং আধ্যাত্মিকতারও বিকাশ সাধিত হইয়াছিল।

কিন্তু বাহ্য প্রকৃতির গুণে জনসমাজের যে অবস্থান্তর ঘটে, সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিরাশি প্রভাবে তদপেক্ষা আরো গুরুতর অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। মানুষ লইয়া সমাজ। মানুষ তো আর কেলব বাহ্য প্রকৃতির দাস নহে। বাহ্য প্রকৃতি প্রতিনিয়ত তাহার হৃদয় মনের উপর কার্য্য করিতেছে সত্য, কিন্তু তথাপি সে স্বাধীন। তাহার হৃদয়ের ভাব, মনের গতি প্রভৃতি তাহার কার্য্য ও চিন্তাকে সতত পরিমিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে। এমন কি সে আপনার জ্ঞান প্রভাবে বাহ্য প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত সতত পরিবর্ত্তিত করিতেছে। সে মরুভূমে হরিৎ ক্ষেত্র রচনা করিতেছে, আবার চিরশস্যশালিনী ভূমিকে অনুর্ব্বর মরুভূমে পরিণত করিতেছে;—সে মরুমধ্যে মার্ভ বা খিভা নির্ম্মাণ করিতেছে, আবার ভারতের ঘননিবিড় অরণ্যানির উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহার "সুজলা সুফলা" ভূমিকে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর ক্রীড়াভূমে পরিণত করিতেছে! যে বাহ্য প্রকৃতিকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার শক্তি-জাতা সামাজিক শক্তি-নিচয়ের প্রভাব কি অল্প?

জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি—ইহারাই সমাজের আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রধান শক্তি চতুষ্টয়। কিন্তু ইহারা কেহই স্বাধীন নহে। ইহাদের সকলেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। ইহাদের একের ভাব অপরে সংস্পৃষ্ট ও সংক্রামিত হইয়া পরস্পরকে অনুরঞ্জিত করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা সচরাচর যাহাকে সামাজিক অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করি, তাহা কেবল তাহার আভ্যন্তরীণ জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতি প্রভৃতির অবস্থার নামান্তর মাত্র।*

* "What is called a state of society is the simultaneous state of all the greater social facts or phœnomena. Such are the degree of knowledge and of intellectual and moral culture

জ্ঞানই মানবের ও মানবসমাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। জ্ঞান—আত্ম-জ্ঞান,—আমি আছি, ইহাই মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম ও প্রধান চিহ্ন; ইহাই তাহার বুদ্ধি বিকাশের ক-অক্ষর। ইহা হইতে ক্রমে অপর ভাবের ও অপর জ্ঞানের উৎপত্তি। জ্ঞান সর্ব্ব প্রথমে মলিন, নিষ্প্রভ, অজ্ঞানতাপোষক সত্য, কিন্তু তথাপি তাহাই মানবের প্রথম উপার্জ্জিত ধন। শিশু আত্মা প্রথমে এই মলিন, নিষ্প্রভ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই জগতে দাঁড়াইয়াছিল। আবার জ্ঞান মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন। ধর্ম্ম বল, নীতি বল, রাজনীতি বল, সকলই জ্ঞানের মুখপ্রেক্ষী হইয়া আপনাদিগের জীবন পরিচালিত করিয়া থাকে; সকলের ক্ষমতাই জ্ঞানের অধীনতা স্বীকার করে। আদৌ ইহারা সকলেই জ্ঞানের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং আজও জ্ঞানের দ্বারাই ইহারা সকলে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, ইহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মানবের ধর্ম্মভাবের বিবর্ত্তনে ভয় প্রথম সোপান। এই ভয় মানবের জ্ঞানের অঙ্কুর ভেদের ফল। মানুষ তখন শিশু; তখন সে জানে কেবল, আমি আছি আর এই জগৎ আছে; তখন সে পৃথিবীর বিপ্লবকারিণী শক্তিরাশির সমক্ষে অসহায় হইয়া দণ্ডায়মান; এই সকল শক্তির বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা তখনও তাহার জন্মে নাই, তাহাদের প্রভাব প্রশমিত করি-

existing in the community and in every class of it; the state of industry, of wealth and its distribution; the habitual occupation of the community; their division into classes, and the relation of those classes to one another; their common beliefs which they entertain on all subjects most important to mankind; and the degree of assurance with which those beliefs are held; their tastes and the character and degree of their æsthetic development; their form of government and the more important of their laws and customs. The condition of all these things and of many more which will readily suggest themselves, constitute the state of Society or the state of civilization at any given time."—Mill's Logic, Bk. VI. Ch. X. মিল এত কথায় এত সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, সমাজিক অবস্থা সমাজের জ্ঞান ধর্ম্ম, নীতি ও রাজনীতির অবস্থারই নামান্তর মাত্র।

বার মন্ত্র সে তখনও শিখে নাই; সুতরাং তখন এই অল্প জ্ঞানে তাহার ধর্ম্ম হইল প্রকৃতি-পূজা। এইরূপে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় মানবীয় ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে; কখনও বা প্রেতপূজা, কখনও বা প্রকৃতি পূজা; কখনও বা বহু দেবতার অর্চ্চনা, কখনও বা একেশ্বরের আরাধনা;—ধর্ম্ম বৈষম্য কেবল জ্ঞান বৈষম্যের ফল।

ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বর্ত্তমান সভ্য জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রণালী সমূহের ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক বৌদ্ধ ধর্ম্মের কত আকার; এক খৃষ্ট ধর্ম্মের কত সম্প্রদায়; এক মুসলমান ধর্ম্মের কত শাখা! এই সকল অধিকাংশ স্থলেই কেবল জ্ঞান বৈষম্যের ফল।

জ্ঞানের সঙ্গে নীতিরও অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায়, সামাজিকগণের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নীতিরও বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মানব জাতির অতি শৈশবকালে পৃথিবীতে আজিকার উন্নত নীতি বিদ্যমান ছিল না। মানুষ তখন অল্পজ্ঞান, অসহায়, প্রকৃতির সংহারিণী শক্তি সমূহের তাড়নায় বিতাড়িত। ভয় তখন তাহার প্রধান ভাব, আত্মরক্ষা তখন তাহার প্রধান প্রবৃত্তি। ভয় অল্পজ্ঞানের সন্তান; তখনকার নীতিও ভয়ের সন্তান সন্ততি। তখন আত্মরক্ষাই প্রধান নীতি। ক্রমে দুইটী প্রাণীর মিলনে পরিবারের সৃষ্টি। পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী হইতে জাতির উৎপত্তি। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায় ভাবেরও সৃষ্টি। যখন একাধিক গোষ্ঠী মিলিত হইয়া প্রবলতর শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য জাতির সৃষ্টি করিল, তখন পূর্ব্বকার "আমি আমি" "আমার আমার" গিয়া "আমি এবং তুমি" "তোমার এবং আমার" উৎপন্ন হইল। তখন আর কেবল আমি ও আমার করিলে বহুত্বে একত্ব থাকে না, কাজেই তখন "আমারটা আমার" "তোমারটা তোমার" "তাঁহারটা তাঁহার"—এই তিন পুরুষের একত্বে ন্যায় ভাবের সঞ্চার। কিন্তু এখানে ন্যায়ের অঙ্কুর মাত্র প্রকাশিত, মানবীয় নীতির ভিত্তি মাত্র সংস্থাপিত। তখন ন্যায়ের অর্থ বিনিময়, ব্যবসাদারী,—আমি তোমার স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিব, তুমিও আমার স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিও। ন্যায় তখন সর্ত্ত মাত্র।

যুগে যুগে সমাজের নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যুদ্ধ-যুগে সমাজের নীতি শক্তিজা—দৈহিকবলের ভিত্তির উপর সংস্থাপিতা; যুদ্ধ ব্যবসায়ের পোষ্যা পুত্রী মাত্র। তখনকার প্রধান আদর্শ সাহস ও সত্যবাদীতা,—বলের সহচর সহচরী। তখন বলই ন্যায়, যাহার বল রহিল তাহার সবই রহিল; আজ সে নীতি কৈ?

আজ চৌর্য্যবৃত্তি মহাপাতক, কিন্তু যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয় নাই, তখন কে কাহাকে চোর বলিতে পারিত? চৌর্য্য ও চোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির সহচর; যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ততদিন জনসমাজে তাহাদের অস্তিত্ব। যদি কমিউনিষ্টগণের সাধের স্বপ্ন জীবনে পরিণত হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য্য এবং চোরও জনসমাজে লুপ্ত হইবে।

আজ সতীত্ব অমূল্য রত্ন। কিন্তু যখন বিবাহ-প্রথা ছিল না, তখন সমাজ এই অমূল্যরত্নের অধিকারী হয় নাই।

এক সময়ে এজগতে রাজা ও দেবতায় প্রভেদ ছিল না; "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" কিন্তু আজ রাজা কে? এক সময়ে রাজহত্যা মহাপাতক ছিল, এখন রাজহত্যা অবস্থা বিশেষে পাপ না হইয়া পুণ্যও হইতে পারে।

জ্ঞান পরিবর্ত্তনে নৈতিক ভাব ও নৈতিক আদর্শ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষুর উপরেও আছে। এই দেশের শিক্ষিত লোকদিগের নৈতিক ভাব ও নৈতিক আদর্শ তাঁহাদের জ্ঞান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত না পরিবর্ত্তিত হইয়াছে! দশবৎসর পূর্ব্বে যাহাকে দুর্নীতি বলিয়া মনে করিতাম, আজ তাহাকে সুনীতি বলিয়া আদর করিতেছি; আর দশবৎসর পূর্ব্বে যাহাকে সুনীতি বলিয়া ভক্তি করিতাম, আজ তাহাকেই দুর্নীতি বলিয়া ঘৃণা করিতেছি।

জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় শাসনপ্রণালীরও সতত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সমাজে যখন জ্ঞান ও বিদ্যা অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সেই সমাজে তখন হয় স্বেচ্ছাচারী রাজা, না হয় অত্যাচারী ক্ষুদ্র আভিজাতদল রাজ্য শাসন করিয়াছেন। আবার যে সমাজে যখন জ্ঞান ও বিদ্যা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমাজে হয় নিয়মতন্ত্র রাজত্ব, না হয় সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সমগ্র সভ্য জগৎ যে এক ঘোরতর রাজনৈতিক বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে আমূল বিকম্পিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে জ্ঞান বিস্তার ও জ্ঞানোন্নতির কত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে!

যেমন জ্ঞান সমাজের অপর শক্তিত্রয়কে—ধর্ম্ম, নীতি এবং রাজনীতিকে নিয়মিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার ধর্ম্ম, নীতি এবং রাজনীতিও জ্ঞানের উপর প্রভূত আধিপত্য উপভোগ করে। মানুষের জ্ঞান তাহার ধর্ম্মকে রচনা করিয়াছে; আবার তাহার স্বহস্ত রচিত ধর্ম্মও জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত

করিয়াছে। উরূপার ইতিহাসে একবার কেবল ধর্ম্মেরই উৎপীড়নে জ্ঞান পরম সমৃদ্ধিশালিনী নগর নগরী পরিত্যাগ করিয়া তমসাচ্ছন্ন গুহা ও সন্ন্যাসালয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যখনই যে দেশে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক বিবর্ত্তনের একটা বিশেষ যুগে,—কোনও বিশেষ প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্ম উৎপন্ন ও বদ্ধমূল হইয়াছে,—তখনই এই ধর্ম্ম প্রভাবে জ্ঞানের উন্নতি বা অধোগতি হইয়াছে। ধর্ম্মভাব নিরতিশয় রক্ষণশীল। সে সর্ব্বদা নূতনের ভয়ে ভীত, নবালোক দেখিলে তাহার কোমল প্রাণ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে। এজগতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সকলেই স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী রাজার স্বভাব প্রাপ্ত; সকলেই সর্ব্বদা ঈর্ষা-প্রবণ ও সন্দিহানচিত্ত। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম নূতনের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই নবাঙ্কুরিত জ্ঞানকে তাহার মাতৃক্রোড়ে গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীশে সক্রেটিসের বিষ পান, জ্ঞানের মুখ চাপিয়া ধরিবার জন্য ধর্ম্মের চেষ্টার ফল। গুওর্ডিনো ব্রুনোর হত্যা, গ্যালিলিওর হত্যা, এবং জগতের অপরাপর বিজ্ঞান-বীরদিগের হত্যাকাণ্ড—এই সমুদায় জ্ঞানের উপর ধর্ম্মের অত্যাচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আর এক উপায়ে ধর্ম্ম জ্ঞানের উপরে আধিপত্য ভোগ করিয়াছে। জ্ঞানের বিস্তৃতিতেই উন্নতি; এবং ধর্ম্ম হিন্দু-ভারতে ও খৃষ্টীয়-উরূপায় জ্ঞান বিস্তারের ব্যাঘাত দিয়াছে। প্রাচীন সমাজে ধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল;—শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থই ধর্ম্মগ্রন্থ। ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার সকলের অধিকার ছিল না; এই প্রতিষেধ দ্বারা ধর্ম্ম জ্ঞান বিস্তৃতির ব্যাঘাত করিয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্ম যে সর্ব্বদাই জ্ঞানের সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে তাহা নহে। একদিকে যেমন জ্ঞান বিস্তৃতির ব্যাঘাত জন্মাইয়া, ধর্ম্ম জ্ঞানের ভবিষ্য উন্নতি ও পরিণাম মঙ্গলের মূলভিত্তি কর্ত্তন করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ জ্ঞানালোচনা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া তাহার গভীরতাও সম্পাদন করিয়াছে। পৌরোহিত্যের সৃষ্টিতে জনসমাজে অনেক বিপ্লবাদির মধ্যেও যে জ্ঞানের আলোক রক্ষিত ও উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং একদিকে ধর্ম্ম যেমন জ্ঞানের বিস্তৃতির ব্যাঘাত জন্মাইয়া তাহার অনিষ্ট করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ এই জ্ঞান বিস্তৃতির ব্যাঘাত জন্মাইয়াই তাহার গভীরতা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। ভারতে জ্ঞান দেশময় ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই ধর্ম্মের অত্যাচারে, কিন্তু আবার এই ধর্ম্মেরই কৃপায় এদেশে তাহার

এরূপ গভীরতা সম্পাদিত হইয়াছিল যে, আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্রাহ্মণ বুধগণের সেই গভীর চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান-কীর্ত্তি সমূহ জগতের সরল শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা লাভ করিতেছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও ধর্ম্ম জ্ঞানোন্নতির অল্প সহায়তা করে নাই। এক পিউরিটান ধর্ম্ম ইংরাজ জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে কি এক মহা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম-সংস্কার জর্ম্মাণি এবং সমগ্র উরূপার জ্ঞানোন্নতির কি অল্প সহায়তা করিয়াছে? বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। এই সমুদায়ই জ্ঞানের উপর ধর্ম্মের সদাধিপত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাজনীতিও জ্ঞানের উপর অল্প আধিপত্য ভোগ করে নাই। বর্ত্তমান সভ্যসমাজের কোনও কোনও দেশের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। ইংরাজি বিজ্ঞানের উন্নতিতে ইংরাজের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অল্প সহায়তা করে নাই। স্বাধীন জাতি স্বাধীন ও প্রমুক্তভাবে জ্ঞানোন্নতি করিতে সমর্থ। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জ্ঞানোন্নতির অতি প্রধান সহায়। রুশে জ্ঞানের বড় দুরবস্থা—রুশিয়ার রাজনৈতিক দুরবস্থার ফল। রুশিয়ায় কেহ স্বাধীনভাবে একখানি গ্রন্থ লিখিতে পারে না। রুশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে রাজপুরুষদিগের মুখ চাহিয়া সতত আপনাদিগের প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখিতে হয়। না করিলে তাহা সংবাদপত্র-পরিদর্শকগণের হাত দিয়া পাশ হয় না, পাশ হইবার সম্ভাবনা নাই—তাহার উপর তজ্জন্য সম্পাদকের গুরুতর দণ্ডবিহিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। রুশের লেখকগণকে সর্ব্বদা সসর্পে গৃহবাস করিতে হয়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে? *

* একজন পরিব্রাজক ট্রিক্‌নিফ্‌ নামক একজন পুস্তক বিক্রেতার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :—

"Triknieff would be a happy man if Government would instal a censor in his town and arm him with full powers; but he and Government look at this question from opposite points of view; for Triknieff wants to promote the sale of literature, and Government desires to check it. It is more than enough for the authorities that publications should come out with tolerable frequency in the nine university towns—St. Petersburg, Moscow, Kazan, Dorpat, Vilna (Lithuania) Kiev, Kharkov, Odessa and Warsaw. All these places possess censors, and most of them one or two daily independent newspapers, whose articles have to be submitted for revision three clear days before going to print. "(*The Russians of Today*—p p 112-13.)

এত গেল সংবাদ পত্রের দুর্দ্দশার কথা। গ্রন্থাদিরও সেই একই দশা! এই পরিব্রাজকই তাঁহার পুস্তক বিক্রেতার কোনও নূতন গ্রন্থ প্রচারের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

Three months is the shortest time that can elapse before he gets back his manuscript, more or less embellished with corrections in red pencil; but sometimes six months slip by, for the censors have a great deal to do" (*Ibid.*)

এই অবস্থায় যে রুশে জ্ঞানোন্নতি অসম্ভব, এই কারণেই যে রুশের সাধারণ লোকেরা শিশুর মত অজ্ঞান, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

তবে সর্ব্বদাই যে রাজনৈতিক পরাধীনতায় জ্ঞানোন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে তাহাও নহে। তদ্দ্বারা জ্ঞান বিস্তৃতির বিঘ্ন জন্মাইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছাচারী রাজা যখন রুশীয়ার পীটারের মত, বা ভারতের আকবর সাহার মত আপনি জ্ঞানপিপাসু, তখন তাঁহার অধীনে দেশে রাজনৈতিক অধীনতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকা সত্বেও জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে।

ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের কি ঘনিষ্ট সম্পর্ক, ধর্ম্মের সহায়ে জ্ঞানের কিরূপ উন্নতি ও ধর্ম্মের অত্যাচারে জ্ঞানের কিরূপ অবনতি হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে নীতির যে অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, ফলতঃ নীতি যে ধর্ম্ম ভিন্ন দাঁড়াইতে পারে না,—ইহাও সাধারণতঃ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার বিশেষ ব্যাবৃতি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক, ধর্ম্ম কিরূপে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, এবং রাজনীতি কিরূপ ধর্ম্মকে নিয়মিত করে, তাহা তত স্পষ্ট বা তত সহজ বোধ্য নহে।

সমাজের প্রথম অবস্থায় ধর্ম্ম ও রাজনীতি অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত ছিল। সমাজের উৎপত্তি—জাতির সৃষ্টি ধর্ম্মমূলক, এবং এই নবসৃষ্ট জাতির প্রধান ও প্রথম কার্য্যই সমাজ গঠনার্থ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা। সমাজের শৈশব অবস্থায় যখন প্রত্যেক পরিবারের পতিই সেই পরিবারের রাজা এবং ধর্ম্মযাজক ছিলেন,—তখন তাঁহার আজ্ঞাতে রাজনীতির অনুশাসন ও ধর্ম্মের আদেশ উভয়েই মিশ্রিত ছিল। তার পর যখন পরিবার বৃদ্ধি সহকারে গোষ্ঠির

উৎপত্তি তখনও গোষ্ঠিপতি স্বয়ং রাজা ও প্রধান পুরোহিত—রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির জীবন্ত আদর্শ। তার পর জাতির উৎপত্তি—তাহার প্রধান ভাব ধর্ম্ম।[১] ধর্ম্মের একতাই বিভিন্ন গোষ্ঠির একত্বের মূলভিত্তি। আদিম সমাজের প্রধান বন্ধন-রজ্জু ধর্ম্ম। তখন স্বদেশ ও স্বদেশহিতৈষণা ভাবের জন্ম হয় নাই; কিন্তু ধর্ম্মভাবের জন্ম হইয়াছে—এবং এই ধর্ম্মভাবই তখন সমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।[২] তখন ধর্ম্মের সঙ্গে রাজার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

ধর্ম্মভাবের দ্বারা মানুষের হৃদয় মনের অপর সর্ব্ব প্রকারের ভাব পরিমিত ও পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক ভাবেও ধর্ম্মমত সংক্রামিত হইয়া, কোথাও বা অত্যাচার বৃদ্ধি, কোথাও বা শাসন সংস্কার ঘটাইয়াছে। পিউরিটান ধর্ম্মের দ্বারা অর্দ্ধ জগতের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ধর্ম্ম ভারত ও তুরস্কে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা খর্ব্ব করিয়াছে;—এক স্থানে ব্রাহ্মণ-প্রভাবে, অন্যত্র এফেন্দির তাড়নায়। ক্রুসেদের দ্বারা উরূপার রাজনৈতিক অবস্থার কি অল্প পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল? বর্ত্তমান সভ্য জগতের, শিরোভূষণ আমেরিকাতেও রাজনীতির উপর ধর্ম্ম কত আধিপত্য ভোগ করিতেছে।*

* সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মসো টকুয়াভিল্ (M. Alexis de Tocqueville) লিখিয়াছেন;—"Every religion is to be found in juxta position to a political opinion which is connected with it by affinity. If the human mind be left to follow its own bent, it will regulate the temporal and spiritual institutions of society upon one uniform principle; and man will endeavonr, if I may use the expressioon, to harmonise the state in which he lives upon earth with the state which he believes to await him in heaven. The greatest part of British America was peopled by men who, after having shaken off the authority of the Pope, acknowledged no other religious supremacy; they brought with them into the new world a form of Christianity which I cannot better describe than by styling it a democratic and republican religion. This sect contributed powerfully to the establishment of a democracy and a republic, and from the earliest settlement of the emigrants politics and religion contracted an alliance which has never been dissolved. (*Democracy in America*—P. 304).

আইন কানুন বিধিবদ্ধ করা রাজনীতির কার্য্য; এবং আইন কানুনের উপর ধর্ম্মের প্রভূত আধিপত্য। দেশাচার হইতে আইনের সৃষ্টি; এবং প্রত্যেক সমাজের প্রাচীনতম সংস্কার সমূহ ধর্ম্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। ভারতে হিন্দুর রাজনীতি মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজা প্রজার সম্বন্ধ, প্রজাদিগের অধিকার, প্রজাগণের বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পর সম্পর্ক সমুদায়ই প্রাচীন হিন্দুসমাজে ধর্ম্মসূত্ররূপে লিপিবদ্ধ। ইহুদিদিগেরও রাজনীতি তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যেই লিপিবদ্ধ। রাজার দেবত্ব ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির ঘনিষ্ট সম্পর্কের ফল।

নীতির সঙ্গে রাজনীতির সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্পর্ক। সামাজিকগণের চরিত্র গঠনে রাজনীতি প্রভূত আধিপত্য ভোগ করিয়া থাকে।* এক এক খানি আইনের দ্বারা এক একটী সমাজের কত অনিষ্টপাত হয়, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ইংলণ্ডে Poor Laws দ্বারা সাধারণ লোকের চরিত্র নিরতিশয় হীন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশে গৃহস্থেরা আপনাদিগের ইচ্ছামত যাহার যেরূপ খুসী গরিবদিগকে দান করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে গরিবদিগের প্রতিপালনার্থ রাজস্ব আদায় হয়,—এই রাজস্বকে poor rate অথবা দরিদ্রকর বলে। এই সংগৃহীত অর্থ হইতে প্রত্যেক গ্রামে বা প্যারিশে এক একটী দরিদ্রাবাস নির্ম্মিত হয়, এবং যখন যে অকর্ম্মঠ হইয়া পড়ে, তখনই সে এই আবাসে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ভবিষ্যতের জন্য সাধারণ লোকেরা আর বড় অর্থ সঞ্চয় করে না। বার্দ্ধক্যে জরা-

* It is clear that the right conduct for any member of society depends to a great extent on what others expect him to do, and what he may reasonably expect them to do; and all such expectations are largely determind by law. In such cases the definition of moral duty seems to be dependent on and posterior to the determination of legal obligation. But further, from an egoistic point of view, it may seem that the reasonableness of observing any rules must depend on the consequences to oneself of observing or not obesrving them and that legal penalties are likely to be decisive in the consideration; so that egoistic morality will practically depend altogether on Law;—so far as the scope of Law extend—*Professor Sedgewick.*

গ্রস্ত হইলে দরিদ্রাবাসই তাহাদের বাসগৃহ হইতে পারিবে, এই আশাতেই তাহারা সুস্থতায় উপার্জ্জিত ধনে সুরাপান প্রভৃতি কদাচারে গা ঢালিয়া দেয়।*

আবগারী আইনের দ্বারা এদেশের লোকের নীতি কি পরিমাণে দূষিত হইতেছে; তাহা সর্ব্ব বিদিত। ইংরাজের সাক্ষীর আইনদ্বারা এবং তাঁহাদের জটিল ও কূট কার্য্যবিধির কৃপায় এদেশে যে লোককে অল্পাধিক পরিমাণে অসত্যবাদী করিতেছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। আবগারী আইনে ইংলণ্ডের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে। রুশের আবগারী আইনে সে দেশের লোকদিগকে জোর করিয়া যেন সুরাপায়ী করিয়া তুলিতেছে।†

এইরূপে রাজনীতি দ্বারা সামাজিকগণের নীতি কি যে পর্য্যন্ত দূষিত হইতে পারে, তাহার শত শত অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সভ্য জগতের ইতিহাসেই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

মোট কথা এই—জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, ইহারা সকলে একে অন্যের হস্ত ধারণ করিয়া, একে অন্যের উপর সতত নির্ভর করিয়া চলে। ইহাদের

* Poor Law দ্বারা ইংরাজের নীতি কিরূপ দূষিত হইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ;—

"A large proportion of the poorest class look upon self-denial as folly; because, however wicked, improvident, or idle a man may have been, though he may have spent liberal wages in dissipation, yet so soon as he has spent all and qualified himself by self-made destitution, he can claim as his legal right food, raiment, and shelter for himself and his family at the cost of his frugal and industrious neighbours." (Peak's Social wreckage—p 8).

† একজন পরিব্রাজক লিখিতেছেন ;—

About a dozen years ago, liquor traffic was farmed out by Government to speculators, who abused their monopoly to sell vodki at exorbitant rates. The peasantry, knowing that there was a tariff which was only eluded by connivance with the provincial authority whom the monopolists bribed, banded themselves into temperance societies, with a view to forcing down the prices. Hereupon the farmers complained to Government, and the teetotal leagues were dissolved as illegal secret societies." (The Russians of Today—p 29).

সমষ্টির সমঞ্জসীভূত উন্নতিরই নাম সামাজিক উন্নতি। সমাজ সংস্কার ইহাদের সকলের একসঙ্গে সংস্কার-সাধনের নামান্তর মাত্র। যাহারা সমাজ বা ধর্ম্ম সংস্কারকের খ্যাতি ও পদমর্য্যাদা লোভী হইয়া, রাজনীতির নামে ঘৃণায় কুঞ্চিত অথবা ভয়ে কর্ণে হস্ত প্রদান করেন, তাঁহারা সমাজ-শরীরের জীবন-গতি কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। প্রকৃত সংস্কার যদি করিতে চাও; তবে এক যোগে সমাজের এই প্রধানতম শক্তি চতুষ্টয়ের সংস্কারব্রতে ব্রতী হইতে হইবে। নতুবা একদেশদর্শী সংস্কার-চেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে।

শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল।

পাতা মুড়বেন না

সন্ন্যাসী-গায়ক।

[স্থান গিরিশিখর, সম্মুখে কুটীর, পদতলে নির্ঝরিণী।]

"শুকাইল ইন্দুবালা নিদাঘের ফুল!
হায় রে সে রূপরাশি,
যেন স্বপনের হাসি
লুকাইল নিদ্রাকোলে—ফুটিবেনা আর!
ছিন্ন যেন শচীকোলে লাবণ্যের হার!"

বৃত্রসংহার।

১

সায়াহ্ন গগন-গায়
ভানু অস্তমিত প্রায়,
স্থিরশোভা ধরিয়াছে সকল ভুবন,
দেখিতে দেখিতে আলো
নীরবে নিভিয়া গেল,
অটল অচলে রবি করিল শয়ন।

২

মৃদুল সমীর ধীরে
পরশি নিঝর নীরে
সোহাগে কাঁপায়ে, সুখে কাঁপিল আপনি,
লতিকা তরুর গলে
পবন পরশে দোলে,
হাসে তরু, ভাসে সুখে প্রণয়-কাহিনী।

৩

বিহগ বিহগী সনে
পশিছে আনন্দ মনে
আপন কুলায়,—বসি ধরিল সঙ্গীত,
ক্লান্ত বসুধার প্রাণ
শীতলি মধুর গান,—
শৃঙ্গে শৃঙ্গে সমীরণ বহিছে সে গীত।

শান্তির আশ্রম যেন
সকলি নীরব হেন,
সায়াহ্ন গিরির শোভা নয়ন-রঞ্জন,
শিরোপরি নীলাম্বর
অসীমতা মুগ্ধকর
পদতলে বসুমতি পুলকে মগন।

৫

হেন সান্ধ্য গিরিশিরে
একটী যুবক ধীরে
আরোহি, বিষণ্ণ আঁখি করি প্রসারণ
নিরখিছে শোভারাশি
চিন্তার সাগরে ভাসি
সান্ধ্য-প্রকৃতির সনে ঢালিয়া জীবন।

৬

প্রশান্ত ললাটে তার
চিন্তার শতেক ধার
বিশাল লোচনদ্বয় বিষাদে জড়িত,
বরণের গৌর আভা,
বদনে গাম্ভীর্য্য শোভা
নিরাশার চিহ্ন তাহে রয়েছে অঙ্কিত!

৭

নিরজন গিরিশিরে
একটী কুটীর হেরে
ক্ষণেক ভাবিল যুবা অনন্য হৃদয়ে,
"অভাগার মত কেহ
ছাড়ি পরিজন গেহ
রয়েছে কুটীরে নিত্য যাতনা সহিয়ে?

৮

"কেবা সে পর্ব্বতবাসী
সহি হিম তাপরাশি
একাকী বিজনে হায় যাপিছে জীবন,
ইচ্ছাকরে কাছে গিয়া
দুঃখ রাশি জিজ্ঞাসিয়া
অসুখের অশ্রু তার করি নিবারণ।

৯

হায় আমি!
"জীবন-বসন্তে কেন
উদাসীন হয়ে হেন
পথে পথে নিরন্তর করিছি ভ্রমণ,
অনশনে দিন যায়
কেবা আর মুখ চায়,
ছিঁড়িয়াছি সাধ করি স্নেহের বন্ধন;

১০

"যে জ্বালা হৃদয়ে লয়ে
যৌবনে সন্ন্যাসী হয়ে
সহিতেছি অনুদিন যাতনা অপার,
শান্তির আলোক ধার
অশান্ত হৃদয়ে আর
বরষিয়া না জুড়ায় এতীব্র আঁধার।

১১

চিন্তার লহরী গুলি
চঞ্চল তরঙ্গ তুলি
বিপ্লাবিত করিলেক যুবার হৃদয়,
বিষাদ নয়ন ধার
অজানিতে শতবার
বিন্দু বিন্দু নেত্রকোণে হইল উদয়।

১২

শূন্যমনে ক্লান্তিভরে
শ্যাম দুর্ব্বাদল পরে
বসুধা হৃদয়ে যুবা লইল আশ্রয়,
চন্দ্রিকা-বসন পরি
অলক্ষিতে বিভাবরী
নীরবে নিদ্রার সহ আসিল ধরায়।

১৩

শান্তিময় চারিধার
একটী নিস্বন তার
পশিলনা যুবকের শ্রবণ ভিতর,
সিকত নয়নদ্বয়,
সকলই শূন্যময়,
চাহেনা বিস্মাদে যুবা গগনউপর।

১৪

চঞ্চল চিন্তার স্রোতে
ভাসি, দৃষ্টি অবনীতে
নামাইয়া, পুনঃ যুবা করিল দর্শন,
নির্ম্মল নিঝরজলে
মৃদুল হিল্লোলে দোলে
চন্দ্র, তারা, বিভাসিত অনন্ত গগন।

১৫

পদতলে নিরঝর
শুভ্রশোভা মনোহর
বহিছে রজত ধারে সুধা বরষিয়া,
তীরে বন ফুলরাশি
চন্দ্রমা কিরণে হাসি
আধ নিমিলিত আঁখি, রয়েছে ফুটিয়া।

১৬

দীর্ঘতরু ফুলরাজি
কৌমুদী কিরণে সাজি
উচ্চমহীধর শিরে, নীরবভাষায়
হৃদয় বিমুক্ত করি
বিভুর মহিমা স্মরি
সানন্দে মিলিত তানে তাঁর গুণ গায়।

১৭

অপার্থিব শোভা সব
মাধুরী জড়িত ভব
নিরখিয়া যুবকের ভাসিল হৃদয়,
একটী চিন্তার পরে
চঞ্চল লহরী ধরে
গত কথা স্বপ্ন সহ হইল উদয়।

১৮

কাঁপাইয়া নীলাম্বর
ভাসাইয়া মহীধর
মধুর সুতীব্র কণ্ঠে ধরিল সঙ্গীত
যুবা, সুধা বরষিয়া
গিরিশির নিনাদিয়া,
নিদ্রিতা বসুধা প্রাণে মিশিল সেগীত।

১৯

যুবার বিষাদ গানে
অম্বরে তারকা প্রাণে
নীরবে করিল যেন দুঃখের সঞ্চার,
নিশার নীহার ধারে
ভাসি নীল পারাবারে
বরষি লোচন নীর ভাসা'ল সংসার।

২০

তারকা-নয়নে নীর,
প্রকৃতি গম্ভীর ধীর,
সিকত সে অশ্রুধারে নিশীথ ধরণী,
সমীর উচ্ছ্বাস তুলি
সে দুঃখ সঙ্গীতে মিলি
গাইল কম্পিত করি নৈশ প্রতিধ্বনি।

২১

ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া
চন্দ্রকর মিশাইয়া
প্রতিধ্বনি সেই কণ্ঠ লইল কুটীরে,
কুটীর বাসিনী বালা
সহিছে অনন্ত জ্বালা,
এ গীত পশিল তার মরম মাঝারে।

২২

ভগ্ন হৃদয় তার
আঘাতিল বার বার,
অভাগিনী শূন্যমনে কুটীর ছাড়িয়া
বাহিরে আসিল যবে,
কিরণ-প্রপাত ভবে
ক্ষণেক দেখিল বালা, নীরবে চাহিয়া

২৩

শোভার তরঙ্গে আজি
মহীধর, তরু রাজি
ভাসিয়া যাইছে সব, হাসে শশধর,
দুঃখিনী হৃদয়ে কেন
মোহের ছলনা হেন,
নৈরাশ্য-জলদ-মাখা যাহার অন্তর।

২৪

শূন্য অচলের শিরে
মানব মূরতি হেরে
ধীরে ধীরে চলে বালা নিকটে তাহার,
দাঁড়াইয়ে ক্ষণতরে,
নিরখিল আঁখি ভরে,
উথলিল অভাগীর স্মৃতি পারাবার।

২৫

"গায়ক সন্ন্যাসী হায়!
কি আশা আমার তায়?
আমার হৃদয়নাথ বলিব কেমনে?"—
বলিয়া মূর্চ্ছার ঘোরে
পড়িল ধরণী পরে
সমর্পিয়া দেহভার যুবার চরণে।

২৬

যুবার চকিত আঁখি
হিমাংশু কিরণ মাখি
পতিত হইল সেই বদন উপরে
ঘুরিল মস্তক তার,
শূন্যময় চারি ধার,
দেখিল সে মুখ যুবা আপন অন্তরে

২৭

নীল পদ্ম পর্ণ আঁখি
শোভার মাধুরী মাখি
সৌন্দর্য্য কিরণে ভাসি মুদিত হইয়া,
পাংশু বদনের পরে
সুঅলক থরে থরে,
চন্দ্রমা বিভায় খেলে লহরী ধরিয়া।

২৮

শোভার প্রতিমা হেরে
যুবক নয়ন নীরে
ভাসিল, সে অশ্রুধারে হৃদয় তাহার
গলিয়া, লোচন দিয়া
অশ্রু-রূপে বিগলিয়া
করিল বিশুষ্ক প্রেমে জীবন সঞ্চার।

২৯

"আমার প্রতিভা হায়!
আজি কি পাইব তায়?—"
বলি যুবা, নিরঝর সলিল আনিয়া
আদরেতে বার বার
সিক্ত করি মুখ তার,
আপন জীবন, প্রেমে দিলরে ঢালিয়া;—

৩০

কহিল তখন,
"তোমার প্রণয় তরে
যে যাতনা প্রাণে ধরে
হতাশ হৃদয়ে আমি ছাড়িয়া সংসার,
ভ্রমিতেছি দেশে দেশে,
কত দুঃখ, কত ক্লেশে
দিন যায়, এ যাতনা কি কহিব আর?

৩১

"প্রতিভা, প্রতিভা মম,
প্রাণ হতে প্রিয়তম,
উঠ প্রিয়ে, ধরা-শয্যা করি পরিহার,
সুদীর্ঘ বরষ পরে
আজি বিধি দয়া করে
মিলাইল তোমা ধনে, কহ একবার—

৩২

"ভালবাস অভাগায়,
এ বিষাদ যাবে হায়!
নিরাশ হৃদয়ে হবে আশার সঞ্চার,
বাসভূমি ছাড়ি কেন,
একাকী অচলে হেন,
সংসার ত্যজেছ কিলো বিরহে আমার?

৩৩

"সে কথা তোমার মুখে
শুনিয়া ভাসিব সুখে,
বিগত জীবন আজ যাইব ভুলিয়া,
নীরজ নয়ন খুলি
মানসে লওলো তুলি,
তোমার পরশে প্রাণ রহিবে বাঁচিয়া"।

৩৪

মূর্চ্ছাভঙ্গে প্রাণপতি
হেরিয়া, কম্পিত সতী
সরিল না বাক্য আর, চাহিয়া বদন
হেরিল অতৃপ্ত হয়ে,
আনন্দ উচ্ছ্বাস সয়ে
রহিল না প্রাণ তার এ বিশ্বে তখন।

৩৫

খুলিল স্বর্গের দ্বার
পবিত্র জীবন তার
প্রবেশিল অমরায়, বিমল কিরণে
মিশিল প্রতিভা, হায়!
পাইয়া আবার তায়
হারাইল, হতভাগা ক্ষণিক মিলনে।

৩৬

সতীর সম্মান তরে
দেবের আশীষ বরে
জনমিল পল্লবিত তরু মনোহর
সেই গিরি শিরোপরে
প্রতিভার মৃত্যু পরে,
পতিব্রতা এজগতে অনন্ত অমর।

৩৭

দিবস রজনী হায়!
গগন বিদারি গায়
সেই তরু পদ-মূলে গায়ক সন্ন্যাসী,
শূন্য শূন্যে ভাসে গীত,
শুনিয়া চকিত চিত—
পথিক, ব্যথিত প্রাণে বুঝে দুঃখরাশি।

শ্রীমতী নীহারিকা রচয়িত্রী।

ব্রাহ্ম সমাজত্রয়ের মিলন।*

প্রকৃত মিলন সম্ভব কিনা ?

বড় শুভক্ষণে বাবু নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র "আলোচনাতে" "সাড়ে তিনটা ব্রাহ্ম দলকে একতার বন্ধনে বদ্ধ" করিবার আলোচনা তুলিয়াছেন। কারণ, বিগত মাঘোৎসব হইতেই আদি, সাধারণ ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার-প্রমুখ নববিধানবাদী ব্রাহ্মসম্প্রদায়ত্রয়কে মিলনের জন্য ব্যগ্র হইতে দেখা যাইতেছে। এই মাহেন্দ্র ক্ষণে এ আন্দোলন আশাপ্রদ বটে। আমার বিবেচনায় আলোচনার কলেবরে ইহার আলোচনা—বাদানুবাদ সম্ভবপর বা উপযুক্ত স্থান নহে। কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর জন্য যখন ইহার পত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তখন তাঁহার সপক্ষে বিপক্ষে অন্যের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহাও বলিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে নির্ভর করিয়াই অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য দুই একটী কথায় বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"সাড়ে তিনটা দল" বলিতে আমরা এই বুঝিয়াছি—আদি এক, সাধারণ এক, আর নববিধান দেড়: এই সাড়ে তিন দলের একীকরণ বা মিলন সম্ভবপর কিনা, ইহার আলোচনা করিতে গেলেই, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, দেখা উচিত। "একেশ্বরে বিশ্বাস, মধ্যবর্ত্তিবাদে অবিশ্বাস, উপাসনা প্রার্থনার আবশ্যকতা স্বীকার"—এইরূপ কয়েকটী মূলমতে বিশ্বাস করিলে এবং নীতিপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হইলেই একজন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন। এই কয়টীতে বিশ্বাস করিতে গেলেই "মনুষ্য নির্ব্বিশেষে সমুদায় নরনারী ভ্রাতা ভগিনী, সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে সকলের সমান অধিকার" ব্রাহ্মকে এরূপ আরো কয়েকটী মতে বিশ্বাস ও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রাহ্মদিগকে আর একটি বিষয় দেখিতে হয়,—প্রত্যেক সমাজের উপাসনালয় প্রতিষ্ঠাকালে সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে যে ট্রষ্ট্ ডিড্ খানা পঠিত ও প্রোথিত হয়, তাহা

* এই বিষয়টী অতি গুরুতর সন্দেহ নাই; কিন্তু আলোচনার স্তম্ভ তাহার আলোচনার সম্পূর্ণ উপযুক্ত স্থান কিনা, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ পূর্ব্ববারের পত্রিকায় একটু অনবধানতা বশতঃই নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটি স্থান পাইয়াছিল। যাহাহউক আলোচনায় এই বিষয়ে অসম্প্রদায়িকতা রক্ষা করিয়া আর বেশী আলোচনা করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যতে আর এ বিষয়ে প্রতিবাদ গৃহীত হইবে না, ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মুখপত্রই এই আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

কার্য্যে পরিণত হইতেছে কিনা? আমাদের মতে এই সাড়েতিনটী দলে এই কয়টী মূলমতে যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলনের কোন অন্তরায় নাই এবং থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে প্রত্যেক ব্রাহ্মের ব্যক্তিগত ভাব ও মনোমালিন্য পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সকলের এক মহা সম্মিলনের জন্য—প্রয়াগতীর্থ স্থাপনের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত।

তবে এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়টী মূলমত ও প্রত্যেক সমাজের ট্রষ্টডিডের কথা লইয়া আদিব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালীর বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। নগেন্দ্র বাবু প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কেবলমাত্র দুইটী বিষয়ে পার্থক্য আছে। তাহা এই—(১) একমাত্র হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে আদি সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক মত গ্রহণ করিয়া হিন্দু ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ ব্রহ্মবাদী হইলেও তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ; (২) জাতিভেদ-পোষক চিহ্ন ধারণ ও ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব কার্য্যতঃ অস্বীকার করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের মধ্যে এক "নববিধান ব্যতীত" নগেন্দ্র বাবু আর কোন পার্থক্যই দেখিতে পান নাই। তিনি বরং এ কথাই বলিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহারই নাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ"। সুতরাং আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে পার্থক্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের "নববিধান" নাম ছাড়িয়া দিলে আদি বাহ্মসমাজের সহিত নববিধান সমাজেরও সেই একই পার্থক্য দাঁড়াইতেছে। তবে এখন দেখা যাক, এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত সাধারণ ও নববিধান সমাজদ্বয়ের পার্থক্য ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলমতগত পার্থক্য কিনা?

অনেক দিন হইল ব্রাহ্মসমাজে ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, বৈদান্তিক ধর্ম্ম আর ব্রাহ্মধর্ম্ম এক নহে। এবং হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক সত্য আছে, সেইরূপ জগতের অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায়ের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক সত্য সকল নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে একমাত্র "হিন্দুভাবে"—"ভারতের ধর্ম্মরূপে" যজন যাজন করিলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদারতা বিনষ্ট হইবে, জগতের ধর্ম্মকে জাতি ও দেশ বিশেষের ধর্ম্ম করা হইবে। তার-

পর জাত্যভিমান বজায় রাখিতে গেলে ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মতে আঘাত পড়ে, অব্রাহ্মের কার্য্য হয়। ইহাতে থিয়ডোর পার্কার, মার্টিনু প্রভৃতি বিদেশী মহাত্মারা একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে পারেন না। যে ধর্ম্মকে আমরা জগতের ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাকে এরূপ সংকীর্ণতর সীমায় বদ্ধ করিতে কোন উন্নতিশীল ব্রাহ্মই বোধ হয় ইচ্ছা করিবেন না। সমুদায় ধর্ম্মের "সার-ধর্ম্মই" (আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ বসুজ মহাশয় এই আলোচনাতেই গত বর্ষে যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন) যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়, তবে আর দেশ কাল পাত্রাপাত্র ভেদ থাকে না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, নগেন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত একযোগে কাজ করার যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেও উক্ত সমাজের সহিত অপর সমাজদ্বয়ের প্রকৃত মিলন হইতেছে না,—মূলমতগত যে পার্থক্য তাহা রহিয়া যাইতেছে; সুতরাং এ মিলন বাহিরের মিলন।

তারপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান সমাজের মিলনের কথা। ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঈশ্বরের "বিধান" (Dispensation) বলিতে বোধ হয় আদি,মধ্য, অন্ত্য কোন ব্রাহ্মসমাজের লোকেরই আপত্তি না থাকিতে পারে। তবে দশ পাঁচ জন লোক এমনও থাকিতে পারেন, যাঁহারা ধর্ম্মকে ঈশ্বরের বিধান বলিতেও হয়ত কুণ্ঠিত। এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ হয় অধিক হইবে না। কোন ধর্ম্মের মধ্যে যতটুকু সত্য আছে, সেই টুকুই ঈশ্বরের বিধান—সমুদায় ধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মেও যতটুকু সত্য আছে, তাহাই ঈশ্বরের বিধান। আজ যাহাকে আমরা সত্য বলিতেছি, ধর্ম্মবির্ত্তনে কালে হয়ত তাহাই অসত্য বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চির উন্নতিশীল, সুতরাং জগতে যে কালে যে সত্য বিকাশিত হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমরা বিশ্বাস করি, ব্রাহ্মধর্ম্মের এখন যাহা মত তাহা সত্য, তাই ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঈশ্বরের বিধান বলিতে আপত্তি নাই। কিন্তু "বিধান" বলিতে আপত্তি না থাকিলেও "নববিধান"বলিতে সাধারণ ও আদি সমাজের সকলেরই আপত্তি আছে, এবং থাকার কারণও আছে। নগেন্দ্র বাবু যাহাই কেন বলুন না, কেশব বাবু যে সকল ক্রিয়া কলাপ করিয়া গিয়াছেন,তাহা নববিধান সমাজের রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত বিধানবাদী বিভাগের কার্য্যকলাপ তাহার সাক্ষ্য। এখনই তাঁহাদের

কার্য্য কলাপে যে সকল কুসংস্কার ঢুকিয়াছে, কালে যে ইহাতে আর কুসংস্কার ঢুকিয়া ইহাকে একটী উপধর্ম্মে পরিণত করিবে, তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ হইতে পারে? আবার নগেন্দ্র বাবু বলেন, "প্রাচীন সময়ে ধর্ম্মজগতে ঈশ্বরের যে সকল ক্রিয়া হইয়াছে, তৎ সমুদায়ের নাম প্রাচীন বিধান; বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহার ক্রিয়া বলিয়াই ইহা নববিধান বাচ্য হইয়াছে"। নববিধান মানিতে গেলেত প্রাচীন বিধান মানিতেই হইবে। নগেন্দ্র বাবু কিংবা নববিধানী বন্ধুগণ কি তবে বলিতে চান যে, প্রাচীন সময়ে ধর্ম্মজগতে যতপ্রকার ক্রিয়া হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের বিধান? শাণিতকৃপাণহস্তে মহম্মদের নরশোণিত পাতের আদেশ, খ্রীষ্টধর্ম্মে পোপদিগের অত্যাচার ও রোমানক্যাথলিকদিগের উপর প্রোটেষ্ট্যাণ্ট দিগের নিষ্ঠুরতা, হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিক ক্রিয়া কলাপ ও যাগ যজ্ঞাদি, সকলই ঈশ্বরের বিধান? তাহাহইলে যে আর ঈশ্বরের বিধান অবিধান কি, তাহার ভেদাভেদ থাকে না—তাহা হইলে যে অদ্বৈতবাদীদিগের ন্যায় বলিতে হয় "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"!! তাই বলিতে ছিলাম, প্রাচীনকালে ধর্ম্মজগতে যে সকল ক্রিয়া-কলাপ হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ঈশ্বরের বিধান নহে—তাহাতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের ব্যক্তিগত মত, ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অজ্ঞানতা জড়িত রহিয়াছে, এবং অধুনাও ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবর্ত্তক ও প্রচারকদিগের কুসংস্কার, ব্যক্তিগত ভ্রান্তমত ঢুকিয়া ইহাকে উপধর্ম্মে পরিণত করিয়া শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিতে বসিয়াছে।

আর একটী কথা। ঈশ্বরের বিধান যাহা, তাহা আবার নূতন পুরাতন কি? ঈশ্বরের যা বিধি, তা চিরকালই এক। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে "নববিধান" নাম দিতে গেলেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগকে প্রাচীন বিধান অথবা এক একটা বিধানবাচক স্বতন্ত্র নাম দিতে হয়। আবার তাহাদিগকে বিধান নাম দিতে গেলেই তাহাদের মধ্যে যাহা কিছু সত্য বা অসত্য আছে, তৎসমুদায়কেই ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। তবে কি মনে করিব, ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্বে যতপ্রকার ধর্ম্মমত জগতে প্রচারিত হইয়াছে,তাহার প্রত্যেকের প্রত্যেকটী মতই ঈশ্বরের বিধান? তাহা হইলে যে ভয়ানক হইয়া দাঁড়ায়।—তাহা হইলে যে ব্রাহ্মকে অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করিতে হয়! অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু মানিতে গেলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলমতে আঘাত পড়ে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নামে অভিহিত করা আর ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি পরি-

বর্ত্তন করা, এক হইয়া দাঁড়াইতেছে! ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নাম দিলেই অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় ইহা উপধর্ম্ম হইয়া পড়িবে, এবং এখনই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। তাই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নামে অভিহিত করিলে তাহার সার্ব্বভৌমিকত্ব বিনষ্ট হয়, তাহাকে উপধর্ম্মে পরিণত করা হয়। বিধানবাদীগণ আর একটী কথা এই বলেন, যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান নাম দিয়া আমরা জগতের সমুদায় ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছি এবং তত্তৎধর্ম্মের সাধক ভক্তদিগকে আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে পাইয়াছি। আমরা বলি, ইহাতে নববিধানের নূতনত্ব কিছুই নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতিতেই ইহা নিহিত রহিয়াছে। নববিধান প্রচারের পূর্ব্বেই এসকল মত ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব "নববিধান" নাম রাখিতে গেলে উভয় সমাজের মধ্যে প্রকৃত মিলন সম্ভব নহে।

তার পর উদারতার কথা। নগেন্দ্র বাবু বলেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্রের যাহা করিবার ছিল, তিনি তাহা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার কার্য্যের জন্য এখন আর কেহ তাঁহাকে কটু কাটব্য বলিও না, গালাগাল দিও না। আমরাও বলি কটু কাটব্য বলা বা গালাগাল দেওয়া সুরুচিসঙ্গত নহে। তবে তিনি যেসকল মত ও ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট করাইয়া ও ব্রাহ্মধর্ম্মের নববিধান নাম দিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের যে ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিতে গেলে কি অন্যায় করা হইবে, না তাঁহাকে গালাগাল দেওয়া হইবে? ইহা যদি নববিধানবাদী বন্ধুরা সহ্য করিতে না পারেন, তবে মিলনত দূরের কথা, একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করার আশাও বৃথা। নগেন্দ্র বাবু আদ্যন্ত আপনার গা বাঁচাইয়া চলিয়াছেন। যত দোষ ত্রুটী সমস্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। আপনাদের দোষ-ত্রুটীর একটী কথাও উল্লেখ করেন নাই। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়েরা ব্যক্তিগত ও সাধারণ ভাবে পুস্তক ও পত্রিকায় যথা অযথারূপে আক্রমণ করিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতি করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া বোধ হয় তাঁহারাই এখন কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইবেন। এই মিলনের আন্দোলনে আমরা সেই সকল পুরাতন কাহিনী আর তুলিব না।

নগেন্দ্র বাবু বলেন "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বেদী লইয়া সম্প্রতি যে বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। * * * * যাঁহার বেদীতে

বসিবার ইচ্ছা হইবে না, তিনি বসিবেন না; যিনি বসিতে চান, তিনি বসিবেন; এইরূপ নিয়ম করাই শ্রেয়ঃ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী ভাল; অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে এ বিরোধ ঘটিত না"। নগেন্দ্র বাবুর এই কয়টী কথায় আমরা একেবারেই সায় দিতে পারিলাম না। তিনি যাহাকে "অতি সামান্য" বলেন, আমরা তাহাকেই "অতি গুরুতর" বলি। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিডের অঙ্গীকারের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হইতেছে। ট্রষ্টডিডে আছে—"এখানে (মন্দিরে) কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা নিকৃষ্ট জীব বা জড় পদার্থ ঈশ্বর জ্ঞানে অথবা ঈশ্বরের সমান জ্ঞানে কিংবা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পূজিত হইবে না এবং ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকটে প্রার্থনা স্তুতি বা সঙ্গীত হইবে না। কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থ বা কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। * * * কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বর প্রণীত বা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত বা সমাদৃত হইবে না"। এই বেদী শূন্য রাখিয়া স্বতন্ত্র বেদীতে বসিয়া উপাসনা করাতে ইহা বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার স্মরণার্থ চিহ্নরূপে রক্ষিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও প্রথমতঃ এই হেতুতেই বেদী শূন্য রাখিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। আবার উৎসবাদির সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের গুণ কীর্ত্তনাদি করিয়া যে সকল সঙ্গীত সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা পদে পদে ট্রষ্টডিডের অবমাননা হইতেছে। এবারও ভাদ্রোৎসবে যে সকল সঙ্গীত গীত হইয়াছে, তাহা ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পরন্তু "যাঁহার বেদীতে বসিবার ইচ্ছা হইবে না, তিনি বসিবেন না"—এটী কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি; কিন্তু "যিনি বসিতে চান, তিনি বসিবেন"—"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী ভাল" বলিয়া নগেন্দ্র বাবু যতই কেন বলুন না, ইহা যে কোন কালেও কার্য্যে পরিণত হইবে, আমরা কেন নগেন্দ্র বাবুও বোধ হয় তাহা বিশ্বাস করেন না। তাহা হইলে আর প্রতাপ বাবু ইচ্ছা সত্ত্বেও বেদীতে বসিতে পাইতেছেন না কেন?

এই সকল কারণেই বলিতেছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ ত্রয়ের যে অসম্মিলন, তাহা ব্যক্তিগত বা কার্য্যগত নহে,—মতগত। এই মতগত পার্থক্য যতদিন না দূর হইতেছে, ততদিন এই তিন সমাজের "সাড়ে তিনটী দলের" মিলন কিছুতেই সংসাধিত হইতেছে না। তবে যে সকল বিষয়ে একযোগে কাজ করা

যাইতে পারে, তাহার অনুষ্ঠান দ্বারা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদ্ভাব স্থাপন ও বর্দ্ধনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করি।

তারপর আদান প্রদানের কথা। পাত্র পাত্রীকে যদি স্বামী স্ত্রী মনোনয়নের ভার দেওয়া হয়, তবে কেবল ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা কেন, অপরাপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও পরস্পরের বিবাহাদি হইতে পারে। এবং বিবাহাদি কার্য্য এরূপ প্রশস্ততর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। তবে "নবসংহিতার" সম্বন্ধে এই মাত্র বক্তব্য যে যদি তাহাতে আপত্তি-জনক কোন অংশ না থাকে, তবে তদনুসারে কার্য্য হওয়া যেরূপ দূষ্য নহে, তদ্রূপ তদনুসারে কেহ অনুষ্ঠানাদি করিতে ইচ্ছা না করিলেও বিধানবাদী বন্ধুদিগের মনক্ষুণ্ণ বা আদান প্রদানে অসম্মত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। পাত্র পাত্রী মিলিয়া যে পদ্ধতি অনুসারে কি যে আচার্য্যের দ্বারা বিবাহিত হইতে ইচ্ছা করিবেন, তদনুসারে অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই বোধ হয় এ সকল গোলযোগের কারণ থাকিবে না।

গুটি দুই কাজের কথা।

একে তিন, তিনে এক, একথা সকল দেশেই প্রসিদ্ধ আছে। তবে ব্রাহ্মসমাজে ইহা খাটিবে না কেন? এক ব্রাহ্মসমাজ হইতে ক্রমে তিন ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, এক্ষণে তিনের মধ্যে মিলন ভূমি কোথায়, তাহা আবিষ্কার করা উচিত। পৃথিবীতে সকল তত্ত্বেরই যদি মীমাংসা থাকে, এবং তাহাই আবিষ্কার করিবার জন্য যদি তত্ত্বদর্শীদিগের চেষ্টা হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ তত্ত্বেরও অবশ্য একটি মীমাংসা আছেই আছে। হিন্দু, যবন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের মধ্যে যেখানে যেখানে একতার স্থল বর্ত্তমান আছে, তথায় দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত সম্মিলন এবং সদ্ভাব স্থাপনার্থ আমরা সকলে প্রয়াসী; কিন্তু ঘরে ঘরে মিলনের জন্য কেন তেমন ইচ্ছা হয় না? ইহা এক কঠিন সমস্যা। ঘরের লোক পর হইলে কি সে এমন শত্রু হয়, যে তাহার সঙ্গে আর কোন বিষয়েই মিলিবে না? ইহা অতি দুঃখের বিষয়। যাউক, আর দুঃখ করিবার সময় নাই, প্রত্যেক সমাজের স্বাধীনমত, স্বতন্ত্র কার্য্যক্ষেত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন্ কোন্ বিষয়ে মিলন সম্ভব, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। সামাজিক সম্মিলন। প্রতিমাসে এক একটী সামাজিক সভা। অন্ততঃ তিন দলের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মগণের তাহাতে উপস্থিতি, নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ, সদালাপ, সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রস্তাব। এটি বড় সভা। তদ্ব্যতীত ছোট ছোট সভা, তাহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা, অবস্থা বিশেষে প্রার্থনা, সঙ্গীত। এইরূপে পরস্পরের সহিত ঘন ঘন সাক্ষাৎ হইলে তাহা হইতে অনেক হিতকর কার্য্যের সূত্রপাত হইবে। উপরি উক্ত দুই প্রকার সভায় তিন দলের চিন্তা ও ভাবের সংঘর্ষণ এবং বিনিময় হইতে পারিবে।

২। সাধারণ হিতানুষ্ঠানে যোগ। কার্য্যযোগেতে পরস্পরের সহিত আরো ঘনিষ্ট যোগ বাড়িবে। এখন যে প্রকার বিচ্ছেদ এবং ঔদাসীন্যভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে দলবিশেষের কোন বিশেষ চিহ্নিত কার্য্যে যোগের সম্ভাবনা নাই; কারণ তাহার ভিতরে বিশেষ মত আছে, সে সকল মতভেদের মত। কিন্তু সাধারণ দাতব্য কার্য্যে,—দুর্ভিক্ষ নিবারণ, যুবাদিগের চরিত্র শোধন, সাধারণ নীতি এবং ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা কিংবা সংবাদপত্র প্রচার, এ সকল বিষয়ে সমাজত্রয় এক সঙ্গে অনায়াসে কার্য্য করিতে পারেন।

৩। সামাজিক ক্রিয়ায় যোগ দান। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, নামকরণ, গৃহপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সাধ্যানুসারে তিন দলের লোককে নিমন্ত্রণ করা। যদিও এরূপ কার্য্য পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু চলিত আছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে হওয়া উচিত।

প্রস্তাবও দেখিতেছি শেষ তিনটিতে দাঁড়াইল! তিনের মধ্যে তবে বোধ হয় কিছু নিগূঢ় সম্বন্ধ থাকিবে। এরূপ প্রণালীমতে কার্য্য করিলে ভবিষ্যতে কি ফল ফলিবে, তাহা ফলদাতা বিধাতাই জানেন; কিন্তু আমাদের আশা হয়, ইহা দ্বারা ক্রমে ভিন্ন দলের ব্রাহ্মগণের মধ্যে বিশ্বাস, সদ্ভাব ও মিলনের ভূমি বিস্তৃত হইবে। এখন যে যে বিষয়ে মতভেদ কার্য্যভেদ আছে, তাহা যে একেবারে বিলুপ্ত হইবে তাহা নহে, কিন্তু বিরুদ্ধ মত এবং ভাব সকল তখন এমন এক উদার এবং দয়ার চক্ষে সকলে দেখিবেন, যাহাতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট শিক্ষা পাইবেন। আপনার লোকের অন্যায় কার্য্য, বিরুদ্ধ মত যেরূপ কৃপা-দৃষ্টিতে দেখা যায়, তখন সেই দৃষ্টিতে আমরা ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে দেখিব। অবশ্য ভয়ে ভয়ে হাতে রাখিয়া এই সকল প্রস্তাব করা গেল, কিন্তু বাস্তবিক তিন দলের মধ্যে বিচ্ছেদ অপেক্ষা মিলনের ভূমিই অধিক প্রশস্ত।

ব্যক্তিগত অনৈক্য গণনা করিতেছি না, সমাজগত—দলগত অনৈক্য সম্বন্ধে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। *

নোয়ার তরণী।

নোয়ার ক্ষুদ্র তরণী প্লাবনের জলে ভাসিতেছে। শৃঙ্গ, কন্দর, উপত্যকা, অধিত্যকা সকলই জলময়। নোয়া কি সপরিবারে রক্ষা পাইবে?—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আকাশ ভেদ করিয়া সুন্দর কপোত চঞ্চুতে নবীন বৃক্ষশাখা বহন পূর্ব্বক নৌকার উপর আসিয়া বসিল; এবং সেই সঙ্গে অকূল জলরাশির ভিতর সুসমাচার অবতীর্ণ হইল। ঘটনার প্লাবনে জনসমাজ ডুবিয়াছে, তার উপরে ক্ষুদ্র আলোচনার তরণী ভাসিতেছে। প্রাণ থাকে কি যায়, ঠিক নাই। ভাবনাকে পিঞ্জরমুক্ত করি, দেখি অকূল জলে আশ্রয় করিবার কোনও পদার্থ পাওয়া যায় কি না? জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, সদাচার, সভ্যতা, সকলই ডুবিবার উপক্রম হইল। ডুবে নাই কি? বাকি আছে কি? সকলই যদি যায়, সমুদায় জগৎ যদি মরে, একটী বস্তু কেবল অবশিষ্ট থাকে। সেই বস্তুর নাম "আমি"। ধ্বংস এবং পরিবর্ত্তন তাবৎ সৃষ্টিকে উদরস্থ করিতেছে; কেবল আমি যাহা ছিলাম, তাহাই আছি। রূপান্তর হইতেছি, অবস্থান্তর হইতেছি; কিন্তু মূলেতে অপরিবর্ত্তনীয় আছি। যদি আমি রহিলাম, যদি আমি আমার আশ্রয় হইলাম, যদি আমিই আমার রাজত্ব, দেবত্ব ও ধর্ম্মমন্দির হইতে পারিলাম, অন্যেতে প্রয়োজন কি তবে? ন্যায়ের কুযুক্তি, দর্শনশাস্ত্রের তীব্র কটাক্ষ, বিজ্ঞানের প্রলাপ আমাকে কি ধ্বংস করিতে পারে? যদি একবার আমার পতন হয়, তার সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়, নীতি, সকলেরই অধঃপতন হয়। আমি বাঁচিলেই ব্রহ্মাণ্ড বাঁচে। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজিদআলি সাহা যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন একটী গজল্ রচনা করেন। তাহার উপসংহার এই—"যব্ মর গুজ্রা, দুনিয়া গুজ্রি।" ধর্ম্মপদ গ্রন্থে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, "জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতি রাত্রে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আপনার উপরে আপনি চৌকিদারি করিবেন।" তৎপরেই ইহা লিখিত আছে—"আপনি আপনার কর্ত্তা, আমার কর্ত্তা আর কে হইতে পারে? আপনি যদি আপনাকে পরাজয় করি, তাহা হইলে এমন একজন প্রভু পাই, যাঁর সঙ্গে

* "ব্রাহ্ম সমাজত্রয়ের মিলন" সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী প্রস্তাব পাইয়াছিলাম, তন্মধ্যে কেবল এই দুইটীই প্রকাশিত হইল।

অন্য কাহারও তুলনা হয় না।" অতএব এই পরিবর্ত্তনের বিষম-বিপ্লবে আলোচনা-তরণী আত্মারূপ অটল পাহাড়ে চিরদিনের জন্য বদ্ধ রহিল। লেখক এবং পাঠক উভয়েই যেন আত্মরক্ষার মহাব্রত পালন করিতে পারেন।

কিন্তু পর্ব্বত ভিন্ন পর্ব্বতকে আশ্রয় দেয় কে? গিরি গিরিপৃষ্ঠে, শিলা শিলা-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চিরদিন নিরাপদ। আমাকে আশ্রয় দিতে হইলে একজন প্রবলতর "আমি" আবশ্যক। শাস্ত্রে বলে, দুইটী সুন্দর পক্ষী এক শাখায় উপবিষ্ট; একটী অপরটীর সহায় ও সাক্ষী। একের নাম জীবাত্মা, অপরের নাম পরমাত্মা। পরমাত্মার কি কিছু নাম আছে? জনহীন অরণ্যে মুশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো, তোমার নাম কি? কি নামে পরিচয় দিলে দুরন্ত মিশরবাসীগণ তোমার আদেশ স্বীকার করিবে?" ঈশ্বর বলিলেন, "আমি আছি" এই মাত্র আমার নাম। "অস্তীতি" ইহা ভিন্ন আর তাঁহার বিষয় কে কি বলিতে পারে? যদি তাবৎ ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যায়, যদি আমাদের শরীরের প্রতি পরমাণু পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, যদি যুক্তি বিজ্ঞান সমুদায় সৃষ্টিকে কল্পনামাত্র বলিয়া প্রমাণ করে, তাহা হইলে এই আদিশক্তি মূলাধার স্বয়ম্ভু প্রাণস্বরূপকে কি পরিবর্ত্তন বা বিকার স্পর্শ করিতে পারে? তাঁর ব্যক্তিত্ব সকল ভুবনের উপরে, তাঁর পুরুষত্ব তাবৎ পৌরুষকারের ভিত্তি। সেই প্রকাণ্ড আমিত্ব মূলরূপে প্রকৃতির ভূমিতে নিহিত এবং তাঁহা হইতেই প্রাণ ও রস সঞ্চারিত হইয়া আমি তুমি—আমরা সকলে—শাখা প্রশাখা রূপে জীবক্ষেত্রে শোভা পাইতেছি। প্লাবনের ভিতরে, ভাবনা-কপোত যখন আমার নিকট আমাকে প্রচার করে, সেই সঙ্গে আমার নিকট তাঁহাকেও প্রচার করে। যদি আমার থাকা যাওয়া কাহারও কথার উপর নির্ভর না করে, তবে যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার থাকা, তিনি কি লোকের কথার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবেন? কথা যাঁহা হইতে, তিনি অনির্ব্বচনীয়; চিন্তা যাঁহা হইতে তিনি অভাবনীয়। তবে কি না কথা এবং ভাবনা তাঁহাকে না পাইয়াও পথহারা পাখীর ন্যায় স্বভাবের বেগে তাঁহারই দিকে পক্ষ চালনা করে। না পাইয়াও যাঁহাকে পাইতে প্রকৃতির এই অনিবার্য্য তৃষ্ণা, তিনি কি চিরকাল অপ্রাপ্য থাকিতে পারেন? বাস্তবিক না পাইয়াই আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি, না জানিয়াই জানিয়াছি। "তাঁহাকে জানিয়াছি, এমনও নয়; না জানি এমনও নয়।" অতএব কোনও যুক্তি, কোনও অসদুপদেশ সেই অখণ্ডনীয়, সর্ব্বাধার প্রকাণ্ড আত্মাকে খণ্ডন করিতে পারে না।

তাঁহার বর্ত্তমানতাতেই আমি আমি, তুমি তুমি। যখন কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন; যখন কিছুই থাকিবে না, তখনও তিনি থাকিবেন। তবে দেখ মহাপ্লাবনে, যদি আমি বাঁচিয়া গেলাম, আর সর্ব্বাশ্রয় অনন্ত আত্মা অমর নির্ব্বিকার হইয়া আমার সঙ্গে রহিলেন, তবে আর নোয়ার তরণী ডুবিবে কেন? নানক গান করেন,—

"প্রভুজি, তেঁই শরণাই আয়া,
উতর গয়া মেরে মনকে সংশা
যব্ তেঁরে দরশন পায়া।"

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

এ মহা সংগ্রামে কে জয়ী?

ভারতভূমি এক প্রকাণ্ড রণক্ষেত্র। কত কাল হইতে যে এই দেশের বক্ষস্থলে কত প্রকার সংগ্রাম হইতেছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? যে সংগ্রামে মহম্মদ ঘোরী ভারতের তোরণ-দ্বার পদাঘাতে উদ্ঘাটন করিয়া অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, যে সংগ্রামে সুলতান মাহামুদ সোমনাথের মূর্ত্তি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া মন্দিরস্থ বহুমূল্য ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়াছিল, যে রণ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া রাজার পর রাজা, সম্রাটের পর সম্রাট আপনাদের অস্তিত্ব হারাইয়াছিল, আমরা সে রণের কথা বলিতেছি না। যে রণ-মদে উন্মত্ত হইয়া রাজপুত রমণীগণ আপনাদের গৌরব রক্ষার জন্য অকাতরে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া এ সংসারে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, যে রণ-কৌশলে মহারাষ্ট্র কেশরী শিবজী মুসলমানগণের প্রাধান্য বিনষ্ট প্রায় করিয়াছিলেন ও কিয়ৎকালের জন্য পর-পদদলিত ভারতবক্ষে হিন্দু পরাক্রমের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, আমরা সেই রণের কথাও বলিতেছি না। আমাদের সংগ্রাম ভিন্ন প্রকারের। এই সংগ্রাম সমাজ-সংস্কাররূপ মহা সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ভাবে ভাবে, নূতনে পুরাতনে, আলোকে ও অন্ধকারে। বহুদিন হইতে আমাদের দেশে এই পবিত্র সংগ্রাম চলিতেছে। কখন কখন রণের প্রখরতা কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিয়াছে, কখন বা সংস্কারক ও সংস্কার বিরোধীগণ বর্দ্ধিত তেজে সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছেন। আজ আমাদের প্রশ্ন, এই মহা সংগ্রামে জয়ী কে?—এত কাল পর্য্যন্ত বিজয়লক্ষ্মী কাহার পক্ষপাতিনী হইয়া আসিতেছেন? এই

প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা বলিব এবং তৎপর তাহার যথা সাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

এ মহাসংগ্রামের প্রারম্ভে আমাদের বঙ্গীয় সমাজ কিরূপ ছিল, তাহার একটী প্রকৃত চিত্র প্রদান করা অতি সহজ নহে। এক দিকে শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ লোকের মনে যতপ্রকার কুসংস্কার প্রবেশ করিতে পারে, বঙ্গবাসীদের হৃদয়ে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সমাজে নৈতিক বন্ধন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে যাও, যেদিকে চাও, কেবল মাত্র দেখিবে ব্রাহ্মণদিগের অন্যায় একাধিপত্য। আর রমণীদিগের কথা যদি বল, তাহাদের দুর্দ্দশার ত সীমাই ছিল না। হতভাগ্য রমণী যেই পতিহারা হইল, আর তাহার নিষ্ঠুর আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া মৃতস্বামীর চিতায় তুলিয়া দিল! হতভাগিনী সেই জ্বলন্ত চিতার আগুনে পুড়িয়া মরিল, আর হৃদয়বিহীন দর্শকগুলি মহানন্দে বাড়ী চলিয়া গেল! সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বঙ্গীয় সমাজ সেই সময়ে সয়তানের ক্রীড়াভূমি ছিল। সমাজের পাপের ভরা যখন পূর্ণ হইল—ঈশ্বর বলিলেন, "এই পর্য্যন্ত তুমি যাইবে আর যাইতে পারিবে না।" তখনই সংস্কারের ভেরী বাজিয়া উঠিল। এক মহাপুরুষ বঙ্গদেশের এই ভয়ানক পূতিগন্ধময় সমাজকে পরিষ্কৃত করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিলেন। বলিতে হইবে না, এই মহাত্মাই প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়। দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া প্রেমে হৃদয়পূর্ণ করিয়া, মাতৃভূমির দুর্দ্দশায় ব্যথিত প্রাণ হইয়া একাকী রামমোহন এই মহারণে প্রবৃত্ত হইলেন। বালক বলিয়া সামাজিকগণ প্রথমতঃ এই বালক-সংস্কারকের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেন না। কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে এই বালক সামান্য বালক নহে—এ বালক পিতার গঞ্জনা ও সমাজের লাঞ্ছনাকে তৃণবৎ উপেক্ষা করেন—যখন দেখিলেন এই বালকের তেজঃপূর্ণ বক্তৃতায় তাঁহার সমবয়স্কগণ মুগ্ধ হইতেছে, তখন সেই এক বালককে বিনাশ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ যুবা বৃদ্ধ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু কি বাতুলতা, ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ের আশ্রয়-স্থান, পবিত্রতা যাঁহার উদ্দেশ্য, সহানুভূতি ও প্রেম যাঁহার পরিচালক, কাহার সাধ্য তাঁহাকে বিনাশ করে? সেই রণভেরী বাজিয়া উঠিল, আজও সেই বাদ্য বাজিতেছে। সেই রণ আজও চলিতেছে। রামমোহন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতৃভূমির ও নরনারীর সেবা করিয়া জগতে অবিনাশী কীর্ত্তি রাখিয়া শান্তিধামে চলিয়া গেলেন। এই মহাপুরুষের বিষয় উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতবর Monier williams

লিখিয়াছেন, "এরূপ লোকের জীবনী কেবল ভারতবর্ষের পক্ষে কেন, সমস্ত জগতের পক্ষে একটী মহামূল্য সম্পত্তি।" রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর সংস্কার-বিরোধীগণ মনে করিয়াছিল যে, ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কারের ভেরীও নীরব হইবে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইল না; এতদিন যে ভেরী রাজা একাকী বাজাইতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ভেরী শতকণ্ঠে শব্দিত হইতে লাগি। জগতে সাধু কার্য্যের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরের বিধান দেখিতে পান না, তাঁহারা এই মহা ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কার-আন্দোলন যদি পরীক্ষা করিয়া দেখি, তাহা হইলে ইহা আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিব যে, তিনি যে সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য ভিত্তির উপর তাঁহার আন্দোলন সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুতেই সেই আন্দোলন বিনষ্ট হইতে পারে না। সেই ভিত্তি কি?—ধর্ম্ম। কেবল ধর্ম্ম বলিলে হইবে না, নিরীশ্বরবাদপূর্ণ থিওসুফিও তো ধর্ম্ম—সেই ধর্ম্ম নয়—কোন সংকীর্ণ ধর্ম্ম নয়,—উদার ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম গম্ভীরভাবে, হৃদয়ে আঘাত করিয়া বলিতেছে "ঈশ্বর জগতের পিতা, নরনারী তাঁহার সন্তান, সেই এক ঈশ্বর আমাদের পূজনীয়, তিনি আমাদের ইহকাল পরকালের আশ্রয়, আর নরনারী আমাদের ভ্রাতা ও ভগিনী।" এই মহাধর্ম্ম, এই উদার প্রেমের ধর্ম্মের সহিত সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সংবদ্ধ। যত দিন পর্য্যন্ত এই জীবন্ত ধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন কি এই আন্দোলন বিনষ্ট হইবে? যাঁহার প্রাণ নরনারীর দুঃখে কাঁদিবে, যাঁহার হৃদয় পদদলিতা হিন্দু নারীর দশা দেখিয়া বিদীর্ণ হইবে, সেই জগতের সাক্ষী পরম দেবতাকে সম্বোধন করিয়া "তোমারি কাজে সঁপিনু প্রাণ" বলিয়া এই মহারণে অগ্রসর হইবে। পবিত্র ধর্ম্মের সহিত এই সাধু কার্য্যের এরূপ পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতেই লক্ষ লক্ষ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া আজও সংস্কারকগণের অমিত তেজের কিছুমাত্র লাঘব হইল না। এজন্যই সংস্কারকগণ বহু শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও সিংহগর্ব্বে বিচরণ করিতেছেন। স্বীকার কর আর নাই কর, ইহা ঠিক কথা যে ব্রাহ্মসমাজই এই মহা কার্য্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মসমাজ একাকী সেই কার্য্য চালাইতেছেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক এই সংস্কার কার্য্যে ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ানদের নিকট হইতেও বড় বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। কেশবচন্দ্র ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহার বক্তৃতাধ্বনি অনেকের কর্ণে প্রতিধ্বনিত

হইতেছে; কেশব যখন তাঁহার সমাজ সংস্কারের বিজয়-ভেরী বাজাইতেন, জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিত। কেশবের অগ্নিময়ী বক্তৃতাধ্বনি বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। কঠিন-হৃদয় পিতা যে এতকাল সংসারের সকল সুখ ভোগ করিয়া ও সকল ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়া বিলাসিতায় ডুবিয়াছিলেন, অথচ আপনার বিধবা বালিকাকে ব্রহ্মচর্য্যের "ফাঁকি" করিয়া সংসারের সকল সুখ ও সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া চির-দাসত্ব-শৃঙ্খল পরাইয়া পিতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ছিলেন, কেশবের জ্বলন্ত বক্তৃতাতে সেই হতভাগ্যেরও পাষাণ হৃদয় গলিয়া গেল, বালিকার সেই দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বালিকাকে ব্রাহ্মসমাজে রাখিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "এই বালিকা তোমাদের নিকট রহিল, ইহার সদ্গতি তোমাদের দ্বারা সাধিত হইবে। আমি আর এস্থলে দাঁড়াইতে পারি না, আমি সমাজের দাস, সমাজ জানিতে পারিলে আমাকে লাঞ্ছনা প্রদান করিবে।" কেশবের বক্তৃতা-ধ্বনি যে কেবল নগরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; তাঁহার সেই মধুর ধ্বনি সকল প্রাকৃতিক বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া দেশের গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে প্রবেশ করিল; তাঁহার সেই স্বাধীনতার কথা, সেই আশার কথা শুনিয়া অনেক মৃত শরীরে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। এ জন্যই দেখিতে পাই, ব্রাহ্মসমাজ অত্যাচার পীড়িতা স্বার্থপর-সমাজ-পদদলিতা বালবিধবার আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে। যে হতভাগিনী কয়েক দিন পূর্ব্বে ভিখারিণী অপেক্ষাও দুঃখিনী ছিলেন, আজ তিনি পুনর্ব্বিবাহিতা হইয়া রাজরাণী হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমার বলিবার যাহার কিছু ছিল না আজ তাঁহার স্বামী, তাঁহার সন্তান, তাঁহার গৃহ—আজ তাঁহার আনন্দের সীমা কি?—কটুবাক্য বই মিষ্ট কথা কেহ যাঁহাকে বলে নাই, আজ তাঁহার সন্তানের মধুর মা মা ধ্বনি, স্বামীর আদর হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। এইরূপ এক একটী পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহ কর্ত্রীর পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলে কাহার হৃদয়ে না সুবিমল আনন্দের সঞ্চার হয়? কিন্তু হায়! সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা নিজেও কোন সৎ-কার্য্য করিবে না, অন্যকেও করিতে দিবে না। একটী দুঃখিনী বালবিধবা দারুণ "ব্রহ্মচর্য্যের" যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইল, আর এই শ্রেণীমধ্যে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। বিকট চীৎকারে তাহারা, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোককে পাগল করিয়া তুলিতে ছিল;

কিন্তু কয়জন তাহা শুনিল? ইহারা মানুষের সাধু কার্য্যের মধ্যে ভয়ানক জঘন্য অভিসন্ধি আরোপ করিয়া কেবল আপনাদের হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করে, আর কিছুই নহে। এমন সুখের সংসার, সুখের স্বামী, সুখের সন্তান সন্ততি আর জীবনের সার ধন স্বাধীনতা হইতে যাহারা চির দিনের জন্য এই দুঃখিনী বালবিধবাদিগকে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করে, তাহাদিগকে যে আমরা কি বলিয়া সম্বোধন করিব, জানি না।

কেশবের দুন্দুভি নীরব হইল, শত কেশব মিলিতকণ্ঠে গগন মেদিনী বিকম্পিত করিয়া সেই তুর্য্যধ্বনি আরম্ভ করিল। শতপ্রাণ রণমদে মাতিয় উঠিল। যে পর্য্যন্ত কুসংস্কার কুরীতি সমাজে বর্ত্তমান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত বঙ্গীয় সমাজ নর নারীর সমান অধিকার স্বীকার না করিবে ও অকাতরে নারী জাতিকে তাহার স্বীয় অধিকার প্রদান না করিবে, সে পর্য্যন্ত তাহারা এই রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে না। একজন যদি নৈতিক সাহসের অভাব বশতঃ পলায়ন করে,দশজন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। এ সংগ্রামে শারীরিক শক্তির প্রয়োজন নাই, মানসিক বিক্রম, নৈতিক সাহস ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর চাই।

পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও এই শ্রেণীর সংস্কারকদিগের সহিত যোগদান করেন নাই, তিনি স্বতন্ত্র ভাবে সংস্কার কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তবে তাঁহার লক্ষ্য একটী কোন বিশেষ প্রথার প্রতি সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি মহা পণ্ডিত। নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া শাস্ত্র সহায়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র সম্মত! কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রচলন বিষয়ে তাঁহার উদ্যম যে আশানুরূপ সফল হয় নাই, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে বোধ হয় যে, ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন যেরূপ একটী উদার ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, ব্রাহ্মগণ যেরূপ ধর্ম্ম জ্ঞানের অনুশাসনে এই সাধুকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলনের সহিত যদি সেইরূপ কোন উদার ধর্ম্মের পবিত্র যোগ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় যে তাঁহার এত উদ্যমের এরূপ শোচনীয় ফল ফলিত না। দেখিতেছি আমাদের দেশে এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, সংস্কার-বিরোধীগণ ছলে বলে কৌশলে সংস্কারকদিগের প্রতি লোকের বিদ্বেষ ও ঘৃণা জন্মাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্য, তথাপি আন্দোলনের গতি রোধ করিতে কেহ সমর্থ হইতেছে না। সংস্কার বিরোধীদিগের সংখ্যা যে অল্প, তাহা নহে। বিরোধীদিগের মধ্যে নানা শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক আছেন।

প্রথম শ্রেণী—যাঁহারা সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সংস্কারকদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, সমাজের বর্ত্তমান কুরীতিগুলি বাস্তবিক কুরীতি নয়, তাহা সমাজের পক্ষে বিশেষ উপকারী—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইঁহাদের যথেষ্ট শিক্ষাভিমান আছে, সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে, হৃদয়ের বিশ্বাস ও মত যাহাই কেন হউক না, তাঁহারা সমাজে আপনাদের প্রতিপত্তিটুকু বজায় রাখিবার জন্য আপনাদের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া অধিকাংশের মতেই মত দিয়া থাকেন এবং ইহার মধ্যে কোন কারণ বশতঃ যদি সংস্কারকদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মে ও দলাদলির ভাবটা প্রবল হয়, তবে তো আর রক্ষা নাই। কি করিলে সংস্কারকগণ অপদস্থ হইবে, ইহাই তাঁহ'দের প্রধান চেষ্টা। সমাজে পসার রাখিবার ইচ্ছাটা ইঁহাদের এত বলবতী যে, যাহা কিছু নূতন তাহাতেই ইঁহারা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইঁহাদের বিজাতীয় ঘৃণা। অথচ সত্যকথা বলিতে গেলে, এই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাই ইঁহাদের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, যে জ্ঞানের অহঙ্কারে ইঁহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন, সেই জ্ঞান কিন্তু ষোল আনা বিলাতী আমদানী।

কিন্তু কাহার সহিত তর্ক করিতেছি, শূন্যে অসি প্রহারে কি ফল লাভ হইবে? যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছে যে অন্যে বুঝাইলেও বুঝিবে না, বিকট চীৎকার ব্যতীত যাহাদের কোন বিশেষ যুক্তিতর্ক নাই, সমাজে পশার রক্ষার জন্য কেবল যাহারা অহর্নিশি ব্যস্ত, তাহাদের সঙ্গে তর্ক করা ও নির্জ্জন অরণ্যে রোদন করা, এ দুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। প্রেমের মাহাত্ম্য সে কি বুঝিবে, যে আপনাকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত? অন্যের সুখ দুঃখে তাহার কি আসিয়া যায়, যে আপনার সুখসাধনে মগ্ন? বিধবার চক্ষের জলের প্রতি সে কেন দৃক্‌পাত করিবে, যে বিধবা হইতে শারিরীক ও মানসিক নানা সুখ সুবিধা উপভোগ করে? স্বার্থপরতায় যাহাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা কি অন্যের দুঃখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখে? তুমি পুরুষ, যত বার তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হইবে ততবার তোমার বিবাহ করিবার অধিকার আছে; কিন্তু হতভাগিনী রমণী যদি পতিহীনা হইল, তুমি তৎক্ষণাৎ ধর্ম্ম প্রচারকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই জ্ঞানহীনা ক্ষুদ্র বালিকার নিকট "ব্রহ্মচর্য্যের" ব্যাখা আরম্ভ কর! কিন্তু তাহার প্রাণে সান্ত্বনা কেন মানিবে?

তুমি যেমন ব্রহ্মচর্য্যের মর্ম্ম বোঝ, ক্ষুদ্র বালিকাও তেমনি বোঝে। হতভাগিনী যাবজ্জীবন এই কল্পিত ব্রহ্মচর্য্যের আগুনে পুড়িয়া মরুক, এই যাহাদের ন্যায় বিচার, এই যাহাদের যুক্তি তর্ক তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিয়া কি হইবে?

সংস্কার-কার্য্যে বাধা দিবার আমাদের অনেক লোক আছে। শত্রু সংখ্যা অনেক। কিন্তু এজন্য কি সংস্কারকদিগকে ভীত হইয়া এই পবিত্র কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে? তাঁহারা কি কখনো এই রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে পারেন? সমাজের প্রাণ স্বাধীনতা, সমাজের ভিত্তি সাম্য। যত দিন না ইহা সমাজে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তত দিন তাঁহাদিগকে এই রণক্ষেত্রে অহর্নিশি জাগিয়া থাকিতে হইবে। তাঁহারা যেন কখন মনে স্থান না দেন যে, এই মহারণে তাঁহাদের পরাজয় হইবে। এই মহারণের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যিনি ইহার ইতিহাস প্রকৃতরূপে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে এ মহাসংগ্রামে কে জয়ী? তিনি জানেন বিজয়লক্ষ্মী এতকাল কোন্ পক্ষকে আশ্রয় করিয়া আসিতেছেন? তিনি জানেন এই পবিত্র রণের পরিণাম কি হইবে? শত্রুপক্ষের নিষ্ফল চীৎকারে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। ইহা গোলা বিহীন কামান মাত্র। এ রণে এখন তাঁহারা জয়ী—যখন এ রণের অবসান হইবে তখনও সংস্কারকের জয় ঘোষিত হইবে। ন্যায় ও প্রেম যাহাদের অস্ত্র, স্বাধীনতা ও সাম্য যাহাদের রণনিনাদ, সত্য যাহাদের আশ্রয় আর ঈশ্বর যাহাদের সেনাপতি, কখন কি তাহারা রণে পরাজিত হইবে? ইহা সত্য যে আমরা অনেকেই ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের সকলই ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র। কিন্তু যখন সেই ক্ষুদ্র মানবের মধ্যে অনন্ত শক্তির কণা প্রবেশ করিয়া উহার প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে, তখন সেই ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রত্ব কোথায় পড়িয়া থাকে? তখন তাহার ন্যায় এক ব্যক্তির শক্তি ও অসীম তেজ দেখিয়া জগৎ অবাক্ হইয়া যায়। ঐ দৈববলে বলীয়ান হইয়া মহাত্মা পার্কার লক্ষ শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়াও ভীষণ দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অনন্ত শক্তির আভা অন্তরে প্রতিভাত হইলে ক্ষুদ্র বালক পর্য্যন্ত এত শক্তির অধিকারী হয় যে, তাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলী আঘাতে সুদৃঢ় প্রস্তরময় গিরিরাজি শূন্যে মিলাইয়া যায়। এই শক্তি দেশী বিদেশী, ক্ষুদ্র বৃহৎ, ধনী দরিদ্রের প্রভেদ জানে না। যত দিন পর্য্যন্ত সংস্কারকগণ এই অনন্ত শক্তিকে আপনাদের নায়ক রাখিয়া

মহারণে প্রবৃত্ত থাকিবেন, যত দিন ন্যায়, সত্য প্রেম ও পবিত্রতাকে আপনাদের সহায় করিয়া রাখিবেন, তত দিন পরাজয়ের আশঙ্কা নাই। সংস্কারকগণ সে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। অসীম সাহস ও দৃঢ়তম বিশ্বাসের সহিত সেই কার্য্য করিতে থাকুন, নিশ্চয় দেখিবেন সত্যের জয় ও অসত্যের বিলয় অবশ্যম্ভাবী।

কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর?

(সন্ন্যাসিনীর উক্তি)

১

কোন্ প্রাণে গাঁথ মালা আর?
শ্মশানেতে যার বাস,
যার ঘরে সর্ব্বনাশ,
কি সুখে সে গাঁথে ফুল হার?
(এ বিলাস সাজে কি গো তার?)

২

ভস্মাবৃত সুখের সে ধাম;
ফুলবন কবিতার,
দাবদগ্ধ ছার খার,
কোথা পেলে কুসুমের দাম?

৩

শ্মশানের শিশু তুই বালা,
শ্মশানে ভোরের বেলা
খেলেছিস্ ছেলে খেলা,
সয়ে গেছে শ্মশানের জ্বালা।

৪

শ্মশানের শিশু তুই বালা,
আশে পাশে চিতা তোর,
কৈশোর স্বপনে ভোর,
কল্পনায় গাঁথিছিস্ মালা।

৫

কল্পনার প্রেম-মালা নিয়া
মরণ উৎসাহে ভোর,
আধখানি প্রাণ তোর
কেন দিলি শ্মশানে ঢালিয়া ?

৬

ভস্মে ভস্ম করি স্তূপ পাকার,
কি ফল লভিবি হা রে,
মরণ কি কভু পারে,
মৃতে প্রাণ করিতে সঞ্চার ?

৭

পার গো, পার গো যদি বালা,
কুমারী হৃদয়ে তব
জাগাও জীবন নব
গাঁথ প্রেমে "সঞ্জীবনী" মালা।

৮

এ মালা পরাবে যার গলে,
নূতন জীবনে জেগে,
স্বরগীয় অনুরাগে,
প্রেম তব লবে প্রাণে তু'লে।

জনৈক বঙ্গ-মহিলা।

———000———

আলোচনা।

ঋগ্বেদের দেবতাগণ—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিত—নবজীবন ; শ্রাবণ। রমেশ বাবু মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন ; ঈশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্পের উপরে আশীর্ব্বাদ বৃষ্টি করুন। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ অতি উপদেয় পদার্থ হইবে। রমেশ বাবু ও তাঁহার সহযোগীগণ উপযুক্ত লোক, অনুবাদ যে নির্ভুল ও সুন্দর হইবে, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। স্বার্থান্ধ শ্রেণী বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষের ঈর্ষা ও শত্রুতাচরণ স্বত্বেও যে রমেশবাবু বঙ্গীয় পাঠকসমাজের চিরকৃতজ্ঞ ভাজন হইবেন, তাহাও স্থির নিশ্চিত। নবজীবনে প্রকাশিত প্রবন্ধটী সম্ভবতঃ রমেশ বাবু তাঁহার সংকল্পিত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকা হইতেই সংক্ষেপ করিয়া ঐ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটী পাঠ করিলে ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য বিশদরূপে জানিতে পারা যায়, ও তাহার সম্যক আলোচনা ও অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রাণে গভীর তৃষ্ণার উদয় হয়। কেবল একটী স্থলে রমেশ বাবু, তাঁহার সরল দেশহিতৈষণা এবং প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তি কলাপের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া, একটী ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি! তাঁহার প্রবন্ধের শেষভাগে রমেশবাবু লিখিয়াছেন যে—হিন্দুধর্ম্ম সজীব ধর্ম্ম, কেননা তাহা চারি সহস্র বৎসর ভারতে বিরাজ করিতেছে। "হিন্দু ধর্ম্মই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের ধর্ম্ম, তাহা চিন্তাশীল পণ্ডিত মাত্রেই জানেন ; তাহার কারণ এই যে, হিন্দুধর্ম্ম সজীব ও উৎকর্ষশীল, মৃত জড় পদার্থ নহে।"—এই বিষয়টী সম্বন্ধে রমেশ বাবুর সঙ্গে আমাদিগের একটু বোঝা পড়া আছে।

এ জগতে দুই শ্রেণীর ভাষা আছে ;—এক শ্রেণীকে সজীব ভাষা বলে—যে ভাষায় লোকে কথা বার্ত্তা কহে ; আর এক শ্রেণীকে মৃতভাষা কহে যে ভাষায় আর আজি কালি কোনও দেশের লোকে দৈনন্দিন ক্রিয়া কলাপ বিষয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে না। ল্যাটিন মৃত ভাষা, সংস্কৃত মৃত ভাষা। ইংরাজি, বাঙ্গলা প্রভৃতি জীবিত ভাষা। জীবন্ত ভাষার লক্ষণই তাহা পরিবর্ত্তনশীল। তাহার ব্যাকরণ সতত পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; মৃত ভাষাতে তাহা হয় না। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে এখন আর কেহ এক চুল পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। সংস্কৃত লিখিতে হইলে সেই প্রাচীন কালের লিখিত ব্যাকরণাদি পুস্তকবদ্ধ নিয়মানুযায়ী লিখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষাতে সেরূপ করিতে হয় না। গ্রন্থকারগণ আপনাদিগের পছন্দমত লিখিয়া যান,

বক্তাগণ আপনাদিগের ইচ্ছামত বক্তৃতা করিয়া যান, ব্যাকরণ তাঁহাদের পদানুসরণ করে। জীবন্ত ভাষায় ব্যাকরণ ভাষার পদানুসরণ করে, মৃত ভাষায় ভাষা ব্যাকরণের পদানুসরণ করিয়া চলে। মৃত ভাষায় সূত্র প্রভৃতি পুস্তকবদ্ধ, সীমা নির্দ্দিষ্ট; জীবিতভাষা স্বাধীন। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই। যেই কোনও ধর্ম্ম পুস্তকবদ্ধ হইল, অমনি প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে তাহা জীবিতের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মৃতদিগের রাজ্যে গমন করিল। ধর্ম্ম পুস্তক ঈশ্বরের স্বহস্তরচিত; তাহার একচুল পরিবর্ত্তন করে কাহার সাধ্য? সুতরাং যে ধর্ম্ম কোনও বিশেষ ধর্ম্মপুস্তকের উপর রচিত, সেই ধর্ম্ম মৃত; তাহার পরিবর্ত্তন করিতে গেলে, তাহা বিপ্লবে পরিণত হয়। তবে কখনও কখনও ধর্ম্মপুস্তকের উপর টীকা টীপ্পনি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন ঘটান গিয়া থাকে বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের জীবন রক্ষিত হয় না। হিন্দুধর্ম্ম পুস্তকনিবদ্ধ। বেদ পুরাণাদি হইতে এক চুল এদিক ওদিক করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। কেহ হিন্দুধর্ম্মের উপর এখন হাত চালাইয়া বর্ত্তমান সময়ের উন্নত জ্ঞান ও শিক্ষার সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার সংস্কৃত ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে না। বর্ত্তমান কালের প্রকৃত হিন্দুগণ তাহাকে উপধর্ম্ম বা অধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয়ই তাহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। এই নব্য হিন্দু সম্প্রদায় যদি আপনাদিগের সংস্কৃত মত ও বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হন, তাঁহারা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ হইতে নিশ্চয় চ্যুত হইবেন। হিন্দুধর্ম্ম সংস্কার করিতে গিয়া মহামতি রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির যে দশা হইয়াছে, তাঁহাদেরও সেই দশা হইবে। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা অভিনব নামে অভিহিত হইবেন। এবং কালক্রমে ব্রাহ্মসম্প্রদায় যেমন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, এই নবহিন্দুসম্প্রদায়কেও ঠিক সেইরূপ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের যদি সে জীবন থাকিত, তবে ইঁহারা হিন্দুনামে অভিহিত হইয়াও তাহার যথেপ্সীত সংস্কার সাধন করিতে পারিতেন;—যেমন বাঙ্গালা লেখক বলিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়াও বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি বাঙ্গলাভাষার অনেক সংস্কার সাধন করিতেছেন। রমেশবাবু তাঁহার হিন্দুধর্ম্মের মত একটী সংজ্ঞার দ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই; সুতরাং তাঁহার হিন্দুধর্ম্মকে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং সে অবস্থায় শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় না ঘটাইয়া হিন্দুধর্ম্মকে জীবিত ও উৎকর্ষশীল বলা যাইতে পারে না।

শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ।

(প্রথম প্রস্তাব)

শাস্ত্রীয় বচন সকলের অন্যায় অর্থ ও অন্যায় প্রয়োগ করা মহাপাপ। ঋষি ও আচার্য্যগণ শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই উপাদেয়। তাহা লঙ্ঘন করিয়া শাস্ত্র-বাক্যের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করা অধর্ম্ম। এই বর্ত্তমান কালে তাদৃশ পাপ ও অধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা দমন করা শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ অধ্যাপক দিগের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি কতিপয় লেখক কয়েক খানি সাময়িক পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সেই সকল প্রবন্ধের মধ্যে অনেক স্থলে শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ ও অযথা প্রয়োগ দৃষ্ট হইল। তন্মধ্যে অদ্য আমরা নিম্নস্থ প্রবন্ধটীর মধ্যগত কতিপয় অন্যায় শাস্ত্রার্থ ধরিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। ভরসা করি, তাহার সুবিজ্ঞ লেখক মহাশয়, আমাদের প্রতি ক্রোধ না করিয়া, শাস্ত্র-বিচারের পদ্ধতি অনুসারে, স্বীয় উদ্ধৃত বচন সকলের প্রকরণগত ও শাস্ত্রানুগত যথার্থ অর্থ অবধারণ করিবেন।

বিগত "চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ" মাসের আলোচনাতে "বেদ সত্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ আছে। ঐ প্রবন্ধটীর কোন কোন অংশ শাস্ত্র-সঙ্গত বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমুদয় প্রবন্ধটী শাস্ত্র-সঙ্গত নহে। বস্তুতঃ সমগ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, লেখক "বেদ" শব্দের এক নূতন অর্থ কল্পনা করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রসিদ্ধ বেদকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বেদকে সত্য কহিয়াছেন। সে সম্বন্ধে তিনি যে সকল শাস্ত্রীয় বচন প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কোন কোন বচনের যেরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই।

তাঁহার ইহাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, "বদ আপ্তবাক্য নহে, তাহাতে অনেক কল্পিত জল্পনা আছে, অতএব তাহাকে পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের আত্মার মধ্যে যে নূতন সত্য কখনও কখনও অকস্মাৎ উদিত হয়, তাহাই সত্য বেদ। তাহা আধ্যাত্মিক সত্য জ্ঞান বিশেষ; মনুষ্য দেব-কৃপায় তাহা লাভ করিয়া প্রচার করিয়া থাকে। বাস্তবিক বেদের আবির্ভাব আত্মাতেই হয়।"

এই অভিপ্রায়গুলি প্রমাণ করিবার জন্য লেখক মহাশয় প্রথমে ভাগবতের প্রথম শ্লোকের এই অংশ উপস্থিত করিয়াছেন।

"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে"

তিনি এই পদটুকুর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"যিনি আদি কবির হৃদয়ের দ্বারা বেদের বিস্তার করিলেন।" কিন্তু সেই আদি কবি কে, কাহার হৃদয়, এবং কিরূপে বেদের বিস্তার করিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝান নাই। ফলতঃ তাঁহার ঐ সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কোচিত অর্থ দ্বারা লোকে যাহাতে তাঁহার নিজ মতটী বুঝিয়া লয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পরব্রহ্ম "আদি কবিতে" আদিকালের বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের অন্তরে "হৃদয়ের দ্বারা" কিনা তাদৃশ মনুষ্যের হৃদয়রূপদ্বার যোগে "বেদের" (অর্থাৎ নব আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যজ্ঞানের) বিস্তার করিলেন। স্বমতপ্রিয় লেখক মহাশয় নিজের এই কল্পিত অভিপ্রায়রূপ ধূলি-মুষ্টি-দ্বারা পাঠকগণের মনশ্চক্ষুকে অন্ধ করিয়া, উক্ত ভাগবৎ বাক্যের প্রকৃত অর্থকে তাঁহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিতে যত্ন করিয়াছেন।

পাঠকদিগের বুঝিবার জন্য আমরা এস্থলে উক্ত ভাগবদ্‌বাক্যের সংক্ষেপার্থ নিবেদন করিতেছি। মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহাশয়েরা তাহার দোষ-গুণ বিচার করিবেন।

শাস্ত্রানুসারে পরমাত্মা ত্রিবিধ নামে উক্ত হন। পরব্রহ্ম, কার্য্যব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম। মোক্ষ ও কৈবল্যরূপে তাঁহার নাম পরব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তাঁহার নাম কার্য্যব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মা, শব্দাবলম্বিতজ্ঞান এবং বৈদিক ক্রিয়ার অধিষ্ঠাতা ও ফলদাতা বিধায় তাঁহার নাম শব্দব্রহ্ম অথবা লক্ষণাপ্রয়োগে বেদই। পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির অনুরোধে কার্য্যব্রহ্ম বা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। সেই ব্রহ্মাই একমাত্র আদি কবি। প্রত্যেক প্রলয়ান্তে প্রথম সৃষ্টিকালে পরব্রহ্ম, ঐ জ্ঞান, মন্ত্র ও ক্রিয়াময় শব্দব্রহ্মরূপ সনাতন বেদশাস্ত্রকে কার্য্য-ব্রহ্মরূপ আদিকবি-ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রেরণ করেন। লিখিত পুস্তকমাত্র বেদ, একথা শাস্ত্রে বলেন না। মূলতঃ বেদ সনাতন ও নিত্যপদার্থ। মহাপ্রলয়ে তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে পরমাত্মার শক্তিতে বিলীন হয়। সৃষ্টি-কালে ব্রহ্মার হৃদয়দ্বার যোগে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ দ্বারা তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ প্রণালীতে স্থূলতঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছে। [illegible] উহার প্রবাহরূপ নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে।

তাহার মধ্যে কোন নূতন সত্য আসে না। পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহাই আইসে; কেননা, তাহা আপ্তবাক্য, সনাতন ও অভ্রান্ত। এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্ম ভেদে বেদ আবির্ভূত হইয়া কালেতে গীত, পঠিত ও লিখিত হয়। যাহা গীত, পঠিত ও লিখিত হয়, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অসত্য বা নূতন সত্য থাকেনা।

"আদি কবি" শব্দে যে ব্রহ্মা এবং সেই ব্রহ্মারই হৃদয়ে যে পরমাত্মা সৃষ্টিকালে বেদরাশি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা বেদ বেদান্ত পুরাণ প্রভৃতি সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। লেখক মহাশয় যদি উক্ত বচনের শ্রীধর-স্বামিকৃত টীকা পাঠ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারিতেন। কেননা তাহার মধ্যে এই সিদ্ধান্ত পোষক তাবতীয় বিখ্যাত বিখ্যাত বেদ বচন ধৃত হইয়াছে। যথা—

"হিরণ্যগর্ব্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেকে আসীৎ"।

অগ্রে হিরণ্যগর্ব্ভের (ব্রহ্মার) উদ্‌ভব হইল, তিনি সকলের একমাত্র জাত-প্রভু।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ
প্রহিণোতি তৈস্মৈ তমিত্যাদি শ্রুতেঃ।"

"যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন" ইত্যাদি (রাঃ মোঃ রাঃ কৃত অর্থ ও সম্মানিত বচন—মাণ্ডুক্যোপঃ ভূমিঃ)

এতাবতা স্বামী লেখেন

"আদিকবয়ে ব্রহ্মণেপি ব্রহ্ম বেদং
যস্তেনে প্রকাশিতবান"। * * "হৃদা
মনসৈব তেনে"—

যিনি 'আদিকবিতে' ব্রহ্মাতে 'ব্রহ্মকে' (শব্দব্রহ্মকে) কিনা বেদকে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ সেই ব্রহ্মার হৃদয়ে কিনা মনেতে প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন বোধ হয় লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে, এই ভাগবৎ বচন দ্বারা তাঁহার অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না। তাঁহার উক্তি এই যে সর্ব্বত্র বিশেষ বিশেষ মনুষ্যদ্বারা অর্থাৎ ব্যক্তি-লক্ষণযুক্ত মানব কর্ত্তৃক "আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য কখনও কখনও তদ্বিষয়ক চিন্তাদ্বারা, সঙ্গনিয়ম

(Law of Association) হেতুক আবিষ্কৃত হয়; কখন কখন সমাধি অবস্থায়, কখনও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে জাগ্রত অবস্থায় অকস্মাৎ প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম বেদ।" এই উক্তি উপরি উক্ত বচনদ্বারা সপ্রমাণ হয়না। ফলতঃ ইহার প্রমাণক বচন কোন শাস্ত্রে পাইবেন না। লেখক মহাশয়ের মতটী বেদবিরোধী ব্যক্তিদিগের আদরণীয় বটে, কিন্তু অশাস্ত্র। এইরূপ শাস্ত্রবাক্যের অর্থ-সংকোচ পূর্ব্বক আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাকরা সাহসমাত্র।

লেখক মহাশয় শতপথব্রাহ্মণের নিম্নস্থ বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"মনো বৈ সমুদ্রঃ মনসো বৈ সমুদ্রাৎ"
বাচাঽভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্"

তিনি উহার এই অর্থ লেখেন "মন সমুদ্র; মন-সমুদ্র হইতে বাক্য-রূপ কোদালীদ্বারা দেবতারা ত্রয়ী (বেদ) বিদ্যা খুঁড়িয়াছিলেন।" তিনি এস্থলে ব্যাখ্যা করেন যে, "এই রূপক বাক্যের স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে, মনের চিন্তা হইতেই বেদ অর্থাৎ নূতন সত্য সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

লেখক মহাশয়ের কৃত এই তাৎপর্য্যটী অশাস্ত্র। কেননা এস্থলে এবং এইরূপ সর্ব্ব স্থলে "মন" শব্দের অর্থ "ব্রহ্মা"। ব্রহ্মার গভীর মানস-সাগরে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বেদ নিহিত ছিল। তাহা হইতে বেদমন্ত্রাধিপ দেবগণের উদ্দিষ্ট যজ্ঞ সিদ্ধার্থ এবং নিবৃত্তি ধর্ম্মের প্রচারার্থ ব্রহ্মারই বাক্যদ্বারা তাহা পূর্ব্ব-কল্পের ন্যায় প্রকাশিত হইল। এস্থলে "মন" শব্দে কোন ব্যষ্টিলক্ষণবিশিষ্ট মানবের মন নহে। কোন মানবের মন বেদরূপ সার্ব্বভৌমিক জ্ঞানের মূল উৎস হইতে পারে না। একমাত্র ব্রহ্মাই বেদের যোনি এবং সার্ব্বভৌমিক মহামানস স্বরূপ ব্রহ্মাই তাহার দ্বার। ব্রহ্মার নাম যে "মন" তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব নাই।

যথা মানবে ১। ৭৪

"তস্য সোঽহর্নিশস্যান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুদ্ধ্যতে।
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকং।"

ব্রাহ্মপরিমিত অহর্নিশান্তে নিদ্রাগত ব্রহ্মা প্রতিবুদ্ধ হয়েন। প্রতিবুদ্ধ হইয়া সৃষ্ট্যর্থ মনকে নিয়োগ করেন।

"সৃষ্ট্যর্থং মনোনিযুক্তিরেব মনঃসৃষ্টিঃ" (কুল্লুকঃভঃ)

ব্রহ্মার এই প্রকার নিয়োগের নাম মনঃ সৃষ্টি।

"অথবা মনঃ শব্দোঽয়ং মহত্তত্ত্ব পর এব" (কল্লুকঃ ভঃ)

অথবা ইহাই বুঝ যে এই "মনঃ" শব্দটী মহত্তত্ত্ববোধক। মহত্তত্ত্ব শব্দে ব্রহ্মাই।

অপরঞ্চ মানবে ১। ৭৫

"মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।"

পরমাত্মার সৃষ্টি-ইচ্ছা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া "মনোমহান" মহত্তত্ত্ব রূপ "মহামন" জগদাদি সৃষ্টি করেন।

অতঃপর বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গপুরাণে একবাক্যে ব্রহ্মার এই সকল নাম কহিয়াছেন।

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পুর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সম্বিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ॥

মনঃ, মহত্তত্ত্ব, মতি, ব্রহ্মা, পুর, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, চিতি, স্মৃতি, সম্বিৎ এবং বিপুর।

সৃষ্টি ও বেদ প্রকাশ স্থলে প্রজাপতি ব্রহ্মাই যে "মন," "মহান" বা "মহত্তত্ত্ব" শব্দে কথিত হন, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পত্রিকা ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নাই। এজন্য আর একটী বৈদিক প্রমাণ মাত্র প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হইব। মুণ্ডক শ্রুতিতে আছে—

"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং॥

অর্থ,—পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে সঙ্কল্প করিলে, তাঁহা হইতে প্রথমতঃ অন্ন উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে সত্য, সত্য হইতে লোক, কর্ম্ম ও অমৃত উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য্য,—সর্ব্ব শাস্ত্রগত বা প্রকরণগত "উপক্রম-উপসংহারাদি লিঙ্গ-ষটক দ্বারা ঋষি ও আচার্য্যগণ শাস্ত্রবাক্যের যে অর্থ অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই উপাদেয়। বচনটী যেরূপ আছে তাহাতে সহসা তাহার কোন অর্থই বোধগম্য হয় না। তাহা এই

"পরমেশ্বর সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। তাহাতে ধান্য যব গোধূমাদি অন্ন জন্মিল। সেই অন্ন খাইয়া মানুষের ধড়ে প্রাণ আসিল। সেই প্রাণ হইতে মানুষের মন জন্মিল। মানুষের মন হইতে সত্য উৎপন্ন হইল। সত্য হইতে যত লোক, তাহাদের কর্ম্ম এবং দেবসেব্য অমৃত উদ্ভব হইল।"

এইরূপ করিয়া যদি ঐ বচনটীর অর্থ বুঝা যায়, তবেই অদ্ভুত ব্যাখ্যা লাভ হইল। এ অর্থে না আছে ধড়, না আছে স্কন্ধ, না আছে পুচ্ছ, না আছে শৃঙ্গ। যদি কেহ এই অর্থে বিশ্বাস করিয়া মনে করেন আমি খুব শাস্ত্র জানি, এবং আর যদি কেহ ঐ অর্থে অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক একেবারে শাস্ত্রকেই অশ্ব-ডিম্ব বলিয়া অবধারণ করেন; তবে তাদৃশ উভয় প্রকার মহাত্মাকেই তুল্যান্যতুল্য পণ্ডিত জ্ঞান করিতে হইবে। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মত-ভেদ লইয়া যদি বিবাদ হয় এবং সেই বিবাদ যদি পত্রিকা-সম্পাদকেরা প্রকাশ করেন এবং পাঠকেরা পাঠ করেন, তবে সকলেরই অন্তে আকাশ-কুসুমবৎ সমান ফললাভ হইবে। সকলেরই—অর্থাৎ "গায় গাওয়ায় যেবা করয়ে শ্রবণ।"

কিন্তু আচার্য্যদিগের ব্যাখ্যা অতি উপাদেয়। তাহাই শাস্ত্রের অভি-প্রেত।তাহাই শাস্ত্রের আদ্যোপান্ত মধ্যবর্ত্তী প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত সমঞ্জসীভূত। উক্ত বেদবাক্যের আচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা এইরূপ :—

"পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহা হইতে "অন্ন" অর্থাৎ জগৎ-সংসারের সাধারণ উপাদান-কারণ- স্বরূপিণী অব্যাকৃত প্রকৃতি বিকশিত হইলেন। সেই অব্যাকৃত অন্নস্বরূপিণী প্রকৃতিরূপ মহাপটে "প্রাণ" অর্থাৎ পরব্রহ্মের সৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তিরূপী হিরণ্যগর্ভ্ভ জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই হিরণ্যগর্ভ্ভরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে "মন" অর্থাৎ সৃষ্টিক্রিয়া সাধনার্থ ব্রহ্ম-মানস উৎপন্ন হইল। (এ স্থলে "প্রাণে" আর "মনে" ঔপ-চারিক ভেদমাত্র)। সেই "মন" অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব হইতে "সত্য" অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হইল। (অব্যাকৃত প্রকৃতি অব্যক্ত বিধায় অসৎ শব্দে কথিত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূত ব্যক্তপ্রকৃতি বিধায় সৎ বা সত্য নামে কথিত হয়)। সেই পঞ্চভূত হইতে "লোক" অর্থাৎ ভূলোক ও স্বর্গলোকাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইল, সেই সকল লোকমণ্ডলে মনুষ্যাদি প্রাণিগণের বর্ণাশ্রমাচারানুযায়ী "কর্ম্ম" অর্থাৎ নানাবিধ ক্রিয়া এবং তাদৃশ ক্রিয়া সমূহের ফলরূপ "অমৃত" উৎপন্ন হইল। "অমৃতং কর্ম্মজং ফলং;" "যাবৎ কর্ম্মাণি কল্পকোটি শতৈরপি ন বিনশ্যন্তি তাবৎ ফলঞ্চ নবিনশ্যতীত্য-মৃতং" ॥ কর্ম্মের ফলের নাম "অমৃত"। অর্থাৎ কল্পকোটি শত কাল যাবৎ যদি কর্ম্ম বিনষ্ট না হয় তাবৎ তাহার ফলও বিনষ্ট হয় না,এজন্য সেই কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট "অমৃত" শব্দে উক্ত হইয়াছে। এতাবতা "মন" বা "মহত্তত্ত্ব"

সৃষ্টিকর্ত্তা বিধায় "মন" শব্দে এই বচনে কেবল মাত্র ব্রহ্মাই অভিপ্রেত হইয়াছেন।

অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, উপস্থিত ক্ষেত্রে "মন" শব্দে ব্রহ্মা। তাহা কোন ব্যষ্টিনরের মন নহে। তাঁহা হইতে যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অনুসারে সৃষ্টি প্রকাশ পায়, সেইরূপ বেদও প্রকাশ পাইয়া থাকে।

লেখক মহাশয় আর্য্যধর্ম্মের মূলস্বরূপ বেদশাস্ত্রকে অপদস্থ এবং স্বীয় অভিমত বেদকে সপ্রমাণ করিবার জন্য শতপথ ব্রাহ্মণের আর একটী বচন তুলিয়াছেন। যথা—

"ত্রয়োবেদা এতএব। বাগেবার্গবেদো,
মনো যজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ।"

তাঁহার অর্থ—"তিনবেদ ইহাই। বাণী ঋগ্বেদ, মন যজুর্ব্বেদ এবং প্রাণ সামবেদ"।

তাঁহার কৃত তাৎপর্য্য—"মন, বাণী ও প্রাণ যদি বেদত্রয় হয়, তবে এ তিনটী প্রত্যেক মনুষ্যেতেই আছে। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যই বেদের আধার হইতে পারে। কিন্তু পারে বলিয়াই যে সকলেই হইবে, তাহা নহে। যাঁহারা বেদপ্রাপ্তির যোগ্যতা উপার্জ্জন করেন তাঁহাদিগের মন, বাণী ও প্রাণই বেদ প্রকাশ করে।"

দুঃখের বিষয়, এ বচনটীও সুবিজ্ঞ লেখক মহাশয়ের মত সমর্থন করে না। কেন না এ স্থলে "বাক্", "মন", ও "প্রাণ" শব্দে মানবের বাক্য, মন, ও প্রাণ নহে। তাহা প্রজাপতি ব্রহ্মার বাক্য, মন ও প্রাণরূপে উহ্যিত হইয়াছে। অতএব উক্ত বচনের অর্থ এইরূপ হইবে।

"ঋগ্বেদ প্রজাপতির বাক্যস্বরূপ।
যজুর্ব্বেদ তাঁহার মনঃস্বরূপ। সামবেদ তাঁহার প্রাণ স্বরূপ।"

প্রজাপতি ব্রহ্মাই একমাত্র সমগ্র বেদের আধার রূপে এই বচনে লক্ষিত হইয়াছেন। কোন বিশেষ মানবের বাক্য, মনঃ,প্রাণ লক্ষিত হয় নাই। কেন না মনু কহিয়াছেন (১২।১৪)।

"পিতৃদেব মনুষ্যানাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়াঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥"

পিতৃ, দেবতা ও মনুষ্যদিগকে হব্যকব্যান্ন প্রদান দ্বারা যে ফললাভ হয়, বেদ তাহার প্রমাণ। বেদকে কেহ ধরিতে পারে না। মীমাংসাদি

শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার প্রমেয়ভাগ বোধগম্য হয় না।

আমাদের মাননীয় লেখক মহাশয় স্বীয় মত প্রমাণ করিবার অভিলাষে মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম হইতে নিম্নস্থ বচনটী তুলিয়াছেন।

"শ্রুতি ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে নেত্যাহুরপরেজনাঃ।
নচ তৎ প্রত্যস্থয়ামো নহি সর্ব্বং বিধীয়তে॥

তিনি এই বচনের এই অর্থ লেখেন—"শ্রুতিকে কেহ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বলেন না। আমরা তাহার নিন্দা করি না; কিন্তু ইহাও (স্বীকার করি) না যে, সকল শ্রুতিই ধর্ম্মবিহিত।" এই অর্থ লিখিয়া মহামান্য লেখক মহাশয় বলেন যে, "ভীষ্মের এই মত যে সকল শ্রুতি ধর্ম্ম-বিহিত নহে, আশ্চর্য্যরূপে ব্রাহ্ম মতের সহিত ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে।" আমরা এ স্থলে পাঠকগণের বোধ সুলভার্থ লেখক মহাশয়ের তাৎপর্য্যকে ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। ব্রাহ্মমতে সকল শ্রুতি, ব্রহ্মজ্ঞান বা সত্যধর্ম্মের অনুকূল নহে। শ্লোকের অর্থে "সকল শ্রুতি ধর্ম্মবিহিত নহে" এই যে বাক্যটী আছে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, লেখক মহাশয় একেবারে তাহা ব্রাহ্মমতে প্রয়োগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মমত সাধারণতঃ যে প্রকারে সংগঠিত হইয়া আছে, তাহাতে আমাদের বিবেচনায় উক্ত বচনটী সেরূপ ব্রাহ্মমতে কিছুতেই সংলগ্ন হয় না। অতঃপর লেখক মহাশয় "সকলশ্রুতি ব্রাহ্মমতে আদরণীয় নহে, কিন্তু কোন কোন শ্রুতি আদরণীয়" এই মনের কথাটার উপরি যে ঐ বচনটী লাগাইতে চাহেন তাহাও সম্ভব হয় না। কেন না, প্রথমতঃ উদ্ধৃত বচনটী "রাজধর্ম্ম" প্রকরণের অন্তর্গত। রাজধর্ম্ম প্রকরণীয় বচন বেদবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযোগী হইতে পারে না। তাহা রাজা, প্রজা, কোষ, সাক্ষ্য, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম ইত্যাদি বিষয়ে লাগিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সেটী যে অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সে অধ্যায়টী "সত্যানৃত" বিষয়ক। অর্থাৎ তাহাতে, কিরূপ স্থলে সত্য কথা কহিবে, কিরূপ স্থলে মিথ্যা কথা বলাও উচিত, এইরূপ "সত্যানৃত" ধর্ম্মের উপদেশ মাত্র আছে। নতুবা, তাহাতে এমন কিছু বিচার নাই যে, বেদ হইতে যাহা সত্যধর্ম্ম তাহা বাছিয়া লইবে এবং যাহা মিথ্যা ধর্ম্ম তাহা ত্যাগ করিবে।—

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সত্য কি, অনৃত কি এবং সনাতন ধর্ম্মই বা কি? কোন সময়ে সত্য বলিবে এবং কোন সময়েই বা মিথ্যা কহিবে?

ঐ সব প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে, বাক্য-কথন-স্থলে সত্য ও মিথ্যার লক্ষণ কি? কখনো কখনো সত্য কথা বলিলে শান্তি ভঙ্গ হয়, রক্তারক্তি হয়, কখনো বা মিথ্যা বলিলে সব দিক্ রক্ষা পায়। অতএব এ সম্বন্ধে "সনাতন ধর্ম্ম" কি? অর্থাৎ শিষ্ট-পরম্পরা ক্রমে ধর্ম্মজ্ঞেরা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? এস্থলে "সত্য" শব্দে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য নহে, মিথ্যা শব্দে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পরিত্যাজ্য মিথ্যা নহে; "সত্য" শব্দে বেদ প্রতিপাদ্য সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞানও নহে এবং "মিথ্যা" শব্দে বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডও নহে। সুতরাং ইহা হইতে ব্রাহ্ম কোন উপকারই লাভ করিতে পারেন না। এখানে "সনাতন ধর্ম্ম" শব্দে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নহে, কিন্তু "সত্য মিথ্যা বলার সনাতন ব্যবহার" মাত্র। সংক্ষেপতঃ এ প্রশ্নে "বেদের কি সত্য, কি ধর্ম্ম্য, কি অসত্য, কি অধর্ম্ম্য" তাহার কোন ছন্দাংশই নাই।

প্রশ্ন যদি বুঝিয়া থাক, তবে এখন উত্তরের সার ভাগ বুঝ।—"ভীষ্ম উত্তর করিলেন—সত্য কথনই উত্তম।—** লোক মধ্যে যাহা দুর্জ্ঞেয়, তাহা কহিতেছি। কোন কোন সময়ে সত্য অবক্তব্য, কখন বা অনৃত বক্তব্য হয়। যাহাতে মিথ্যা সত্য হয় এবং সত্যও মিথ্যা হইয়া থাকে।** সত্য ও মিথ্যা বিশেষ রূপে নিশ্চয় করিতে পারিলে মনুষ্য ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া থাকে।** যে বিষয়ে ধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্লভ ও দুর্জ্ঞেয় এই প্রশ্ন তাদৃশ হইয়াছে। ধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করা অতি দুষ্কর।** জীবগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত ঋষিগণ ধর্ম্মের প্রবচন করিয়াছেন। অতএব যাহা অভ্যুদয় সমন্বিত তাহাই ধর্ম্ম।** জীবগণের অহিংসার নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রবচন কৃত হইয়াছে। অতএব যাহা অহিংসা সংযুক্ত তাহাই ধর্ম্ম।** কোন কোন ব্যক্তি শ্রুতিকেই ধর্ম্ম কহেন, অপরে তাহা অঙ্গীকার করেন না, আমরা তাহার প্রতি অসূয়া করি না, সকলই কিছু বিহিত হয় না, যাহারা অন্যায় দ্বারা কাহারও ধন হরণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে ধনীর সন্ধান বলিয়া দেওয়া উচিত নহে! ইহাই ধর্ম্মরূপে নিশ্চিত।—ইত্যাদি"—

ভীষ্মের উপরিউক্ত উত্তরটী সমগ্রভাবে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে, কি অভিপ্রায়ে এই কথাগুলি উক্ত হইয়াছে। যথা—"কেহ শ্রুতিকেই ধর্ম্ম বলেন, অপরে তাহা বলেন না, আমরা তাহার প্রতি অসূয়া করি না, সকল শ্রুতিই কিছু ধর্ম্ম বিহিত নহে"—। এই কথা গুলির তাৎপর্য্য

এই যে, এই "সত্যানৃত" বিষয়ক প্রশ্নে যে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা অতি দুর্জ্ঞেয়। ধর্ম্মের লক্ষণ কীর্ত্তন করা বড়ই দুষ্কর। কিন্তু জীবগণের 'অভ্যুদয়' অর্থাৎ কল্যাণের নিমিত্ত, এবং জীবগণের অহিংসার নিমিত্ত ঋষিগণ যে সকল "ধর্ম্ম প্রবচন" অর্থাৎ স্মৃতিরূপ-বিধি করিয়াছেন, তাহাই "ধর্ম্ম"। এস্থলে "ধর্ম্ম" শব্দে সদাচার-বিহিত বিধি। কেহ কেহ "শ্রুতিকেই" কিনা মূল বেদকেই সেইরূপ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বা বলেন না, আমরা তাহার কোন কথার প্রতিই অসূয়া করি না। কেননা "সকল শ্রুতিই কিছু ধর্ম্ম বিহিত (অর্থাৎ কল্যাণপ্রদ বিধি) হইতে পারে না। কেবল ঋষিগণ যে সকল বেদানুগত ধর্ম্মপ্রবচন ও স্মৃতি নিবন্ধ করিয়াছেন তাহাই বিহিত। বেদে কেবল শব্দতঃ ও সামান্যতঃ সত্য কথনেরই আদেশ আছে। কিন্তু অনেক স্থলে, সত্য কথন অভ্যুদয়প্রদ নহে। ঋষিগণ বেদের সেই নিগূঢ় ধর্ম্ম—সেই অতি গুহ্য মঙ্গল উদ্দেশ্য—সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রবচন করিলেন "দস্যুকে ধনির সন্ধান বলিবে না—বরং মিথ্যা-শপথ পূর্ব্বক বলিবে "জানি না"। এই সকল স্থলে সত্যাপেক্ষা মিথ্যা কথন শ্রেয়ঃ।" (মহাভারতে উক্ত অধ্যায়ে)। এতাবতা সত্যানৃত কথন সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, তাদৃশ স্থলে শ্রুতি অপেক্ষা ঋষিপ্রবচন অধিক বিহিত। কিন্তু ঐ বচনটীর এমন অর্থ নহে যে, সমগ্র-শ্রুতি বা শ্রুতির সর্ব্বাংশ লেখক মহাশয়ের অভিমত সত্যধর্ম্ম প্রতিপাদক নহে বলিয়া শ্রুতি ও তাহার প্রবচনস্বরূপ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে হেয় পূর্ব্বক মানব আপনার মতের প্রতি নির্ভর করিবেন। সুতরাং আমাদের ব্রহ্মনিষ্ঠ লেখক মহাশয়——

"সকল শ্রুতি ধর্ম্ম বিহিত নহে"

ভীষ্মের এই কথাতে সাহস পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বীয় মতসমর্থন করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিফল হইতেছে। কেননা, তাঁহার মত এই যে, "ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য বেদ নামক পুস্তকে বদ্ধ নহে। বেদের আবির্ভাব আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগৃহীত বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের আত্মাতে বা মনেতে হয়। বেদ নামক পুস্তকে অনেক কল্পনা দেখা যায়। অতএব তাহাকে পরীক্ষা দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা কেবল আপ্ত-বাক্য বলিয়া যে স্বীকার্য্য তাহা নহে। সকল দেশে সকল জাতিতে বেদ জন্মিতে পারে এবং সকল দেশের ধর্ম্ম-গ্রন্থে ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান

শাস্ত্রে বেদ থাকিতে পারে।" লেখক মহাশয়ের এই সকল মত এদেশীয় নহে—শাস্ত্রীয় নহে এবং যুক্তি সিদ্ধও নহে। যাহা হউক, মহাভারতের উক্ত বচন তাহা কোন মতেই প্রমাণ করে না। তিনি যদি অধ্যায়টী পূর্ব্বাপর মিলাইয়া ও ভাবিয়া পড়িতেন, তবে বোধ হয় ওবচনটী কখনই তুলিতেন না।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু—খড়্গপুর।

—০○০—

প্রাচীন ধর্ম্ম সূত্র।

আপস্তম্ব সূত্র।

প্রাচীনকালে দক্ষিণাপথে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যে অন্ধ্র নামে একটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এই খানে আপস্তম্ব বংশীয় এক ব্রাহ্মণ খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে একখানি ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তাহা আপস্তম্বসূত্র নামে বিখ্যাত। সে শাস্ত্র অন্ধ্র দেশীয় রীতি নীতির পরিচায়ক, বা তাৎকালিক আর্য্য সমাজের চিত্র, আমরা বলিতে পারি না। তাহা হইতে কয়েকটী সূত্র অনুবাদ করিয়া আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

ছাত্রাবস্থা।

(সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে)

ব্রাহ্মণ কুমার অষ্টমবর্ষে বসন্তকালে, ক্ষত্রিয় একাদশ বর্ষে গ্রীষ্মকালে, এবং বৈশ্য দ্বাদশ বৎসর বয়সে শরৎকালে দীক্ষা লাভ করিবে।

ব্রহ্মচারী আচার্য্য গৃহে ৪৮, ৩৬, ২৪, বা অন্যূন দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিবে। আচার্য্যের সহিত তর্ক করিবে না, তাঁহার সেবা করিবে, তাঁহার নিম্নতর আসন গ্রহণ করিবে।

ব্রহ্মচারী যজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ ক্ষেত্রে আহার্য্য গ্রহণ করিবে না। মরিচ, লবণ, মধু বা মাংস ভোজন, পাদুকা, ছত্র, অলঙ্কার, বা সুগন্ধ ব্যবহার, দিবানিদ্রা বা স্ত্রীসঙ্গ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। শিখা মাত্র রাখিয়া,

তিনি সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিবেন বা একটী গুচ্ছে কেশগুলি বাঁধিয়া রাখিবেন। তাঁহার গায়ে ও দাঁতে মলা থাকিবে; তিনি হাসিবেন না, বা স্নানকালে জলক্রীড়া করিবেন না। তিনি কোন সভা সমিতিতে যাইবেন না। লাঙ্গুটী চর্ম্মাচ্ছাদন, ও পলাশদণ্ড ব্রহ্মচারীর বিধেয়!

তিনি প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষালব্ধ অন্ন আচার্য্যকে উপহার দিবেন। এবং তিনি আদেশ না করিলে তাহা নিজ ব্যবহারে নিয়োজিত করিতে পারিবেন না। ভোজন পাত্র আপনি পরিষ্কার করিবেন। তিনি আচার্য্যের জল ও যজ্ঞ-কাষ্ঠ আহরণ করিবেন, এবং যজ্ঞ-বেদী পরিষ্কার করিবেন। আচার্য্য জাগিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে উঠিতে হইবে। শয়নকালে তিনি আচার্য্যের পা ধোয়াইয়া ও গা মুছাইয়া দিবেন। তিনি আচার্য্যের পশ্চাদ্গামী হইবেন, পাদুকা বা উষ্ণীষ পরিয়া তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইবেন না; সাবধান হইবেন যেন তাঁহার গায়ের বাতাস আচার্য্যের গায়ে না লাগে; বা আচার্য্য-স্পৃষ্ট বায়ু তাঁহার গায়ে না লাগে। তিনি আচার্য্য সমক্ষে প্রাচীরাদি কিছুতে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বসিবেন না। আচার্য্য সমক্ষে আর কাহাকে আচার্য্যবৎ সম্মান করিবেন না। আচার্য্য যাঁহাকে বন্দনা করিবেন, ব্রহ্মচারীও তাঁহাকে বন্দনা করিবেন। আচার্য্যকে কোন কর্ম্মে উদ্যত দেখিলে, তিনি তাহা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। বিদায় কালে আচার্য্যকে দক্ষিণে রাখিয়া বিদায় লইবেন।

অনধ্যায়।

পৌষ ও চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায়, এবং অমাবস্যায় দুই দিন পাঠ নিষিদ্ধ। যে দিন গ্রামে অতি নিকৃষ্ট (চণ্ডাল) বা অতি উৎকৃষ্ট কোন লোক আসিবে, সে দিন পাঠ নিষিদ্ধ। বিদ্যুৎ বা বজ্রপাত হইলে ও সহধ্যায়ীর মৃত্যু সংবাদ শুনিলে এক দিন; অসময়ে বিদ্যুৎ, বজ্র, ও বৃষ্টিপাত হইলে এই তিনটীর কোন একটীর অভাব হইলে এক দিন; বেদোৎসর্গ উপাকর্ম্ম, এবং অষ্টকাশ্রাদ্ধে তিন দিন, এবং মহা গুরু নিপাতে দ্বাদশ দিন পাঠ বন্ধ থাকিবে। কুকুর, শৃগাল, গর্দ্দভ, পেঁচক বা বৃকের চীৎকার, ক্রন্দন বা বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিলে, অথবা ঝটিকা হইলে পাঠ বন্ধ করিতে হইবে। নিমন্ত্রণ যুটিলে, গ্রহণ, ভূমি কম্প, ঘূর্ণাবর্ত্ত, উল্কাপাত, বা অগ্নিদাহ হইলে এক দিন পাঠ বন্ধ থাকিবে।

আহার্য্য।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যে কোন জাতীয় পাচকের রন্ধন ভোজন করিতে পারেন। কিন্তু, ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতির গৃহে ভোজন করিতে পারেন না।

যে আহার্য্যে চুল বা কীট পড়িয়াছে, পলাণ্ডু মিশিয়াছে, কাহারও অঞ্চল বা পদস্পর্শ হইয়াছে, কুকুর বা বিড়ালে স্পর্শ করিয়াছে, বাজারে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে বা যাহা বাসি হইয়াছে, বা টকিয়া গিয়াছে, তাহা তিনি খাইবেন না।

মদ্য, উষ্ট্র, হরিণ, ও মেষ দুগ্ধ, পলাণ্ডু, রসুন, ছত্রাক, গো, সরভ, গ্রাম্য শূকর, ও যুক্তখুর পশু, গ্রাম্য কুক্কুট, মাংসাশী পক্ষী, হংস, ভাষ ও সারস অভক্ষ্য।

কামধেনু, বৃষ, কচ্ছপ, বন্যবরাহ, সজারু, গণ্ডার, ও শশক অভক্ষ্য মহে। সর্পের ন্যায় মস্তক বিশিষ্ট মৎস্য ও কুম্ভীর অভক্ষ্য।

শূদ্র, বৈদ্য, অস্ত্র ব্যবসায়ী, কুশীদ গ্রাহী, নপুংসক, প্রনিধি, মত্ত, বন্দী ও উন্মাদ প্রদত্ত আহার্য্য অগ্রাহ্য।

বিধি ব্যবস্থা।

নরহত্যা,ভ্রূণ হত্যা, স্বর্ণচুরী, অগম্য গমন, ও সুরা পানে ব্রাহ্মণ পতিত হয়। শূদ্র সহবাস, কুকুর, কুক্কুট ও শূকর ভক্ষণ অশুচিকর।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার আহার করিবেন। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সস্ত্রীক উপবাস করিবেন। বিবাহের সাম্বৎসরিক রাত্রিতে তিনি মাটীতে শয়ন করিবেন। বিবাহ ছয় প্রকার; ব্রাহ্ম, আর্ষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব, আসুর ও রাক্ষস। অতিথি সেবা গৃহস্থের মুখ্য কর্ত্তব্য।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান করণ, দান গ্রহণ উত্তরাধিকার ও শস্য সঞ্চয় ব্রাহ্মণের কার্য্য। ব্রাহ্মণ কখন অস্ত্র স্পর্শ করিবেন না, অস্ত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবার জন্যও নহে। ক্ষত্রিয়ের কার্য্যও ঐরূপ; কেবল যাজন, অধ্যাপন, ও দান গ্রহণের পরিবর্ত্তে রাজ্য শাসন, ও যুদ্ধ কার্য্য সংযোগ করিতে হইবে। বৈশ্যের কার্য্য ক্ষত্রিয়ের অনুরূপ; কেবল শাসন ও যুদ্ধকার্য্যের পরিবর্ত্তে কৃষি, বাণিজ্য, ও গোচারণ সংযোগ করিতে হইবে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের সময় নিদ্রিত থাকিবেন না; থাকিলে উপবাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পিতৃগণের শ্রাদ্ধ

কার্য্য গৃহস্থের নিত্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ আসরে কুষ্ঠ রোগী, ব্যভিচারী ও মুণ্ড-শিরলোক উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয়।

আশ্রম চতুষ্টয়।

আশ্রম চারি প্রকার; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস ও বানপ্রস্থ। যে ব্রাহ্মণ এই চারি প্রকার আশ্রম সেবা করেন,—তাঁহার মুক্তিলাভ হয়। নিরগ্নি, নির্গৃহ, নিস্পৃহ, নিরাশ্রয়, মৌনব্রত, ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী উলঙ্গ হইয়া, বা অন্যের পরিত্যক্ত চিবর পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিবেন। সুখ, দুঃখ, সত্য, মিথ্যা, ইহকাল, পরকাল, ও বেদ উপেক্ষা করিয়া তিনি পরমাত্মার অনুসন্ধান করিবেন। বানপ্রস্থ নিস্পৃহ, নিরাশ্রয়, ও মৌনব্রত হইয়া একাগ্নি রক্ষা করিবেন। বনজাত চর্ম্ম বা বল্কল তাঁহার পরিধেয়। ফল, মূল তাঁহার ভোজ্য; ক্রমে তাঁহাকে এ সকল পরিত্যাগ করিয়া, জল, বায়ু বা আকাশ-মাত্রে জীবন ধারণ করিতে হইবে। গ্রামের বাহিরে একাকী বা সপরিবারে তিনি বাস করিবেন।

রাজধর্ম্ম।

রাজা নগরের মধ্যে দক্ষিণ দ্বারী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবেন। প্রাসাদের দক্ষিণে আমন্ত্রণ গৃহ, এবং তাহার দক্ষিণে নগরের অনতিদূরে সভাগৃহ নির্ম্মিত হইবে।

সভাগৃহে মৃণ্ময় বেদীতে পাশক্রীড়া হইবে। রাজা চৌর্য্য ও ব্যভিচার নিবারণ করিবেন এবং গ্রামণী ও পুরপতি নিয়োগ করিয়া শুল্ক সংগ্রহ করিবেন। ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক, বালক, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, অন্ধ, মূক, বধির ও রুগ্নের নিকট শুল্ক লইবেন না।

বর্ণভেদে ব্যবস্থা ভেদ।

জাতিভেদে পরিচ্ছদ ও নমস্কার প্রণালী স্বতন্ত্র হইবে। দশ বৎসরের ব্রাহ্মণকুমার শতায়ু-ক্ষত্রিয়ের পিতৃতুল্য। সম্ভাষণকালে ক্ষত্রিয়কে অনাময়, বৈশ্যকে অনষ্ট এবং শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন করিতে হইবে।

ক্ষত্রিয় হত্যার প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণকে সহস্র গাভী দান, বৈশ্য হত্যার শত, এবং শূদ্র হত্যার দশটী মাত্র। ব্রাহ্মণ-হত্যার ও গুরুপত্নী গমনের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অপেয় পান, অভক্ষ্য ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া "পবিত্র" পাঠ করিবেন, ও সাতদিন উপবাস করিবেন, এবং অনার্য্যগমন করিলে রোদে পিঠ দিয়া ঘাসের উপর বসিয়া থাকিবেন।

অতিথি ব্রাহ্মণ হইলে উঠিয়া সম্ভাষণ করিবে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলে উঠিতে হইবে না। অতিথি শূদ্র হইলে, তাহার দ্বারা কিছু কাজ করাইয়া লইয়া, তবে খাইতে দিবে।

ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিবেন না, ব্রাহ্মণের দণ্ডদাতা ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্তই তাঁহার যথেষ্ট দণ্ড। শারীরিক দণ্ড ব্রাহ্মণের জন্য নহে। অন্য জাতীয় লোককে রাজা প্রাণদণ্ডও বিধান করিতে পারেন। উচ্চ তিন শ্রেণী শূদ্রাণীর সহিত ব্যভিচার করিলে, নির্ব্বাসণ; কিন্তু শূদ্র উচ্চ শ্রেণীকে ঐরূপ করিলে প্রাণদণ্ড লাভ করিবে।

শূদ্র উচ্চজাতীয় কাহারও নিন্দা করিলে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে। সে উচ্চ জাতীয় কাহারও সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে ব্যবহার করিলে বেত্রাঘাতে পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবে। শূদ্র চুরী করিলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে, ও তাহার সম্পত্তি সরকারে জব্দ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ঐরূপ অপরাধ করিলে, তাহাকে অন্ধ করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহার চোখের উপর একটা কাপড় বাঁধিয়া দিবে!

গৌতম-সূত্র।

গৌতমধর্ম্মশাস্ত্র আপস্তম্ব অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহাও দক্ষিণাপথে রচিত হইয়াছিল। প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র সকলের তুলনা করিয়া আর্য্য ইতিবৃত্তের অনেক কথা আবিষ্কার করা যাইতে পারে।

ছাত্রাবস্থা।

(তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে)

পাঠকালে আচার্য্য ও শিষ্যের মধ্য দিয়া কুকুর, নকুল, সর্প, ভেক, বা বিড়াল চলিয়া যাইলে শিষ্যকে তিন দিন উপবাস করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, ও নিত্যস্নায়ী হইবেন। তিনি সূর্য্যের দিকে চাহিবেন না। মধু, মাংস, সুগন্ধ, মাল্য, যান, পাদুকা, দিবানিদ্রা, কাম, ক্রোধ, লোভ, ব্যাকুলতা, বাচালতা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ভয়, ও দন্তধাবন পরিত্যাগ করিবেন। গুরু সমক্ষে তিনি থুথু ফেলিবেন না, হাসিবেন না, হাই তুলিবেন না, বা আঙ্গুল মট্‌কাইবেন না। কখন গুরুর নাম ধরিবেন না, সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষা হীনতর আসন গ্রহণ করিবেন।

গুরু শিষ্যকে শারীরিক দণ্ড বিধান করিবেন না, আচার্য্য ব্রাহ্মণ না হইলেও শিষ্য তাহার সম্মান করিবে।

শ্রাবণ পূর্ণিমায় বেদপাঠ আরম্ভ করিবে। ঝড় উঠিলে, মৃদঙ্গ, রথচক্র বা আর্ত্তনাদ শুনা গেলে, দল বাঁধিয়া শৃগাল, কুকুর বা গর্দ্দভ ডাকিলে, রামধনু উঠিলে, আকালিক চন্দ্রমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, বা মেঘ দেখা গেলে পাঠ বন্ধ থাকিবে। বজ্রাঘাত, ভূকম্প, উল্কাপাত, গ্রহণ, অমাবস্যায় এবং আষাঢ়, কার্ত্তিক ও ফাল্গুন পূর্ণিমায় একদিন অনধ্যায়। যুগপৎ বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত হইলে তিনদিন অনধ্যায়।

নগরে বেদাভ্যাস নিষিদ্ধ।

আশ্রম।

আশ্রম চারি প্রকার; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, ভিক্ষু ও বৈখানস। গার্হস্থ্য এই সকলের মূল। কারণ, গৃহী ভিন্ন আর কেহ সন্তান উৎপাদন করে না।

ভিক্ষু বা সন্ন্যাস আশ্রম বৈখানস বা বানপ্রস্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। নিঃসম্বল, নিস্পৃহ, নির্ব্বিকার, মৌনব্রত ও জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী কেবল ভিক্ষা হেতু গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সকলের আহার সমাপন হইলে তিনি ভিক্ষা করিবেন, এবং একপথে একবারের অধিক চলিবেন না। বর্ষার চারি মাস তিনি একস্থানে থাকিবেন; অন্য সময় এক গ্রামে দুই রাত্রি যাপন করিবেন না। নগ্নতা নিবারণ করিবার জন্য তিনি বস্ত্র পরিধান করিবেন। বৈখানস বনে বাস করিবেন এবং স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফল, মূলে জীবন রক্ষা করিবেন। শ্বাপদ-হত মৃগমাংস তাঁহার অভক্ষ্য নহে। তিনি জটা, বল্কল ও চর্ম্ম ধারণ করিবেন এবং কখন গ্রামে প্রবেশ করিবেন না। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বজাতীয় এবং আপনার অপেক্ষা অল্প বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিয়া ব্রহ্মচারী গৃহী হইবেন। বিবাহ আট প্রকার; ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব, গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ। প্রথম চারিটী বৈধ। আপন অপেক্ষা এক, দুই বা তিন শ্রেণী নীচে বিবাহ করিলে সন্তান সবর্ণ, অম্বষ্ঠ, ও উগ্র, বা নিষাদ আখ্যা লাভ করে। ঐরূপ নিম্নতর শ্রেণীর স্বামী ঘটিলে সূত, মাগধ, আয়োজব, ক্ষত্রি, বা চণ্ডাল উপাধি লাভ করে। ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়ে সূত, ব্রাহ্মণী ও বৈশ্যে মাগধ এবং ব্রাহ্মণী ও শূদ্রে চণ্ডাল উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্ম বিবাহে উর্দ্ধ ও অধস্তন বিংশতি

পুরুষ, প্রাজাপত্য ও দৈবে দশ পুরুষ এবং আর্ষ বিবাহে সাত পুরুষ উদ্ধার হয়।

বিধবা ইচ্ছা করিলে দেবরের ঔরসে পুত্রোৎপাদন করিতে পারে। দেবরের অভাবে সপিণ্ড, সগোত্র, সমান প্রবর বা স্বজাতীয় যে কাহারও সহবাস করিয়াও পারে; কিন্তু দুইটীর অধিক যেন সন্তান না হয়। স্বামী ছয় বৎসর নিরুদ্দেশ হইলেও স্ত্রী সপিণ্ডের সহিত সহবাস করিতে পারে। পাঠার্থী দ্বাদশ বৎসর নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। বালিকা কাপড় পরিতে শিখিবার পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া কাহারও মত, কিন্তু রজোদর্শনের পূর্ব্বেই বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ঘটনার তিন মাস মধ্যে অভিভাবক বিবাহ না দিলে কন্যা আপনি পতি গ্রহণে অধিকারিণী। শূদ্রকে প্রতারণা করিয়া বিবাহ-অর্থ সংগ্রহ করা দুষণীয় নহে। বেদপাঠ ও তর্পণ গৃহীর নিত্য কর্ত্তব্য। রাগে, আনন্দে, ভয়ে, লোভে, যন্ত্রণায়, বাল্যে, বার্দ্ধক্যে ও মত্ততায় মিথ্যা কথা কহিলে পতিত হয় না; এবং বিবাহ উপলক্ষে মিথ্যা কথা কহিলে পাপ হয় না।

শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও উৎকৃষ্ট ভোজ্য দিবে। বেদানভিজ্ঞ, কিন্তু সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণকে মধ্যবিধ, এবং অসচ্চরিত্রকে ঘাস ও জল খাইতে দিবে। ব্রাহ্মণ অতিথিকে কুশল, ক্ষত্রিয়কে অনাময়, এবং বৈশ্য ও শূদ্রকে আরোগ্য প্রশ্ন করিবে।

শূদ্রকে অতিথি বলিয়া বিবেচনা করিবে না। ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের পরে ভোজন করাইবে। ধনবান্ অপেক্ষা কুটুম্ব, তদপেক্ষা উন্নতবর্ণ, তদপেক্ষা বিদ্বান্, তদপেক্ষা বয়োঃজ্যেষ্ঠ সম্মাননীয়। বিপদে পড়িলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু শূদ্র-ব্যবসায় সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

ব্রাহ্মণের পক্ষে সপ্তপাক যজ্ঞ, সপ্তহবির্যজ্ঞ, এবং সপ্তসোমযজ্ঞ বিধেয়। পাকযজ্ঞ যথা;—অষ্টকা, পার্ব্বণ, তর্পণ, শ্রাবণী, অগ্রহায়ণী, চৈত্র, বা আশ্বযুগী। হবির্যজ্ঞ যথা;—অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়, পশুবন্ধ, এবং সৌত্রামণী। সোমযজ্ঞ যথা;—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ, ষোড়াসিন, অতিরাত্রে, এবং আপ্তার্য্যাম। গৃহী ব্রাহ্মণ অনার্য্যদিগের সহিত কথা কহিবেন না। ব্রাহ্মণসন্তান দাড়ি রাখিবেন না। তিনি স্ত্রীর সহিত একত্র ভোজন করিবেন না। পথে চলিবার সময় উষ্ণীষ ব্যবহার করিবেন না

রাজধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজা আর সকলেরই প্রভু। তিনি সকলকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবেন। যাহারা আত্মদমনে সক্ষম নহে, তিনি তাহাদিগকে দমন করিবেন। ব্রাহ্মণ ও অকর্ম্মণ্যদিগকে রাজা প্রতিপালন করিবেন। শস্যের দশম, অষ্টম, বা ষড়ভাগ রাজার প্রাপ্য, বাণিজ্য-শুল্ক মূল্যের বিংশতিভাগ। শ্রমজীবীরা মাসে একদিন বেগার দিবে।

শূদ্র উচ্চ জাতীয়ের নিন্দা করিলে, বা বেদ পাঠ করিলে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে; উচ্চ জাতীয়ের সমকক্ষতা করিলে, শারীরিক দণ্ড দিবে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নিন্দা করিলে, শত কার্শপণ ও বৈশ্য ঐরূপ করিলে দেড় শত কার্শপণ দণ্ড দিবে; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিন্দা করিলে পঞ্চাশ ও বৈশ্যের নিন্দা করিলে পঁচিশ কার্শপণ দণ্ড দিবেন। কিন্তু শূদ্রের নিন্দা দণ্ডনীয় নহে। বিংশতি কার্শপণের মাসিক সুদ পাঁচ মাস। সুদ ও আসল সমান হইলে আর সুদ দিতে হইবে না। কিছু বাঁধা থাকিলে সুদ দিতে হয় না। ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড নাই। নির্ব্বাসন তাঁহার পক্ষে কঠিনতম দণ্ড। কাহারও প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় দোষ নাই।

ব্রাহ্মণের অশৌচ দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের একাদশ, বৈশ্যের দ্বাদশ, শূদ্রের এক মাস। অশৌচ সময়ে স্নান ও মাংস ভক্ষণ নিষেধ; এবং মাটিতে শয়ন ও উপবেশন বিধেয়।

আহার্য্য।

ভৃত্য, কৃষাণ ও ক্ষৌরকার প্রদত্ত আহার্য্য-গ্রহণীয়; কিন্তু নপুংসক, রক্ষক, সূত্রধর, কৃপণ, বৈদ্য ও মুণ্ডশির প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণীয় নহে। মেষ ও উষ্ট্রের দুগ্ধ, যাহাদের পাঁচটী করিয়া আঙ্গুল আছে কি দুই সার দাঁত আছে, যাহারা লোমশ, যাহারা লোমশূন্য, তাহাদের মাংস অভক্ষ্য। সজারু, স্বাবিড়, গণ্ডার ও কচ্ছপ ভক্ষ্য; প্লব, হংস ও সারস, গৃহশূকর ও কুক্কুটমাংস, ছত্রাক, এবং পলাণ্ডু অভক্ষ্য।

বিধি ব্যবস্থা।

ব্রাহ্মণ বা রাজাকে হত্যা করিয়াছে, শূদ্রের যাজন করিয়াছে, অপাত্রে বেদ রহস্য প্রকাশ করিয়াছে, নিম্নতম ব্যক্তির সংসর্গ করিয়াছে, এমন পিতাকে পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, রীতিমত তাহার শ্রাদ্ধ করিবে। ব্রহ্মহত্যা, গুরুপত্নী গমন, মদ্যপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ চুরী করিলে পতিত হয়।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও গুরুনিন্দা মহাপাতক। ব্রহ্মহত্যা করিলে দ্বাদশ বৎসর, ক্ষত্রিয় হত্যায় ছয় বৎসর, বৈশ্য হত্যায় তিন বৎসর, এবং শূদ্র হত্যায় এক বৎসর অতিকৃচ্ছ্র সাধন করিবে। গোহত্যা, আর বৈশ্য হত্যা সমান। ভেক ও ইন্দুরাদি বধ করিলে পাপ হয়; কিন্তু বারনারী হত্যা করিলে কোন পাপ নাই। মদ্যপানের প্রায়ঃশ্চিত্ত নাই। যে স্ত্রী নিম্নতর জাতীয়ের সহিত ব্যভিচার করিবে, তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবে। সূর্য্যোদয়ের সময় নিদ্রিত থাকিলে, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। এবং সূর্য্যাস্তের সময় নিদ্রিত থাকিলে, সমস্ত রাত্রি ঐরূপ করিবে। অখ্যাদ্য ভোজন করিলে, তিন দিন উপবাস করিবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ।

সাম্য ও অনুপাত।

কিছু দিন হইল এ দেশের একদল লেখক সাম্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদিগের লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁরা বলেন, সাম্য কবির কল্পনায় বা বাতুলের বাতুলতায় তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবনে, সংসারের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে সাম্যবাদ ঘটিতে পারে না। বৈষম্যপূর্ণ সংসারে সাম্য স্থাপনের চেষ্টা আর শূন্যমার্গে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণের চেষ্টা—উভয়ই সমান, উভয়ই পণ্ডশ্রম। ইহাঁরা অনুপাতবাদী।

বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক সদা সর্ব্বত্র সাম্যবিরোধীগণ সাম্যবাদের একটা কল্পিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া তাহার সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। সাম্যবাদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারিলে, অথবা বুঝিতে পারিয়া তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিয়া নিলে, তাহার বিরুদ্ধে আর যাহা কিছু দাঁড় করান যাউক না কেন, একটা অনুপাতবাদ দাঁড় করান যায় না, ইহা স্থির নিশ্চিত। একটু তলাইয়া দেখিলে অনুপাতবাদের যদি কোনও সদর্থ থাকে, তাহার সঙ্গে যে সাম্যবাদের বড় একটা বিরোধ নাই ইহা সহজেই দেখা যাইবে।

সাম্য কাহাকে বলি? সাম্য অর্থ এ নহে যে মনুষ্যমাত্রেই সমশক্তি সম্পন্ন। কালিদাস, শেক্ষপীর, দান্তে এবং তুমি আমি, রামু শ্যামু সকলেই ক্ষমতাতে অথবা প্রতিভাতে সমান, সাম্যবাদী এ অদ্ভুত কথা বলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র বলেন,—মানুষ মাত্রেরই অধিকার সমান। মানব-সমাজে জাতিভেদে বা জন্মভেদে অধিকার ভেদ থাকা অন্যায় ও অযৌক্তিক। *

অনুপাতবাদী কি বলেন? অনুপাতের যদি কোনও অর্থ থাকে, তবে তাহা এই যে, যাহার যেরূপ শক্তি তাহার সেরূপ অধিকার হইবে। অথবা গণিতের ভাষায়—

রামের শক্তি : শ্যামের শক্তি :: রা-র অধিকার : শ্যা-র অধিকার।

এই অনুপাতের দুইটী ব্যাখ্যা হইতে পারে।

(১) রাম শ্যাম অপেক্ষা বলবান, অতএব রামের শ্যামকে প্রহার করিবার অধিকার আছে। পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা বলবান, অতএব তাহার এক পত্নী বর্ত্তমানে অপর পাঁচটী বৈধ ও অবৈধ পত্নী রক্ষা করিবার অধিকার আছে; আর রমণী অবলা অতএব স্বামীর মৃত্যুতে সে স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ব্রহ্মচারিণী হইয়া হিন্দুকুলের ধর্ম্ম রক্ষা করিবে।

* মার্কিন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাপত্রে এবং তৎপরে ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফরাসী জাতীয় সমিতির (National Assembly) মানবের অধিকার সম্বন্ধীয় অনুশাসন পত্রে (Grand Declaration of the rights of men and of citizens) আধুনিক সাম্যবাদীদিগের মত অতি বিশদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত দলিলে লিখিত আছে :—

"We hold these truths to be self-evident—that all men are created equal; that they are endowed by their creator with certain unalienable rights; that these are life, liberty and the pursuits of happiness; ইত্যাদি।—

ফরাসী অনুশাসন পত্রে আরো বিশদ ভাষায় এই মত প্রচারিত হইয়াছে :—

The representatives of the people of France, formed into a National Assembly, considering that ignorance, neglect, or contempt of human rights are the sole causes of public misfortunes and corruptions of Government, having resolved to set forth in a solemn declaration, those natural imprescriptible and unalienable rights—* * recognise and declare in the presence of the Supreme Being and with the hope of His blessing and favour the following sacred rights of men, and of citizens :—

1. Men are born and always continue free and equal in respect of their rights. Civil distinctions, therefore, can only be founded upon public utility.

Equal in respect of their rights—অধিকার সম্বন্ধে মানুষ মাত্রেই সমান—ইহাই প্রকৃত সাম্যবাদ। মার্কিন দলিলে All men are created equal—তাহার অর্থও equal in respect of their rights.

(২) নবজীবন সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিধবা বিবাহ প্রস্তাবে অনুপাত-বাদের এই পবিত্র ব্যাখ্যার আভাস পাওয়া যায়।

ইংরাজ বাঙ্গালী অপেক্ষা সবল অতএব তাহার জন্য ভারতের ক্ষীর-সর নবনীত টেবিলে সুপরিপাটীরূপে সজ্জিত থাকিবে, আর বাঙ্গালীর জন্য কোথাওবা বুটের অগ্রভাগ, কোথাওবা কিলটা ঘুসিটা, আর কোথাওবা কাঁকড় প্রস্তুত থাকিবে। অনুপাতবাদী দেশহিতৈষী;—সাহেব বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহার অনুপাতবাদটা ঘাটাইলে তত ভাল লাগিবে কি?

অনুপাতবাদের এই অর্থ হইলে, তাহাকে যে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে সহজে দাঁড় করান যাইতে পারে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলে অনুপাতবাদীকেও ইহা মানিয়া নিতে হইবে যে জগতের আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষ মানুষের উপর যেখানে যত অত্যাচার করিয়াছে তৎসমুদায়ই ন্যায়সঙ্গত। আর আজিও পৃথিবীর যেখানে যত অত্যাচার হইতেছে, কুলীরমণীর সতীত্ব হরণ করিয়া দুরাত্মা ওয়েবের বিচারে মুক্তিলাভ হইতে, রুষিয়ার মূক প্রজাবৃন্দের উপর জারের দুর্ব্বিসহ অত্যাচার, সকলই ন্যায়সঙ্গত। জোর যার মুলুক তার—Survival of the fittest—এই অনুপাতবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও চলিতে পারে। তবে দুঃখ এই, এই বীভৎস অনুপাতবাদকে সাম্যের বিপক্ষে দাঁড় করাইলে তদ্দ্বারা সাম্যের শক্তি ও তেজ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।

(২) কিন্তু অনুপাতবাদের ভিতরে এতদপেক্ষা সমধিক যুক্তিসঙ্গত একটা অর্থও থাকিতে পারে। সেটী এই যে, যে ব্যক্তি সে অধিকার ভোগ করিবার উপযুক্ত সে সেই অধিকার ভোগ করিবে। অনুপাতবাদের এই অর্থই সদর্থ হইলে, তাহার সঙ্গে সাম্যের বড় একটা বিরোধ থাকিতে পারে না।

প্রত্যেক অধিকারের সঙ্গে কতকগুলি কর্ত্তব্য বাধা আছে। এই সকল কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অনুযায়ী অধিকারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে অধিকার যত বড়, তাহার পশ্চাৎবদ্ধ কর্ত্তব্য রাশি তত ভারি। যে অধিকার সংলগ্ন কর্ত্তব্যরাশি সাধন করিবার আমার ক্ষমতা আছে, আমি সে অধিকার ভোগ করিব; আর যে অধিকার সংলগ্ন কর্ত্তব্য-রাশি পালন করিবার তোমার সামর্থ্য আছে, তুমি সে অধিকার ভোগ

করিবে। ইহা অতি সহজ কথা। এইরূপ হওয়াইতো উচিত। সাম্যবাদী ইহার বিরোধী নন।

যাঁহার যেরূপ শক্তি তাহার অধিকার সেরূপ হইবে। বেশ কথা! কিন্তু কাহার কিরূপ শক্তি আছে,তাহা জানিব কেমন করিয়া? ইহার একটী মাত্র উপায় আছে—পরীক্ষা। যে, যেশক্তির পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইবে, সেই সেই শক্তির অনুযায়ী অধিকার লাভ করিবে।

আর একটী কথা। অধিকার মাত্রই শক্তি অনুযায়ী হওয়া কর্ত্তব্য, অনুপাতবাদ একথা বলে। সুতরাং অনুপাত-বাদী ইহাও বলিতে বাধ্য যে,শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ না করিয়া কাহাকেও কোনও অধিকার দেওয়া যাইবে না। অথবা কেবল প্রতিযোগীতা দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লভ্য। অতএব সকল প্রকারের অধিকার লাভের জন্য মানুষ মাত্রেরই চেষ্টা করিবার অধিকার আছে। আপনার শক্তি কি এবং কত ইহা প্রমাণ করিবার অধিকার সকলেরই সমান। এই স্থলেই সাম্য ও অনুপাত এক হইয়া গেল।

সাম্য শক্তিগত অধিকারের বিরোধী নহে। তাহার রিরোধ জন্মগত অধিকারের সঙ্গে। তুমি রাজপুত্র রাজারগৃহে স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে ভূমিষ্ট হইয়াছ, কিন্তু ইহাতে তোমার নিজের বাহাদুরী কিছুই নাই এবং তদ্বারা যে তোমার রাজনৈতিক মেধা অপর সাধারণ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর হইবে, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, অতএবই যে তুমি শূদ্র পুত্র অপেক্ষা অধিক জ্ঞানার্জ্জনক্ষম ও ধর্ম্মপিপাসু হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। জন্ম নিবন্ধন কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট হইতে পারে না। জীবন সংগ্রামে যে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে পারিবে, সেই শ্রেষ্ঠ। এবং আপন আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার অধিকার ও সামাজিক সুযোগ সকলের সমান থাকা কর্ত্তব্য। সাম্যবাদী কেবল ইহাই চান। তুমি রাজা, বা ব্রাহ্মণ অতএব সমাজ যে তোমার হস্তে মার্টিনী হেনরী বন্দুক দিয়া তোমাকে বর্ম্ম চর্ম্ম পরিহিত করাইয়া জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রেরণ করিবে, আর আমি দুঃখী প্রজা অথবা নিপীড়িত শূদ্রসন্তান, আমার হস্তে যে ভঙ্গপ্রবণ কৃশকায় ঘুনেধরা বংশ যষ্টি খণ্ড প্রদান করিবে, ইহা অন্যায়। সাম্যবাদ ইহারই প্রতিবাদ করে।

কিন্তু জন্মগত অধিকারের স্বপক্ষে আজি কালি একটী নূতন উকীল

খাড় করান হয়, সেটী বৈজিকতত্ত্ব। বৈজিকতত্ত্বে যে সত্য নাই তাহা নহে। পিতা মাতার দোষগুণ যে অল্পাধিক পরিমাণে সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তবে ইহাও ঠিক, বৈজিক দোষগুণ যে পরিমাণে শরীরে সংক্রামিত হয়, সে পরিমাণে মনে সংক্রামিত হয় না। যে পরিমাণে নিম্নতর শ্রেণীর জীবে সংক্রামিত হয়, সে পরিমাণে উচ্চতর শ্রেণীর জীবে হয় না। পশু পক্ষীতে যে পরিমাণে হয় মানুষে সে পরিমাণে হয় না।

বৈজিক তত্ত্বানুসন্ধায়ী বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, পশু পক্ষীর জীবনে বৈজিক তত্ত্বের সত্যসমূহ প্রত্যক্ষীভূত করিয়া তাহা হইতে মনুষ্যের উপর সেই সকল সত্য খাটাইয়া থাকেন। পশুপক্ষীগণের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট বীজেই উৎকৃষ্ট শাবক উৎপন্ন হয়, ইহা কে না জানেন? কিন্তু পশু পক্ষীতে যে পরিমাণে বৈজিক দোষগুণ সংক্রামিত হইতে পারে মনুষ্য সন্তানে যে সে পরিমাণে হইতে পারে না, ইহা সাধারণতঃ বৈজিকতত্ত্ববাদীগণ অনুধাবন করিয়া দেখেন না। মানব শরীরের গঠন একে পক্ষী-প্রভৃতি ইতর জন্তুর গঠন অপেক্ষা অনেক জটিল। তাহাতে আবার মানুষের মানসিক অবস্থাদি দ্বারা তাহার শরীরের বিকাশ কার্য্য বহুল পরিমাণে নিয়মিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। পশু পক্ষীদিগকে উপযুক্ত আহার দিলেই তাহারা পুষ্ট হইয়া উঠে। মানুষের কি তাহা হয়? পুত্র শোকাতুরা মাতা, অথবা পতিবিয়োগ-বিধুরা পত্নীকে সকল প্রকারের পুষ্টিকর খাদ্য গলাধঃ করাইলেও যতদিন মনের যাতনা না দূর হইয়াছে, ততদিন তাহাদের শরীর পুষ্ট করে কাহার সাধ্য? মানুষ কেবল রক্ত মাংসের পিণ্ড নহে, তাহার হৃদয় আছে, তাহার মন আছে, তাহার প্রকৃতির একটা অতীন্দ্রিয় দিক্ আছে। এই অতীন্দ্রিয় দিকের উপর কত প্রকার অতীন্দ্রিয় ও অননুভূত শক্তিরাশি ভূমিষ্ট হইবা মাত্র, অথবা তাহারও পূর্ব্বে জড়ায়ু গর্ভে বীজ নিহিত হইবা মাত্রই তাহার উপর কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, তাহার ঠিকানা করিতে পারে কে? তাহার পরিবারের জীবনী, তাহার দেশের ইতিহাস, তাহার শৈশবের শিক্ষা, তাহার সমাজের নৈতিক, রাজ নৈতিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক মত, বিশ্বাস, শাসন প্রণালী প্রভৃতি দ্বারা তাহার শরীর মনের বিকাশ কার্য্য সতত পরিমিত ও পরিচালিত হইয়া

থাকে। এ অবস্থায় মানব প্রকৃতির উপর বীজের আধিপত্য অতি যৎসামান্য। বস্তুত এসংসারে ধার্ম্মিকের অধার্ম্মিক পুত্র, জ্ঞানির মূর্খ সন্তান ও বীরের ঔরসে কাপুরুষের জন্ম—এ সকল দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও বৈজিক তত্ত্বের স্কন্ধে জাতি ভেদে অধিকার ভেদ সমর্থনের ভার অর্পণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। বস্তুত প্রভু-সন্তান এবং দাস-শিশু, ব্রাহ্মণ-কুমার ও শূদ্র-তনয় এবং ইংরাজ-বালক ও বাঙ্গালী বালকের মধ্যে আমরা আপাততঃ যে সকল বৈসাদৃশ্য দেখিয়া থাকি তাহা বৈজিক তারতম্য নিবন্ধন ঘটে না। কিন্তু শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থাদির বৈসাদৃশ্যের ফল মাত্র। * অতএব নিকৃষ্ট প্রাণী মণ্ডলীর উপর বৈজিকতত্ত্বের যতই কেন আধিপত্য থাকুক না মনুষ্য সমাজে বৈজিক তত্ত্ব সহায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী জাতি, বা পরিবারের মধ্যে কোনও প্রকৃতিগত বৈষম্য সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় না। সুতরাং উচ্চ বংশ অথবা শ্রেষ্ঠতর জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিলেই যে কেহ উচ্চতর অধিকারের উপযুক্ত হইবে, ইহা বিনা প্রত্যক্ষ প্রমাণে স্বীকার করিয়া লওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে।

অতএব কি অনুপাত বাদ, ক তাহার পৃষ্ট পূরক বৈজিকতত্ত্ব কিছুই সাম্যের বিরুদ্ধে বৈষম্যের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

বাঙ্গলার অনুপাত-বাদীগণ সাম্যের বিরুদ্ধে আর একটী যুক্তি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন—সেটী আজ পর্য্যন্ত জগতে কোথাও পূর্ণ সাম্য সংস্থাপিত হয় নাই, অতএব সাম্য অসম্ভাবিত, কল্পনা মাত্র। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য বাক্যব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন। চিন্তাশীল সুলেখক বলিয়া যাহারা প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের মুখেও এরূপ যুক্তি আমাদিগকে

* There is a stage in the growth of every organism in which it cannot be told, except by the environment, whether the animal that is to be will be a fish or reptile, monkey or man. And so with the new born infant; whether the mind that is yet to awaken to consciousness and power is to be English or German, American or Chinese—the mind of a civilized man or the mind of a savage—depends entirely on the social environment in which it is placed."—Henry George.—সচরাচর বৈজিক তত্ত্ববাদীগণ বীজগুণে যে সকল প্রকৃতিগত বৈষম্য ঘটিয়া থাকে মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা কেবল এই সকল Social environment এর ফল মাত্র। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করিতে চাহিলে পাঠক Henry George এর Progress and Poverty নামক সুন্দর পুস্তকের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় Difference of Civilization to what due—শীর্ষক প্রস্তাবটী দেখুন।

শুনিতে হইতেছে, ইহাই পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। উরূপায় সাম্য স্থাপিত হয় নাই—উরূপীয় সমাজে ঘোর বৈষম্য আছে, অনুপাত-বাদী ভারতের জাতি ভেদের পক্ষ সমর্থণ করিতে গিয়া বার বার এ কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু উরূপায় পূর্ণ সাম্য স্থাপিত হইয়াছে কে বলিল? আর উরূপায় যাহা নাই তাহাই কি অপদার্থ? শত বৎসর পূর্ব্বে যাহা মানুষ কল্পনাও করিতে পারিত না, তাহাও তো আজ বাস্তব জীবনে প্রতি নিয়ত ঘটিতেছে, তবে আজ যাহা মানব সমাজে নাই, তাহা যে শত সহস্র বা লক্ষ বৎসর পরে হইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

ভারতে মহাদেব শাক্য সিংহ স্বর্ণ সিংহাসন হইতে পথের ভিকারী হইয়া, ইহুদাদেশে মহামুনি ঈশা আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, এবং আধুনিক উরূপায় ফরাসী বিপ্লবের নেতৃবর্গ আপনাদিগের প্রিয়তম মাতৃভূমিকে স্বদেশীয়ের রক্তস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া যে মহাধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন; যে মহামন্ত্র প্রভাবে শূদ্রের বহু শতাব্দীর দাসত্ব শৃঙ্খল মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্ন হইয়া ভারতের চারি বর্ণ একাকার হইয়াছিল, যাহার প্রতাপে স্বেচ্ছাচারী রাজা রাজসিংহাসনে ও অত্যাচারী পুরোহিত দেবমন্দিরে যুগপৎ কাঁপিয়া উঠিয়াছে, যাহার বলে দুর্ব্বল অসহায় মৃতপ্রায় নরনারী আপনাদিগের হৃত স্বাধীনতা ও অধিকার পুনঃগ্রহণের জন্য সিংহদর্পে জনসমাজকে আমূল কাঁপাইয়া দিয়াছে, সেই মহাধর্ম্ম, সেই মহামন্ত্র, সেই সাম্যবাদ মিথ্যা কল্পনা! বাতুলের বাতুলতা!—কথাটা বড় ধৃষ্ট। সমগ্র মানবেতিহাসের শিক্ষাকে যাহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহাদের যত কেন চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতার সুখ্যাতি থাকুক না, তাঁহাদিগকে ধৃষ্ট না বলিয়া আর কি বলিব? কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালি পাঠকের সমক্ষে আমাদিগকে আবার সাম্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য লেখনি ধারণ করিতে হইতেছে—ইহাই বড় লজ্জা—বড় দুঃখের কথা।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

অভ্যাসই মোহ।

অভ্যাসের এমনি মোহিনী শক্তি যে, তাহা সকল পদার্থকেই পুরাতন করিয়া দিতে পারে। আজ যাহার জন্য আমার প্রাণ লালায়িত, যাহাকে পাইলে আমি স্বর্গ হাতে পাই মনে করি, যাহার সাধনায় আমার আহার নিদ্রা রহিত হইয়া গিয়াছে, সেই অতীব বাঞ্ছনীয় বস্তুও অভ্যাসবলে সামান্য পদার্থ হইয়া পড়ে। লাভানন্তর কয়েক দিন বা কয়েক মাস অথবা কয়েক বৎসরের ব্যবহারেই অভ্যাস তাহাকে পুরাতন করিয়া দেয়, তাহার আর নূতনত্ব বা রমনীয়তা কিছুই থাকে না, যে ঘোর আকর্ষণে প্রাণ এত দিন অস্থির ছিল সে আকর্ষণ আর প্রাণকে টানিতে পারে না। মানবাত্মা নূতন চায়, কিন্তু কোন নূতনই তাহার নিকট চির-নূতন থাকিতে পারে না। ধন সম্পত্তি, পদ-মর্য্যাদা, যশমান; এমন কি,—বন্ধুর প্রণয় ও নব পরিণীতা ভার্য্যার প্রীতিও অভ্যাস বলে নূতনত্ব হারাইয়া শুষ্ক, অর্থশূন্য, গদ্যময় পুরাতন বস্তু হইয়া যায়। মানব প্রাণে অভ্যাসের রাজত্ব এমনই প্রবল!

যখন প্রথম মানব সাগর দর্শন করে, তখনকার গম্ভীর মহান্ ভাবের কথা চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। দিগন্তব্যাপী সুনীল বারিরাশি দূর হইতে সুদূরে চক্ষুর দৃষ্টি রেখাকে লইয়া ফেলিতেছে, ঘন ঘন আস্ফালনে ও তাড়নে কর্ণ বধির প্রায় হইয়া যাইতেছে। উন্নত ঊর্ম্মিমালা পরস্পরের উপর পড়িয়া নাচিয়া খেলিয়া কেমন ফেনপুঞ্জে পরিনত হইতেছে। তল কোথায়? শেষ সীমা কোথায়?—গর্ত্তেই বা কি আছে? দর্শক স্তব্ধ, গম্ভীর, নির্ব্বাক! তৎকালে নিকটে অতি প্রিয়তম বন্ধু পর্য্যন্ত আসিলে গ্রাহ্য করেন না, প্রাণাধিক শিশু সন্তান আসিলেও কথা কহাইতে পারে না!—সাগরের অনন্ত তত্ত্বে প্রাণ ভাসিয়া গিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে, সংসারের বন্ধন রজ্জুগুলিও এক এক করিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে, অন্তত অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আর পুত্র মিত্র আত্মীয় স্বজনে তাঁহার বিমুগ্ধ চিত্তকে অনন্ত চিন্তার সুখময়ী স্বপ্নভূমি হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না। আবার কিন্তু, এই মানব সন্তানই শত সহস্র দিন সাগরোপকূলে অতিবাহিত করিতেছেন। শত

সহস্রবার সাগরের পূর্ব্বোক্ত মতন নৃত্য ও কল্লোল, গাম্ভীর্য্য ও অতলস্পর্শতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মনেই বা ঐরূপ ভাবের উদ্রেক হয় না কেন? সাগর তীরবর্ত্তী জনপদ সমূহের অধিবাসীদের মধ্যে কয়জন লোককে উক্তরূপ বিস্ময় ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ হইয়া নিস্পন্দাবস্থায় থাকিতে শুনিয়া থাকি? ইহার অর্থ কি? এ প্রহেলিকার মূলে কে?—উত্তর, অভ্যাস।

তদ্রূপ যখন আমরা কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রথম গমন করি, তখনকার মনের ভাব কি অপূর্ব্ব! সম্মুখে বিশাল গিরিবর, ঊর্দ্ধে অনন্ত বিস্তীর্ণ গগণমণ্ডল, নিম্নে বন্ধুর পার্ব্বতীয় ভূমিখণ্ড—চারিদিকে নির্জ্জনতা, নিস্তব্ধতা, শান্তি ও সৌন্দর্য্য! সে ভাব বর্ণনা করা যায় না। পাঠক! কোথায় তখন তোমার ঘর বাড়ী, কোথা তোমার ধন সম্পদ, কোথায়ই বা তোমার স্ত্রী পুত্র, কোথা তোমার আত্মীয় বন্ধু? কেবল একাকী, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ততার মধ্যে কেবল একা। রাত্রে নির্জ্জন গিরি কন্দরে? কেমন সুন্দর! কেমন ভয়-ভীষণ! কি উন্নত গম্ভীর ভাবের আবাস! তখন অগণিত-তারকা-মণ্ডিত মৃদু পবন সঞ্চালিত বৃক্ষাবলি পরিবেষ্টিত, বিজন শৈলোপরি—পাঠক, তুমি একা। একা, না আর কোন অপরিচিত মহাশক্তিমান পুরুষ তোমার সন্নিধানে? যথার্থই সে বিহ্বল ভাব বর্ণনাতীত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কয়জন পার্ব্বতীয় অধিবাসী, ঐ মহাভাবের আস্বাদ পায়? কেন পায় না?—অভ্যস্ত বলিয়া তাহাদের নিকট পর্ব্বত পর্ব্বত বৈ আর কিছুই নহে, আর কোন অভিনব ভাবের উত্তেজক নহে, আজন্ম কালই পর্ব্বত তাহাদের, ও তাহারা পর্ব্বতের।

কিঞ্চিৎ স্থিরভাবে আলোচনা করিলেই এই শুষ্কতা, বা কঠোরতা, বা দৃষ্টিহীনতা দোষকে কেবল মাত্র সাগরোপকূলবাসীদেরই বা পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসীদেরই নহে, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে সন্দেহ নাই। মানব মাত্রেই অভ্যাসের দাস। যেমন জড় জগতে তেমনি অন্তর্জ্জগতে। যেমন শরীরকে যাহা অভ্যাস করাইবে তাহাই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, ঠিক তদ্রূপ যে অবস্থায় মনকে কিছু দিন রাখিবে মন তাহাকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি করিবে। বস্তুতঃ আমরাও এইরূপ অভ্যাস বলে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় সমূহ প্রতি দিন নয়ন গোচর করিতেছি; অথচ তাহাদের গূঢ় মর্ম্ম বা অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মহিমা হৃদয়ঙ্গমই

করিতে সমর্থ হই না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, সূর্য্যোদয় প্রাকৃতিক সোভা ও সৌন্দর্য্যের এক অতীব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমস্ত রাত্রির অন্ধকারের পর যখন পূর্ব্বাকাশ বিদীর্ণ করিয়া সোণার দিনমণি হাসিমুখে দেখা দিতে থাকেন, যখন মেঘমালা ধীরে ধীরে পূর্ব্বদ্বারে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হয় ও উজ্জ্বল কান্তিতে সুশোভিত হইয়া জগতে তদাগমন বার্ত্তা প্রচার করে, যখন চারিদিকের ঘোর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দু একটী পক্ষী কুলায় মধ্যে বসিয়া মধুর সঙ্গীত লহরী উত্থিত করিতে থাকে ও সুদূর পর্য্যন্ত সেই সুরের তরঙ্গে প্রতিশব্দিত করিয়া তুলে, যখন এক এক করিয়া তারকাগুলি নিবিয়া আসে ও আকাশ রাজ্যের নীলিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিষাদে মলিনতর হয় ও অচিরে সর্ব্বশেষ জ্যোতিবিন্দুও তিরোহিত হইয়া যায়,—সেই শোভার নিরুপমখনি, সৌন্দর্য্যনিলয় সূর্য্যোদয় যে অতুল ভাবময় ও অগাধ গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—কয় জন আমরা এতাদৃশ বিশাল ব্রহ্মবেদ প্রতিদিন অধ্যয়ন করি? কয় জন বৎসরের মধ্যে একটী দিনও পবিত্র হৃদয়ে সরল প্রাণে এই মনোহর দৃশ্যের প্রতিবিম্ব সন্দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করেন? কয় জন?—কেন এরূপ হয়?—উত্তর, অভ্যাস।

কেবল কি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত? সমতলবাসী সর্ব্বসাধারণ জনগণের হৃদয়োদ্দীপক, ভাবপ্রসূ শত শত, সহস্র সহস্র দৃশ্যেই দিবানিশি পরিবৃত হইয়া রহিয়াছি। বস্তুতই যে দিকেই দৃষ্টি করি, যে শব্দই শ্রবণ করি, যাহা কিছু আমাদের সহিত সম্বদ্ধ,—সে সমস্তই চিরনূতন, অদ্ভুত, আশ্চর্য্য এবং অশেষ কল্যাণকর অচিন্তভাবের প্রস্রবণস্বরূপ। গগণ-মেদিনী সুধাময় হাস্যের তরঙ্গে প্লাবিত করিয়া যখন পূর্ণশশী মস্তকোপরি বিরাজ করে, নব নব পত্রাবলিতে সুশোভিত হইয়া তরুরাজি যখন প্রকৃতির মোহিনী বেশ-ভূষা প্রদর্শন করে, সুন্দর সুন্দর পুষ্পের মালা পরিয়া বৃক্ষলতা যখন সরল হাসির ছটায় বায়ু-মণ্ডলকে আলোকিত করে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শ্যামল তৃণ-শোভা যখন সুস্নিগ্ধ আভায় নয়নকে আকর্ষণ করে ও বহুমূল্য শয্যায় বিভ্রম জন্মাইয়া দেয়, পক্ষীগণ যখন সায়ংকালে বৃক্ষে বৃক্ষে, তটে তটে, ও উড়িয়া উড়িয়া গান করিতে থাকে,—আর কে তারা, কেন আছে, কেন উড়ে, কেন ডাকে—এই সব প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া পাগল-প্রাণ কবি

যখন নিষ্পন্দ ভূমিশয্যায় দেহপাতন করিয়া অচেতন প্রায় হইয়া থাকেন; শীতের শৈত্য, প্রাবিটের অবিরল ধারার বরিষণ, নিদাঘের অসহ্য উত্তাপ,—ইত্যাদি—ইত্যাদি—এ সমস্তই কি এক এক অচিন্ত্য আশ্চর্য্য ঘটনা নহে? চিরনূতন, অদ্ভুত, অবর্ণনীয়। বস্তুতঃই We live in the midst of perpetual miracles অথচ আমরা কি তদ্রূপ অনুভব করি? সর্ব্বদা করা দূরে থাকুক, কখন অনুভব করিতে পারিয়াছেন এরূপ লোকই বা কয় জন আছেন? যাঁহারা আছেন তাঁহারা ধন্য। আর সকলে পারি না কেন?—উত্তর, অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়া।

আরও কথা আছে।—এই যে আমাদের দেশের লোক এতকাল ব্যাপিয়া কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জীবনপাত করিতেছে; আমাদেরই দেশের পূজনীয় ঋষিরা যে সকল অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যাহাদের মর্ম্ম ও যাহাদের নিগূঢ় তত্ত্বের কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পাইয়াই পাশ্চাত্য দেশ সমূহের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ মোহিত ও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতেছেন, সেই সমস্ত মহামূল্য ধর্ম্মোপদেশ অবহেলা করিয়া ভারতীয় জন সাধারণ যে বৃথা কতকগুলা বাহ্যাড়ম্বর ও গোলমাল লইয়া আপনাদের জীবনের সার ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইতেছে ও দুর্লভ মনুষ্য জন্ম বিফলে কাটাইয়া আসিতেছে ইহার মূলে কি? এমন কি, বিদ্যাবুদ্ধিবলে যাঁহারা আজ কাল আমাদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর লোক, শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী, তাঁহারাও সেই প্রাচীন শৃঙ্খল মোচন করিতে সমর্থ হইতেছেন না? প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে যাঁহারা প্রশস্ত উদার হৃদয়ে বাল্য বিবাহের বিষময় ফল প্রচার করেন, কার্য্যকালে নিজের বালিকা কন্যাকে বিবাহ দিতে তাঁহারাও সঙ্কুচিত হন না;—বক্তৃতার সময় উচ্চকণ্ঠে বিধবা বিবাহের গুণ গরিমা প্রকাশ করিয়াও যে কত খ্যাতনামা সুশিক্ষিত বক্তা উক্ত সাধু ব্রত জীবনে পালন করিতে পারেন না;—মুখে, কলমে ও কাজে আমাদের যে এত বিষম প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে;—উন্নত, উদার শিক্ষার গুণেও যে আমাদের হৃদয় ঐ প্রাচীন শৃঙ্খলের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভে সক্ষম হইতেছে না;—ইহার কারণ কি? উত্তর—অভ্যাস, সুদীর্ঘকালের অভ্যাসে ঐ সমস্ত কুপ্রথা ও কুসংস্কার আমাদের মনের রক্ত মাংস হইয়া গড়িয়াছে।

আবার দেখুন, যে স্বাধীনতা জীব মাত্রেরই পরম প্রিয়তম ধন, যাহার

মুহূর্ত্তের অভাবে ইতর প্রাণীরা পর্য্যন্ত অধীর হইয়া পড়ে, জীবনের সকল কল্যানের নিদান, সকল সুখের মূল সেই স্বাধীনতা-ধন হারাইয়া আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি সামাজিক নিষ্ঠুর প্রথা সমূহের সুদৃঢ় পিঞ্জর মধ্যে কেমন নিশ্চিন্ত ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন! স্বর্গের হরিণীরা যেন ভুলিয়াই গিয়াছেন যে, তাঁহারা কোথাকার অধিবাসী কাহার সন্ততি ও তাঁহাদের মঙ্গলদায়িনী জীবন-স্রোতস্বিনীর গতি কোন্ মহাসাগরের অভিমুখে! ঐ যে কুলিন কামিনী চিরদিন অপরের সংসারে পরিচারিকাবৎ দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহার দুঃখময় জীবনে কেবলই বিধাতার প্রতি অনুযোগ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন অসন্তোষ বা অপ্রিয়-ভাব-কালিমার লেশমাত্র লক্ষিত হয় না; তাঁহার বিজন মুহূর্ত্তের সুদীর্ঘ প্রশ্বাস বায়ু স্বর্গাধিপতির চরণ প্রান্তে বৈ ভ্রমেও নিজ স্বামীর অভিমুখে বা সমাজপতিদের দিকে প্রেরিত হয় না; শত কষ্টের মধ্যেও তিনি প্রাণপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক বরং কস্মিন কালে একদিনের তরে তাঁহার চরণ সেবা করিতে পাইলেও আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞানে আনন্দে পুলকিত হন এবং পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কৃতির ফল ভোগ বিবেচনায় অম্লান বদনে অবনত মস্তকে যাবতীয় কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেন ও ভবিষ্যতের দুঃখ দুর্গতি নিবারণ কামনায় সমস্ত জীবন শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও পরোপকারেই অতিক্রম করেন—এ অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মূলে কে? উত্তর, অভ্যাস। অনেক দিনের অভ্যাস দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দ্বিতীয় স্বভাব প্রকৃত স্বভাব যে নহে, তাহা প্রমাণ করিতে আর অধিক কষ্ট পাইতে হয় না, কেন না তাহা হইলে সর্ব্ব দেশেই নারী জাতির স্বভাব ঐরূপ দৃষ্ট হইত। সুতরাং ক্ষণকালের জন্য উক্ত নারীমূর্ত্তি কোন ইউরোপীয় স্বাধীনা রমণীর জীবনচ্ছবির পার্শ্বে স্থাপন করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই উভয়ের মধ্যে কি বিষম প্রভেদ। এই প্রভেদের মূলে কে?—অভ্যাস।

চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি বিদ্যাই মানবের ভূষণ স্বরূপ, বিদ্বান্ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও সর্ব্বদেশ পূজ্য। অথচ বর্ত্তমান সময়ে এই দেশের শিক্ষিত সমাজে এই চির প্রচলিত পরম বাক্যের এরূপ ব্যভিচার দেখিতেছি কেন? কেন আজি শিক্ষিত যুবকদের অধিকাংশের রীতি নীতি এরূপ দূষিত? কেন তাঁহাদের জীবনে শিক্ষার মঙ্গল কিরণ প্রতিভাত হইতে পারে নাই? কেন ঐ হতভাগ্য যুবক বৃন্দ নীচ ঘৃণিত পাশবাচারে জীবন ক্ষেপ করিতেই ভালবাসে ও তাহাদের শিক্ষার বিষয়ীভূত সেই সকল মহোচ্চ সত্যকে অবহেলা ও উপহাস করাকেই পুরুষত্ব বিবেচনা করে? যিনি গণিত শাস্ত্রের কুটিলতর, জটিলতম প্রশ্ন সমূহও অক্লেশে মীমাংসা করিতে সমর্থ, কেন সেই কৃতবিদ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিবিধ উপাধিবিশিষ্ট যুবা পুরুষ ধর্ম্ম নীতি বা সামাজিক অতি সুহজ সহজ প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে সমর্থ হন না? মিথ্যা কথা কহা উচিত নয়, মদ্যপান বা বেশ্যাশক্তি দ্বারা মানবাত্মার অধোগতি হয়, এই সহজ কথা বুঝিতে হইলে কেন তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়? এই বিড়ম্বনার কারণ কি?——উত্তর, অভ্যাস। যত দিন তাহারা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, এক দিনের জন্যও ধর্ম্ম বা নীতিবিষয়ক কোন প্রশ্নের মীমাংসায় তাহাদিকে চিন্তা করিতে হয় না, বাটীতেও এ সকল বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই। সুতরাং এক প্রকার ওপক্ষে তাহারা অন্ধ বলিলেই হয়। এ সকল হতভাগ্য যুবক এক দিকেই বর্দ্ধিত হয়, এক পার্শ্বেই উন্নতি করে, অপর এক অত্যাবশ্যকীয় দিক অস্পৃষ্ট পড়িয়া থাকে। এই অনভ্যাস বশতঃই, অথবা এইরূপ একাঙ্গ শিক্ষা অভ্যস্ত হওয়াতেই ইহাদের এরূপ শোচনীয় দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের উপার্জ্জিত অকিঞ্চিৎকর শুষ্ক ও নিষ্ফল জ্ঞানের অহমিকাতে স্ফীত হইয়া এবং পাশব প্রবৃত্তির উত্তেজনার দাস হইয়া ঘৃণিতভাবে যৌবনকাল অতিবাহিত করে ও অবশেষে রোগে শীর্ণ ও ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া জঘন্য পাপ জীবনের অবশিষ্টাংশ রোদনেই পর্য্যবসিত করে।—এই সমস্ত মানবাত্মার ধ্বংসের মূলে কে?—অভ্যাস।

প্রবন্ধ ক্রমে সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। যাহা হউক, এইটুকু অদ্য আমরা বুঝিলাম, বা এই পুরাতন জানা কথাটার পুনরালোচনা করিতে সমর্থ হইলান যে,—শুদ্ধ অভ্যাস মানুষকে ভ্রান্ত করিয়া রাখে, সত্যকে অসত্য, অসত্যকে সত্য, সুখকে অসুক ও কষ্টকে সুখ ভ্রম করিয়া দিয়া, নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলাইয়া অস্বাভাবিকরূপে তাহার মনকে গঠিত করিতে পারে। অভ্যাস বলেই এমন কবিত্বপূর্ণ মনোহর জগতের অধিবাসী হইয়াও আমরা শুষ্ক হৃদয়বিহীন কাষ্ঠ বা প্রস্তর খণ্ডবৎ হইয়া আছি। অভ্যাস বলেই আমরা এই আশ্চর্য্য বিশ্বকৌশলের মধ্যে থাকিয়াও মুগ্ধ না হইয়া মৃত যন্ত্রবৎ অহোরাত্র পরিচালিত হইতেছি; আমাদের প্রাণে প্রাণে মিল

কি অদ্ভুত, প্রেমটী কি সুন্দর পদার্থ, এমন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ধন প্রেম সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে উপভোগ করিতেছি, অথচ তাহার মর্য্যাদা অবগত হইতে পারিতেছি না; কি সুন্দর শিশু-সন্তানের সরল হাস্য-শোভা! অথচ এই হাসির ছটার মধ্যে থাকিয়াও আমরা তাহার অর্থ-গ্রহ করিতে পারি না। এই জ্যোৎস্নাময় সংসারে আমরা অভ্যাসের দাস হইয়া মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। এই সুখের সংসারে আমরা অভ্যাসে অন্ধ হইয়া ভ্রান্তিবশতঃ কতই না কষ্ট পাই, ঘরের মধ্যে তাই পর হইয়া রহিয়াছি। স্বার্থে অভ্যস্ত হইয়া দূরদৃষ্টি ও নির্ভর হারাইয়াছি ও তাই মঙ্গলময়ের সন্তান হইয়াও তাঁহার গৃহের চারিদিক হাহাকারে পূর্ণ করিতেছি। এ অভ্যাসই সর্ব্ব মূলাধার। অভ্যাস ভাল জিনিস ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিতে দেয় না, ইহাই আবার মন্দ জিনিসও দেখিয়া ভালরূপে বিচার করিতে দেয় না। জীবনে যত সুশিক্ষা হয় তাহাদের প্রত্যেকটীর আদিতে অভ্যাস, আবার অপর দিকে ইহাই ভবিষ্যতের পথে কণ্টক স্থাপন করে। এজন্য অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা আবশ্যক। মানুষকে পশু ও দেবতা উভয়ই করিতে পারে যে শক্তি, তাহাকে যৎপরোনাস্তি সাবধানতার সহিত ঘরে স্থান দেওয়া উচিত। এ পর্য্যন্ত জগতে যত লোক বাস করিয়াছে, করিতেছে বা করিবে সকলেই—প্রত্যেকেই এই অভ্যাসের বলে ন্যূনাধিক পরিমাণে ছোট বা বড় হইয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে তাই দেখি অভ্যাসই রাজা, রাজার রাজা, অতুল ক্ষমতা। রাজা প্রজা, বীর ভীরু, জ্ঞানী মূর্খ, প্রায় সকলেই ইহার শাসনে মুগ্ধ। তাই বলি অভ্যাসই মোহ। কিরূপে এ মোহের হাত এড়ান যায়?

দিন কি এমন হবে!

(যমুনালহরী-রচয়িতা রচিত)

গীতি-কবিতা।

দিন কি এমন হবে এ ভারতে, দিন কি এমন হবে!
গাইবে সবাই, মিলি এক ঠাঁই, একি গান একি রবে। ধ্রু।

ভূমি কি সাগরে, শান্তি কি সমরে,
স্বদেশে বিদেশে, স্ববশেতে ঘুরে,
তুলিয়া গলা রে, গাবে বলভরে
ভাই ভাই যেন সবে।
দিন কি এমন হবে!!

কুমারী হইতে, হিমাদ্রি লইয়া,
উঠিবে সেতানে, বাঁশরি বাজিয়া,
উঠিবে হৃদয় মরমে নাচিয়া
পরশি সে সুর তবে।
দিন কি এমন হবে!!

সাগরে সাগরে, ভাসায়ে তরণী,
গাইবে সাহসে, ধরিয়া ক্ষেপণী,
উঠিবে তুফান, কাঁপায়ে মেদিনী,
গরজি গভীর যবে।
দিন কি এমন হবে!!

যথাই না যাবে, যে দেশে ঘুরিবে,
এ বন এ গিরি, নয়নে ভাসিবে,
রহিবে লাগিয়া, এ নদী নির্ঝর
সে কাণে মধুর রবে।
দিন কি এমন হবে!!

চষিবে চাষিবে, বুনাবে বানাবে,
মিলি মিশি সবে, আপনাতে রবে,
হাতে হাতে ধরি নাচিবে গাইবে,
তাড়াবে যে দুখ ভবে।
দিন কি এমন হবে!!

মোছাবে সবার চকের কাঁদনা,
ঘুচাবে যার যে ক্ষুধার যাতনা,
এ প্রাণ এ মনে সাধিবে সাধনা;
বেঁটে খাবে সমভাবে।
দিন কি এমন হবে!!

ছুটিবে চৌদিকে, খুঁজিবে খাজিবে,
দুখের মোচনে উপায় দেখিবে,
কারু নাহি হবে, নাহি ভুলি রবে
আপনা স্বদেশ কবে।
দিন কি এমন হবে!!

আনিবে উঠাই' যা ভাল যে খানে,
ফেলাবে ছুটাই' মন্দ যা স্বধামে
করি ভর পরিমিতে পরিশ্রমে
দল বেঁধে বেঁধে সবে।
দিন কি এমন হবে!!

পরশিতে কেউ আঙ্গুলের ধারে
উঠিবে জাগিয়া সকল শরীরে,
একের গ্লানিতে সবে গ্লানি ভরে
এক তনু হয়ে রবে;
তবে সে সেদিন হবে এ ভারতে,
তবে সে দিন হবে।
গাইবে সবাই কাযেতে কেবল
সুরে না এ গান যবে।
দিন কি এমন হবে!!

এ খুসি তোমার যত আজিকার
তোষে না আমারে কভু ;
সুখী না সাজনে শংসয় আসনে
নিগ্রহ সহস্রে প্রভু।
শিরে রণ-ঋণ পাগড়ী প্রবীণ
নিরন্ন পেটে ফুডৌল ;
সাজি বল হায়! কি সুখ তাহায়
গাঁয়ে ও পাড়ায় মৌল।
এ জিভা তোমার আজি ব্যভিচার
হলো চাটু গেয়ে গেয়ে।
কথায় কথায় কৃতজ্ঞতা হায়!
দেও মন কচালিয়ে।
চকে নাই নীর কাঁদিয়া অধীর
মাথ কালী শোক ছলে,
এরূপে সদায় প্রকৃতিরে হায়!
বিকৃত করহ বলে।
দেখি আজিকার এ দশা তোমার
পায় কি আনন্দে হাসি ;
বিদরয়ে বুক দেখিলে ওমুখ
কুডৌল কুরূপ রাশি।
তবে এই মন হাসিবে তখন
দেখিবে তোমায় সবে,
হইতে শঙ্কায় গণিত সংখ্যায়
জীবিত বলিয়া যবে।
তবে সে সেদিন হবে এ ভারতে,
তবে সে সেদিন হবে।
গাইবে সবাই কাযেতে কেবল,
সুরে না এ গান যবে।
দিন কি এমন হবে!!

খুলি মন প্রাণে উৎসব কীর্ত্তনে
পারনা গাইতে গীতি,
বাঁধা যাও পথে অপমান সাথে
শাসে চারি পাশে ভীতি।
আসেনা তোমার কোনও কথার
প্রতীকার কোন কাযে ;
দেখি এ দুর্দ্দশা এত সুখে হাসা
যায় কি সরায়ে লাজে ?
কি জানি কেমন তব অই মন
আমারে খুসী না লাগে ;
তবে যায় হাসা যদি এই দশা
ঘুচে কোন মতে আগে।

হলো গৃহ বন মৃগয়া কানন
অধিবাসী পশু পাখী ;
শশভাণে তায় কত চাষা হায়!
মারা যায় ক্ষেত রাখি।
যত চা বাগান নীলের গুদাম
নিধুবন কুঞ্জরাজি,
কুলীর দুখিনী যুবতী রমণী
গোপিনী তাহাতে আজি!

কথায় কথায় পদাঘাত ঘায়
পেটের প্লীহা বিদরে ;
কে শুনে তোমারে "উদারানুদারে"
'লর্ড' কি 'কমন' ঘরে ?
উঠয়ে কেবল কথার কচাল্
চাল্না বদলে কেউ ;

তোমার কপালে মাত্ চালে চালে
টীপে, টীপে, বিঘ্ন ঢেউ।

নিরখি নিরখি অন্ধ দুই আঁখি
বকি ক্ষয়িগেছে থোঁতা ;
কি কান্না কি হাসি সবেতে উদাসী
আজি এ হৃদয় ভোঁতা।
উঠে পরকাশি ফুটি হাসি রাশি
ভাসি এ সুখেতে তবে।
বাক্য-সুখ ছাড়ি ডুব্‌বে কষ্ট ধরি
কাযের সাগরে যবে।

তবে সে সেদিন হবে এ ভারতে,
তবে সে সেদিন হবে ;
গাইবে যখন কাযেতে কেবল
সুরে না এ গান সবে।
দিন কি এমন হবে!
এভারতে দিন কি এমন হবে!!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়—আগ্রা।

নিরাকারবাদে কি শান্তি আছে ?

এই পুরাতন প্রশ্ন কেবল পৌত্তলিক এবং নরোপাসকদিগের কর্ত্তৃক উত্থাপিত হয়, তাহা নহে ; অনেকানেক প্রাচীন এবং যুবক ব্রহ্মবাদীর মুখেও শুনা যায়। বাস্তবিক এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনো ভালরূপে হয় নাই, কখনো হইবে কিনা তৎপক্ষেও বহু লোকের মনে গভীর সন্দেহ আছে। এ প্রশ্নের সদুত্তর আমরা কোথায় পাইব ? ব্রাহ্মগণ প্রতি দিন নিত্য উপাসনায় 'শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' বলেন ; সমাজে উপাসনা মন্দিরে, গৃহ-কর্ম্মানুষ্ঠানে শান্তি কথন পাঠে কিছু মাত্র ত্রুটি দেখা যায় না। কিন্তু এই শান্তি শব্দটী উপাসনার ইতি দিবার ভাগ কি অনেকে "আপদঃ শান্তিঃ" রূপে ব্যবহার করেন না ? নিশ্চয় করিয়া থাকেন। আমিও বোধ হয় করিয়া থাকি। প্রাণ হীন দীর্ঘ প্রার্থনা এবং অসার প্রশস্ত উপদেশ-নিপীড়িত আত্মা বহুক্ষণ সমাজ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, অধৈর্য্য এবং নিদ্রাক্রান্ত হইয়া যখন অবস্থান্তর বা কার্য্যান্তরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন সে উপাসনার আর কোন অংশে যোগ দিতে সক্ষম হউক বা না হউক, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" শব্দগুলি প্রাণের সহিত উচ্চারণ করে। তাহার মুখ যদিও "আপদঃ শান্তিঃ" না বলুক, হৃদয় কিন্তু অতি আদরের সহিত তাহা বলে। বস্তুতঃ শান্তি কথাটা যেমন সহজ, শান্তি উপভোগ তেমন নহে। ধর্ম্ম সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি শান্তির ভিক্ষারী নয়,

জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড লইয়া তাহারা এক প্রকার জীবন কাটাইয়া দেয়; তাহার উপর সময়-বিশেষে হয় প্রতিমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল, না হয় অভ্যস্থ গুটি কতক শাস্ত্রীয় বচন উচ্চারণ করিল, ইহার অতিরিক্ত অভাব বোধ তাহাদের থাকে না। শান্তিও নাই, শান্তির প্রয়োজনও নাই, এরূপ অবস্থায় যাহারা আছে, তাহাদের অজ্ঞতাই শান্তি। কিন্তু যাঁহাদের বাহ্য উপকরণ কিছুই নাই, কেবল যাঁহারা চিদাকাশে চিদানন্দ সম্ভোগ করিয়া নিরাকার দেবতার ইঙ্গিতানুসারে তাঁহার সেবা করিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের মুখে এখন পৃথিবী শুনিতে চাহিতেছে যে, তাঁহারা শান্তি পাইয়াছেন কি না? সে ঈষদ্ধাস্য মুখে ব্যঙ্গ সহকারে বলিতেছে, "হে নিরাকারবাদী যুবক! তুমি তো অনেক জ্ঞান বিচার, ধর্ম্ম কার্য্য, হিতানুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেছ; কিন্তু সত্য করিয়া বল দেখি, তোমার দাঁড়াইবার স্থান আছে কি না? যৌবনের নবানুরাগে অনেক সৎকার্য্য তুমি করিয়া থাক, ধর্ম্ম-তত্ত্বের বহুল যুক্তি বিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকের চিত্ত হরণ কর, তাহা মানিলাম; কিন্তু তোমার ভিতরে শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহা কি বলিতে পার? জ্ঞান বিচারে শান্তি আছে, সদনুষ্ঠান সাধনেও শান্তি আছে, নতুবা তুমি এত দিন কিসের বলে এসব করিতেছ; কিন্তু কথাটা এই, সেই শান্তি কি অনন্ত শান্তির সাগর হইতে প্রসূত, না কার্য্য-মূলক সাময়িক অবস্থা প্রসূত? তোমার কার্য্যের উদ্যম এবং জ্ঞান বিচারের নৈপুণ্যে আমি ভুলিব না। সাধুতার বেশভূষা বা বিধি নিয়মানুসরণও আমি অনেক দেখিয়াছি। তোমার মত কত ব্রহ্মবাদী শেষ বয়সে মহাঅসুখে কাল হরণ করিতেছ, পরিণামে সে সংসার এবং ধর্ম্ম কিছুতেই সুখী হইতে পারে নাই। ভাবের আবেগে কত ব্যক্তি পিপাসু হইয়া স্বভাবের বিপরীত পথে গিয়া পরিশেষে অবিশ্বাসী পর্য্যন্ত হইয়াছে। তুমি যে সেরূপ হইবে না তাহার প্রমাণ কি? প্রেত-তত্ত্ববাদী, কি ব্ল্যাভেট্স্কী, কি ঘোষপাড়ার কর্ত্তা গোঁসাইজীর কাছে যে তোমাকে যাইতে হইবে না, তাহা কে বলিল? "যদি শান্তি চাও, তবে হয় গাঁজা খাও, ভস্ম মাখ, কম্বল উড়াও, না হয় বহির্ম্মুখগামী নিশ্বাস-বায়ুকে উদরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেও। যদি তাহা না পার তবে বৈরাগী বাবাজীর আখড়ায় গিয়া যুগলমূর্ত্তির সেবা কর, শান্তি পাইবে।" কেন আর "ওঁ তৎসৎ" বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঢুলিতেছ, উহাতে কিছু

হইবে না।"—পৃথিবী এইরূপ প্রশ্ন এবং উপদেশচ্ছলে ব্রহ্মজ্ঞানীদিগকে বিদ্রূপ করিতেছে।

অমরধাম হইতে একবার প্রতিবাদ হইল। ঈশা, মহম্মদ, জনক, নানক আরো অনেকানেক মহাত্মা বলিলেন, চিন্ময় সচ্চিদানন্দে জীব পরম শান্তি লাভ করিবে, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এই মহাবাক্য পৃথিবীর কতিপয় জীবিত নিরাকার বাদীর হৃদয়েও প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহারাও বলিলেন, "আমরা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিব। আমরা নিরাকার দেবতার প্রেমে মাতিয়া হাসি কাঁদি নাচি গাই; তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসুধা পানে আমাদের বুদ্ধি তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য্যে যোগ পিপাসু আত্মা আরাম পাইয়াছে;—এবং বিচিত্র লীলা দর্শনে হৃদয় এবং আজ্ঞাপালনে ইচ্ছা চরিতার্থ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গদেশে যে নিরাকারবাদ ধর্ম্ম আসিয়াছে, তাহা ঈশ্বর প্রেরিত এক নূতন বিধান, ভগবান ভূভারহারী, তদ্দ্বারা জীবগণের সকল কামনা পূর্ণ করিবেন। স্বভাবের বিপরীত পথে যাইয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রাণ হারাইতে হইবে না, নিশ্বাস প্রশ্বাসে ব্রহ্মবায়ু বহিতেছে তাহাই কেবল দেখ। কল্পিত ভূত প্রেত দেখিবার জন্য যোগ সাধনের প্রয়োজন নাই, সহজে ব্রহ্মকৃপাবলে চিদানন্দ রসে মগ্ন হইতে পারিবে। ইহা বৈদান্তিক বা মহম্মদীয় নিরাকার বাদ নহে; ইহা ইহুদী কিম্বা ইয়োরোপীয় শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানও নহে; কিন্তু ইহা জীবন্ত ভগবানের প্রেরিত জীবন্ত নিরাকারবাদ। ইহাতে বেদান্তের যোগ, বৈষ্ণবের ভক্তি-লীলা, ইয়োরোপের ধর্ম্ম ও খৃষ্টের নীতি সমস্তই আছে। আবার পুরাণ ইতিহাসের বাস্তবিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভিতর আধ্যাত্মিক গভীর অনন্ত রহস্যও আছে। এই ধর্ম্মে আমরা শান্তি পাই, শান্তি খাই, শান্তি গায়ে মাখি। বাহিরের প্রতিমা দেখিবার অবসর কোথায়? চক্ষু খুলিতেই ইচ্ছা করে না, কেবল প্রাণের সামগ্রীকে প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়া দুইয়ে এক, একে দুই হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।" পৃথিবীতে এত বড় উচ্চ কথা এবং আশার কথা কে বলিল, একবার তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে, কেবল কথা শুনিলে চলিবে না। খুঁজিয়া বাহির কর, ভগবানের এরূপ কোন সাক্ষী সত্য সত্য আছে কি না।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা।

অবতরণিকা।

শারীরিক অসুস্থতা কোন অবস্থাতেই কাহারও নিকট সুখকর কিংবা প্রীতিপ্রদ নহে। ইহার যন্ত্রণায় এই সৌন্দর্য্যময় বিশ্বজগৎ শোভা-শূন্য বোধ হয়, মানসিক তেজ ও চিন্তা-শক্তি ক্রমে শিথিল হইয়া যায়, কঠিন পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা লোপ পায়; কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহা চাহে না। কিন্তু এই অসুখকর অসুস্থতায় আমার কিছু জ্ঞান লাভ হইয়াছে। এই অসুখে যে শিক্ষা ও আনন্দ পাইয়াছি, তাহার স্মৃতি আমার নির্জ্জন-প্রিয় জীবনের একটী পবিত্র সুখ। মাতৃভূমির ঘটনা-পূর্ণ প্রধান প্রধান স্থান গুলি দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে যত্নের সহিত আশৈশব পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম; কখন যে সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে আমার কিন্তু এমন বিশ্বাস ছিল না। অবরোধবাসিনী হিন্দুমহিলাদিগের পক্ষে দেশ ভ্রমণ কত যে অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু-ধর্ম্মে অচল বিশ্বাসে, পূর্ব্বেও শত শত মহিলা তীর্থ দর্শনে যাইতেন এবং এখনও গিয়া থাকেন; তথাপি ইহা হিন্দু রমণীর পক্ষে যে তত সহজ সাধ্য নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? দেশ ভ্রমণের কল্পনা অথবা স্বপ্ন আমার কখনই সফল হইত কিনা, তাহা আমি জানি না; কিন্তু শঙ্কটাপন্ন শারীরিক অসুস্থতা ও আত্মীয় স্বজনের উদ্বিগ্ন স্নেহে আমার এই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালার জলবায়ু আমার অসুস্থ শরীরের পক্ষে অনুকূল নহে। কিন্তু স্নেহময় প্রিয়জন ছাড়িয়া দীর্ঘকাল দূরদেশে থাকা নিতান্ত কষ্টকর। আবার অন্যদিকে জীবন রক্ষা করিতে হইলে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া মধ্যে মধ্যে বিদেশে যাইতে হয়। অসুস্থতাই আমার ভ্রমণের মুখ্য কারণ।

১৮,—সালে বর্ষার প্রারম্ভে আমার শরীর আবার দিন দিন অধিকতর অসুস্থ হইতে লাগিল। এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে ১৮—সালের ৩রা নবেম্বর তারিখে রাত্রি ৯ টার সময় আমি জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমযাত্রা করিলাম। আমার তখনকার শারীরিক অবস্থা এত শোচনীয় ছিল যে, আমি আরোগ্য হইয়া আবার দেশে

ফিরিয়া আসিব কি না, সে বিষয়ে আমার বন্ধু বান্ধবদের অনেকেরই সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

আমার নিজের মনে তখন যে বিশেষ কোন নূতন আশঙ্কা হইয়াছিল তাহা এখন তত স্মরণ নাই, তবে মৃতপ্রায় অবস্থায় ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া স্বাস্থ্য পুনর্লাভ করিবার জন্য বিষণ্ণমনে আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় মনে করিলে স্মৃতি এখনও আমার হৃদয়ে বিষাদ ঢালিয়া দেয়। সে যা হোক্ ট্রেন ছাড়িল; সঙ্গে দুই সহোদর থাকিলেন, আর সকলে বিদায় লইলেন। ক্ষণকাল পরেই কেবল শকটের ভীষণ ঘর্ঘর শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

অশান্তিময় রাত্রি নিদ্রা অনিদ্রায় কোন রূপে কাটিয়া গেল। প্রভাতে জাগিয়াই বুঝিলাম যে, আমরা অনেক দূরে আসিয়াছি। ভ্রাতার মুখে শুনিলাম "নোয়াদি"। আমার পূর্ব্ব পরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-রাজি পরিশোভিত নোয়াদির নাম শুনিয়া তাহার প্রাতঃ-সূর্য্য-রশ্মিময় শোভা দেখিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু গাত্রোত্থানে অসমর্থ, সে সাধ পূর্ণ হইল না।

অপরাহ্নে গাড়ী যখন মৃজাপুরের মধ্যে দিয়া যাইতে লাগিল, তখন বিন্ধ্যগিরির শিরে সূর্য্যের অস্তগামী অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমার সহোদরদ্বয় বিমুগ্ধ হইয়া আমাকেও তাহা একবার দেখাইবার নিমিত্ত মুহূর্ত্তের জন্য শয্যাতে উঠাইয়া বসাইলেন। আমি সেই অনির্ব্বচনীয় জীবন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং প্রদোষের স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া একটু যেন জীবন পাইলাম ও সুস্থ হইলাম। আমার সৌন্দর্য্য-প্রিয় কবি-প্রকৃতি বন্ধুগণের সহিত যে একত্র হইয়া সেই স্বর্গীয় শোভা দেখিতে পাইলাম না, তখন তাহাই কেবল মনে হইতে লাগিল। কেমন শূন্যমনে উদাস-প্রাণে সেই কনক-কিরণের সৌন্দর্য্য সাগরে ভাসিয়া গেলাম। বঙ্কিমবাবুর "সাধের তরণী, আমার" মনে আসিয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে এই সংসারে এই অনন্ত বিশ্বের অমিশ্রিত সুখভোগ হতভাগ্য মানবের ভাগ্যে কখনই প্রায় ঘটেনা, নতুবা সেই নিরূপম মাধুরী হেরিয়া আমার চক্ষে জল আসিল ও হৃদয় অশ্রুষিক্ত হইল কেন? একের সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য অপরে সহজে অনুভব করিতে পারেন, তাই আমার সেই সায়াহ্ন হর্ষ-বিষাদ-কাহিনীও বলিতে ইচ্ছা নাই।

রাত্রি প্রায় ৮ টার সময় গাড়ী কিছু বেশীক্ষণের জন্য থামিলে প্লাট-ফরমে হৈ রৈ, কলরব, ডাক হাঁক শুনিয়া বুঝিলাম যে কোন একটী বড় ষ্টেসনে পৌঁছিয়াছি। ইহা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম স্থান সেই প্রয়াগ তীর্থ।

গাড়ী পুনর্ব্বার উদাসীন ভাবে চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে হঠাৎ অস্থিভেদী শীতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আবার হৈ রৈ কলরব—বুঝিলাম গাড়ী কানপুরে আসিয়াছে। তাকাইয়া দেখিলাম একটী শ্বেত পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী আমাদিগের গাড়ী মধ্যে বিরাজমান,—সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটীশ সিংহ আমাদিগকে উদ্বেজিত না করিয়া ক্ষণকাল পরে মস্তকোপরি 'হ্যামকে' দোদুল্যমান হইলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে শিষ্টাচারের সহিত আপনা হইতেই আমার সহোদরের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার পত্নী আমাকে পীড়িত লক্ষ্য করিয়া স্বামীকে নীরব হইতে কহিলেন। যদিও অধিক সময়ই "ব্রিটিশ সিংহের বিকট বদন" রেল গাড়ী ইত্যাদিতে 'নিগার' দর্শনে আরও বিকটতর হয় এবং তাহাতে নানা প্রকার অপ্রিয় ঘটনাও সততই ঘটিয়া থাকে, তথাপি ইহাদিগের ভদ্রোচিত আচরণে আমাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট কি অসুবিধা হয় নাই। কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই সামান্য ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল। অবশেষে অতি প্রত্যূষে গাড়ী এটোয়া থামিল, আমরা সেখানে নামিলাম ও আমাদিগের জন্য রক্ষিত যানে আমরা কোন এক আত্মীয় ব্যক্তির বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

প্রাণ-সাগরে।

হে মানব, ডুবে যাও প্রাণের সাগরে,
প্রাণের সাগরে সে, ডুবিলে না মরে।
ঐ দেখ, বেলা তার মৃত্তিকায় নয়,
ডুবে না তাহাতে ভানু হইতে উদয়।
গগনের সীমান্ত না সীমা তার ছোঁয়,
তল তার না স্পর্শি না কালের রজ্জু নোয়।
কভু বৃদ্ধি হ্রাস নাই, কভু না তুফান,
আপনার প্রতিষ্ঠায় আপনি শয়ান।
কেবল সে ধক্ ধক্—কেবল ধবল
বারি তার বিকসিত অনন্ত মঙ্গল।
সাগরে উত্থিত ক্ষুদ্র বাষ্পের মতন
উঠে তার গর্ব্ভ হ'তে সকল জীবন।
উঠে স্মৃতি, উঠে জ্ঞান, উঠিছে বিবেক,
উঠিছে ইন্দ্রিয়-শক্তি—চেতনা-উদ্রেক।
অগণিত সৌর-চক্র—অগণিত তারা
সাগরে উঠে সে বিম্ব, সাগরেই হারা।
কোথা চাও, কোথা যাও সাগর ত্যজিয়া
এই তো অমৃতানন্দ তোমারি লাগিয়া।
সহজে আত্মার জাগাইয়া আত্ম-জ্ঞান
ঢেলে দেও মহাপ্রাণে আপনার প্রাণ।
যে ফল পাইবে তাহে, না পাবে সংসারে,
ডুবে যাও, ডুবে যাও, প্রাণের সাগরে।

শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা বিগত বারে "বেদ-সত্য" প্রবন্ধের কতকাংশের প্রতিবাদ করিয়াছি। এবার অবশিষ্টাংশে লেখক মহাশয়ের যে সকল ভুল হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মূল প্রবন্ধ ও আমাদের এই প্রতিবাদটী মিলাইয়া পড়িলে, আমরা অনুগৃহীত হইব।

আমাদের মহা সম্ভ্রান্ত লেখক মহাশয় স্বীয় পক্ষ সমর্থনার্থ নিতান্ত অসঙ্গত অর্থ সহকারে নিম্নস্থ বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"শ্রুতির্বিভিন্ন স্মৃতয়োর্বিভিন্না।
নৈকো মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

এই পাঠে বা পাঠান্তরে, এই বচনটী ও ইহার মর্ম্ম জ্ঞাত না আছেন, এমন ভদ্র লোক বঙ্গ দেশে নাই। বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিষয়-কর্ম্মী ভদ্র লোক সকলেই এক বাক্যে ইহার যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহাই যথার্থ শাস্ত্রীয়। তাহা এই—

শ্রুতির মত বিভিন্ন। স্মৃতির মত বিভিন্ন। এমন একজন মুনি নাই, যাঁহার মত অন্য মুনির মতের সহিত ভিন্ন নহে। এস্থলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এইরূপ বুঝেন যে অধিকারী, দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ব্যবস্থা সকল ভিন্ন ভিন্ন। নতুবা শাস্ত্র সকলকে পরস্পর বিরোধী ভাবিলে, এযাবৎ কাল ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকিত না। প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে অধিকার, শাখা, সম্প্রদায় সমাজ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেবল মাত্র শাস্ত্র দ্বারা নীয়মান হইবে না। কেবল শ্রুতি, স্মৃতি ও ঋষিগণের শাস্ত্র পড়িয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব অবধারণ করিবে না। জনে জনে যদি তাহার কোন এক প্রকার মতের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে ভারতীয় প্রচলিত সমাজ

করেন, এমন কি যদি একই বেদের অন্তর্গত কোন এক শাখার কোন ব্যক্তি সেই বেদের অন্তর্গত শাখান্তরীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে মহা পাপ হয়। যদি যাজ্ঞবল্কের শাসিত সমাজস্থ কোন ব্যক্তি মিতাক্ষরার বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পরাশরীয় ব্যবস্থার অনুসরণ করেন, তবে সমাজের শান্তি ভঙ্গ হয়। এরূপ কার্য্য করা অবিহিত। ধর্ম্মের তত্ত্ব গূহাতে নিহিত আছে। এস্থলে "গূহা" শব্দে "গূহ্যস্থান "দুর্জ্ঞেয় স্থান", "গোপন স্থান" ইত্যাদি। সেখান হইতে সেই গূহ্যতম ধর্ম্মতত্ত্ব জানা কঠিন। তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মতত্ত্ব অতি গূঢ় এবং দুর্জ্ঞেয়; অতএব মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরু, আচার্য্য ও ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা ধর্ম্ম, আচার, পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে পন্থা আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিবেক।

যখন বঙ্গদেশের সমস্ত ভদ্র লোকেই চিরকাল হইতে ঐরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, বিশেষতঃ যখন এই বচনটীর প্রধান উদ্দেশ্য সামাজিক হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষা করা, তখন প্রবন্ধকার মহাশয় যে, বল পূর্ব্বক তাহার অর্থান্তর কল্পনা করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞতার কার্য্য হয় নাই। তিনি "গূহা" শব্দে "অন্তর" কিনা মানবের মন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোথা হইতে এই অর্থ বাহির করিলেন, তিনিই জানেন। যাহা হউক, তাঁহার মতে ধর্ম্মের তত্ত্ব বেদ স্মৃতিতে নাই, কিন্তু মানুষের মনে নিহিত রহিয়াছে। তিনি মনে করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিলেন। কিন্তু শব্দের প্রকৃত অর্থ যখন তাহার ভাবের অনুকূল নহে, তখন শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকারে আত্ম-মত বা ব্রাহ্ম-মত সমর্থন করিলেই হইত। তিনি এক একটী ধর্ম্ম পথকে "মহাজনদিগের পথ মাত্র" বলিয়াছেন। তাঁহার তাৎপর্য্য এই যে, সে পথ একটা নাম মাত্র পথ; কিন্তু ধর্ম্ম অন্তরে আছে। লেখক মহাশয়ের এই ভাবের বিপরীত, হিন্দুরা বলেন যে, মহাজনদিগের পথই পথ। তদ্ভিন্ন শাস্ত্র অচল। মনের তো কিছু স্থিরতাই নাই। অতঃপর লেখক মহাশয় "মহাজন" শব্দে এই বুঝিয়াছেন, যেমন—রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমরা হিন্দুমতে বৈদিক শাখাপ্রতি—কুলপতি,—গৃহ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল পুরুষগণ ভিন্ন অন্যকে মহাজন বলি না।

নুযায়ী শাখা ও সমাজ গঠন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা মহাজন বলি। রামমোহন রায় বেদ ও স্মৃতি বিহিত ভারতীয় প্রচলিত শাখা সম্প্রদায়ের উপরি হস্তক্ষেপণ করেন নাই; কেবল বৈদান্তিক জ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন; সুতরাং সমাজ সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন স্বতন্ত্র মহাজন বলা যাইতে পারে না। বাবু কেশবচন্দ্র বেদাচার বহির্ভূত উপধর্ম্মের সৃষ্টি কর্ত্তা ছিলেন; সুতরাং তিনিও মহাজন শব্দের যোগ্য নহেন।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রানুসারে ব্যক্তি-ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য বিশেষ দেব কৃপায় "বেদ" লাভ বা প্রচার করিতে পারে না। প্রত্যেক কল্পারম্ভে ব্রহ্মাই তাহা লাভ করেন। ব্রহ্মা হইতে আদি নিবৃত্তি-পথাবলম্বী ও কর্ম্ম-কুশল ঋষিগণ তাহা প্রত্যাদেশ স্বরূপে লাভ করিয়া থাকেন। সেই সকল ঋষিগণ জাতি পুরঃসরে প্রবাহরূপে নিত্য বিধায় তাঁহাদের নিকটে বেদ পূর্ব্ব-কল্পের ন্যায় যথাবৎ প্রকাশিত হয়। তাঁহারা ভ্রম প্রমাদ রহিত বিধায় তাহার সহিত কিঞ্চিৎও কল্পনার যোগ হয় না। আমাদের সুবিজ্ঞ লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, "বেদ নামক পুস্তকের মধ্যে অনেক কল্পিত কল্পনাও দেখা যায়।" ফলে সেরূপ লেখাতে আমরা তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। আমরা জানি, সে দোষ খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর।

আমরা কেবল তাঁহাকে সংক্ষেপে একটী কথা বলিব। বেদে কেবল যদি ব্রহ্মজ্ঞান বা তাঁহার অভিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম মাত্র থাকিত, তবে ভারতীয় নিম্নাধিকারীগণের কি গতি হইত? বস্তুতঃ পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর উপযুক্ত ঈশ্বর প্রেরিত শাস্ত্র। সৃষ্টি ও শাস্ত্র ঈশ্বরের। ইহার মধ্যে কি সত্য কি মিথ্যা তাহা তুমি বা আমি সহসা বলিতে পারি না। কেননা, আমাদের বুদ্ধির স্থৈর্য্য নাই। তাহা প্রাতে একরূপ, সন্ধ্যায় অন্যরূপ। একটা উপদেশ শুনিলেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শাস্ত্র কিন্তু ধ্রুব। কেবল গুরুদেবের কৃপায় শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, নিরুপাধিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সৃষ্টি, স্থূল সূক্ষ্মকারণ দেহ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতারূপ ত্রিপুটী, সর্ব্বপ্রকার উপাসনা, বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া যায়। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান যাবৎ না জন্মে, তাবৎ তপ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম, পূজা, বেদাধ্যয়ন

কল্পনা-বিরহিত ব্রহ্মজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানীর সংখ্যা অতি অল্প বা নাই বলিলেও হয়, তখন বৈদিক ধর্ম্মের প্রয়োজন কি বলিয়া অস্বীকার করিব? যতক্ষণ স্বীয় স্বপ্নাবস্থার মধ্যে বিচরণ করত রাজপাটে বসিয়া আছ, ততক্ষণ সে রাজ্য ভোগকে কিরূপে মিথ্যা বলিতে পার? যদি আত্মজ্ঞানে, ব্রহ্মজ্ঞানে, তত্ত্বজ্ঞানে অভেদ জ্ঞানে জাগরিত হইতে পার, তবে বলিতে পারিবে তোমার পক্ষে বেদশাস্ত্র, বৈদিকজ্ঞান, বৈদিকক্রিয়া প্রভৃতি মিথ্যা। সে কেবল তোমারই পক্ষে মিথ্যা মাত্র বলিতে পারিবে, অন্যের পক্ষে নহে। কেননা অন্যের পক্ষে তাহা মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যের ন্যায় ফল দান করে। তুমি বলিবে সে ফল স্বপ্নবৎ। কিন্তু তাহার উত্তর এই যে, সংসারাবস্থায় তাহাই চিত্তশুদ্ধিজনক এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের সোপানস্বরূপ। নতুবা মোক্ষাবস্থায় শাস্ত্রানুসারে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলই মায়াময়; সুতরাং পরমার্থতঃ মিথ্যা। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ।

লেখক মহাশয় উত্তরগীতা, মুণ্ডকোপনিষৎ, কুলার্ণবতন্ত্র, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ভাগবৎ, ভগবদ্গীতা, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে যে সকল প্রচলিত বচন উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বেদ শাস্ত্রকে ও বৈদিক ক্রিয়া কলাপকে মিথ্যা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন, সে সমস্ত বচনই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও জ্ঞানীগণ জ্ঞাত আছেন। তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, সে সকল বচন অধিকাংশতঃ কেবল প্রাগুক্ত প্রকার "জগৎমিথ্যা, ব্রহ্মসত্য" ইত্যাকার পরমার্থিক অবস্থায় সংলগ্ন হয়; সংসারাবস্থায় তাহা সংলগ্ন হয় না।

যদি লেখক মহাশয় সে ভাবে বচন গুলি প্রয়োগ করিতেন, তবে তাঁহার লেখার ভাব সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় হইত; কিন্তু তিনি সে ভাবের নিকট দিয়াও যান নাই। সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত বচন গুলি সমুদয়ই প্রকরণ-বিরুদ্ধ হইয়াছে। তাহা সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে গেলে অত্যন্ত লিপি বাহুল্য হয়, এই জন্য সংক্ষেপে নিবেদন করি; জ্ঞানী মহাত্মারা দোষগুণ বিচার করিবেন।

"বিহায় শব্দ শাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্।"

এই বচনটীতে "সত্য" শব্দে ব্রহ্ম। শব্দরূপী বেদ ত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মো-

পাসনা যত হউক বা না, যাঁহারা দ্বেষ পূর্ব্বক শাস্ত্র অমান্য করেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ বচন সকল কি প্রশ্রয়ের স্থল নহে? ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানীগণ সর্ব্বশাস্ত্র হইতে সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে গ্রহণ ও ধারণ করেন সত্য। কিন্তু দ্বেষপূর্ব্বক তাঁহারা বেদনিন্দা করেন না। তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক বেদ ত্যাগ করেন না। কিন্তু আমাদের লেখক মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া, এক মাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসক হইয়া, বেদ নিন্দা ও নূতন আধ্যাত্মিক বেদ প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর পাইতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। এই বচনের নিম্নে তিনি লিখিয়াছেন যে, "সত্যই যে একমাত্র অবলম্বনীয়, ইহা ঊনবিংশ শতাব্দির আবিষ্ক্রিয়া নহে, ইহার অনেক পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল।" এই উক্তি গুলি অসম্বন্ধ প্রলাপ। কেননা এবচনে যে সত্যের উল্লেখ, তাহা "ব্রহ্ম"। ঊনবিংশ শতাব্দী যে সত্যের জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহা ভারতীয় মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় "খদ্যোত" তুল্য।

লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত "যথা অমৃতেন তৃপ্তস্য" এই বচনে আছে যে, "পরম বস্তু স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে বেদে প্রয়োজন নাই।" আমাদের বক্তব্য এই যে, একথা যথার্থ। কিন্তু যিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাঁর পক্ষে বেদের প্রয়োজন নাই। অন্যের পক্ষে আছে।

লেখক মহাশয়ের উত্থাপিত "দ্বেবিদ্যেবেদিতব্য", "তত্রাপরা ঋগ্বেদঃ" এই সকল বচনে দুটী বিদ্যার উল্লেখ আছে। একটী অপরা বিদ্যা; অন্যটী পরা বিদ্যা। একটী মূল প্রশ্ন হইতে এই দুইটী কথা উঠিয়াছে। বেদের একটী প্রতিজ্ঞা আছে যে,এমন একটী বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে সকল পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান হয়। যেমন এক সুবর্ণকে জানিলে সুবর্ণ নির্ম্মিত বলয়, কঙ্কন, কুণ্ডল প্রভৃতি তাবতীয় অলঙ্কারের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়; ইহাই জানা যায় যে বলয়, কঙ্কন, কুণ্ডলাদি কেবল মিথ্যা নাম রূপ মাত্র; বস্তুতঃ সবই সুবর্ণ; সেইরূপ বেদের ঐ প্রতিজ্ঞা। যথা, এক মাত্র পরমাত্মাকে জানিলে ইহাই জানা যায় যে, তাঁহারই সত্য স্বরূপ রত্নকল্প ধাতু দ্বারা এই জগৎ অচিন্ত্য ও অনন্ত প্রকার রূপ নামে প্রকাশ পাইতেছে। তৎসর্ব্বত্রে তিনিই এক মাত্র সত্য; নতুবা জগৎ রূপে প্রকটিত নামরূপ সমস্তই মিথ্যা। ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণার্থ শৌনক

জ্ঞাত হওয়া যায়? অঙ্গিরা যে উত্তর করিবেন, তাহার অনুষ্ঠান স্বরূপ কহিলেন, জানিবার যোগ্য দুইটী বিদ্যা আছে। একটী পরা, অন্যটী অপরা। চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ্ এ সকল অপরা কিনা অপ্রধান বিদ্যা। আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর পর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই পরা অর্থাৎ প্রধান বিদ্যা। (শাঃ ভাষ্য) "পরাচ পরমাত্মবিদ্যা এব অপরাচ ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন তৎফল বিষয়া।" পরমাত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা। যে বিদ্যা দ্বারা অনাত্ম বিষয় সকল মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, যাহা দ্বারা জীব ব্রহ্মে ঐক্য জ্ঞান জন্মে, যাহা মোক্ষের একমাত্র হেতু, তাহাই পরাবিদ্যা। উপনিষৎশাস্ত্র এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বর্ণের আর যে যে অংশ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, তৎসমস্তই পরাবিদ্যা শব্দের বাচ্য। এই পরাবিদ্যাকেই বেদান্ত কহে। (৩মুঃ ২খঃ ৬শ্রু) "বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে সমাহার করিয়াছেন যে, কেবল বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। অতএব তাহাই পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যা প্রতিপাদক নির্গুণ শ্রুতি সমস্ত জ্ঞানাধিকারে প্রেরিত হইয়াছে। "অপরাবিদ্যা" শব্দের অর্থ কর্ম্মকাণ্ড। ত্রয়ীবিদ্যা বা ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ সামান্যতঃ সেই কর্ম্মকাণ্ডকে বুঝায়। ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন, উপাসনা, প্রার্থনা, বিধিপূর্ব্বক বেদ পাঠ ও তৎসমস্তের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ—এ সমস্ত তাহারই অন্তর্গত। ফলকামী, কর্ম্মী ও সংসারী ব্যক্তিদিগের অধিকারে এই বিদ্যা প্রেরিত হইয়াছে। সামান্যতঃ তাহাই "বেদ" ও "অপরাবিদ্যা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদরাশি সচরাচর "বেদ" শব্দে উক্ত হয় না। তাহার মধ্য হইতে প্রবৃত্তি ধর্ম্মের অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের অন্ত হওয়ায়, তাহা "বেদান্ত" শব্দে উক্ত হয়।

এই পরা ও অপরা বিদ্যাদ্বয় কেবল এই বচনেই উল্লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। তাহা নানা নামে অন্যান্য স্থানেও উক্ত হইয়াছে। সেই সর্ব্বস্থলের আদ্যন্ত বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রের অভিপ্রায় অবগত হইতে হইবে। তবে আদ্যোপান্ত অর্থ-সঙ্গতি লাভ হইয়া শাস্ত্রার্থে উপপত্তি জন্মিবে। আমরা নিম্নে উক্ত বেদ বচনের তুল্যার্থ কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তদুপলক্ষিত শাস্ত্রের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ ইত্যাদি" (কঠ ২।২)

রক্ষার্থ প্রবৃত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডকে প্রেয়ঃ কহে। এই দুই ধর্ম্মই মনুষ্যকে অধিকার করে। অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারে শ্রেয়ঃ এবং কর্ম্মাধিকারে প্রেয়ঃ, এই দুই অধিকারে দুই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক মানব নীয়মান হন। ইহার মধ্যে শ্রেয়ঃ পরাবিদ্যার অনুগত এবং প্রেয়ঃ অপরাবিদ্যার অনুগত। মনুও কহিয়াছেন (১২।৮৮) "প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং।" বৈদিক ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি সংসার ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেয়ঃ, নিবৃত্তি মোক্ষধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রেয়ঃ। উহার মধ্যে প্রবৃত্তি ধর্ম্মটী বেদ-বাদ-বিষয়িণী রতি স্বরূপ এবং কুসুমিত ফলশ্রুতি পূর্ণ বিদ্যোপদেশ বিশেষঃ। আর নিবৃত্তি ধর্ম্মটী ব্রহ্মেতে সমাধি লাভের অনুকূল ব্যবসায়িত্মিকা বুদ্ধি স্বরূপ। (গীতা—যামিমাং পুষ্পিতং প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য)। গীতাভাষ্যোপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, "দ্বিবিধোহি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ"। প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ।" "তত্রৈকোজগতঃ স্থিতি কারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স হেতুর্য্যঃ সধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ব্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়ার্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেন কালেন।" বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ। প্রথমটী ধর্ম্ম, পুণ্য, উপাসনা; প্রার্থনা, ফলাদি সহকারে জগতের প্রবাহ রূপ নিত্য স্থিতির কারণ। দ্বিতীয়টী ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ কর্ত্তৃক অথবা বৈরাগ্যাধিকারে অনুষ্ঠীয়মান। তাহাই প্রাণিগণের শ্রেয়ঃ ও সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু।

এক্ষণ অবশ্যই বুঝা যাইবে যে, সমগ্র বেদই অপরা বিদ্যা নহে। প্রবৃত্তির অধিকারে বেদ "অপরা," নিবৃত্তির অধিকারে "পরা"। তন্মধ্যে উপনিষৎ ও মন্ত্রবর্ণীয় এবং ব্রাহ্মণ বর্ণীয় ব্রহ্মরহস্যপূর্ণ অংশ সকল বিশেষরূপে নিবৃত্তির অধিকার পোষক। যাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়, তিনি ব্রহ্ম। তিনি অপরাবিদ্যা, প্রবৃত্তি, প্রেয়ঃ, বেদবাদ, যাগফল, যোগফল, বেদপাঠ ইত্যাদির অন্তর্গত রূপে জ্ঞেয় নহেন। তিনি কেবল পরবিদ্যা নিবৃত্তি শ্রেয়ঃ সমাধি ইত্যাদি অধিকারে জ্ঞেয় হয়েন। সেই পরাবিদ্যা বা নিবৃত্তি ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। তাঁহাকে জানিলেই সব জানা যায়।

অঙ্গিরার উত্তর এই যে, তাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়। তিনি কিরূপ? তাহা বুঝাইবার জন্য কহিলেন "যত্তদদ্রেশ্য—ইত্যাদি শ্রুতি" যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, অশ্রোত্র; তিনি অপাণি,

রূপে দেখেন। এস্থলে শঙ্করাচার্য্য কহেন, "ভূতযোনিং ভূতানাং কারণং" পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গমানাং অর্থাৎ "ভূতযোনি" শব্দের অর্থ সর্ব্বভূতের যোনি, জন্মস্থান, কারণ। যেমন পৃথিবী স্থাবর জঙ্গমাদি দেহের উপাদান কারণ, তদ্বৎ। ফলতঃ স্বীয় স্বরূপের অন্যথা না করিয়া সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম, সর্ব্বভূতের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ মাত্র। অর্থাৎ তাঁহাকে বিবর্ত্ত বা পৃথক করিলে, তিনি ব্যতীত এ জগতের নাম রূপাদি মিথ্যা হইয়া যায়। কেবল তাঁহাকেই সর্ব্ব প্রকার আবির্ভাবের সত্য মূলরূপে জানা যায়।

"ঈদৃশমক্ষরং যয়া বিদ্যয়াধিগম্যতে সা পরা বিদ্যেতি"

যে বিদ্যাদ্বারা ঈদৃশ অক্ষর (অক্ষয়) পরমাত্মাকে জানা যায়, তাহাই পরাবিদ্যা।

সেই ব্রহ্ম কিরূপ ভূত-যোনি? তাহা জ্ঞাপনার্থ পর শ্রুতিতে কহিলেন।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে" ইত্যাদি—

যেমন ঊর্ণনাভকীট সূত্র সৃজন ও গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ঔষধি (তৃণাদি) জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষের দেহ হইতে কেশলোমাদি জন্মে, তদ্রূপ সেই অক্ষর পুরুষ হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। তাহাতে স্বতন্ত্র উপাদানাদি কারণান্তরের অপেক্ষা থাকে না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান ইহাই অভিপ্রেত; সুতরাং তাঁহাকে জানিলে সব জানা যায়। কারণ তিনিই একমাত্র সত্য। তাঁহার আশ্রয়ে এই জগৎ সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রকাশের একমাত্র মূলীভূত কারণ তিনি। নতুবা এই জগতের সমস্ত পদার্থ ও সমস্তভূত কেবল মিথ্যা নামরূপ মাত্র। "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি শ্রুতে।" যাঁহাকে জানিলে "অশ্রুত-জ্ঞান" শ্রুতজ্ঞানের ন্যায় হয়, যাহা কখনও মনে করা যায় নাই তাহা মনে প্রতিভাত হয়, যাহা অবিজ্ঞাত ছিল তাহা জানা যায়, তিনি ব্রহ্ম। বেদান্তরূপ পরাবিদ্যার সাধনা দ্বারা সেই সর্ব্ববীজস্বরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়। সেই বিদ্যাতেই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা
ভুবনস্য গোপ্তা সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা-

বিশ্বের কর্ত্তা ও ত্রিভুবন-পালক ব্রহ্মা ('দেবানাং' "দ্যোতনবত্তামিন্দ্রাদীনাং প্রথমো") জগৎ ও শরীরাদির বিশেষ বিশেষ অঙ্গের দীপ্তিদাতা ও প্রতিপালক ইন্দ্রাদি দেবগণের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন। তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা—সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা—পরাবিদ্যা—বেদান্তবিজ্ঞান কহিয়াছিলেন।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠারূপে কহিলেন। পরে সেই বিদ্যাকেই পরাবিদ্যা ও বেদান্তবিজ্ঞান শব্দে কহিয়াছেন। পশ্চাৎ সর্ব্বশেষ খণ্ডে "যথানদ্যঃ স্যন্দমানাঃ" প্রভৃতি কয়েকটী শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে, তাদৃশ পরাবিদ্যা দ্বারা যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি নাম রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাৎপর দিব্য পুরুষে গিয়া অস্ত হন। তিনি ব্রহ্মই হয়েন। তাঁহার কুলে অব্রহ্মবিৎ উৎপন্ন হন না। ক্রিয়াবান্—যথোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানযুক্ত, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিরা শ্রদ্ধা সহকারে ব্রহ্মলাভ করেন। যাঁহারা বিধিবৎ শিরোব্রত আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যা কহিবেক। যিনি ব্রতপূর্ব্বক এ বিদ্যা গ্রহণ না করিয়াছেন, তিনি এই বিদ্যা অধ্যয়ন করিবার অধিকারী নহেন। সর্ব্বশেষে পরমঋষিকে নমস্কার করিয়াছেন। এ স্থলে শঙ্করাচার্য্য সমাপ্তি বাক্য দিতেছেন—"সমাপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা সা যেভ্যোব্রহ্মাদিভ্যঃ পারম্পর্য্যক্রমেণ সম্প্রাপ্তা তেভ্যঃ নমঃ পরমঋষিভ্যঃ।" ব্রহ্মা হইতে পারম্পর্য্য ক্রমে যে ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ এই মুণ্ডক-উপনিষৎ-শাস্ত্র সমাপ্ত হইল। তাহার ঋষিকে নমস্কার।

আদ্যোপান্ত মুণ্ডকোপনিষৎকে লিঙ্গষট্‌কানুগত বিচার দ্বারা ধীরভাবে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, নিম্নাধিকার পোষক কর্ম্মকাণ্ডীয় অংশ-ব্যতীত সমগ্র বেদশাস্ত্র অপরা বিদ্যা মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু লেখক মহাশয় তন্মধ্য হইতে "অপরা ঋগ্বেদো" এই বচনটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, "অতএব লৌকিক বেদ-গ্রন্থ অপরা বিদ্যার মধ্যে গণ্য।" অর্থাৎ ভারতের বেদ নিকৃষ্ট-বিদ্যা—কেবল মানবের মন হইতে যে জ্ঞান বাহির হয় তাহাই সত্য ও উৎকৃষ্ট বেদ! আমাদের বিচারে তাঁহার এই সিদ্ধান্তটী তাঁহার উদ্ধৃত "তত্রাপরাঋগ্বেদো" ইত্যাদি মুণ্ডকশ্রুতির অনুগত নহে। লেখক মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, পরাবিদ্যা মানুষের মন হইতে স্বতঃ উৎপন্ন

উঠিয়া যাইত। এবং ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য স্থানের লোক, যাঁহারা ব্রতপূর্ব্বক বা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া বেদবেদান্ত পড়েন না, তাঁহারা স্ব স্ব মন হইতে এতদিন বিস্তর পরাবিদ্যা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, বর্ত্তমান কালের যুক্তিসম্ভূত ঈশ্বরতত্ত্ব বা অন্য কোন দেশের পরমার্থ বিদ্যা কখনই ভারতীয় বৈদিক পরমার্থ বিদ্যার নিকটেও আসিতে পারিবে না। অতএব আমরা বেদকে "অপরা ও পরা," "প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি," "কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড" ইত্যাকার যুগলভাবে যেমন চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছি, সেইরূপ ভাবে ভবিষ্যতেও চিরকাল দেখিব। কেন না, এই দৃষ্টিই বেদ-বেদান্তাদি স্মৃতিপুরাণাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রসিদ্ধ। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত নিবৃত্তি ধর্ম্মের অধিকারী না হন, তাবৎকাল বেদপাঠে, ফলশ্রুতি জ্ঞাপক বেদবাদে ও ফলাভিসন্ধির সহিত নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডে রত থাকেন। নিবৃত্তি ধর্ম্মে অধিকার জন্মিলেও তিনি সাধনাবস্থায় বেদের দাসই থাকেন। সে অধিকারে যখন তাঁহার সিদ্ধাবস্থা হয়, তখনই তাঁহার নিকট "শব্দব্রহ্ম" (বেদ), তাহার ঋক্ ও ছন্দ, তপঃ, ব্রত, তীর্থ, জপ, হোম, অর্চ্চনা, প্রার্থনা, মায়াময়-বাসনা, শ্রুতি দ্বারা বিক্ষিপ্ত সকামচিত্ত, ইত্যাদির অধ্যয়ন ও অনুষ্ঠান অনাবশ্যকীয় হয়। তথাপি সে অবস্থাতেও তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, হৃদয়ে সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরার্থে, লোক শিক্ষার্থে, ভারত-সমাজ রক্ষার্থে সেই সমস্ত অনুষ্ঠান করেন। কেন না, শাস্ত্রের কঠিন শাসন এই যে, গৃহস্থ শিবতুল্য যোগী হইলেও মনেতেও সামাজিক আচারের লঙ্ঘন করিবেন না।

লেখক মহাশয় আপনার মত সপ্রমাণ করণার্থ, আর যে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে সমস্তই অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে অথবা সিদ্ধাবস্থায় প্রয়োগ হইতে পারে। যদি লেখক মহাশয় তাদৃশ উন্নত অধিকারে সে বচনগুলি প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে কোন কথাই থাকিত না। কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধি স্বতন্ত্র। তিনি ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত, ঈশ্বর প্রণীত, অপৌরুষেয়, প্রবাহরূপ নিত্য, সত্য, সার্ব্বভৌমিক সনাতন বেদশাস্ত্রকে নিন্দা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মানবের চঞ্চলা বুদ্ধিবৃত্তিকে এক নূতন প্রকার বেদের উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার যত্ন করিয়াছেন। এই অভিসন্ধি অত্যন্ত অসৎ। তিনি মনে করিয়াছেন যে, তাঁহার মনের মত বেদটী ব্রাহ্মধর্ম্মের

ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বঙ্গভাষার শাস্ত্র-বিচার সকল পড়িয়া দেখেন নাই। দেখিলে জানিতে পারিতেন যে, উক্ত রাজা রামমোহন রায় কেবল বেদবেদান্ত সিদ্ধরূপেই ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বেদবেদান্ত ও ঋষিবাক্যসমূহকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।* তাঁহার এই ইচ্ছা ছিল যে, নিবৃত্তিধর্ম্মেতে ভারতীয় উপাধিকারীগণ ক্রমে আরোহণ করিবেন। ফলতঃ সে অধিকারে বেদ, বেদান্ত, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এ সমস্ত মিথ্যা জানিয়াও তিনি কাহারো বুদ্ধিভেদ করেন নাই। আমরা লেখক মহাশয়ের উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন সমূহের প্রকরণ বিরুদ্ধতা ও শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানাইবার জন্য, বিশেষতঃ তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ ভ্রান্ত না হন তাহার উপায় বিধানার্থ এই দীর্ঘ প্রতিবাদ করিলাম। তাঁহার সহিত বিবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুব্রাহ্ম-বিদ্যা ও হিন্দুশাস্ত্রকে রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, শাস্ত্রীয় যে কোন বচন তিনি উদ্ধৃত করিবেন, তাহার শব্দার্থ মাত্রে সন্তুষ্ট না হন। কিরূপ অধিকারে, কোন্ বিষয়ক প্রকরণে তাদৃশ বচন আছে তাহা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহার অর্থ নির্ণয় করেন। ঋষি, আচার্য্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাপক ও গুরু প্রভৃতি মহাজনেরা তাহার যেরূপ অর্থ, প্রয়োগ ও যোজনার নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বতঃ পরতঃ জ্ঞাত হন। পশ্চাৎ অভিলষিত স্থলের প্রমাণার্থে স্বীয় প্রবন্ধাদিতে তাহা উদ্ধৃত করেন। যদি স্বীয় মত তাদৃশ কোন বচন দ্বারা প্রমাণ না হয়, তবে কেবল যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিপাদনই কর্ত্তব্য। আমাদের প্রার্থনা এই যে, যেন তাদৃশ স্থলে লেখক মহাশয় নিরপরাধী শাস্ত্রকে হত্যা না করেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু—খড়গপুর।

---

* সম্প্রতি বেদশাস্ত্রের কতিপয় বিশদ ও বিস্তীর্ণ বিবরণ "পাক্ষিকসমালোচক" ১ম খঃ ২০। ২১ সংখ্যায় এবং বারাণসীর "ধর্ম্মপ্রচারকে" ৮ম ভাঃ ১।২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা

পুরাতনে নূতনে।

(প্রথম প্রস্তাব)

আজ কাল আমাদের পূর্ব্বতন সামাজিক রীতি নীতির উপর লোকের, অন্ততঃ শিক্ষিত মণ্ডলীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িয়াছে। যে রীতি নীতি গুলি বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাহাদিগকে একেবারে বিদায় দিতে অনেকে ইচ্ছুক নহেন; সুতরাং তাঁহাদের বিধিমতে চেষ্টা হইতেছে, সে গুলি যাহাতে থাকে। অপর পক্ষ সে রীতি নীতি গুলি সমাজের অহিতকর, এই সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদের সমূল উচ্ছেদ সাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। তাই রাখিবার জন্যই হউক, কি ভাঙ্গিবার জন্যই হউক, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সে গুলির উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ অতি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সে রীতি গুলি বদ্ধ-মূলই হউক, আর সংস্কৃত হউক, তাহারা যে ভালই হইবে তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অন্ধ বিশ্বাসে চালিত না হইয়া অপক্ষপাত-প্রণোদিত যুক্তি সমূহের সাহায্যে সে গুলির অস্তিত্বের কারণ বাহির হইলে, তাহাদের উপরে স্থাপিত-ভিত্তি হইয়া যে পদ্ধতি গুলি টিকিবে, সেই গুলিরই দীর্ঘ জীবন আশা করা যায়। নতুবা এক দিনের সঙ্কল্পে সে গুলিকে ভাঙ্গিলেও কোন লাভ নাই, রাখিলেও কোন লাভ নাই; প্রত্যুতঃ তাহাতে সমাজের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা।

উপরে অস্মদ্দেশীয় আচার পদ্ধতির সম্বন্ধে যাহা যাহা কথিত হইল, তাহা কিন্তু সকল গুলির সম্বন্ধে খাটে না। কতকগুলি আচার পদ্ধতি এরূপ আছে যে, সে গুলিকে যত শীঘ্র উচ্ছেদ করা যায়, ততই সমাজের মঙ্গল—তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য দীর্ঘ প্রস্তাব, গভীর যুক্তি পরিপূর্ণ বক্তৃতা কিংবা সূক্ষ্ম তর্কের ও প্রয়োজন নাই। সতীদাহ কি গঙ্গায় পুত্র কন্যা বিসর্জ্জনের ন্যায় পদ্ধতি গুলি সমাজ হইতে যত শীঘ্র তিরোহিত হইয়াছে, ততই দেশের মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। যে পদ্ধতি গুলি

আছেন; এবং যাঁহারা সে গুলির জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের মনুষ্য নামে বোধ হয় অতি অল্পই দাবি আছে।

জাতি-ভেদ এই পদ্ধতি গুলির অন্তর্ভুক্ত কিনা, তাহা আমি বলিতে চাই না। পাঠক মহাশয়দিগের এ বিষয়ে নিজের নিজের সিদ্ধান্ত আছে, আমারও একটা সিদ্ধান্ত অবশ্যই আছে। আমার নিজের সিদ্ধান্তকে সমিচীন প্রমাণ করিতে এ প্রস্তাবের অবতারণা করি নাই। তাই সে সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল।

জাতিভেদ সম্বন্ধে গুটীকতক কথা অনেক দিন হইতে বলিব বলিব মনে করিতেছিলাম। তাই অনেক দিনের সাধ আজ মিটাইতে বসিলাম। ভরসা করি পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া শুনিবেন।

প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, অধুনাতন শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক পূর্ব্বতন আচার প্রণালী রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, অপর শ্রেণী সে গুলিকে দূর করিতে কৃতসংকল্প। জাতি-ভেদ সম্বন্ধে এ বিভাগের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সমাজের শিক্ষিত লোকের মধ্যে কেহ কেহ জাতি-ভেদের পক্ষ লইয়াছেন;—সুতরাং তাঁহাদের সহায়তায় যে আবার মৃত-প্রায় জাতি-ভেদ হুঙ্কার করিয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার ত মনে পড়েনা যে, আমি গত বৎসর "কুমার" শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন মহাশয়ের বক্তৃতার পূর্ব্বে জাতি-ভেদের স্বপক্ষে কোন স্থানে যুক্তি দেখিয়াছি। যদিই বা কোন স্থানে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সে গুলিতে তত মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। "কুমার" মহাশয়ের বক্তৃতায় কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার শ্রুতিমধুর ভাষা, নূতন নূতন যুক্তি, অসাধারণ বাগ্মিতা ও অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সাহস সকলকেই যেন স্তম্ভিত করিয়াছিল। কিন্তু সে বক্তৃতাতে ভাষার চ্ছটা থাকিলেও যুক্তির প্রাবল্য তত নাই। যুক্তি গুলি নূতন বটে, কিন্তু অভাবনীয়; অশ্রুপূর্ব্ব বটে, কিন্তু তাহাতে বাহাদুরী নাই; ভাষার চাতুর্য্য আছে বটে, কিন্তু সারবত্ত্বা অতি অল্প। জাতিভেদের কাণ্ড কারখানা তিনি বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে চাহেন!‡ অভিনব হিন্দু-ধর্ম্মোত্তলন-

‡ এখানে এই অভিনব বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। যাহারই ব্যাখ্যা হইয়া উঠিতেছে না, তাহারই সরবরাহের ভার বিদ্যুৎ মহাশয়ের

কারীগণ বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যার বড় পক্ষপাতী। তাই নবপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ বাবু যে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন, তাহাত বোধ হয় না। কিন্তু বৈদ্যুতিক ব্যাখার অন্ধতম আবরণ ভেদ করিয়া আরও গভীর আঁধারে পড়িতে আমাদের বাসনা নাই; তাই আমরা তাহার বাহির হইতেই বিদায় গ্রহণ করিলাম। পাঠক মহাশয় যদি ইহার বিষয় জানিতে চাহেন, তবে গত বৎসরের শ্রাবণ কি ভাদ্র মাসের "বঙ্গবাসীর" ফাইল খুঁজিয়া দেখিবেন।

এই বক্তৃতায় জাতিভেদকে একটী প্রাকৃতিক শক্তি বলা হইয়াছে। "প্রাকৃতিক শক্তি" শব্দটী বড়ই কঠিন। কারণ, "প্রকৃতি" শব্দেরই নাকি ঠিক প্রসর বোঝা শক্ত, তাহাতে আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে "শক্তি" শব্দের উদয়। কাজেই "বাঁশের চেয়ে কুঞ্চি দড়" হইয়া পড়িয়াছে—বিষয় অপেক্ষা ব্যাখ্যা দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। "প্রাকৃতিক শক্তির" অতি বিস্তৃত অর্থ প্রদান করিলে, জাতিভেদ "প্রাকৃতিক শক্তির" মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়েও শ্রীকৃষ্ণ বাবুর মতের সঙ্গে আমার মতের বাক্যগত সাদৃশ থাকিলেও, অর্থগত কোন সাদৃশ্য নাই। আমার অর্থ আমি বিশদ করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গোটাকতক কথা বলিতে হইবে।

জাতিভেদ এক রকম না এক রকম ভাবে সকল সমাজেই আছে। § বড় ছোটতে বৈষম্য, ধনী নির্ধনীতে পার্থক্য সমাজ হইতে উঠিয়া যাইবার এ পর্য্যন্তও কোন আশাজনক নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং

কারণ কি? ইহার প্রধান কারণ আমার নিকট এই বোধ হয় যে, চিকিৎসা বিদ্যার ভিতরে বিদ্যুৎ স্থান পাইয়াছে। সকলেই Electro-Homœopathy শাস্ত্রের নাম বোধ হয় জানেন। আর আমাদের দেশেও ৺সীতা নাথ বাবু ইহার যথেষ্ট অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহার গবেষণা খুব বেশী পরিজ্ঞাত নহে, তথাপি তাহাতে যে কিছু ফল করে নাই, এমত আমার বোধ হয় না। আরও এক কথা; Theosophist দলের লোকেরাও ইহার উপর কতক ঝুঁকিয়াছেন। তাহাতেও কিছু ফল করিতে পারে। তবে বৈদ্যুতিক-প্রভাব লোকের মনে বহু দিন হইতে উদিত হইয়াছে, সত্য। আমার যেন মনে পড়িতেছে যে, "তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকাতেও" বহু কাল পূর্ব্বে কতক গুলি হিন্দু-পদ্ধতি বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা হইতেই এই অভিনব

সে পার্থক্য যে আর কিছু দিন সংসারে থাকিবে, তাহা কতকটা ঠিক। সে পার্থক্যকে জাতিভেদ বলিতে চাও বল, কিন্তু আমাদের দেশের জাতিভেদ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর কতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত। বিলাতে কি ইউরোপে বড় ছোটতে বৈষম্য থাকিলেও তাহা ভঙ্গুর। আজ যে গরিবের ছেলে আছে, কাল হয়ত সে সমাজের শীর্ষ স্থানে বসিবে। আজ যে সকল লোক তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে, কাল হয়তঃ সেই সকল ব্যক্তিই তাহার সঙ্গে আহার ব্যবহার করিয়া নিজকে সম্মানিত মনে করিবে। "কসায়ের ছেলে"Lord Chancellor, নাপিতের ছেলে Sir Richard Arkwright, Cabin boy President Garfield, কি কর্ম্মকার "Elihu Burrit", আমাদের দেশে জন্মান কঠিন। তাই আমাদের"জাতিভেদ" একটী ভয়ানক পদার্থ। এ দেশে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র "শূদ্র" বই আর কিছুই নহেন—রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "দত্ত" বই আর কিছুই নহেন, আর আমি—পৈতাধারী পবিত্র ব্রাহ্মণ! গোঁড়া হিন্দু-সমাজে,প্রকৃত হিন্দু সমাজে ডাক্তার মহাশয়ে আর আমাতে বিস্তর প্রভেদ। তাই বলিতেছিলাম যে, আমাদের দেশেই প্রকৃত জাতি-ভেদ জন্মগত বৈষম্য। বিলাতে কি মার্কিন-দেশে তাহা নাই।

এই জাতি-ভেদ প্রথাতে যে আমাদের কত হিত করিতেছে আর কত অহিত করিতেছে, তাহার হিসাব দেওয়া এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আমি তাহার সম্বন্ধে জমাওয়াশীলের কাগজ ঠিক করিতে বসি নাই; ঠিক করিবার সাধ্যও নাই। তবে জাতিভেদের মোটা মুটী দরকার লক্ষণটী দেওয়া রীতি, তাই তাহা দিলাম।

এই জাতি-ভেদের উদ্ভব-হেতু সম্বন্ধে দুইটী প্রধান পৃথক কারণ আমার দৃষ্টি পথে আসিয়াছে। দুইটীই স্বাধীন বোধ হয়। তবে কেহ কারও উপরে নির্ভর করিতেছে, না কি উভয়েই উভয়েরই অধীন, তাহা আমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার নিকট কিন্তু দুইটী পৃথক বলিয়া বোধ হয়। অতি পূর্ব্ব কালে যে আমাদের দেশে জাতিভেদ ছিল না, তাহা নূতন করিয়া প্রমাণ করা এক প্রকার পাঠক মহাশয়ের বিদ্যার প্রতি দোষারোপ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ব্যাখ্যা বোধ হয় কেবল প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরে অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তৎপরে এই কয়েক দিন বিদ্যুতের বড়ই প্রভাব দেখিতেছি।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং॥"

শ্লোকটী আমাদের এক্ষণে সাধারণ সম্পত্তির মধ্যে গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ খুব কমই পাওয়া যায়। ইহাতেই জাতি-ভেদ সমুদ্ভবের প্রকৃত কারণ বুঝা যাইতেছে। "কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং" শ্রীকৃষ্ণ বাবু অবশ্যই স্বীকার করেন না। কারণ, সেটী যে জলের মত সরল। তাই সেটী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার তত উপযোগী নহে। আজ কাল হিন্দু ধর্ম্মের গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা যে সে ই করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয় যে তাঁহার প্রাপ্য ছাড়িবেন, তাহা বোধ হয় না। তাই জাতি-ভেদের পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাবৎ পরিস্কার ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া অমানিশার গভীর অন্ধকারবৎ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

জাতি-ভেদের প্রথা যে পূর্ব্বে ব্যবসায়-গত বা কর্ম্ম-গত ছিল, তাহার নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রথমে যে আমাদের ভিতর জাতি-ভেদ ছিলনা, তাহাও এক রকম ঠিক। ক্রমে সমাজ যত উন্নত হইতে লাগিল, ততই পরিশ্রমের বিভাগ (Division of labour) আবশ্যক হইয়া উঠিল। এক জনের পক্ষে স্বীয় জীবনের সমস্ত অভাব স্বকীয় ক্ষমতায় মোচন করা সমাজের আদিম অবস্থায়ই হইয়া উঠে। সভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় শ্রেণী-বিভাগ না হইলে, সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় না। স্বীয় স্বীয় উদর চিন্তায় সকলে ব্যাপৃত থাকিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে না। তাই আর্য্য-উপনিবেশ গুলির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন ভ্রমণশীল জীবন ছাড়িয়া কৃষি-জীবন গ্রহণ করিলেন, তখন সেই পুরাতন জীবনোচিত কার্য্য গুলি ক্রমে ক্রমে অবসর গ্রহণ করিল। পরিশ্রমের বিভাগ আরম্ভ হইল; তৎসঙ্গে সঙ্গেই শ্রেণীর উৎপত্তি হইল। শ্রেণী হইল মাত্র, কিন্তু "জাতি" হইল না! তখনও পরস্পরে আহার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল না—বিবাহও যে প্রচলিত ছিল তাহা বোধ হয়। তাহার বহুদিন পরে মনুতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ সকল জাতির কন্যাই বিবাহ করিতে পারিতেন। "শূদ্রৈবভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতা" * ইত্যাদি শ্লোকই তাহার পরিচায়ক। ক্রমে সে পদ্ধতি গুলি উঠিয়া গেল, বিবাহও বন্ধ হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বেই আহার

বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন প্রকৃত "জাতি-ভেদ" প্রথার সৃষ্টি হইল। মনুতে কিন্তু অন্যান্য জাতির সহিত আহার প্রকাশ্যভাবে নিষিদ্ধ নহে, কেবল শূদ্রের সঙ্গে নিষিদ্ধ বটে; কিন্তু তাহাতেও জাতি যাইত না (মনু, ১১ অঃ, ১৫৩ শ্লোক)

সংক্ষেপে এই প্রকারে জাতি-ভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল। এটী আমাদের দেশের জাতি-ভেদের উৎপত্তির কারণ। ইহা ব্যতীত আরও একটী কারণ ইহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় এবং তাহা আমাদের দেশে কি অন্য কোন দেশ বিশেষে নিবদ্ধ নহে—সেটী সাধারণ কারণ। তাহা এই—

মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থায়—অথবা যখন মনুষ্য সমাজ ভুক্ত হয় নাই, তখন সকলেই স্বাধীন—সকলেই স্বেচ্ছাচারী—প্রকৃতি কমনীয়, জনশূন্য প্রান্তরে বেড়াইয়া বেড়াইত, নিজের নিজের উদর চিন্তায় সকলেই ব্যস্ত—নিজের ইচ্ছায়ই তখন সকলে পরিচালিত হইত; সেই সময়ে রাজা কি বাদসাহ কাহারও অধীনে কেহ নহে এবং লোকে অন্যের শাসন সহ্য করিতে পারিত না। এ প্রকার বিবাদী ধাতুর দ্বারা গঠিত যে সমাজ, তাহার সমন্বয় কিসে হইবে? সর্ব্বাদৌ সেই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত, ভ্রমণ-কুশল, নিরঙ্কুশ মনুষ্য দলের মধ্যে নিয়ম (system) স্থাপিত করা প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এক জনকে সকলেই প্রথমে মান্য করিবে—এক জনের আজ্ঞার অবহেলা কেহই করিতে পারিবে না, এইটীই সমাজ সংস্থাপনের মূল ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইল। এটী কিন্তু প্রথমেই সমস্ত জাতিতে বিস্তৃত হয় না। প্রথমে একটী পরিবারে নিবদ্ধ ছিল। পৃথক্ পৃথক্ পরিবারের কর্ত্তা তখন স্বীয় পরিবারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ক্রমে সেই পদ্ধতি সমস্ত জাতিতে বিস্তৃত হইল। তখন একটী "কেন্দ্রগত শক্তি" সমাজে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। সেই শক্তির নিকটে সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু একজনের মাথা ঠিক হইলেও ত হইল না। মাথা কিসে কাজ করিবে? সমাজে যাঁহারা বুদ্ধিমান্ কি ক্ষমতাশালী, তাঁহাদের কার্য্যের ক্ষেত্র অবারিত রাখিলে তবে তাঁহারা সমাজের উন্নতি-কল্পে স্বীয় স্বীয় জীবন প্রদান করিতে পারেন। যদি তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অন্ন চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন, তবে সমাজের উন্নতি হয় না, এবং সমাজে "মানসিক" বল (Intellectual force) এক কেন্দ্রে আসিয়া একত্র হইতে পারে না—তাহার সমষ্টি এক স্থানে আসিয়া রাশীকৃত হইতে

তাহারা, এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের সুখস্বচ্ছন্দ বিধান করিতে পারে—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে বুদ্ধিমানেরা নিশ্চিন্ত হইয়া সমাজের উন্নতি কল্পে স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি বৃত্তি নিয়োজিত করিতে পারেন। যাহাতে বুদ্ধিমানেরা অসুবিধা ভোগ না করেন, যাহাতে বলবানের বল বৃথা কাজে ব্যয় না হয়, তাহারই জন্যে প্রথমে "দাস শ্রেণীর" সৃষ্টি হইল। সমাজে যাহারা দুর্ব্বল প্রথমতঃ তাহারাই দাস শ্রেণী ভুক্ত ছিল। ক্রমে বিজিতদিগকেও সেই দলেই ভুক্ত করা হইল। ইহার পর অন্যান্য শ্রেণী হওয়া অতিশয় সহজ। তাই ক্রমে ক্রমে অন্যান্য শ্রেণী সৃষ্ট হইল। তৎপরে সেই শ্রেণী গুলি কি প্রকারে জাতিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা প্রস্তাবান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

বিলাত প্রত্যাগত বাঙ্গালী।

সময়ের গতি এক বিচিত্র ব্যাপার! কাহার সাধ্য উহার বৈচিত্র্য বুঝিয়া উঠে? যাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহা সময়ের অদ্ভুত আবর্ত্তনে আপনিই আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। যাহা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের নিকট স্বপ্নবৎ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত, আজ তাহা আমাদের সম্মুখে জীবন্তভাবে, প্রকৃত ঘটনায় পরিণত। আর যাহা আমরা এখন অতিদূরে অস্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তাহাই কালে আমাদের সন্তান সন্ততির নিকট সাক্ষাৎভাবে আসিয়া দাঁড়াইবে। তাই বলিতেছিলাম, সময়ের

বঙ্গবাসীকে বারাণসী তীর্থ দর্শনে যাইতে হইলে এক মহা কাণ্ড উপস্থিত হইত। স্ত্রী পুত্রের রোদন-রোল, মাতার কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে আর প্রতিবেশীদের বিষণ্ণ মুখ দেখিতে দেখিতে তীর্থ-যাত্রীকে বিদায় লইতে হইত, যেন তীর্থ-যাত্রী এ সংসার হইতে চির চিদায় লইতেছেন, যেন তাঁহার এ সংসারের লীলা শীঘ্রই শেষ হইবে। সেই এক দৃশ্য। আর বর্ত্তমান সময়ে কি দেখিতেছি? আজ সেই বাঙ্গালী গগন-বিহারী পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনভাবে যথায় ইচ্ছা তথায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। এখন আর সেই হৃদয়ভেদী রোদনধ্বনি নাই, সেই অশ্রুজল নাই, বিদায়ের সেই ভাব নাই। ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দাও। আজ বাঙ্গালী সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া য়ুরোপের নানা স্থানে এবং বহু দূরবর্ত্তী আমেরিকায় যাইয়া নানা বিভাগে নানা বিষয় শিক্ষা লাভ করতঃ ভারতের জ্ঞান গৌরব দেখাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে। সভ্যতাভিমানী য়ুরোপ ও মার্কিনবাসী ইহাদের মানসিক শক্তি দেখিয়া বিস্মিত। বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়। ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান অবস্থা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাদের প্রতি সাধারণ বাঙ্গালীগণের কিরূপ ভাব, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা এবং কোন কোন গুরুতর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য। এই লক্ষ্য লইয়া আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

যতই বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই আমরা দেখিতেছি যে, "বিলাত-প্রত্যাগত" বলিয়া একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী গঠিত হইতেছে। ইহা যে নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। একেইত ভারতবাসী নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়, নানা বর্ণে বিভক্ত এবং এই নানা বিভাগই যে জাতীয় পতনের একটী প্রধান কারণ, এ বিষয়ে কে দ্বিরুক্তি করিবে? কোথায় আমরা এই নানা সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া এক করিব, তাহা না করিয়া আমরা নিত্য নূতন শ্রেণী সৃষ্টি করিতেছি! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? যদি আশা করিয়া থাক যে,ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে যে বর্ণ ভেদ রহিয়াছে, সেই অস্বাভাবিক জাতি-ভেদ রক্ষা করিয়াও জাতীয় উত্থান সাধিত

পতিত দেশের অভ্যুত্থান হইবে, তবে হে সমাজ-তত্ত্বানভিজ্ঞ, তোমার সেই আশাএখনি পরিত্যাগ কর। আর শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণে কি ফল? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব দেশীয় কোন ইঙ্গ ভারতীয় সংবাদ পত্রে কি লিখিয়াছিল, একবার মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। লিখিয়াছিল—"ভারত বাসীদের মধ্যে বংশপরম্পরাগত যে সকল কুসংস্কারও মিলনের প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, তাহা যদি আমরা (ইংরেজ) শিক্ষা দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিই, যদি এই বিংশতি কোটী মানব সম্মিলিত হয়, কাহার সাধ্য আর ইহাদিগকে শাসন করে; অতএব তাহাদিগকে এই ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন এই কুসংস্কার, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, বর্ণে বর্ণে প্রভেদ সম্পূর্ণরূপ থাকিয়া যায়।" এখন কুসংস্কারের পক্ষপাতীদিগের চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের জাতীয় পতনের মূল কোথায়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি আমাদের চৈতন্যোদয় না হয়, জানি না তবে কিসে আমাদের এই মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবে। বলিতেছিলাম যে, একেই আমাদের দেশে নানা সম্প্রদায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার মধ্যে যদি উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীগণের আর একটী পৃথক শ্রেণী সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আর এ দেশের দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না। যাঁহারা এত দিন স্বাধীন দেশে থাকিয়া, স্বাধীন বায়ু সেবন করিয়া, স্বাধীন লোকের মধ্যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন—যাঁহারা সভ্যতর সমাজের সহিত মিশিয়া অনেক সদ্ভাব, সদাশা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যেরূপ আমাদের জাতীয় দোষগুলি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন, যাঁহারা চিরকাল এ দেশেই কাটাইতেছেন তাঁহারা কখনও তদ্রূপ পারিবেন না। সুতরাং বিলাতপ্রত্যাগত স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে আমরা অনেক আশা করিয়া থাকি। কিন্তু তাঁহারা যদি দেশে আসিয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করেন, কখনো আশা করিতে পারি না যে, তাঁহাদের দ্বারা এ দেশের কোন বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য এই, "বিলাতপ্রত্যাগত" বলিয়া যে একটা নূতন শ্রেণী গঠিত হইতেছে, ইহার জন্য কে দায়ী, কে প্রকৃত দোষী? আমাদের মতে প্রধান দোষী আমাদের অনুদার কুসংস্কারাবিষ্ট সমাজ। বিলাতপ্রত্যাগতদিগকে সমাজে গ্রহণ করা উচিত কি অনুচিত, হিন্দু সমাজে

সন্তোষজনক মীমাংসায় কেহ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। আমাদের পণ্ডিতগণ অনেকবার শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা দর্শাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণ করা উচিত নয়। এইরূপে যে কত দিন চলিবে, কে বলিতে পারে? যে পর্য্যন্ত এই সকল গুরুতর প্রশ্ন মীমাংসার ভার স্বার্থপর বিকৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী, অর্থ ও পসার লোভী, হৃদয় বিহীন পণ্ডিতগণের উপর অর্পিত হইবে, যত দিন পর্য্যন্ত সমাজ ইহাদিগকে নেতা বলিয়া মান্য করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত এই প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা হইবে না। দেশ রসাতলে যাইতেছে, তাহাতে তাহাদের কি আসে যায়? দেশের উন্নতি অধোগতির ধার তাহারা ধারে না, অর্থ পাইলেই হইল! যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের পণ্ডিত সমাজ বলিবে, "প্রায়শ্চিত্ত না করিলে সমাজে প্রবেশাধিকার পাইবে না," ততদিন পর্য্যন্ত বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীও বলিবেন, "তোমার এমন সমাজ চাই না। কোন পাপ করি নাই যে, প্রায়শ্চিত্ত করিব। বিশ্বাস করি না যে, ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ দান করিলে কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। স্বাধীন দেশে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, কাহারো অনুরোধে স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিব না।" সমাজ যখন তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিল না, তখন ইহাঁরা কোথায় যান। হয় অন্য কোন সমাজে যাইয়া আশ্রয় লইবেন, নতুবা তাঁহারা আপনারাই এক নূতন সমাজ সংগঠন করিবেন। মানব সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়া থাকিতে পারে না। এখন পাঠকগণ দেখুন যে, "বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীগণ" যে একটী নূতন শ্রেণীতে পরিগত হইতেছেন, ইহার জন্য কে দায়ী। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক দিগের মধ্যেও এমন অনেক আছেন, যাঁহারা ইহাঁদের উপরে বড়ই অসন্তুষ্ট। দেশীয় লোকেরা বিলাতপ্রত্যাগত লোকদিগের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিয়া থাকেন, আমরা সেই সকল অভিযোগের এক একটী করিয়া ধরিব এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

১ম অভিযোগ—বিলাতপ্রত্যাগতগণের মধ্যে জাতীয় ভাবের বিশেষ অভাব, ইহাঁরা বিজাতীয় ভাব পূর্ণ। এখন জিজ্ঞাস্য, কি করিয়া জানিবে যে ইহাঁদের মধ্যে জাতীয় ভাব নাই? প্রতিপক্ষ উত্তরে এই বলিবেন, ইহাঁদের

বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীরা জাতীয় পরিচ্ছদ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিজাতীয় আকার ধারণ করেন। কেবলমাত্র বসন ভূষণের প্রভেদ বশতঃই যদি আমরা বিলাতপ্রত্যাগতদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করি ও তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে বিলাতপ্রত্যাগতদিগের বিশেষ কোন দোষ দৃষ্ট হয় না, কেবল আমাদেরই অনুদারতা এবং সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়। আজ কাল জাতীয়তা লইয়া বড়ই গোলযোগ চলিতেছে। এমনও কতকগুলি কুশিক্ষা-প্রাপ্ত লোক আছে, যাহারা মনে করে, যে সকল লোক ন্যায় বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখে, যাহাদের হস্ত বালবিধবার অশ্রুজল মুছাইতে সর্ব্বদা ব্যগ্র, যাহারা জাতিভেদ ঈশ্বরের বিধান বহির্ভূত মনে করিয়া অন্য বর্ণের সহিত আহার বিহার, কি আদান প্রদান করিয়া থাকে, ইহারাও বিজাতীয় ভাব পূর্ণ, অস্পৃশ্য, স্বদেশ-বিরোধী! এই বলিয়া ইহাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচারও করিয়া থাকে। এই সকল সঙ্কীর্ণ-মনা লোকের সহিত তর্কে কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা বিবেকের আদেশের পবিত্রতা বুঝিতে অক্ষম, স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম যাহার বুঝে না, "পশার" ব্যতীত যাহাদের কার্য্যের অন্য কোন পবিত্রতর পরিচালক নাই, তাহাদের সঙ্গে তর্ক করা আর বায়ুতে অসি প্রহার করা, উভয়ই সমান। যাঁহারা বলেন, বিলাতপ্রত্যাগতদিগের বিজাতীয় ভাবের প্রধান চিহ্ন বিজাতীয় পরিচ্ছদ, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, বাঙ্গালীর জাতীয় পরিচ্ছদ কি? সত্য কথা বলিতে কি, বাঙ্গালীর কোন জাতীয় পরিচ্ছদ নাই। মুসলমান যখন এদেশের রাজা ছিল, তখন বাঙ্গালী একবারে মুসলমান সাজিয়াছিল। এই যে চাপ্‌কান চোগা এবং সামলা, যাহা আমরা অনেকে জাতীয় পরিচ্ছদ বলিয়া মনে করি, তাহা বাস্তবিক মুসলমানদিগের নিকট হইতে গৃহীত। "ঝোলা-পাজামা" এখন ইংরেজের সংঘর্ষণে সূক্ষ্মতর দেহ ধারণ করিয়াছে এবং ইহার নাম এখন "প্যাণ্টালুন"। তবে জানিতে চাই, মুসলমানগণের নিকট হইতে যে চাপ্‌কান চোগা ইত্যাদি লইয়াছি, তাহা যদি জাতীয় পরিচ্ছদ হইতে পারিল, তবে ইংরাজ-রাজত্বে বাস করিয়া ইংরাজের পোষাক গ্রহণে আপত্তি কি এবং তাহার প্রতি এত ভ্রূকুঞ্চন কেন? কেহ কেহ

কামিজ ও কোটটী কোথা হইতে পাইলে? এমন সুন্দর জুতা যোড়া, কেমন সুন্দর মোজা, ইহা কোথা হইতে পাইলে? ইহাতো ইংরাজের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছ। তবে প্যাণ্টালুনটীর উপর এত ঘৃণা কেন? এখন দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালীর কোন জাতীয় পরিচ্ছদ নাই এবং যে পর্য্যন্ত এইরূপ কোন একটা জাতীয় পরিচ্ছদ না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত একের অন্যের পোষাকের প্রতি বিদ্বেষ-নয়নে দৃষ্টি করিবার কোন অধিকার নাই। তাই বলি, পরিচ্ছদ লইয়া এত গোলযোগ কেন? পরিচ্ছদের সহিত জাতীয়তার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ নাই। জাতীয়ভাব অর্থাৎ স্বজাতি-প্রেম বা স্বদেশ-প্রেম হৃদয়ের জিনিস; উহার সহিত বাহিরের পরিচ্ছদের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও, তবে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপান রাজ্যে গমন কর। দেখিবে, জাপানবাসী প্রায় সকলেই য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। সেই হ্যাট, সেই কোট, সেই প্যাণ্টুলান, সকলই সেই, কোন বিভিন্নতা দেখিতে পাইবে না। পরিচ্ছদ তাহারা আমেরিকান দিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ বলিতে পারে, জাপান বাসীদের জাতীয় ভাব নাই? কখনই না। স্বজাতি-প্রেমে জাপানবাসী কোন জাতি হইতেই হীন নহে। কোন্ শক্তি বলে এই ক্ষুদ্র দ্বীপ এত গৌরব, এত সমৃদ্ধির অধিকারী হইয়াছে?—স্বজাতি-প্রেম। যাহাদিগকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসভ্য বলিয়া সভ্যতাভিমানী য়ুরোপীয় ও আমেরিকগণ ঘৃণা করিত, আজ স্বজাতি প্রেমের মোহ-মন্ত্রে সেই অসভ্য জাতি অনেক সভ্য জাতিকে পরাস্থ করিয়াছে। তাই আবার বলি, জাতীয়তার সহিত পরিচ্ছদের সম্পর্ক কি? স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন প্রায় সমস্ত জীবন বিজাতীয় পরিচ্ছদে কাটাইয়াছেন। কিন্তু, হে ভারত-উদ্ধারী ভাই, তাঁহার হৃদয়ে যে স্বজাতি-প্রেম—তাঁহার প্রাণে যে স্বদেশ-হিতৈষণা ছিল, বুকে হাত দিয়া বল দেখি, তোমার হৃদয়ে তাহার লক্ষাংশের একাংশও আছে কি? তাঁহার প্রাণভরা স্বজাতি-প্রেম, তাই জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের পরিচর্য্যা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আর তুমি আমি কি করিলাম, বিদ্বেষভাব পরতন্ত্র হইয়া প্রত্যেক আস্তা-কুড়ায় যাইয়া দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা পুস্তক ও সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠা রঞ্জিত করতঃ বাহাদুরী বিস্তার করিলাম, "ভারত-

দ্বিতীয় অভিযোগ—কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, একটু গোময় ভক্ষণ করিলে কিম্বা কেশাগ্র কিঞ্চিৎ ছেদন করিলে যদি দেশের লোক ও আত্মীয় স্বজন সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণের জাতীয়তার অনুরোধে এই যৎসামান্য ত্যাগ স্বীকারে আপত্তি উত্থাপন করা বিধেয় নহে। বরং এই সামান্য প্রথাটী অবলম্বন পূর্ব্বক, আপনাদের স্বজাতি-প্রেমের পরিচয় দেওয়া উচিত! যাঁহারা বিলাত-প্রত্যাগত-দিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা দেশের প্রকৃত শত্রু বলিয়া গণ্য করি। সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, যে সকল লোকেরা শিক্ষাভিমানে মহা স্ফীত, যাঁহারা আপনাদিগকে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সাধারণ সংবাদ পত্রে এরূপ ভয়ঙ্কর মত প্রচার করিতে সঙ্কোচিত নহেন! হতভাগ্য ভারতভূমি, ইহাঁরাই আবার তোমার প্রতিনিধি! যে সকল দেশীয় লোক বিলাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা কেবল কথায় নহে, কার্য্যে জাতিভেদের কলঙ্কিত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন; আপনাদের উন্নত জ্ঞান বলে জানিতে পারিয়াছেন যে, এরূপ একটী জঘন্য প্রথা মানব সমাজের কলঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে। তুমি কি চাও যে, ইহাঁরা সেই কল্পিত জাতীয়তার অনুরোধে তাঁহাদের উন্নত জ্ঞান ও বিশ্বাস, বিবেকের আদেশ, ও সুমার্জ্জিত রুচি পতিত সমাজের চরণে বিসর্জ্জন দিবেন? নিতান্ত কাপুরুষ না হইলে কেহ কাহারও নিকট এরূপ ভয়ানক কাপুরুষতা প্রত্যাশা করিতে পারে না। জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের জাতীয়তার অর্থ কি? কাপুরুষতা, ভণ্ডামি ও কপটতা যদি জাতীয়তার লক্ষণ হয়, তবে এই বিকৃত জাতীয় ভাবের উপর পদাঘাত করিয়া চিরদিন আপনার বিবেকের স্বাধীনতা লইয়া বিদেশে বিজাতীয় হইয়া থাকিব, ইহাও শ্লাঘনীয়। কি সুখে সেই স্থানে, সেই সংসর্গে থাকিব, যে স্থানে স্বাধীনতার আদর নাই, যে স্থানে কপটতা ও স্বজাতি-প্রেম একই মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, কাপুরুষতা যে স্থানে পুরুষত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। বিরাগী হইয়া বনে বনে নিকৃষ্ট জন্তুর সঙ্গে বাস করা বরং শ্রেয়ঃ তথাপি এ কলঙ্কিত ও পূতি গন্ধময় মানব সমাজের সংস্পর্শে আসা উচিত নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীদের নিকট হইতে

সেই আশা পূর্ণ করেন না। কেহ কেহ স্বদেশে আসিয়া এরূপ জঘন্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নাম করিতেও লজ্জা হয়। ইচ্ছা হয়, তাঁহাদের "ডিপ্লোমা"গুলি লইয়া অগ্নিতে ভস্ম করিয়া নদী জলে নিক্ষেপ করি। সে দিনও বোম্বাই প্রদেশে নানা ভাষাবিৎ, নানা উপাধি (ব্যাধি) ধারী একজন বিলাত-প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ গোময় ভক্ষণ করিয়া বিলাত গমন ও তথায় অধ্যয়ন ইত্যাদি মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন! হতভাগা, যদি জানিতে তোমার মধ্যে একটুও নৈতিক সাহস নাই, যদি দেশে ফিরিয়া আসিয়া এরূপ জঘন্য ভাবে জাতি রক্ষা করিতে হইবে বুঝিতে পারিয়াছিলে, কেন তবে তোমার এ দুর্ম্মতি হইয়াছিল, কেন এ কুকার্য্য করিলে? ধিক্, শত ধিক্ সেই শিক্ষায়, যাহাতে মনে একটুও নৈতিক সাহস দিতে পারে নাই। যশোলিপ্সা মানবের ভয়ানক শত্রু; উহাতে যেরূপ মানবের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, আর কিছুতেই সেরূপ পারে না। পশার ও প্রতিপত্তি অতি ভয়ঙ্কর জিনিস। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদের মধ্যে এমনও পশার-লোভী লোক আছেন, যাঁহারা আমাদের সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পান না,—ভয় ,পাছে প্রতিপত্তিটুকু যায়।

যাঁহারা বিলাত-প্রাত্যাগত বাঙ্গালীদিগকে জাতীয় ভাব বিহীন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আজ কাল দেশময় যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে, ইহার মূল কে? অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বিলাত-প্রত্যাগতগণ এই আন্দোলনের মূল। ১০বৎসর পূর্ব্বে বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণ যেরূপ ছিলেন, এখন আর সেরূপ নাই; পূর্ব্বে তাঁহারা দেশ-হিতকর কার্য্যে যেরূপ ঔদাসীন্য দেখাইতেন, তাহা সময়ের অদ্ভুত আবর্ত্তনে যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখন দেখিতেছি, বিলাত-প্রত্যাগতগণ প্রত্যেক দেশ-হিতকর কার্য্যে অগ্রে নিশান লইয়া যাইতেছেন, আর দেশের শিক্ষিত লোক তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছেন। ১০বৎসর পূর্ব্বে যে লালমোহনের নাম ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ছিল, আজ সেই লালমোহনের নাম দিক্ দিগন্তরে ছাইয়া পড়িয়াছে। জিজ্ঞাসা করি, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি বলিবে, বিলাত-প্রত্যাগতদিগের জাতীয় ভাব নাই?

বড় সাহেবদের সংসর্গ ভক্ত, স্বদেশীয়দিগের সঙ্গ বড় ভালবাসেন না।" এই অভিযোগটী একেবারে অমূলক। কাহার প্রতি কাহার অধিক টান, তাহা কার্য্য দ্বারাই বোঝা যায়। সত্য বটে, সভ্যতার খাতিরে বিলাত-প্রত্যাগতদিগকে সাহেবদিগের সহিত অনেক সময় মিশামিশি করিতে হয়; কিন্তু, তাহা বলিয়া তাঁহারা স্বজাতি-বিদ্বেষী এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই।

তর্কচ্ছলে মানিলাম যে, বিলাতপ্রত্যাগতগণ সাহেব-সংসর্গ বড়ই ভাল বোধ করেন। কিন্তু তুমি আমি কি করি না? বিলাত-প্রত্যাগতগণ সাহেবদের সঙ্গে মিশেন,—সমান ভাবে—বন্ধুভাবে। আর তুমি আমি মিশিতে যাই, প্রভু ও ভৃত্যভাবে। লম্বা এক চাপ্‌কান পরিয়া, সামলা মাথায় দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সাহেবের বাঙ্গালোর বাহিরে গিয়া আমরা উপস্থিত হই। চাপ্‌রাসী যদি অনুগ্রহ করে, তবে সাহেবের নিকট সংবাদ যাইবে; সাহেবের যদি অনুগ্রহ হইল, তাহা হইলে দেখা হইবে; নতুবা সময় নাই বলিয়া বিদায় করিবেন। সাহেবের যখন বড়ই অনুগ্রহ হইল, দুই তিনটী কথা বলিয়া তোমাকে বিদায় করিয়া দিলেন, আর তুমি সেলাম করিতে করিতে ও আপনার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে!

এখন তোমার অবস্থা বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখ, কে উচ্চ আর কে নীচ। বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তি সাহেবদের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া থাকেন, আর তুমি চাটুকার ভাবে। এত লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়াও তুমি সাহেবকে সেলাম দিতে ক্ষান্ত থাক না। এখন দেখ, কাহার অবস্থা শোচনীয় এবং কে অধিক সাহেব ভক্ত।

আমরা ইহা বলিতে চাই না যে, বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়গণ একেবারে নির্দ্দোষী। দোষ কাহার নাআছে? কিন্তু তাঁহাদের গুণ সমাদর না করিয়া কেবল তাঁহাদের দোষ লইয়া আলোচনা কেন? পরস্পরের মধ্যে যে দোষ আছে, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া ভ্রাতৃভাবে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করা কর্ত্তব্য। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বিলাতি-শিক্ষা-প্রাপ্ত স্বদেশীয়দিগকে এরূপভাবে গ্রহণ করিতে না পারিব, তত দিন তাঁহাদের শিক্ষা,জ্ঞান,

বিষয় আমাদের সমাজ এমনি অনুদার ও সংকীর্ণ যে, যে পর্য্যন্ত বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীগণ গোময় ভক্ষণ না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাঁদিগকে বিজাতীয় বলিয়া সমাজ-সীমার বাহিরে রাখিবে! অনেক সময় এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের এরূপ অনুদারতা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন, এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া আপনার স্বাধীনতা লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ইহাতে সমাজের কোন শিক্ষা হয় না। তাঁহারা এই সকল সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও যদি আপনাদের কার্য্য দ্বারা স্বজাতি-প্রেম দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই সাধু দৃষ্টান্তে সমাজের অনুদারতা ক্রমেই কমিয়া আসিবে। যদি দেখিতে পাই, একটী লোক আমার জন্য কি আমার দেশের জন্য প্রাণপণে খাটিতেছে, আমি ইচ্ছা করি আর না করি, তাহার প্রতি ভক্তি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই ভাবে সমাজকে শিক্ষা দিতে হইবে। সমাজকে দেখাইব যে, সমাজের অনুরোধে, কুসংস্কারের অনুরোধে আপনার প্রাণের স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নই, স্বাধীনতা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; আবার অন্য দিকে দেখাইব, সমাজ আমাকে চায় আর না চায়, আমার প্রাণ স্বদেশের দুঃখে কাতর, আমার হস্ত স্বদেশের কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত। বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকে এরূপ সাধু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, এবং যখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া স্বজাতি-প্রেমে বিগলিত হইয়া স্বদেশের পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিবেন, তখন নিশ্চয়ই সমাজের পাষাণ-প্রাণ গলিয়া যাইবে—আপনিই আসিয়া ভ্রাতৃভাবে ইহাঁদিগকে আলিঙ্গন করিবে।

সমাজকেও বলি, অনুদার সমাজ, আর কতকাল বিলাত-প্রত্যাগত স্বদেশীয়দিগের প্রতি এরূপ ভাবে অত্যাচার করিবে? দেখনা কি, এই অনুদারতা ও কুসংস্কারই দেশের দুর্গতির কারণ। এখনো কি স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর শিক্ষা করিলে না? শিখিবেই বা কি করিয়া?—শত শত বৎসর হইতে যে জাতি পর-পদানত, রাজার অত্যাচার ও সমাজের অত্যাচার উভয়ে মিলিয়া যে দেশের রক্ত মাংস শোষণ করিয়াছে, সেই দেশের সেই জাতি স্বাধীনতার মর্ম্ম কিরূপে বুঝিবে? কুসংস্কার ও কুশিক্ষা যে দেশের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, সে দেশের লোক উদারতা কিরূপে

স্বাধীনতা স্বর্গীয় পদার্থ;—উহার মধুরতা আমরা বুঝিতে পারি নাই, জানি না কবে পারিব।

"Liberty is sacred, as the individual, of whose life it is the reflex, is sacred. Where liberty is not, life is reduced to a mere organic function, *and when man allows the violation of his liberty, he is false to his own nature, and rebels against the decree of God.*"

(Mazzini on the Duties of man——Liberty.)

এই অমৃতময়ী কথা তাঁহারই হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছিল, যিনি স্বাধীনতার জন্য আপনার যথা-সর্ব্বস্ব এবং জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। হায়! কবে আমাদের সমাজ এই মহাবাক্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া লোকের স্বাধীনতার নিকট আপনার মস্তক অবনত করিতে শিক্ষা করিবে?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন।

তাম্বুলোপহার।*

(১)

পাতি হাঁস যেমন স্বভাবতঃ জলে চরে, সেইরূপ আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরে চরে।

(২)

আমরা ঈশ্বরের নানা কাতুরে ছেলে; একটু দুঃখেই আমরা কাতর হই।

(৩)

আমাদিগের সকল দুঃখ মঙ্গলেরই কারণ। অন্ধকারে যেমন লোকে ভূত দেখে, আমরা তেমনি অজ্ঞানান্ধকারে দুঃখ দেখি।

ভূতের ভয়েই গেলাম! ভূতের ভয় না ছুটিলে আমরা কখন মানুষ হইতে পারিব না।

(৪)

পিতা মুখোষ পরিলে যেমন ছেলে ভয় পায়, তেমনি ঈশ্বর দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলে আমরা ভয় পাই। পিতা মুখোষ পরিলে যেমন পিতাই থাকেন, তেমনি পরম পিতা আমাদিগের সম্বন্ধে দুঃখ-রূপ মুখোষ পরিলেও সেই পরম পিতাই থাকেন।

(৫)

দার্শনিকেরা ঈশ্বরের এচোড়ে-পাকা ছেলে; তত্ত্ব সকল যত দূর মানবীয় অবস্থাতে জানা যাইতে পারে, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন। পারলৌকিক অবস্থাতে তাঁহাদের কত ভ্রম দূর হইবে ও সত্যের আলোক কত প্রকাশিত হইবে, বলা যায় না। একটু বিলম্ব কর, এত অধৈর্য্য কেন?

(৬)

অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি দ্বারা রচিত এই শরীর আত্মার নটবহর। এই নটবহর লইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। কোন কোন সময় তাহাতে বিরক্ত হইতে হয়।

(৭)

শরীর আত্মার লেফাফা মাত্র। যে কেবল শরীরের বেশভূষার প্রতি মনোযোগী এবং সারবত্তা-শূন্য, তাহাকে আমি কেবল লেফাফা-দুরস্ত ব্যক্তি বলি।

(৮)

শামুকের খোলা যেমন মস্ত, কিন্তু ভিতরের জীবটী অতি ছোট; তেমনি প্রকৃত ধর্ম্ম অতি সংক্ষেপ ও সরল, কিন্তু ধর্ম্মের বাহ্য অবয়ব মস্ত। প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি লোকের তত মনোযোগ নাই।

(৯)

যেমন প্রসবের সময় ছেলের মাথা একটু একটু পৃথিবীর দিকে দেখা দেয়, তেমনি বৃদ্ধ মানুষের মাথা পরকালের দিকে একটু একটু দেখা দিতেছে; সেইখানে টুষ্ করিয়া গিয়া পড়িলেই হইল।

(১০)

কোন ব্যক্তি পাপ-প্রবৃত্তির দমনের প্রকৃষ্ট উপায় কি জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম যে, পাপেচ্ছা যখনই মনে উদিত হইবে, তখনই আপনাকে কোসে আধ্যাত্মিক লাথি মারাই পাপ-প্রবৃত্তি দমনের প্রকৃষ্ট উপায়। আধ্যাত্মিক লাথি অবশ্য শারীরিক আমি নহে, আধ্যাত্মিক কার্য্য।

(১১) ক্ষু-গ্রাহ্য

যখন পাপেচ্ছা মনে উদিত হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত পাপ সেই পুনরায় অনুতাপ করিবে। তাহাতে এক ঢিলে দুই পক্ষী হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত পাপ আরো প্রক্ষালিত হইবে এবং রূপে দ্ধিতে পাপমতি দমন হইবে।

(১২)

কোন কোন জ্ঞানী বলেন যে, পশুদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে; অন্যান্য জ্ঞানীরা বলেন, তাহা তাহাদের আদোবে নাই। শেষোক্ত জ্ঞানীরা আমাদিগের অন্যান্য জীবভ্রাতাদিগকে মানবীয় অধিকারের কিঞ্চিৎ অংশও দিতে নারাজ; কিন্তু এরূপ নারাজির কোন বিশিষ্ট হেতু দেখি না। উক্ত জীব-ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-বোধ আছে প্রমাণিত হইলেও তাহা মনুষ্যের সঙ্গে তুলনায় অবশ্য অল্প হইবে, তাহাতে আমাদিগের প্রাধান্যের বিশেষ হানি হইবে না, অথচ মানবীয় অধিকারের অতি অল্পাংশ পাইয়াই উক্ত ভ্রাতারা সন্তুষ্ট হইবেন।

(১৩)

ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রত্যাশা করেন যে, লোকে তাঁহাকে মাথায়

করিয়া সমস্ত দিন রাত্রি নাচিবে; কিন্তু এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায়, যেহেতু তাহাদিগের অন্যান্য অনেক কাজ আছে।

(১৪)

অনেক মনুষ্য কেবল আলু পটোলের কথা লইয়া সমস্ত দিন থাকে, এরূপ থাকা কর্ত্তব্য নহে; আলু পটোলের যতদূর অতীত হইতে পারা যায়, হওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

হস্তামলক।

একটী সুন্দর বালক পথের ধারে বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন;—

শিশু, তুমি কে, কাহার পুত্র, কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় বা যাইবে, তোমার নামটী কি?

বালক বলিল;—আমি মনুষ্য নহি, দেবতা বা যক্ষ নহি। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহি। আমি ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষুক নহি। আমি জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১।

লোক চেষ্টার নিমিত্তকারণ যেমন সূর্য্য, আমি তেমনি মনশ্চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-কারণ, উপাধিশূন্য বিচ্ছেদশূন্য নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ২।

অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া জড় পদার্থ যেমন গতিশীল হয়, তেমনি যাহার আশ্রয়ে বিবিধ ইন্দ্রিয় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিবাত-নিষ্কম্প নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৩।

দর্পণজাত প্রতিবিম্ব অবস্তু, সে যাহার প্রতিবিম্ব সে মুখখানি বস্তু। জীবত্ব যাঁহার প্রতিবিম্ব, আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৪।

দর্পণের অভাবে আভাসের অভাব হয়, কিন্তু অকল্পিত বাস্তব মুখের কোন হানি হয় না। বুদ্ধি বিয়োগে জীবত্বের অভাব হইলেও যাহার অভাব হয় না, আমি সেই বাস্তব নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৫।

ইন্দ্রিয়-বিমুক্ত অথচ ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, আমি ইন্দ্রিয়াতীত সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৬।

একই সূর্য্যের আভাস পাত্র-ভিন্নতায় বিভিন্ন হয়; সেই রূপ জীব-বুদ্ধিতে বিভিন্ন কল্পিত হইলেও যাঁহার একত্বের লোপ হয় না, আমি সেই স্বপ্রকাশ শুদ্ধচিত্ত নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৭।

সূর্য্য স্বয়ং অদ্বিতীয় হইয়া অনেক চক্ষুর বিষয় উদ্ভাসিত করেন, তেমনি যিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় হইয়া অনেক বুদ্ধির বিষয়কে উদ্ভাসিত করেন, আমি সেই অদ্বিতীয় সর্ব্ব-প্রকাশক নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৮।

সূর্য্যোদ্ভাসিত পদার্থ-রূপ চক্ষু-গ্রাহ্য, অনুদ্ভাসিত পদার্থ-রূপ চক্ষু-গ্রাহ্য নহে। যাহার জ্যোতিতে সর্ব্ব-প্রভাতক্ষম সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্, আমি সেই সর্ব্ব-প্রকাশক নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ৯।

অদ্বিতীয় সূর্য্য চঞ্চল জলে অনেক রূপে—কিন্তু স্থির জলে অবিভক্ত রূপে প্রকাশিত হন, সেই রূপ চঞ্চল বুদ্ধিতে অনেক রূপে—কিন্তু স্থির-বুদ্ধিতে একরূপে যিনি প্রতীত হন, আমি সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১০।

অতি মূঢ় ব্যক্তি ঘনাচ্ছন্ন দৃষ্টি হইয়া যেমন সূর্য্যকে ঘনাচ্ছন্ন ও নিষ্প্রভ মনে করে, তেমনি অজ্ঞান-বদ্ধ-দৃষ্টি মূঢ়দিগের নিকট যে শুদ্ধ চৈতন্য বদ্ধ ভাবে প্রতীত হন, আমি সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১১।

স্পর্শ না করিয়াও যিনি আকারের ন্যায় তাবৎ বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, শুদ্ধ অচ্ছের ন্যায় আমি সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা। ১২।

হে বিষ্ণু, উপাধি ভেদে যেমন মণির পার্থক্য প্রতীত হয়, বুদ্ধি ভেদে তুমিও সেইরূপ বিভিন্ন রূপে প্রতীত হও। স্থির চন্দ্র চঞ্চল জলে যেমন চঞ্চল রূপে প্রতীত হয়, অস্থির বুদ্ধিতে তুমিও তদ্রূপ চঞ্চল রূপে প্রতীত হও।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ।

আবাহন।

১

গৃহে এস্ জীবনের আনন্দ-আলোক,
নিত্য সম্মিলন হাসি
বরষি, তামস রাশি
দূর কর বিরহের, চির-প্রাণাধার,
তোমার দূরতা ক্ষণে সহেনা আমার।

২

প্রতিভার পূর্ণ ভাতি, স্নেহখণী-ভূত,
তব প্রতিবিম্বে বাঁচি,
তোমাতে ডুবিয়া আছি,
তোমার(ই) শরীরী ছায়া আমি, এ অন্তরে
হৃদয়-বল্লভ এস চিরদিন তরে।

৩

তব দরশন-রাজ্যে অমা-নিশা নাই,
প্রণয়ের সুষমায়
অবিরাম দীপ্তি পায়
বিমুক্ত স্মৃতির কক্ষ, স্নেহের কিরণে
সঞ্জীবনী সুধাসার বরষ জীবনে।

৪

প্রতি পদার্পণে তব বসন্ত বিকাশ,
ফুটে ফুল পরিমলে

তোমার সঙ্গীত-ভরা স্বর পরশনে,
ঘুমন্ত হৃদয়-তন্ত্রী বাজে কম স্বনে।

৫

চিন্তার বিহঙ্গ মম সে কণ্ঠ শুনিয়া
মানসে জাগিয়া উঠে
সে গীত লহরে ছুটে
গায়, প্রেম-মন্দাকিনী মাধুরী সঞ্চারে,
রঞ্জিত আশার মোহ খেলে চারি ধারে।

৬

প্রাণের মিলন দেশে কল্পনা-প্রবাহে,
ভাবের কোমল কায়,
সুখ-শিশু শোভা পায়,
হৃদয়ের হৃদয়েতে, সুধু দরশনে
নূতন জীবন-স্রোত বাড়ে প্রতিক্ষণে।

৭

প্রেমের কাহিনীময় প্রতি দরশন,
সে দর্শন-ইতিহাসে
অপূর্ব্ব কবিত্ব ভাষে,
অপার্থিব সম্মিলন, প্রীতি-সম্ভাষণে
চিত্রিত বাসনা স্বর্গ দেখায় জীবনে।

৮

প্লাবিত সুখের সহ যাই হারাইয়া
শুনি পদধ্বনি তব
দূরে, বিকম্পিত সব
আজিও নয়নে মম, হিয়ায় হিয়ায়

৯

ভুলে যাই বরষের আঁধার রজনী
শশীশূন্য প্রতি যামে,
সূর্য্য হীন দিনমানে
ঝরিত সে অশ্রুনীর, তব দূরতায়,
দরশনে মুগ্ধ হিয়া কিছু নাহি চায়।

১০

গৃহে এস, জীবনের পার্থিব-ঈশ্বর।
প্রাণপুষ্পে আমরণ
পূজিব হে অনুক্ষণ,
আবাহন করি, এস, হৃদয়-মন্দিরে,
বিরাজ প্রেমের দিব্য মূরতির ভরে।

শ্রীমতী নীহারিকা।

সমালোচনা।

ভারত-শ্রমজীবী—দ্বিতীয় কল্প, ১ম ও ২য় সংখ্যা। ২নং বেনেটোলা লেন হইতে প্রকাশিত। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্রিকা। আমরা ভারত-শ্রমজীবীর পুনঃ প্রকাশ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এক সময় এই সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি দ্বারা বঙ্গ দেশের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুবিধা হইয়াছিল। ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত কতকগুলি

উপকারী কাগজের অকাল মৃত্যুতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছিলাম। তাই আমরা আবার ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আজ কাল আমাদের দেশে সাপ্তাহিক, মাসিক অনেক পত্রিকাই চলিতেছে; কিন্তু এ প্রকারের কাগজ বোধ হয় দ্বিতীয় আর একখানা নাই। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সাধারণ লোক শিক্ষিত না হইতেছে, তাহাদের কুসংস্কার বিদূরিত না হইতেছে, তত দিন বড় বড় খবরের কাগজ দ্বারা দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে মনে হয় না। ভারত-শ্রমজীবী যদি সে কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার "শ্রমজীবী" নাম গ্রহণ সার্থক হইবে, দেশের একটী গুরুতর অভাব পরিপূরণে সমর্থ হইবেন।

আমরা যে দুই সংখ্যা ভারত-শ্রমজীবী পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধ পড়িয়া ও ছবি গুলি দেখিয়া প্রীত হইয়াছি; কিন্তু দুই একটী প্রবন্ধের ভাষা আমাদের নিকট একটু জটিল বোধ হইল। সাধারণ লোকে—শ্রমজীবীগণ সেরূপ ভাষা বুঝিবে কিনা, আমাদের গভীর সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস, ভাষা যতদূর সহজবোধ্য হইতে পারে, ইহার পরিচালকগণ সে চেষ্টা দেখিলে প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে। আমাদিগকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, প্রথম সংখ্যার এক স্থানে একটু বিকৃত রুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আশা করি, সম্পাদক মহাশয়, রসিকতা করিতে যাইয়া সুরুচির সীমা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। আমরা শ্রমজীবীর উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

মহারাজা নন্দকুমার—অথবা শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। এখানি একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। পুস্তকের আকারের তুলনায় মূল্য অতি কম; মুদ্রাঙ্কন অতি পরিপাটী। ইহাতে উপন্যাসের গুণ যত না আছে, ঐতিহাসিক ঘটনা তদপেক্ষা অনেক অধিক আছে। রমেশ বাবুর "শত বর্ষ" পড়িতে পড়িতে ভারতের পূর্ব্ব গৌরবে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠে, আর "মহারাজা নন্দকুমারে" ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচার কাহিনী পড়িতে পড়িতে শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠে। মানুষ মানুষের

চরণে ধর্ম্ম কর্ম্ম, বিবেক বুদ্ধি কিরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারে, তাহার চিত্র ইহাতে বেশ চিত্রিত হইয়াছে। যদি চণ্ডী বাবুর লেখনীর তেমন জোর থাকিত—ভাষার তেমন ওজস্বিনী শক্তি থাকিত, তবে আজ এই সকল পৈশাচিক দৃশ্য পাঠ করিয়া লোকে ক্ষেপিয়া উঠিত; তবে মিসেস্ ষ্টোর গ্রন্থে দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচার কাহিনী পাঠ করিয়া যেরূপ লোকে চমকিত হইয়াছিল, আজ চণ্ডী বাবুর গ্রন্থের লোমহর্ষণ ঘটনাবলী পাঠ করিয়াও বঙ্গবাসী মাত্রে তদ্রূপ চমকিত হইত। তথাপি চণ্ডী বাবু শত বর্ষ পূর্ব্বে এদেশ-প্রবাসী ইংরেজ চরিত্রের—গবর্ণরদিগের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন তাহা হৃদয়োত্তেজক ও চিত্ত-দ্রবকারী। "বঙ্গবাসিদিগের প্রতি মুসলমানদিগের সময়ও অত্যাচার হইত, কিন্তু এইরূপ ভীষণ অত্যাচার কখন হয় নাই"—বাঙ্গালি-বিদ্বেষী, বাঙ্গালি-চরিত্রের কুৎসাকীর্ত্তনকারী মেকলের এই উক্তির প্রতি কথা গ্রন্থকার তৎকালের ইংরেজ-চরিত্র দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি নানা স্থান হইতে এই সকল অত্যাচারের যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রের ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। ভারতবর্ষের ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ রাজা নন্দকুমারের চরিত্র যেরূপ জঘন্য করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া নন্দকুমারকে পিশাচ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু নন্দকুমার বাস্তবিক যে তদ্রূপ জঘন্য চরিত্রের লোক ছিলেন না, ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ যে একমাত্র স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহাকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহা বেশ সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এখন ঔপন্যাসিক অংশ সম্বন্ধে গুটীদুই কথা। বাপুদেব শাস্ত্রী, প্রমদা দেবী ও সাবিত্রীর চরিত্র বেশ্ পরিস্ফুট হইয়াছে; তার নীচেই এস্থার বিবি (বেগম বিবি) ও বদরন্নেসার চরিত্র। গ্রন্থকার অনেক চরিত্রেরই একত্র সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু সে গুলি তত পরিস্ফুট হয় নাই। এতদ্ব্যতীত যে দু একটা নরপিশাচ ও স্বদেশদ্রোহীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কোন কোন স্থান আমাদের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হইল। তিনি সুবল মিত্রের চরিত্র বর্ণন করিতে যাইয়া একস্থানে বলিয়াছেন, "সুবলের চরিত্র মন্দ ছিল না। তবে সে একটু গাঁজা খাইত, এবং যশোহরের লোকের কুসংসর্গে ছিল বলিয়া অল্প বয়সেই তাহার লাম্পট্য

লোকের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া একটা প্রদেশের উপর এরূপ গুরুতর দোষারোপ করা, আমরা অত্যন্ত অন্যায় ও রুচিবিগর্হিত মনে করি। গ্রন্থকার মহাশয় "অভিযাত" পরিবারের উপর বড় চটা; তাই তাহাদের কাহার কাহার, পূর্ব্ব পুরুষদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কুৎসা-কীর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণ স্বদেশদ্রোহী অত্যাচারী ছিলেন, পরস্বাপহরণ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছিলেন, এসকল কথার প্রমাণ আছে কিংবা থাকিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা জারজ ছিলেন, তাহার প্রমাণ থাকিলেও বলা উচিত কিনা গভীর বিতণ্ডার বিষয়। তার উপর চণ্ডী বাবুত অন্যান্য ঘটনার ন্যায় তাহার কোন প্রমাণই দেন নাই, অথচ কোন কোন পরিবারের উপর এত বড় একটা গুরুতর কলঙ্ক আরোপ করিয়া বসিলেন! এসকল দোষ আমরা গুরুতর দোষ বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থকার একমাত্র "অভিযাত" পরিবারের উপর খড়্গ হস্ত নহেন, কায়স্থদিগের উপর তাঁহার বড়ই বিজাতীয় ঘৃণা। কায়স্থ শূদ্র যে বিভিন্ন নহে, ইহা বৈদ্যকুলোদ্ভব তাঁহার এবং তাঁহার "পিতৃ পিতামহের চিরন্তন সংস্কার!" তিনি এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কায়স্থ "ছিদাম ও জগন্নাথ" বিশ্বাসদ্বয়কে বাগ্দী সন্তান পর্য্যন্ত প্রমাণিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, অথবা বাগ্দী সন্তানদ্বয়কে কায়স্থ বর্ণে উন্নীত করিয়াছেন! এই জগন্নাথের পুত্রই নাকি রাজা যাদবেন্দ্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ নাকি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তখন হিন্দু সমাজের বন্ধন এত দূর শিথিল ছিল যে, বাগ্দী কায়স্থ হইতে পারিত, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। হিন্দু-সমাজের এই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় শূদ্রগণ কায়স্থশ্রেণী ভুক্ত হইতেছে বটে; কিন্তু আজও কোন বাগ্দী কায়স্থ হওয়া দূরে থাক্, জলচল শঙ্কর বর্ণ হইতে পারিতেছে কিনা, গভীর সন্দেহের বিষয়। তাঁহার বইএ এরূপ একদেশদর্শী অনেক কথা আছে। সে যাহা হউক, এসব দোষ সত্বেও আমরা একথা বলিতে পারি যে, আজ কালকার বাজারে রামু শ্যামুর লিখিত যে শ্রেণীর নাটক নভেল বাহির হইতেছে, "মহারাজা নন্দকুমার" সে শ্রেণীর নহে; তদপেক্ষা উন্নতর শ্রেণীর।

আমাদের আর একটী বক্তব্য এই, তিনি ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক

কোন্‌টী কাল্পনিক ঘটনা, তাহা সাধারণ পাঠকগণ নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিবে কিনা, সন্দেহের বিষয়। পাছে ঐতিহাসিক ঘটনা গুলিও কাল্পনিক বলিয়া মাঠে মারা যায়, এই আমাদের আশঙ্কা।

গীতসূত্রসার—শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কৃষ্ণধন বাবু পুস্তক খানিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগে সংগীতের উপপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। এই পুস্তকের অনেক গুলি গুণ দেখিলাম, তন্মধ্যে ইহার গভীর গবেষণাপূর্ণতা, সুখপাঠ্যতা, প্রাঞ্জলতা ও আড়ম্বরশূন্যতাই অধিক প্রশংসনীয়। শ্রুতি সম্বন্ধে কৃষ্ণধন বাবুর কথাগুলি শুনিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। হিন্দু সংগীতের বিশেষ গৌরবের বস্তু এই কারুকার্য্য গুলির উপর "গণিতক্ষেপ" করিতে গিয়া আমরাও কৃষ্ণধন বাবুর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া ছিলাম; কিন্তু দেশীয় সংগীত-তুম্বুরুগণের গোঁড়ামির ভয়ে তাহা প্রচার করিতে সাহস পাই নাই। এই পুস্তকে মূর্চ্ছনার যে নূতন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা অতীব যুক্তি সঙ্গত। কৃষ্ণধন বাবু যে স্বর লিপি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য; কিন্তু তাহা একবার যিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে একথা স্বীকার করিবেন যে, ইংরাজি প্রচলিত পদ্ধতির পরেই এই প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই স্বরলিপি দেখিয়া শিখিলে শিক্ষার্থীকে বাধ্য হইয়া, অজ্ঞাতসারে হইলেও তালজ্ঞানটা বিশেষ রূপে লাভ করিতে হইবে। এই স্বরলিপিতে তালের প্রত্যেক বিভাগের স্থানে এক একটী এক মাত্রার চিহ্ন পড়িয়া থাকে, এবং আগা গোড়া ড্রয়িং স্কেলের (Drawing scale) মতন করিয়া সময়টা পরিস্কার রূপে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাতে যে তাল শিক্ষার কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষ্ণধন বাবু অতি কোমল, অতিকড়ি ইত্যাদি স্বর এবং রাগ রাগিণীর সময় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অনেকেরই মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু সময় সম্বন্ধে সকল ওস্তাদের মতটা ঠিক্ একরকম হয় না; সুতরাং এই দুইটীকথা কোন মতেই গীতসূত্রসারের দোষের মধ্যে ধরা যাইতে পারে না। কৃষ্ণধন বাবু এই পুস্তকে অনেককেই খোঁচা দিয়াছেন—অনেক বড় বড় রোগীকে বড়ি খাওয়াইয়াছেন; আশা করি ইহাতে উক্ত মহাত্মাগণের এবং দেশের কিছু উপকার হইবে।

অসীম ও সসীম।

(চতুর্থ প্রস্তাব)

গত প্রস্তাবে অস্মিতা ও ঈশ্বর লইয়া অনেক গোলমাল করা গিয়াছিল। বিষয়টী অতীব গুরুতর, সহজে ইহার শেষ মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে; সুতরাং এবারও আমাদিগকে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিতে হইতেছে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

অস্মিতা-ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শক্তির বিকাশে জগদুৎপত্তি, গত প্রস্তাবে ইহাই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে ও সেই অস্মিতা-নিহিত ইন্দ্রিয়-বীজ কিসের আনুকূল্যে ও কিরূপেই বা ক্রমশঃ পরিশেষে জগদাকারে প্রস্ফুটিত হয়, তৎ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এবার তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রত, এই ত্রিবিধ অবস্থার পর্য্যালোচনাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সুষুপ্তাবস্থায় অস্মিতাতে ইন্দ্রিয়ের বীজত্ব নিহিত থাকে ও শেষে ক্রমঃ-সম্বন্ধে স্বপ্ন ও জাগ্রতাবস্থায়, তাহার অপরিস্ফুট হইতে পরিস্ফুটাবস্থা প্রকাশিত হয়। অন্য কথায় ইন্দ্রিয় লয় হইলে সুষুপ্তির ও তাহার ক্রমঃ বিকাশে অগ্র পশ্চাৎভাবে স্বপ্ন ও জাগ্রতাবস্থা উদয় হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়ের বীজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তৎকালীন তাহার বোধ হওয়া অসম্ভব, পরে যখন স্বপ্নাবস্থায় তাহার প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন দৃষ্ট হয় যে কতগুলি অনাত্মানুভবের উদয় হইতেছে। এতাদৃশ অনুভব সমষ্টি সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে প্রতিফলিত হইয়া "সেগুলি অস্মিতার বহির্দ্দেশ হইতে উদয় হইতেছে" ইত্যাকার ভাণ অবলম্বন করে। "সেগুলি আত্ম পদার্থ হইতে উদ্ভূত নহে, পরন্তু অনাত্ম পদার্থই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা" এইরূপ বোধে অহঙ্কারাদি ও তৎসহ বিচিত্র জগৎসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদি জগৎ

সম্বন্ধে আবশ্যক বোধ হইলে পরে বলা যাইবে; আপাততঃ মূল প্রসঙ্গে অগ্রসর হওয়া যাউক।

আমরা অস্মিতাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম; প্রথম অংশে মন, দ্বিতীয় অংশে অহঙ্কার, তৃতীয় অংশে বুদ্ধি। শাস্ত্রে সাধারণতঃ এইরূপ বিভাগই উক্ত হইয়াছে, পরন্তু এরূপ বিভাগের কারণ কি, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। এক্ষণে দেখা যাউক, মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার, এই তিনটীর মধ্যে কোন্ অংশটী অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এতত্রয়ের উৎপত্তি-ক্রমঃ ও সংজ্ঞা নিরূপণ সম্বন্ধে অগ্রে বিচার করা উচিত।

ইন্দ্রিয়-শক্তির ক্রমঃ বিকাশের সঙ্গে অহঙ্কার মন বুদ্ধি একে একে ক্রমশঃ উদয় হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; এরূপ প্রতিপত্তি কতদূর সঙ্গত, তাহাই সর্ব্ব প্রথম আলোচ্য।

শাস্ত্রে চিত্তের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিকে মন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি ও অভিমানাত্মিকা বৃত্তিকে অহঙ্কার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তিই বল বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিই বল, উভয়বিধ বৃত্তির আধার অহং বৃত্তিকেই গণ্য করিতে হইবে। সাংখ্যে মন একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে গণ্য হইয়াছে, পরন্তু মন ইন্দ্রিয়ই হউক বা বৃত্তিই হউক আমাদের তাহা লইয়া বিবাদের আবশ্যক নাই। ইহা নিশ্চয় যে, মন অহঙ্কারের নিকটে যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিয়া উপস্থিত করে, অহঙ্কার তাহাকে আত্মাভিমান রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া বুদ্ধিরূপিণী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি দ্বারা আপেক্ষিক ভাবে সত্যাসত্য বিচার পূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব অহঙ্কার অন্য বৃত্তি দ্বয়ের আধার বিধায় তাহাকেই অগ্রগণ্য পদে বরণ করা কর্ত্তব্য।

আবার অন্যভাবে বুদ্ধিকেই তদপেক্ষা উচ্চাসনে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য; কারণ, বুদ্ধি ব্যতীত অহংবৃত্তি উদয়ের সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু যদি বুদ্ধি না রহিল, তাহা হইলে অহংকে স্বস্থানে রাখিবে কে? অহমের একত্ব (identity of ego) বুদ্ধি ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারেনা, কারণ "আমি সেই একই বস্তু" ইত্যাকার নিশ্চয়াত্মিক অনুভব, একমাত্র বুদ্ধিরই ক্রিয়া। তদ্ব্যতীত অহমের সর্ব্ব অনাত্ম পদার্থ হইতে পার্থক্য সম্পাদন, বুদ্ধি ব্যতীত হইবার উপায় নাই; অর্থাৎ "আমি যে পদার্থ তাহা ইহা নহি" এইরূপ নিশ্চয়াত্মক প্রতীতি-বুদ্ধি ব্যতীত হইতে পারে না। অধিকন্তু ঐরূপ

অনুভব সমূহ ব্যতীত অহঙ্কারের অস্তিত্বও সম্ভবপর নহে, কারণ ইদং ও অহংবৃত্তি দ্বয় যদি বুদ্ধি বৃত্তির ক্রিয়াভাবে একাকারই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ইদং বৃত্তি অভাবে অহং নির্দ্দিষ্ট হইবার অন্য উপায় থাকে না। বুদ্ধি বৃত্তির সঞ্চালনে সেই একাকার অস্মিতা পদার্থে যখন "ইদমস্তি" ইত্যাকার অনুভবের উদয় হয়, তখনই কেবল তদানুসঙ্গিক "অহমস্মি" ইত্যাকার অনুভবের উদয় হওয়া সম্ভবপর; সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্চালন হইতে যখন অহঙ্কারের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইল, তখন বুদ্ধিকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

কিন্তু আবার অন্য এক ভাবে, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকেই অগ্রগণ্যপদে বরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। মন যাবতীয় অনাত্ম বিষয় সংগ্রহেই ব্যাপৃত; তাহার অন্য কোন ক্রিয়া নাই। মন দ্বারা বিষয় সমূহ সংগৃহীত হইয়া অন্তঃকরণ মধ্যে আনীত হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি তাহাদিগের প্রত্যেকের পার্থক্য সম্পাদনপূর্ব্বক জাতি ইত্যাদি ভেদ উপস্থিত করে। অহঙ্কার-ক্ষেত্রে মন ফসল উৎপন্ন করে, বুদ্ধি তাহা কাটিয়া পৃথক পৃথক গুদাম-জাত করে মাত্র। সুতরাং মনের ক্রিয়া ব্যতীত বুদ্ধির ক্রিয়া অসম্ভব হইতেছে, কেবল বুদ্ধির কেন, অহঙ্কারের অস্তিত্বও তদভাবে খ-পুষ্পবৎ। ইদং বৃত্তির আধার মন যদি অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তৎসহ অহং বৃত্তির বিলোপ অনিবার্য্য; সুতরাং এই হিসাবে মনকে সর্ব্বাগ্র পদে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য।

তবে এখন মহাগোল উপস্থিত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই বৃত্তিত্রয়ের কোন্‌টী আদি, কোন্‌টী মধ্য আর কোন্‌টাই বা অন্ত্য, তাহা স্থির করা মহা দুর্ঘট ব্যাপার; বস্তুতঃ স্থির হওয়া অসম্ভব। কারণ, এই তিনটীর মধ্যে একটাকে ছাড়িলে অন্য দুইটীর অস্তিত্ব থাকে না ও থাকিতে পারে না। সে স্থলে ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত যে, একটীর যখন অন্য দুইটী ব্যতীত উৎপত্তি সম্ভবেনা, তখন এ তিনেরই এককালীন যুগপৎ উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। একটীর পর অন্যটী, এইভাবে ইহাদিগের ক্রমোৎপত্তি সম্ভবপর নহে ও স্বভাবতঃ হইতে পারে না। সুতরাং শেষে এই সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে যে, জননীগর্ভস্থ বীজ হইতে যেরূপ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অঙ্কুর এককালেই নির্গত হইয়া থাকে ও ক্রমশঃ সকল গুলিই পরিপুষ্টি লাভ করে, সেইরূপে অস্মিতা বীজ হইতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের অঙ্কুর এককালেই উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করতঃ প্রথমে কারণ, তৎপরে সূক্ষ্ম জগতাদি নির্ম্মাণার্থে পরি-

শেষে জড় জগত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তবে বেদান্ত ও সাংখ্যাদিশাস্ত্রে মনবুদ্ধ্যহঙ্কারাদির ক্রমোৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সদর্থ এই যে, যিনি যে ভাবে লইয়াছেন সেই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন; কেহ বা অনুলোম যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা বিলোম যুক্তি প্রণালীতে মীমাংসা করিয়াছেন। কেহ বা কার্য্যকে কারণ করিয়াছেন, কেহ বা কারণকে কার্য্য করিয়াছেন। মূলে বিশেষ বিরোধ কিছু মাত্র নাই।

এখন উপরোক্ত বিচারে অস্মিতাকে যে তিন অংশে ভাগ করা গিয়াছিল, তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত দেখা যাউক। খণ্ডতা বা অংশীকরণ ভিন্ন, অস্মিতাতে মন বুদ্ধি অহঙ্কারের উৎপত্তি সম্ভবে না, ইহা নিশ্চয়। পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে গেলে আমরা যাহাকে অংশীকরণ কহিতেছি, ইংরাজিতে তাহাকেই বিবর্ত্তন (Evolution) কহে। বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি দৃষ্টে যখন সেই বীজ-নিহিত শক্তির ক্রমঃবিকাশের উদাহরণ দিয়া থাকি, তখন তাহা আমরা এই ভাবেই দেওয়া যায় যে,যে সমস্ত লুক্কায়িত সূক্ষ্ম অংশ,বীজাভ্যন্তরে একত্রে সমাবেশ বশতঃ মানব-চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, ক্রমবিকাশ প্রাপ্তি কালে সেই যৌগিকশক্তি শিথিল হইয়া তন্নিহিত প্রত্যেক অংশকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াতে, তাহা ক্রমশঃ দৃশ্য জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অস্মিতা সম্বন্ধেও ঠিক তাই। মন বুদ্ধি অহঙ্কার এতত্রয়ের একত্রে সমাবেশ অবস্থায় তাহার অস্মিতামাত্রাবিশিষ্ট ছিল, পরে অবিদ্যা বা অনাত্ম বিষয় শক্তি সংযোগে অস্মিতা খণ্ডতা প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে এককালে যুগপৎ উক্ত ত্রিবিধ অঙ্কুর নির্গত হইয়া ক্রমশঃ উপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিলে, তাহার ফল স্বরূপ পরিশেষে জগজ্জাল বিস্তৃত হইল; ইহাই সৃষ্টিসম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত সমন্বয়।

এবম্বিধ খণ্ডনপ্রণালী অনুসারে একমাত্র অস্মিতামাত্রা হইতে বহু চিত্ত, বহু বুদ্ধি ও বহু অহঙ্কার উৎপন্ন হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত জীবের বহুযোনি ভ্রমণ সম্বন্ধীয় মত-পোষক যুক্তির সারাংশ ইহাই। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতি এস্থলে অনাবশ্যক বিধায়, তাহা ছাড়িয়া দিয়া মূল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে অস্মিতা খণ্ডতা প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন বুদ্ধি অহঙ্কার রূপ ত্রিবিধ অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং এবম্বিধ প্রতিপত্তি কতদূর সুবিচার সঙ্গত।

এস্থলে আমাদিগের নিজের যুক্তি দেখাইবার কোন আবশ্যক নাই; বিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট এই সম্বন্ধে যে সকল সময়োচিত অকাট্য যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক তৎকথিত Ego কে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহাই দেখাইয়া নিরস্ত হইব। তদবলম্বিত যুক্তির সারাংশ এই :—He not only devolops this triplicity of the Ego, but moreover assigns its ground; which ground is that every synthetic science must necessarily treat 1st of the condition, 2nd of the conditioned and 3rd of the conception which results from the union of the condetioned with its condition. অর্থাৎ এই তিন কারণে তিনি Ego কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—যে সমস্ত নিয়মের অধীনে মন ও বাহ্যানুভবাদি নিয়মিত, সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাই ১ম কারণ;—সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রমতে যাহা বুদ্ধিপদে বাচ্য, তাহাই তদুক্ত এই ১ম কারণ নির্দ্দেশ করিতেছে। তদ্ব্যতীত যে সমস্ত ঘটনা ও অনুভবাদি উক্ত নিয়মাবলী অনুসারে নিয়মিত হয়,তাহাই দ্বিতীয় কারণ; ইহাতে ইন্দ্রিয়-সম্বলিত মন ইত্যাদিকেই বুঝাইতেছে। উপরোক্ত নিয়ম ও নিয়মিত পদার্থের যোগফলে অন্তঃকরণ দেশে যে বোধ-ভাব আনয়ন করে অর্থাৎ নিমন্ত্রীর যে ভাব উপস্থিত করে, তাহাই তদুক্ত তৃতীয় কারণ; ইহাতে স্পষ্টই আহঙ্কারিক ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তিনি অহমের ভিতর নিয়ম, নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রী এই তিন ভাগ স্থির করিয়া যাহা দেখাইয়াছেন, ফলতঃ আমরাও বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কার পদোক্তিতে তাহাই দেখাইতেছি।

অতঃপর অন্যান্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। পাশ্চাত্য দার্শনিকবর্গের মধ্যে লক্ ইত্যাদি কয়েকজন দার্শনিক অন্তঃকরণস্থ সমস্ত আধ্যাত্মিক ক্রিয়া একমাত্র মনমূলক (Gained from experience) বা অভিজ্ঞতাজাত বলিয়া নিষ্পত্তি করিয়া গিয়াছেন; আবার রীড্ ইত্যাদি কয়েকজন দার্শনিক বুদ্ধির ছাঁয়াকে অর্থাৎ common sense কে সর্ব্বোপরি প্রাধান্য দিয়াছেন। আমরাপশ্চাদুক্ত দার্শনিকবর্গের common senseকে প্রকৃত বুদ্ধিপদে বাচ্য না করিয়া বুদ্ধির ছায়ারূপে যে কারণে বর্ণনা করিলাম, তাহা পরে দেখাইতেছি। তাঁহারা বুদ্ধির ক্রিয়া-প্রণালী সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বিশদভাবে না বুঝাইয়া, কেবল আন্তরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে ও

তাহাই একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এবম্বিধ আন্তরিক বিশ্বাস যে পদে পদে আমাদিগকে ভ্রমে পাতিত করে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকবর্গকে বারম্বার দেখাইয়াছি। বুদ্ধির ক্রিয়াগুলিকে তীক্ষ্ণধার যুক্তি দ্বারা ছেদ না করাতে তাঁহাদের চক্ষে বুদ্ধির অখণ্ডনীয়ত্ব প্রকাশিত ছিল; সেই কারণেই এত গোলমাল। হিন্দু শাস্ত্রমতে বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিরূপে পরিগণিত হইলেও, "তাহা হইতে ধ্রুব সত্য জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে," এরূপ শিক্ষা কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বরং অসত্যে যে সত্যজ্ঞানরূপ অধ্যাস অর্থাৎ বিপর্য্যয়জ্ঞান, তাহাও বুদ্ধির ক্রিয়া ভিন্ন উদয়ের সম্ভাবনা নাই, এরূপ বলিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, সত্যই হউক বা অসত্যই হউক, তাহাতে যে সত্য বলিয়া অন্তঃকরণে বিশ্বাস জন্মিতেছে, তাহা নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া ভিন্ন আর কাহারো নহে। অতএব common sense কে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের একমাত্র উপায় (Criterion) করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা কিছুতে আন্তরিক বিশ্বাস জন্মিতেছে, তৎসমুদয়ই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে; অন্যথা তৎপ্রতি সন্দেহে, উদ্ভ্রান্ত ইত্যাদি দোষের ভাগী করা যাইবে; এবম্প্রকার শিক্ষা বিধানে রীড্ ইত্যাদি দার্শনিকবর্গকে নিতান্তই একদেশদর্শী বলিয়া বোধ হয়। যে অস্ত্রে তাঁহারা হিউমের যুক্তি খণ্ড বিখণ্ড করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, ফলতঃ তাহা না হইয়া বরং তদ্দ্বারা হিউমের যুক্তি প্রণালীর দৃঢ়তা সংস্থাপিত হইয়াছে।

বাস্তবিক উপরোক্ত ভাবে বুদ্ধির একাধিপত্য দেখাইলে চলিবে না। মন, অহঙ্কার বা বুদ্ধি, ইহারা প্রত্যেকেই এক অর্থে নিজ নিজ রাজ্যে একাধিপত্য করিয়া থাকে। এক অর্থে কেহ কাহারও অধীন নহে, আবার অন্য অর্থে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধীন। সুতরাং একভাবে ধরিলে, লক্ ইত্যাদি দার্শনিকবর্গ যাহা বলিয়াছেন তাহাও সত্য; আবার আর একভাবে ধরিলে, তৎবিপক্ষে রীড্ প্রভৃতিরা যাহা মীমাংসা করিয়াছেন তাহাও সত্য; একভাবে সমস্তই মন-মূলক বলিতে পারা যায়, অন্যভাবে বুদ্ধিকেই অন্যগুলির মূল বলিয়া মীমাংসা করা যায়। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া একই বস্তুকে দর্শন করিলে তবে তাহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়।

একদেশদর্শীগণের নিকট সত্য রত্ন লুক্কায়িত থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যদি কেহ কেবল মনক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া বুদ্ধি অহঙ্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহার চক্ষে মনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সকলের মূল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; এবং যিনি কেবল বুদ্ধি বা অহঙ্কার-ক্ষেত্রে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি যে ঠিক তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত সমূহে উপস্থিত হইবেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যাঁহারা কেবল মন ধরিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলুন আর নাই বলুন, বিশ্বাস ও নাস্তিকতা ইত্যাদি মীমাংসায় উপনীত হইবেন। এই সকল ভয়ানক মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হইয়া অন্য পক্ষে এক common senseকে দাঁড় করাইয়া কেবল তাহারই বলে আপনাদের সকল যুক্তি সিদ্ধ কবিয়া তোলেন। আমরা common sense সম্বন্ধে এত বিরোধ করিতেছি বলিয়া common sense যে কেবলই ফাঁকা আওয়াজ তাহা নহে; তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও ক্রিয়া যতদূর সম্ভব নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বৃত্তিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভাগ করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধির এক অংশ বহির্ম্মুখী অন্য অংশ অন্তর্ম্মুখী। প্রকৃত্যনুযায়ী ১ম অংশের নাম বহির্ম্মুখী বুদ্ধি ও অন্য অংশের নাম অন্তর্ম্মুখী বুদ্ধি রাখা গেল। হিন্দু-দর্শনে এরূপ নামকরণ থাকুক বা নাই থাকুক, ফলতঃ তাহাতে যে ভিন্ন নামে এই বুদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ক্রিয়া উল্লিখিত ও বর্ণিত আছে, আমরা তাহা পরে দেখাইব। দার্শনিকপ্রবর কাণ্টও এইরূপ দুইভাগে বিভক্ত করা সঙ্গত বিবেচনাকরিয়াছেন, ও তদনুসারে এক অংশের নাম Theoretical reason ও অন্য অংশের নাম Practical reason রাখিয়াছেন। তিনি উক্ত Theoretical reason বা বহির্ম্মুখী বুদ্ধির যেরূপ ক্রিয়া প্রণালী দেখাইয়াছেন, আমরা তাহাই উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি।—তদুক্ত practical reasonএর ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কিছু বলিতেছি না; পারিত বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব। বহির্ম্মুখী বুদ্ধি সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা চূড়ান্ত। তিনি বলেন—

Theoretical reason takes hold of a certain system of sensation given to it—or of an ego determined by a non-ego and proceeds to unite the manifold of those sensations into a unity for the purpose

of perception. It appears that reason in thus uniting that manifold or in making perception possible, can do so only in the forms of time and space. Hence all the proofs which theoretical reason furnishes for its cognitions run in this wise ;—if experience or sensuous consciousness is to be possible then this or that must be.

অর্থাৎ বহির্ম্মুখী বুদ্ধির অধিকার বাহ্য অনুভব সমষ্টির সীমা পর্য্যন্ত; তাহার সম্বন্ধ ঐকমাত্র সেইরূপ অহমের সহিত, যাহা অনাত্মা দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধ একমাত্র অহঙ্কারের সহিত নিবদ্ধ; অধিকন্তু এতদ্দ্বারা বাহ্যানুভব সমূহের বহুত্ব একত্বে পরিণত হইয়া থাকে, অন্যথা অন্তঃকরণে তদ্বিষয়ক সংজ্ঞা লাভ অসম্ভব ও এবম্বিধ একত্ব কেবল কাল ও ক্ষেত্রাকারেই একমাত্র সম্ভবপর। সুতরাং এতদ্দ্বারা যাহা কিছু বোধগম্য হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ এইরূপে সিদ্ধ যে, যদি অভিজ্ঞতা বা বাহ্যানুভব বোধ সম্ভবপর হয়, তবে তাহা অবশ্য এইরূপেই হইবে, অন্যভাবে হইতে পারে না।

স্থূল মর্ম্ম এই যে, বহুবিধ বাহ্যানুভবকে একত্বে পরিণত করা বুদ্ধির স্বাভাবিক কার্য্য। একত্বে পরিণত না হইলে চিত্তে তদ্বিষয়ে বোধ জন্মিতে পারে না। বাহ্য পদার্থের বহুবিধগুণ সমষ্টিতে আধারত্ব আরোপ করিতে একমাত্র বুদ্ধিই সক্ষম, অর্থাৎ উক্ত বহুবিধ গুণ সমষ্টি হইতে একটী মাত্র পদার্থের জ্ঞান লাভ, কেবল বহির্ম্মুখী বুদ্ধি সত্তার ক্রিয়া হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। "এই বহুগুণ সমষ্টির আধার স্বরূপ ইহা একই পদার্থ" ইত্যাকার অনুভব, বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু হইতে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু এবম্বিধ একত্বে পরিণতিরূপ ক্রিয়া, স্থান কাল আশ্রয় ব্যতীত বুদ্ধি সত্তাতে উদ্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থান কালের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত বহুবিধ অনুভব সমষ্টিকে একটীমাত্র আধার কল্পনা পূর্ব্বক, তদস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস উৎপাদনই বহির্ম্মুখী বুদ্ধির ক্রিয়া। এই বিশ্বাস কি ভাবে অন্তঃকরণে উদয় হয়, তদুল্লেখে কাণ্ট কহিতেছেন যে, যদি বাহ্যপদার্থ-সংজ্ঞালাভ সম্ভবপর হয়, তবে তাহা এইরূপেই হইবে; অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এবম্বিধ বিশ্বাস ভিন্ন, বাহ্য অনুভব সমষ্টির বা জগদস্তিত্বের অন্য প্রমাণ কিছু নাই ও হইতে পারে না। রীড প্রভৃতি দার্শনিকবর্গ এই বহির্ম্মুখী বুদ্ধিকেই common sense আখ্যা

দিয়াছেন। পরন্তু এতদ্দ্বারা ঈশ্বর বা আত্মার নিত্যত্ব সপ্রমাণিত হইবার উপায় নাই, করিতে গেলে বরং প্রকৃতপক্ষে ঠিক তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। কারণ—

বাহিরে ইহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যে স্থলে আত্মা অনাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, সেই স্থানেই ইহার আধিপত্য, অন্যত্র ইহার চালনা হইতে পারে না। যেখানে অনাত্মাই প্রবল, সেই খানেই এবম্বিধ common sense বা বহির্ম্মুখী বুদ্ধির ক্রিয়া সম্ভবপর; সুতরাং ইহা দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্ব বা আত্মার নিত্যত্ব প্রভৃতি কিছুই সপ্রমাণিত হওয়া অসম্ভব। শির বিহনে শিরঃপীড়া হওয়া যেরূপ অসম্ভব, ইহাও তদ্রূপ। যে স্থলে common sense নাই, সে স্থলে তাহার ক্রিয়ার কথা কদাচই উত্থাপিত হইতে পারে না। এবম্বিধ মীমাংসা পোষক স্বরূপ, এ বিষয়ে ক্যাণ্টের যুক্তি প্রণালীর সারাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

The science of metaphysics, in so far as it pretended to furnish theoretical cognitions of supersensuous objects, dwelt in an utter illusion. The only supersensuous cognitions possible being cognitions of cognition itself. Hence the two great problems are :—

1st. To prove an absolute science of reason (i.e. practical reason) possible.

2nd. To prove a science of metaphysics (i.e. science of theoretical reason) imposible.

অন্যত্র Precisely because we could have no experience (imperical knowledge) unless we had *apriori* contemplations of time and space and *apriori* forms of relations whereby to connect the objects in these contemplations and categories. Hence theoretical cognition of God, freedom, and immortality, is a contradiction and impossible.

ক্যাণ্ট বাহ্যজ্ঞানকে এই চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—যথা, প্রথম Sensibility, দ্বিতীয় Understanding, তৃতীয় Receptivity, চতুর্থ Spontaneousness. এই সকল অংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশ ধরিয়া সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে, বহুল বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা, এবং পাঠক বর্গেরও তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে; সুতরাং তাহাতে নিরস্ত হইয়া

মোটা-মোটী ভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই বিধেয়।

উপরোক্ত বিচার প্রণালীর দ্বারা মীমাংসা করা গিয়াছে যে, মন দ্বারা অন্তঃকরণ মধ্যে যে সকল অনুভব আনীত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত, স্থান কাল সহযোগে, বুদ্ধি বৃত্তিতে প্রকাশিত হইলে,—বুদ্ধিবৃত্তি অখণ্ডনীয় নিয়ম সমূহ দ্বারা তাহাদিগকে একত্বে পরিণত করিয়া ও অন্তঃকরণে অস্তীতি ভাণ জন্মাইয়া অহমের সম্মুখে জগজ্জাল বিস্তার করিয়া থাকে। অতএব এস্থলে প্রথমতঃ এই বিষয়টী বিচার্য্য হইতেছে যে, স্থান ও কালের স্বরূপ ও ক্রিয়া কি প্রকার?

স্থান ও কালভূমিকে আশ্রয় ভিন্ন কোন বাহ্যজ্ঞানের স্ফূরণ সম্ভবপর না হইলেও ইহাদিগের মূলভিত্তি অন্তরেই প্রতিষ্ঠিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, অনুভব সমষ্টি অন্তঃকরণে জন্মিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে প্রতিফলিত হইয়া থাকে; তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, তাহাদিগের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থান ও কাল তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অথবা অন্য কথায়, স্থান ও কালকে আশ্রয় করিয়া তাহারা উদয় হইয়া থাকে। বাস্তবিক স্থান ও কাল ব্যতীত, বাহির বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। বাহিরের বলিয়া যে একটা ইন্দ্রজাল আমাদিগের সর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা স্থান ও কাল এই দুইটী মাত্র উপকরণে গঠিত, অথচ এই দুইটীই আমাদিগের অন্তরের বস্তু। আন্তরিক অনুভব সমষ্টি, আন্তরিক স্থান ও কালকে আশ্রয় করিয়াও অথচ বহিরবস্থিতির ভাণ জন্মাইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্ত আশ্চর্য্য ও শ্রুতি বিরুদ্ধ বোধ হইলেও অসত্য নহে। অনুভব কালে "আত্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা এ সমস্ত আত্মার নহে" বুদ্ধির দ্বারা ইত্যাকার বোধ সম্পাদন হইতেই এবম্বিধ বহিরবস্থিতি রূপ ভাণ বা অধ্যাসের উৎপত্তি। "ইহা আমার নহে বা আমি নহি" ইত্যাকার জ্ঞানে, অনাত্ম পদার্থ যে আত্মার বহির্দ্দেশেই কল্পিত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং এইরূপ জ্ঞানে বা অনাত্ম বিষয় বোধে যে স্থান ও কালের উৎপত্তি হইয়া থাকে, একটু তলাইয়া দেখিলে একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অনাত্ম বিষয়-সংযোগাভাবে, তাহাদিগের অস্মিতাতে বা শুদ্ধ বুদ্ধিসত্তাতে, বীজত্ব মাত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে; অর্থাৎ তৎকালে তাহারা কাণ্টের মতে apriori ভাবে

নিহিত থাকে; পরন্তু তাহারা অনাত্ম বিষয় সংযোগে, স্বরূপে প্রকাশিত হইলে, বহির্জগতের অস্তিত্ব আনয়ন করে। যদি অস্মিতাকে একটী বিন্দু কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে বিন্দু সমষ্টিজ্ঞান রেখার সহিত কালের তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু এইরূপ তুলনায় বুদ্ধিমান পাঠক মহা আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন। আপত্তি এই যে, একটী মাত্র বিন্দু হইতে বহু বিন্দুর সমষ্টি-জাত রেখার উৎপত্তি অসম্ভব বিধায় একটী মাত্র অস্মিতা হইতে বহু অস্মিতা-জাত কালের উৎপত্তি অসম্ভব হইতেছে। এরূপ কদাপি হইতে পারে না।

তদুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, অস্মিতা কদাপি বহু হইতে পারে না;—একত্বই যে অস্মিতার মূল স্বভাব, তাহা আমরা পর প্রস্তাবে দেখাইব। সেই একত্ব কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে, তবে যে বর্ত্তমান প্রস্তাবে মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদিতে তাহার খণ্ডন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যে হিসাবে করা গিয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। অস্মিতা বহুত্বে পরিণত না হইলেও যৎকালে তাহাতে অনাত্ম বিষয় সংযোগ হয়, তৎকালে তাহার স্বাধীনত্ব প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে অনাত্ম বিষয়ে তাহার যে প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, তাহা এক অথচ বহু; অর্থাৎ তাহা স্বরূপতঃ এক হইলেও অনাত্ম দর্পণ অনুসারে প্রতিমুহূর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অস্মিতার এবম্বিধ প্রতিবিম্বকে শাস্ত্রকারগণ অহঙ্কার বলিয়া থাকেন। অহঙ্কারের স্বরূপ নিরূপণ, তাঁহারা এইরূপে করিয়াছেন যে, "বৃত্তি স্বারূপ্যমিতরণ্য" অন্য অবস্থায় অর্থাৎ বদ্ধ বা অহঙ্কারাবস্থায় চিত্ত বৃত্তির স্বারূপ্য লাভ হইয়া থাকে। অহং এইরূপে চিত্তবৃত্তির স্বারূপ্য লাভ করতঃ তদনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণামী হয়েন; কিন্তু তা বলিয়া তাহাতে অহমের একত্ব নষ্ট হয় না। অহং এবম্বিধ ভাবে বহু হইয়াও এক থাকেন, সচল হইয়াও অচল ভাবে প্রতীয়মান হয়েন; তাহার কারণ এই যে, অস্মিতার একত্বও অনাত্ম-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অহঙ্কারের বহুরূপের ভিতর একত্ব রক্ষা করণই বুদ্ধির মুখ্য ক্রিয়া—বিশ্বাস তদানুসঙ্গিক ফলমাত্র।

অহঙ্কারের এবম্প্রকার চিত্তবৃত্ত্যনুযায়ী বহুবিধ রূপের সংযোগ ফল, কাল। একই বিন্দুকে বহুবার ধরিয়া দর্শন করিবার যে ক্রমঃ তাহা হইতে যেরূপ রেখার উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ একই অস্মিতাকে অহঙ্কার রূপে

বহুবার দর্শন করিতে হইলে তাহা হইতে কালোৎপত্তি সংঘটিত হয়। তবে স্থান কি? না, সেই কালরেখা হইতে নিক্ষিপ্ত তদীয় লম্বমান ছায়া মাত্র। কথাটা বোধ করি স্পষ্ট হইল না, সুতরাং স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত হইতেছে। অনাত্মসংযোগে রূপান্তরিত বহু অহঙ্কার সমষ্টি-জাত কাল রেখান্তর্গত প্রত্যেক বিন্দু হইতে বুদ্ধির একত্ব সংরক্ষণী নেদং নেদং উক্তি অনুযায়ী অনাত্ম ত্যাগ রূপ ক্রিয়া হইতে ঐ লম্বমান ছায়া অর্থাৎ আত্মার বহির্দ্দেশে অবস্থিতি রূপ বোধ বা ক্রিয়ার উৎপত্তি।

ক্যাণ্ট, স্থান ও কালকে conditions of perception বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এতৎসম্বন্ধে উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা এই মতের সম্পূর্ণ পোষক। কেবল এই মতের কেন, তা ছাড়া যাঁহারা স্থান ও কালকে অভিজ্ঞতাজাত based on experience বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলি নাই ও বাস্তবিক বলিবার নাই। কারণ, এই দুই মতই একই সত্য প্রকাশ করিতেছে। কাল ও স্থানকে চিত্তবৃত্তি বা চিন্তা-জনিতই বল, অথবা চিন্তাকেই কাল ও স্থান জনিত বল, মূলতঃ উভয়পক্ষে কিছুমাত্র বিরোধের কারণ নাই। মন,বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, চিন্তা, কাল, স্থান ইত্যাদি সকলগুলিই কার্য্য-কারণ ভাবে একই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীর একটী সম্পূর্ণ লয় পাইলে, অন্য সমস্তগুলি রক্ষা পায় না ও পাইতে পারে না। সুতরাং সকলগুলিরই যুগপৎ উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য, অধিকন্তু ঐ সমস্তই যে অস্মিতায় অনাত্ম সংযোগের ফল, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কথা এই যে, এই অনাত্ম পদার্থ কি?

ক্যাণ্ট এই খানে নীরব; কোথাও ইহার স্পষ্টতঃ উত্তর দেন নাই। স্পিনোজা এই অনাত্ম বিচারে, কখন কখন ইহাকে প্রকৃত, কখন ইহাকে ঈশ্বর পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ক্যাণ্ট কোন কোন স্থলে এ সম্বন্ধে এই রূপ মীমাংসা করিতে গিয়াছেন—

The ego cannot in reflection posit itself free. The ego can only *be* free, the moment it reflects upon itself its freedom is gone. All limitedness is the result of reflection, of a making-clear-unto itself. Originally the whole activity of the ego extends into the Infinite, but because this activity is not to be a mere appearing of the ego, but is to be such an appearing of the ego *for the ego itself*,

is reflected back, checked and is a non-ego posited as the ground of that check &

এই স্থলে তিনি দেখাইতেছেন যে, অহংচিন্তা হইতেই অহমের বদ্ধাবস্থায় উদয়, ও এবম্বিধ দর্শন ক্রিয়ায় অহং প্রতিবিম্বিত হওয়াতে অনাত্ম দর্পণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অহমের শুদ্ধ স্বরূপাবস্থাতেই অহমের স্বাধীনত্ব সম্ভবপর; পরন্তু অহমের স্বরূপ দর্শনাবস্থায় অর্থাৎ যৎকালে অহঙ্কার রূপে পরিণত হইয়া অহং আপনাকে আপনি দর্শন করে, তৎকালে উহার স্বাধীন জ্যোতিঃ, যাহাতে প্রতিহত হইয়া থাকে, তাহাই অনাত্মা। সুতরাং তাঁহার মতেও জড় জগৎ, অহঙ্কারের আনুসঙ্গিক ফল মাত্র অর্থাৎ অহঙ্কারের বিক্ষেপণী শক্তি বলে বাহিরে সেই অনাত্ম পদার্থের প্রতিফলন ক্রিয়া হইতে জগদুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তন্মধ্যে common sense অনুযায়ী জড় জগতের পৃথক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, বা বার্কেলের তৎপদ লোলুপ ঈশ্বরের পৃথক অস্তিত্ব, কোন ক্রমেই স্বীকৃত হয় নাই। এবম্বিধ জড়জগৎ বা ঈশ্বরের অহঙ্কারের সহিত উৎপত্তি, অহঙ্কারের সহিত স্থিতি ও অহঙ্কারের সহিত লয় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। বেদান্তের জগজ্জাত অহঙ্কার বা সাংখ্যের অহঙ্কার-জাত জগৎ উভয়েই এক কথা। এতন্মতে জগৎ আহঙ্কারিক, অর্থাৎ অহঙ্কারের সহিত কার্য্য-কারণ ভাবে নিগূঢ় সম্বন্ধ। কিন্তু চর্ব্বিত চর্ব্বণের প্রয়োজন নাই, অনাত্মার স্বরূপ নিরূপণ মীমাংসা করিতে বসিয়া আমরা প্রসঙ্গান্তর উপস্থিত করিতেছি।

ক্যাণ্ট বলিলেন, অহং চিন্তা হইতে অনাত্মার উৎপত্তি; একথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। অহং প্রতিবিম্বিত হইলে তৎপূর্ব্বেই অনাত্ম দর্পণের আবশ্যক করিতেছে; নতুবা অহমের অহং চিন্তা সম্ভবপর হয় না। অধিকন্তু যদিও কার্য্য কারণভাবে তাঁহার কথাই স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও তাহাতে অনাত্মার স্বরূপ নিরূপণ হইল না;—জড় জগৎ তাহার প্রকৃত স্বরূপ নহে, কারণ তাহা অহঙ্কারের বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা স্বভাবতঃ বিকৃত; তবে তাহা কি?

শ্রীবিপিনবিহারী সেন।

ধর্ম্মসমাজ ও নিয়মতন্ত্র।

(প্রথম প্রস্তাব)

ধর্ম্ম বিষয়ে সাধারণতন্ত্র কি প্রকার হওয়া উচিত, তাহা কোন্ কোন্ বিষয়ে সম্ভব, তাহার সহিত রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রের কতদূর সাদৃশ্য আছে, এই সমস্ত বিষয়ে পরিস্কার জ্ঞান না থাকিলে সাধারণতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করা যায় না। এ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এবিষয়ের যথোচিত আলোচনা হয় নাই, এবং সেই জন্য আমাদের কার্য্যে সুশৃঙ্খলার অভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই প্রস্তাবে ধর্ম্ম বিষয়ক সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

রাজনীতি বিষয়ে যাঁহারা সাধারণতন্ত্র মতে কার্য্য করেন, তাঁহারা সকলেই যে সকল প্রশ্নের বিচার, মীমাংসা, নিয়মাদি নির্দ্দেশ করেন, তাহা নহে; এবং সকল সময়েই যে একই নীতিসূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা হয়, তাহাও নহে। বরং একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, রাজনীতির কোন নির্দ্দিষ্ট অকাট্য অপরিবর্ত্তনীয় মূল সূত্র নাই। ইংলণ্ড দেশে দেখা যায়, যখন লিবারেল দল প্রবল হয় তখন তাহাদের নীতি সূত্রানুসারে সমস্ত রাজকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যখন কনসরভেটিভদল প্রবল হয় তখন তাহাদের মতেই রাজ্য শাসিত হয়। সাধারণ প্রজামণ্ডলী যেন মূকসাক্ষী স্বরূপ, দুই চারিজন ক্ষমতাশালীলোক তাহাদিগকে যে পথে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা সেই পথেই যায়। অথবা একথা বলিলেও হয় যে, ইংলণ্ডের রাজনীতির দুই জাতীয় মূলসূত্র আছে, যখন যে মূলসূত্রাবলম্বী দল প্রবল হয়, তখন সেই প্রকার রাজনীতি অনুসারে রাজকীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। আয়ের উপর কর নির্দ্ধারণ করা উচিত এবং উচিত নহে, কোন কোন আমদানি বা রপ্তানির উপর কর নির্দ্ধারণ করা উচিত এবং উচিত নহে, মাদক দ্রব্য প্রস্তুত করণাদি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সংস্রব থাকা উচিত এবং উচিত নহে, বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের ভার এবং ভার নহে, ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিত ও যোগ্যতাবিশিষ্ট লোকদিগকে

দুই সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনীতি দুই সময়ে প্রাদুর্ভূত দেখা যায়। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে এবম্প্রকার দুই বিপরীত মূলসূত্র থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আছেন এবং নাই, পরকাল আছে এবং নাই, উপাসনা আবশ্যক এবং অনাবশ্যক—ইত্যাদি বিপরীত মূলসূত্র ধর্ম্মনীতির মধ্যে থাকিতে পারে না। ধর্ম্মসমাজ মধ্যে যদি এই দুই শ্রেণীর লোকই থাকে, তাহা হইলে যখন যে শ্রেণীর লোক প্রবল হইবে তখন তাহাদেরই নীতিসূত্র অবলম্বিত হইবে—ইহা কখন হইতে পারে না। ধর্ম্মনীতি অপরিবর্ত্তনীয়, রাজনীতির ন্যায় তাহা পরিবর্ত্তনশীল নহে; অতএব যদি রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রানুসারে ধর্ম্ম সমাজকে চালাইতে হয়, তাহা হইলে যখন যাহা সাধারণের মত হইবে, তাহাই সেই ধর্ম্ম সমাজে গৃহীত হইবে।

ধর্ম্মসমাজে সকল বিষয় সাধারণের মতে মীমাংসিত হইতে পারে না। এখানে সাধনার প্রয়োজন। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল বহু সাধনা দ্বারা লব্ধ হয়, অতএব যিনি যে পরিমাণে সাধনা করেন, তিনি সেই পরিমাণে ঐ সমস্ত নিগূঢ় বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। একব্যক্তি হঠাৎ কোন ধর্ম্ম সমাজে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল বিষয়ে মত দিবার অধিকারী হইতে পারেন না। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটী বিষয় দেখাইতেছি। মনে কর কয়েক জন লোকের এইরূপ মত হইল যে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা আবশ্যক নহে, তাঁহার গুণানুবাদ ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইল। মনে কর এই সকল লোকের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িল এবং যাঁহারা বহু সাধনা দ্বারা প্রার্থনার আবশ্যকতা স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইল, এ অবস্থায় অধিকাংশের মতে চলিতে হইলে প্রার্থনা বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং প্রার্থনা স্বীকার করিলে অধিকাংশের মত অগ্রাহ্য করিয়া অল্পসংখ্যক লোকের মত গ্রহণ করিতে হয়। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এরূপ স্থলে অধিকাংশের মত লইয়া চলা যায় না। অতএব ধর্ম্মসমাজে সাধারণতন্ত্র সীমাবদ্ধ হইবে, স্থল বিশেষে সাধকদিগের অল্পসংখ্যক লোক সাধারণকে পরিচালিত করিবেন। এস্থলে পৌরোহিত্য-প্রথার আশঙ্কা হইতে পারে এবং তাহা নিবারণের উপায় আবশ্যক। অনেকে বলিবেন যে, যদি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজের প্রাচীন সাধকদিগের, অথবা আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রধান নেতা

কিংবা নববিধান সমাজের নেতার মতে চলিতে হয়। আমরা এই সকল যুক্তি ক্রমে ক্রমে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

কতকগুলি মূল মত লইয়া আমরা হিন্দুসমাজের সহিত অনৈক্য হইয়া স্বতন্ত্র ভিত্তিতে আমাদের সমাজ গঠন করিয়াছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভিত্তিস্থানীয় কতকগুলি মত সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই মতের সহিত যাঁহাদের ঐক্য থাকিবে, তাঁহারা একটী সমাজে বদ্ধ হইতে পারেন। যদি সকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা ঐ মূলমন্ত্র গুলিতে বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে একটী সার্ব্বভৌমিক সাধারণতন্ত্র হইতে পারে; কিন্তু তাহা না হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকদিগের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে সাধনা করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণকে পরিচালিত করিবেন। যে সম্প্রদায়ে সাধারণ লোক চিন্তা, সাধনা করে না, তাহারা দুইচারি জন চিন্তাশীল সাধকের পদচিহ্ন অবলম্বন করিয়া চলে—এইরূপে পৌরোহিত্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিবেকের সীমা পর্য্যন্ত পৌরোহিত্য নাই—তাহার বাহিরেই পৌরোহিত্য। যাহারা আপনাদের বিবেকের আদেশ না শুনিয়া অন্যের প্রদর্শিত পথে চলে, তাহারাই পুরোহিতের সৃষ্টি করে। যদি মূল মত লইয়া অনৈক্য হয়, তাহা হইলে বিবেকের সহিত অনৈক্য হইল; সুতরাং সে স্থলে সকলে এক সম্প্রদায় বদ্ধ থাকিতে পারেন না। কেবল যেখানে সামান্য বিষয়ে প্রভেদ থাকে এবং বিবেকে বাধে না, সেই স্থলেই সাধারণতন্ত্র সম্ভব। দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে প্রার্থনা সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, যদি কতকগুলি লোক প্রার্থনা করা আবশ্যক এবং আর কতকগুলি লোক অনাবশ্যক মনে করেন, তাহা হইলে হয় ঐ মতটী পরিত্যাগ করিতে হয়, নতুবা প্রার্থনা-বিরুদ্ধবাদীদিগকে প্রার্থনা-বাদীদিগের মতেই চলিতে হয়। যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পৃথক সম্প্রদায় করিতে হয়; কিন্তু যদি তাঁহারা মনে করেন যে ইহাতে বিবেকে বাধে না, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রার্থনা-বাদীদিগের অধীন হইতে হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি প্রবল পক্ষ হন এবং প্রার্থনাবাদীরা মনে করেন যে প্রার্থনার আবশ্যকতা যে সমাজে অস্বীকার করে সে সমাজে থাকা বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য, তাহা হইলেও দুই দলকে পৃথক হইতে হয়। আর একটী দৃষ্টান্ত, আত্মার অমরত্বে সকলের বিশ্বাস আছে; কিন্তু কতকগুলি

লোক বলিলেন যে, আত্মা একটী শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া এই পৃথিবীতে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে; কতকগুলি লোক বলিলেন প্রেত-আত্মারা জীবিত আত্মাদিগের সহিত আসিয়া কথোপকথন করেন। আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিয়াও পুনর্জন্ম ও প্রেত-বাদে বিশ্বাস থাকিতে পারে। এইরূপ অনৈক্য স্থলে যদি বিবেকের প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে এক সম্প্রদায় হইতে পারে না। কিন্তু এখানেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে, কোন্ পক্ষের মত প্রবল হইবে? অধিকাংশ যদি পুনর্জন্ম ও প্রেত-বাদে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদেরই মত কি গৃহীত হইবে? সাধারণতন্ত্রানুসারে চলিতে হইলে তাহাই হইবে; কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল পক্ষ, তাঁহারা যদি বিবেকের সহিত এই সকল মতের সমন্বয় করিতে না পারেন, তবে সেই সাধারণতন্ত্র মধ্যে থাকিতে পারেন না।

প্রার্থনা সম্বন্ধেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মত থাকিতে পারে। প্রার্থনা সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল আধ্যাত্মিক বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত, সাংসারিক অথবা শারীরিক বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা উচিত নহে। অন্যের মত ইহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য না হইতে পারে। তাঁহারা বলিবেন যে, ঈশ্বরের নিকট সকল বিষয়ের জন্যই প্রার্থনা করা যাইতে পারে; যেখানে দেখিব আমার জ্ঞান ও বলে কিছু হইল না, সেই স্থলেই ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিব। আপনার ও পরিবারের স্বাস্থ্য ও সাংসারিক সম্পদ বিপদ, দেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি সকল সময়েই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রার্থনা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিতে পারে। ধর্ম্মের দুইটী প্রধান মত সম্বন্ধে কত বিভিন্নতা থাকিতে পারে, আমরা তাহা দেখাইলাম। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এ প্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও সাধারণতন্ত্র চলিতে পারে কি না?

শ্রীযদুনাথচক্রবর্ত্তী।

শাস্ত্রের বাস্তবিক অর্থ।*

(প্রথম প্রস্তাব)

দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যক "আলোচনায়" মান্যবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় "শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ" শীর্ষক প্রবন্ধে শাস্ত্রার্থের মীমাংসা বা তন্মত বিরোধীদিগের "দমন" করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা স্বীয় প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছেন,—

"শাস্ত্রীয় বচন সকলের অন্যায় অর্থ ও অন্যায় প্রয়োগ করা মহাপাপ।" তিনি যুক্তির অভিমান করেন; এই জন্য বলা আবশ্যক যে, তাঁহার এই প্রথম উক্তিই যুক্তি বিরুদ্ধ। শাস্ত্রীয় বচনের অন্যায় অর্থ ভ্রান্তি প্রযুক্তও হইতে পারে, কিন্তু ভ্রান্তিকে কেহ মহাপাপ বলিতে পারে না। অসত্য জানিয়া অসত্য অর্থ করিলেই পাপ হইতে পারে। যাহা হউক বসু মহাশয় সাবধান থাকুন, যেন তাঁহার কৃত অর্থে অন্যায় না হয়, নচেৎ তাঁহার কথানুসারে তাঁহাকেও মহাপাপ স্পর্শ করিতে পারে।

তাঁহার দ্বিতীয় বক্তব্য এই—"ঋষি ও আচার্য্যগণ শাস্ত্রের যেরূপ অর্থ অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই উপাদেয়।" এখানেও বলা যাইতে পারে যে, ঋষি ও আচার্য্যগণ সম্পূর্ণ ভ্রান্তি শূন্য না হইলে একথাও অযুক্ত।

তাঁহার তৃতীয় বক্তব্য "শাস্ত্র বাক্যের স্বকপোল কল্পিত অর্থ করা অধর্ম্ম।" কপোলের দ্বারা যে অর্থের কল্পনা হয় না, মনের দ্বারাই কল্পনা হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় লেখক মহাশয় বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য আমি তাঁহাকে 'মহাপাপ' দোষে দূষিত করিব না এবং বৃথা বাদের দ্বারা পাঠকগণকেও বিরক্ত করিতে চাহি না। প্রবন্ধে যাহা কিছু প্রবল যুক্তির আকারে দাঁড় করান হইয়াছে, তাহার উত্তর দিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে।

বসু মহাশর স্বীয় প্রবন্ধের তৃতীয় ধারায় "বেদ আপ্ত বাক্য নহে" হইতে আরম্ভ করিয়া "আত্মাতেই হয়" পর্য্যন্ত উদ্ধৃত চিহ্ন দ্বারা আমার

* আমাদের অনুরোধ এই, আলোচনাতে যে সকল প্রতিবাদাদি হয়, তাহাতে লেখকদিগের পরস্পরের মধ্যে শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ ভাষা ব্যবহৃত না হয়। তাহা হইলে আমরা দুঃখের সহিত তাহা প্রকাশ করিতে বিরত থাকিব। আং-সং

উক্তি উদ্ধৃতির ভাণ করিয়াছেন; তাহাতো আমি আমার প্রস্তাবে খুঁজিয়া পাইলাম না। এরূপ করা কি অন্যায় নহে? এখানে তিনি জানিয়া মহাপাপকে কেন টানিয়া আনিলেন, বুঝিতে পারি না। হয় তো তাঁহার মত এই যে, প্রাচীন শাস্ত্রের কল্পিত অর্থ করাই মহাপাপ, এখনকার কোন মনুষ্যের কথায় কল্পিত অর্থ করা মহা পাপ নয়। সে যাহাহউক, এখন ভূমিকা ছাড়িয়া প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "শাস্ত্রানুসারে পরমাত্মা ত্রিবিধ নামে উক্ত হন। পর ব্রহ্ম, কার্য্য ব্রহ্ম ও শব্দ ব্রহ্ম"—কোন্ শাস্ত্রানুসারে তাঁহার লেখা উচিত ছিল। কার্য্য-ব্রহ্ম ও শব্দ-ব্রহ্ম যদি কোন শাস্ত্রে পরমাত্মার নাম হয়, তবে সে শাস্ত্রকে এ বিষয়ে ভ্রান্ত বলিতে হইবে; যেহেতু উহা এই সত্য শ্রুতির বিরুদ্ধ—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" তাঁহার (পরমাত্মার) কার্য্য নাই, করণও নাই; অতএব তাঁহাকে কার্য্য-ব্রহ্ম কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? 'শব্দ ব্রহ্ম' বেদ নামক পুস্তকের নাম, পরমাত্মার নাম নহে; যথা গীতাতে উক্ত হইয়াছে "শব্দস্যহি ব্রহ্মণ এস পন্থা যন্নামভি র্ধ্যায়তি ধীর পাথৈঃ" শব্দ বেদের এই পথ যে নিরর্থক নামাদি দ্বারা বুদ্ধি চিন্তা করিতে থাকে ইত্যাদি' (৮, ৯, ১০ সংখ্যক আলোচনার ২৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। এখানে স্পষ্ট রূপে শব্দ-ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ নামক পুস্তক।

বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে তাঁহার পরমাত্মার নাম কার্য্য, ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মা। দুই পঁক্তি পরেই আবার তিনি লিখিয়াছেন, "পর ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টির অনুরোধে কার্য্য-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা উৎপন্ন হন।" এই দুই বাক্য কি পরস্পর বিরোধী নহে? পরমাত্মার নামই যদি কার্য্য ব্রহ্ম হইল, তবে তিনি তাহা হইতে উৎপন্ন হইলেন কি প্রকারে? ইহাই কি বসু মহাশয়ের যুক্তি বা ন্যায় যুক্ত অর্থ?

তিনি লিখিয়াছেন "সেই ব্রহ্মাই এক মাত্র আদি কবি"। ব্রহ্মা যদি পরমাত্মার নাম এবং তিনিই যদি আদি কবি, তবে বলিতে হইবে যে তিনি আপনি আপনাকে বেদ দিয়াছিলেন! ইহা কি শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ নহে?

বসু মহাশয়ের মতানুসারে বেদ, "জ্ঞান, মন্ত্র ও ক্রিয়াময়" এবং উক্ত বেদ "সনাতন ও নিত্য পদার্থ।" মন্ত্র শব্দ দ্বারা যদি ঋচাদি মন্ত্র এবং ক্রিয়ার দ্বারা যদি যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিবক্ষিত হয়, তবে ইহার মধ্যে একটি ও

নিত্য নহে। ঋচাদি মন্ত্রের নূতন রচিত হওয়া তাহাতেই কথিত আছে। *

যজ্ঞাদি ক্রিয়া জীবের দ্বারা সম্পন্ন হয়; জীব যখন অনাদি নহে, তখন তাহার ক্রিয়া কি প্রকারে অনাদি হইতে পারে? যদি আমার কথা বা যুক্তিতে বিশ্বাস না করেন, তবে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিবেন ত? মহাভারতে লিখিত আছে "ঋচামাদি স্তথা সাম্নাং যজুষামাদিরুচ্যতে" ঋক্, সাম এবং যজুর্ব্বেদের আদি কথিত হয়। (আলোচনায় ২৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।)

বসু মহাশয় আমার স্পষ্ট বাক্যে ক্ষমা করিবেন। তাঁহার মত ও যুক্তি সকল যখন পৌরাণিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, তখন বেদ অপেক্ষা পৌরাণিক আচার্য্যদিগের কথা যে তিনি অধিক মান্য করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? ব্রহ্মাকে তিনি উৎপন্ন জীব বিশেষ, (বা ঈশ্বর বিশেষ) বলিয়া বিশ্বাস করেন, এ মত পৌরাণিক। পুরাণ সমুদায় রূপক গল্পে পরিপূর্ণ; কিন্তু ঋক্ মন্ত্র বা প্রাচীন শ্রুতিতে এমত পাওয়া যায় না। তাহাতে এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকেই প্রজাপতি বা ব্রহ্মা নামে বর্ণন করা হইয়াছে। তাঁহাকেই যদি বসু মহাশয় আদি কবি বলিতে চান বলুন, তাহাতে আমার বেদ ব্যাখার কোন ব্যাঘাত হয় না।

বসু মহাশয়ের শাস্ত্র এই যে "ব্যক্তি-লক্ষণ যুক্ত মানব কর্ত্তৃক" বেদ আবিস্কৃত হইতে পারে না। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তিনি হয়ত ঋক্ বেদাদি শাস্ত্র তত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন নাই, অথবা পৌরাণিক বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া বৈদিক সত্য দেখিতে পান নাই। উক্ত শাস্ত্রে অনেক মন্ত্র রচয়িতা "ব্যক্তি-লক্ষণ যুক্ত মানবের" নাম স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে। অধিক কি, এমন ঋচা নাই যাহার প্রকাশক ঋষির নাম সংহিতায় কথিত না হইয়াছে।

"মনো বৈ সমুদ্রঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে মন শব্দের অর্থ মন না লইয়া

* যথা "সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্য সতক্ষদ্ব্রহ্ম হরি যোজনায়। সুনীথায় নঃ পয়সান নোধাঃ প্রাত মর্ক্ষূধিয়া বসুর্তগিম্যাৎ" (ঋগ্বেদ ১।৩২।১৩)

অর্থ (শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক) হে ইন্দ্র! তুমি সকলের আদি; হে সুনেত্র বলবান্ ইন্দ্র! তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর; গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এই নূতন স্তোত্র (মন্ত্র) রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি কর্ম্ম দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।

বসু মহাশয় কল্পিত অর্থ ব্রহ্মা গ্রহণ করিতেছেন, এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই মনু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"তস্য সোঽহার্নিশান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুদ্ধ্যতে
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকং" ইহার শব্দার্থ এই—

"সেই দিবা রাত্রির অন্তে তিনি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সৎ এবং অসাদত্মক মনকে সৃজন করেন।"

এই বাক্যের দ্বারাও মন শব্দের অর্থ ব্রহ্মা হয় না। যদি ব্রহ্মা অর্থ হইত, তবে এ বাক্যের এরূপ অসংগত অর্থ হইত যে, ব্রহ্মা জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। বসু মহাশয় কুল্লুকভট্টের টীকার এ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কুল্লুক ভট্টও ইহা বলেন নাই যে, মন শব্দের অর্থ ব্রহ্মা।

বসু মহাশয় বলেন যে, "বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গ পুরাণে এক বাক্যে ব্রহ্মার এই সকল নাম কহিয়াছেন।"

"মনোমহান্ মতি ব্রহ্মা পুর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সম্বিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ॥"

এখানেও মনের নাম মতি, প্রজ্ঞা, চিতি, ব্রহ্মা ইত্যাদি জ্ঞাপিত হইতেছে। বস্তুতঃ মনের নাম ব্রহ্মা হইতে পারে; যেহেতু, মন একটী সত্য বস্তু, কিন্তু ব্রহ্মার নাম মনাদি হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মা অন্য বস্তুর নাম মাত্র। কারণ, কখনও ব্রহ্মের নাম, কখনও সূর্য্যের নাম ইত্যাদি, ব্রহ্মা স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে।

বসু মহাশয় একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার শব্দার্থ ছাড়িয়া কল্পিত অর্থে তাহার ব্যাখ্যা করেন। যথা—অন্ন শব্দের অর্থ প্রকৃতি, প্রাণ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ, মন শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-মানস ইত্যাদি এবং তাহার দ্বারাই প্রমাণ করিতে চান যে, মন শব্দের অর্থ ব্রহ্মা। এই কুযুক্তি কে যে তর্ক শাস্ত্রে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ (begging the question) কহে, ইহা কি তিনি জানেন না?

বসু মহাশয় আবার নিম্নলিখিত শ্রুতির শব্দার্থ ত্যাগ করিয়া কল্পিত অর্থকে সত্য জ্ঞান করেন—

নিত্য নহে। ঋচাদি মন্ত্রের নূতন রচিত হওয়া তাহাতেই কথিত আছে। *

যজ্ঞাদি ক্রিয়া জীবের দ্বারা সম্পন্ন হয়; জীব যখন অনাদি নহে, তখন তাহার ক্রিয়া কি প্রকারে অনাদি হইতে পারে? যদি আমার কথা বা যুক্তিতে বিশ্বাস না করেন, তবে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিবেন ত? মহাভারতে লিখিত আছে "ঋচামাদি স্তথা সাম্নাং যজুষামাদিরুচ্যতে" ঋক্, সাম এবং যজুর্ব্বেদের আদি কথিত হয়। (আলোচনায় ২৩৮ পৃষ্ঠা দেখুন।)

বসু মহাশয় আমার স্পষ্ট বাক্যে ক্ষমা করিবেন। তাঁহার মত ও যুক্তি সকল যখন পৌরাণিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, তখন বেদ অপেক্ষা পৌরাণিক আচার্য্যদিগের কথা যে তিনি অধিক মান্য করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? ব্রহ্মাকে তিনি উৎপন্ন জীব বিশেষ, (বা ঈশ্বর বিশেষ) বলিয়া বিশ্বাস করেন, এ মত পৌরাণিক। পুরাণ সমুদায় রূপক গল্পে পরিপূর্ণ; কিন্তু ঋক্ মন্ত্র বা প্রাচীন শ্রুতিতে এমত পাওয়া যায় না। তাহাতে এই দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকেই প্রজাপতি বা ব্রহ্মা নামে বর্ণন করা হইয়াছে। তাঁহাকেই যদি বসু মহাশয় আদি কবি বলিতে চান বলুন, তাহাতে আমার বেদ ব্যাখার কোন ব্যাঘাত হয় না।

বসু মহাশয়ের শাস্ত্র এই যে "ব্যক্তি-লক্ষণ যুক্ত মানব কর্ত্তৃক" বেদ আবিস্কৃত হইতে পারে না। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তিনি হয়ত ঋক্ বেদাদি শাস্ত্র তত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন নাই, অথবা পৌরাণিক বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হইয়া বৈদিক সত্য দেখিতে পান নাই। উক্ত শাস্ত্রে অনেক মন্ত্র রচয়িতা "ব্যক্তি-লক্ষণ যুক্ত মানবের" নাম স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে। অধিক কি, এমন ঋচা নাই যাহার প্রকাশক ঋষির নাম সংহিতায় কথিত না হইয়াছে।

"মনো বৈ সমুদ্রঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে মন শব্দের অর্থ মন না লইয়া

* যথা "সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্য সতক্ষদ্ব্রহ্ম হরি যোজনায়। সুনীথায় নঃ পয়সান নোধাঃ প্রাত মর্ক্ষূধিয়া বসূর্তগিম্যাৎ" (ঋগ্বেদ ১।৩২।১৩)

অর্থ (শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক) হে ইন্দ্র! তুমি সকলের আদি; হে সুনেত্র বলবান্ ইন্দ্র! তুমি রথে অশ্ব যোজনা কর; গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এই নূতন স্তোত্র (মন্ত্র) রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি কর্ম্ম দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।

বসু মহাশয় কল্পিত অর্থ ব্রহ্মা গ্রহণ করিতেছেন, এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই মনু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"তস্য সোঽহার্নিশান্তে প্রসুপ্তঃ প্রতিবুদ্ধ্যতে
প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকং" ইহার শব্দার্থ এই—

"সেই দিবা রাত্রির অন্তে তিনি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সৎ এবং অসাদত্মক মনকে সৃজন করেন।"

এই বাক্যের দ্বারাও মন শব্দের অর্থ ব্রহ্মা হয় না। যদি ব্রহ্মা অর্থ হইত, তবে এ বাক্যের এরূপ অসংগত অর্থ হইত যে, ব্রহ্মা জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মাকে সৃজন করেন। বসু মহাশয় কুল্লুকভট্টের টীকার এ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কুল্লুক ভট্টও ইহা বলেন নাই যে, মন শব্দের অর্থ ব্রহ্মা।

বসু মহাশয় বলেন যে, "বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড ও লিঙ্গ পুরাণে এক বাক্যে ব্রহ্মার এই সকল নাম কহিয়াছেন।"

"মনোমহান্ মতি ব্রহ্মা পুর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।
প্রজ্ঞা চিতিঃ স্মৃতিঃ সম্বিৎ বিপুরং চোচ্যতে বুধৈঃ॥"

এখানেও মনের নাম মতি, প্রজ্ঞা, চিতি, ব্রহ্মা ইত্যাদি জ্ঞাপিত হইতেছে। বস্তুতঃ মনের নাম ব্রহ্মা হইতে পারে; যেহেতু, মন একটী সত্য বস্তু, কিন্তু ব্রহ্মার নাম মনাদি হইতে পারে না, যেহেতু ব্রহ্মা অন্য বস্তুর নাম মাত্র। কারণ, কখনও ব্রহ্মের নাম, কখনও সূর্য্যের নাম ইত্যাদি, ব্রহ্মা স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে।

বসু মহাশয় একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া তাহার শব্দার্থ ছাড়িয়া কল্পিত অর্থে তাহার ব্যাখ্যা করেন। যথা—অন্ন শব্দের অর্থ প্রকৃতি, প্রাণ শব্দের অর্থ হিরণ্যগর্ভ, মন শব্দের অর্থ ব্রহ্ম-মানস ইত্যাদি এবং তাহার দ্বারাই প্রমাণ করিতে চান যে, মন শব্দের অর্থ ব্রহ্মা। এই কুযুক্তি কে যে তর্ক শাস্ত্রে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ (begging the question) কহে, ইহা কি তিনি জানেন না?

বসু মহাশয় আবার নিম্নলিখিত শ্রুতির শব্দার্থ ত্যাগ করিয়া কল্পিত অর্থকে সত্য জ্ঞান করেন—

"ত্রয়োবেদা এত এব। বাগে বার্গবেদো, মনো যজুর্ব্বেদঃ, প্রাণঃ সামবেদঃ।"

শব্দার্থ—"তিন বেদ ইহাই। বাণীই ঋগ্‌বেদ, মন যজুর্ব্বেদ, প্রাণ সামবেদ"। কল্পিত অর্থ "ঋগ্‌বেদ প্রজাপতির বাক্য স্বরূপ, যজুর্ব্বেদ তাহার মন স্বরূপ, সাম বেদ তাহার প্রাণ স্বরূপ।"

যাঁহারা ঋগাদি বেদ স্বাভাবিক রূপে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে উক্ত গ্রন্থত্রয় ঋষিদিগের প্রার্থনার সমষ্টিমাত্র; উহা প্রজাপতির বাক্য, মন বা প্রাণ কোন যুক্তি অনুসারে হইতে পারে না। এরূপ কল্পিত অর্থে গোঁড়ারা বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর দত্ত বিবেচনা গুণকে মান্য করেন, তাঁহারা এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন না। অধিকন্তু মন শব্দের অর্থ যদি ব্রহ্মা হইত, তবে বৈদিক নিঘণ্টুতে বা কোশে তাহা পাওয়া যাইত।

বেদ বিষয়ে বসু মহাশয় এই মনু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পিতৃদেব মনুষ্যানাং দেবশ্চক্ষু সনাতনঃ
অশক্যঞ্চা প্রমেয়ঞ্চ বেদ শাস্ত্রমিতি স্মৃতিঃ। (মনুঃ ১২। ৯৪)

শব্দার্থ।—"পিতৃদেব মনুষ্যদিগের বেদে সনাতন চক্ষু (যেহেতু) বেদ শাস্ত্রের (রচনা?) অশক্য এবং (তাহা) অপ্রমেয় এই স্মৃতি।"

এস্থলে মদ্বর্ণিত সত্যবেদই উহ্য, যেহেতু এ শ্লোকের কিয়ৎ পরেই উক্ত হইয়াছে—

"শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধশ্চ পঞ্চমঃ
বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতি গুণকর্ম্মতঃ" (মনুঃ ১২। ৯৮)

শব্দার্থ।—"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং পঞ্চম গন্ধ, প্রসূতি গুণ কর্ম্ম রূপ বেদ হইতেই (ইঁহাদিগের) প্রসব হয়।"

যে বেদ হইতে পঞ্চ ভূতের পঞ্চ গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা ঐশ্বরিক জ্ঞান বা প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহা ঋষি বিশেষের বেদাখ্য প্রার্থনা রূপ মন্ত্র সমষ্টি হইতে পারে না।

অবশেষে বসু মহাশয় নিম্ন লিখিত মহাভারতীয় বাক্যের কল্পিত অর্থ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন।

"শ্রুতি ধর্ম্ম ইতি হেকে নেত্যাহর পরে জনাঃ
নচ তৎপ্রত্যসূয়ামো নহি সর্ব্বং বিধীয়তে"

কিন্তু কৃত কার্য্য হয়েন নাই, কিঞ্চিৎ শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া মৎকথিত অর্থে তাঁহাকেও দাঁড়াইতে হইয়াছে। আমার অর্থ এই "শ্রুতিকে কেহ ধর্ম্ম বলেন, কেহ বলেন না। আমরা তাহার নিন্দা করিনা; কিন্তু ইহাও (স্বীকার করি) না যে সকল শ্রুতিই ধর্ম্ম বিহিত।"

তাঁহার অর্থ এই—"কেহ শ্রুতিকেই ধর্ম্ম বলেন, অপরে তাহা বলেন না, আমরা তাহার প্রতি অসূয়া করিনা, সকল শ্রুতিই কিছু ধর্ম্ম বিহিত নহে।"

পাঠকগণ স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন, এই দুই অর্থে প্রভেদ কি? তাঁহার অর্থেও যখন স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, "সকল শ্রুতিই কিছু ধর্ম্ম বিহিত নহে," তখন তাঁহাকে ইহাও মানা উচিত যে, সকল শ্রুতিই বেদ নহে।

বসু মহাশয় উক্ত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সারস্বরূপ দুই একটি বাক্য গ্রহণ করিতেছি। তিনি বলেন রাজধর্ম্ম প্রকরণীয় বচন বেদ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযোগী হইতে পারে না। যদি না হইতে পারে, তবে উক্ত বচনে বেদের (শ্রুতির) উল্লেখ কি জন্য হইয়াছে? আবার তিনি বলেন, "সত্য শব্দে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য নহে, মিথ্যা শব্দে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পরিত্যাজ্য মিথ্যা নহে।" কাল্পনিক শাস্ত্রজালে যাঁহারা বিমোহিত, তাঁহারাই স্বীয় কল্পনার সমর্থনের নিমিত্ত উক্ত শব্দ দ্বয়ের নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক অর্থ একই, যাহা সত্য তাহা কখনও অসত্য হয় না, যাহা অসত্য তাহা কখনই সত্য হয় না।

তাঁহার আর একটি ব্যাখ্যা—এই "সকল শ্রুতিই কিছুই ধর্ম্ম বিহিত (অর্থাৎ কল্যাণ প্রদ বিধি) হইতে পারে না। কেবল ঋষিগণ যে সকল বেদানুগত ধর্ম্ম প্রবচন ও স্মৃতি নিবন্ধ করিয়াছেন তাহাই বিহিত। বেদে কেবল শব্দতঃ ও সামান্যতঃ সত্য কথনেরই আদেশ আছে। কিন্তু অনেক স্থলে সত্য কথা অভ্যুদয়প্রদ নহে।" শ্রুতি অপেক্ষা ঋষিগণের প্রবচনকে প্রাধান্য দেওয়া, এমত কি বসু মহাশয়ে নূতন নহে? প্রচলিত মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা কি ইহা স্বীকার করিবেন?

উপসংহারে বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "লেখক মহাশয়ের এই সকল

মত এ দেশীয় নহে, শাস্ত্রীয় নহে, এবং যুক্তি সিদ্ধও নহে।" আমি জিজ্ঞাসা করি, এ দেশীয় লোকের মত অন্য দেশীয় কি প্রকারে হইতে পারে? যদি অন্য দেশীয় হয়ই তাহাতেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু অন্য দেশীয় হওয়ার প্রমাণ চাই। বসু মহাশয় এবং তাঁহার স্বমতাবলম্বীরা যাহা বুঝিয়াছেন তাহাই শাস্ত্রীয়, অন্যে যাহা বুঝিয়াছে তাহা শাস্ত্রীয় নহে, তাহারই বা প্রমাণ কি? কাহার মত যুক্তিসিদ্ধ ইহা পাঠকগণ নিজে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বসু মহাশয় যে মতের পক্ষপাতী, যাহাকে প্রচলিত গোঁড়া মত বলা যায়, তাহার দ্বারাই ভারতবাসী আর্য্য দিগের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইয়াছে। ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাভাবিক বিবেককে জলাঞ্জলি দিলে এরূপ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। সত্যের শরণ লইয়াই "শাস্ত্রের বাস্তবিক অর্থ" বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীনবীনচন্দ্র রায়—লাহোর।

উপাসনা।

কর্ম্মে পিতৃলোক সন্তুষ্ট, উপাসনায় দেবলোক সন্তুষ্ট। পিতা মনুষ্য, স্বর্গবাসী হইলেও মনুষ্যত্বের কলঙ্ক শূন্য নহেন। কর্ম্ম অংশ, উপাসনা পূর্ণতা। কর্ম্ম ও প্রীতির পূরণে উপাসনা সিদ্ধ হয়। যেখানে প্রীতি, সেখানে কর্ম্ম প্রিয়জনের মনোরঞ্জন। প্রীতি শূন্য কর্ম্মের অভাব নাই। কর্ম্ম অনিত্য, প্রীতি নিত্য। প্রীতির উচ্ছ্বাসে প্রিয়-রঞ্জন কর্ম্ম। কর্ম্ম জনিত প্রীতি ক্ষীণা, সৈকত-তল-বাহিনী নৈরঞ্জনা। প্রীতি-জনিত কর্ম্ম বীর-কুর্দ্দন, মহাপ্রপাত নায়েগারা। প্রথমটী ভৃত্যের প্রতি প্রভুর স্নেহ, দ্বিতীয়টী মাতৃস্নেহ পূর্ণ-প্রবল-তরঙ্গময়। প্রথমটী স্বোপার্জ্জিত, দ্বিতীয়টী প্রাকৃতিক।

উপাসনা অবস্থা না কার্য্য? ইহা প্রধানতঃ অবস্থা, অংশতঃ কার্য্য। নিত্য প্রীতি মানসিক অবস্থা; কখন সখ্য দাস্য কখন বাৎসল্য ভাবে বিবর্ত্তিত হইতে পারে; অসীম জলরাশি অনাদি অনন্ত অতল বাত-

কর্ষণে উপরিভাগে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। নিত্য-প্রীতি-জনিত অনিত্য কর্ম্ম ক্ষণ স্থায়ী, প্রীতির বিদ্যুৎ বিকাশ, সেইটী উপাসনার কর্ম্মাবস্থা। চক্ষু নিমীলন, আসন বন্ধন, প্রাণায়াম উপাসনার কার্য্য নহে। সর্ব্ববিধ প্রীতি ঈশ্বর প্রীতির শাখা পল্লব। আমি পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করি ইহাও ঈশ্বরের উপাসনা, দুষ্টকে দণ্ড দিই ইহাও উপাসনা। অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন সকলে অংশাবতার, পূর্ণাবতার উপাসনা।

কর্ম্মের আকর্ষণ আছে। প্রীতি অস্ফুট, কর্ম্ম স্ফুট। কর্ম্মের মোহে কর্ম্ম সর্ব্বস্ব হইতে পারে। প্রীতির অস্ফুটতা বৃদ্ধির সহিত কর্ম্মের অস্ফুটতা বৃদ্ধি হয় না। এজন্য অন্তর্বাহিনী প্রীতিকে বহির্বাহী কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রীতির কেবল পরিমাণ অধিক নহে, মাহাত্ম্যও অধিক। বহির্বাহী কর্ম্মশীলতা জীব সুলভ, অন্তর্বাহিনী প্রীতি-পরায়ণতা দেবলোম; তাই বলা হইয়াছে কর্ম্মে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হয়, প্রীতিতে দেবতা পরিতৃপ্ত হন।

কর্ম্মের মোহ হেতু বিকৃত পাশ্চাত্য নীতির উদ্ভব হইয়াছে,—ফলের গুণে উপায়ের দোষ কাটিয়া যায়, The end justifies the means প্রাচ্য নীতি মহত্তর। ফলের কমণীয়তা মোহময়ী, এজন্য প্রাচ্য আচার্য্যের বিধান কর্ম্ম ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। তুমি কর্ত্তা হইলে ফলের আশা অতিক্রম করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রীতি-সমুদ্রে বায়ু স্পর্শে যে তরঙ্গ উঠে সে স্বাভাবিক, ফলাফল চিন্তা করিয়া উঠে না। কর্ম্ম ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইলে প্রীতির পরিধি প্রসারিত করিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন বা নিবৃত্তি সাধন প্রীতির অনুশীলন সাধ্য। ইন্দ্রিয় নিগ্রহে বা ধৃতিসাধন পরিচর্য্যায় নিবৃত্ত মার্গ পরিস্ফুট হয় না। অভাব সাধন খ-পুষ্পের ন্যায় কল্পনা সিদ্ধ, ভাবই একমাত্র সাধ্য। প্রীতি-প্রবৃত্তি সাধন করা যায়; নিষ্কামতা, নিবৃত্তি অসাধ্য।

উপাসনা মানসিক অবস্থা। মানস-অবস্থা শরীর-অবস্থা শাসন করে। উপাসনা কালে শরীর ও মানস অবস্থা কিরূপ হয়, আলোচনা করা প্রার্থনীয়।

সোঽহং-বাদী গর্ব্বিত নহে;—"আমি ও আমার পিতা এক" ইহা দীন বচন, বিনীতের কথা। সোঽহং-বাদী উপাসনা করে না, সে চুম্বক শলাকার কেন্দ্রাভিগমন নিত্য অবস্থা, উপাসনা তাঁহার ধর্ম্ম। গর্ব্বিত সোঽহং-বাদী অশ্বতরীর সন্তান, আকাশ কুসুম, অসম্ভব কল্পনা।

দ্বৈতবাদী সুবর্ণময় ফলাকাঙ্ক্ষী। তিনি আপনার হীনতা স্বীকার করেন এবং পরমাত্মার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করেন। উপাসনা সমগ্রবৃত্তি উৎকর্ষণের একীভূত উপায়, তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। হীনতা স্বীকার উপাসনার অঙ্গ।

বর্ব্বরেরা নিয়ম বা সাধারণতার পক্ষপাতী নহে। নিত্য লক্ষিত নীল আকাশ তাহাদিগকে আকর্ষণ করে না। যাহা আকস্মিক, যাহা অদ্ভুত, যাহা অসাধারণ, তাহাই তাহাদিগকে আকর্ষণ করে। আকস্মিক মেঘ গর্জ্জন, বিদ্যুৎ প্রভাস, রামধনু বা ভূকম্পন তাহাদিগকে দেব শক্তির, দেব জীবন বা জীবন্ত দেবতার পরিচয় দেয়। যাঁহারা নিয়মবাদী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বস্তুতঃ তাঁহাদিগের হৃদয় শাসিত হয় নাই। অসাধারণ আকস্মিকক্ষম না হইলে তাঁহারা দেবতার জীবিততায় বিশ্বাস করেন না। নিয়মানুকূল দেবতা নিয়মের অতিরিক্ত সত্তা সম্পন্ন নহেন, ইহা যুক্তির ব্যভিচার।

নিয়মবাদী নিয়মের সর্ব্ব নেতৃত্ব ও বিশ্ব-ভৌমিকতা স্বীকার করেন, অথচ কার্য্যকালে তাঁহার গ্রাহ্য নিয়মের অতীত নিয়ম থাকিতে পারে, স্বীকার করেন না। জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ করেন, দৃষ্ট মোহে দীনতা অতিক্রম করেন, যে অনুসন্ধিৎসা উপাসনার রূপান্তর, বৈজ্ঞানিকের প্রাণ, সে অনুসন্ধিৎসা অহঙ্কারে উন্মুলিত হয়। উপাসনার প্রাণ প্রেম। প্রেমের রূপ বিনয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ।

নব্য হিন্দু ও বিবাহ-প্রথা।

পারিবারিক সুখ পার্থিব সুখের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। পিতার বাৎসল্য, মাতার স্নেহ, ভাই ভগ্নীর অকৃত্রিম ভালবাসা, মানবজীবনে সুখের উৎস উৎসারিত করে। কিন্তু মানবের প্রাণ চিরকালের জন্য একমাত্র ইহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারে না।—আরও এমন কিছু চায়, যাহাতে ডুবিয়া সে আত্মহারা হইতে ইচ্ছা করে; আপনার অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বে মিশাইয়া দিয়া দুইএ মিলিয়া এক হইতে পারে। এমন একজন চায়, যাহার নিকট জীবনের কোন বিভাগ গোপন থাকিবেনা,—যাহার নিকটে সম্পদে বিপদে, সুখে, দুঃখে পাপে পুণ্যে সমবেদনা ও সহানুভূতি, শান্তি ও সান্ত্বনা পাইবে। এ আকাঙ্ক্ষা,এ বাসনা স্বাভাবিক; শত বাঁধা শত চাপে ইহা রুদ্ধ হইবার নয়;—এ প্রবলতরঙ্গা স্রোতস্বিনী, ইহার খরতর স্রোতে মত্ত মাতঙ্গ কোথায় ভাসিয়া যায়; বালির বাঁধ যত কঠিন করিয়া বাধ না কেন, এক আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইবে। মানব প্রাণে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিকাশ এক সময় না এক সময় হইবেই হইবে। কর্ত্তব্যের কঠোর নিপীড়নে, নীতির ভীষণ তাড়নে, প্রতিজ্ঞার বলে তুমি তাহা নিয়মিত করিতে পার বটে; কিন্তু সমূলে উন্মূলিত করিতে পার না। তুমি যত কেন পিতৃবৎসল, মাতৃভক্ত, ভাই ভগ্নীতে অনুরক্ত হও না, একদিন না এক দিন তোমার প্রাণ পত্নীর পবিত্র প্রেমের জন্য লালায়িত হইবেই হইবে। জগতে এমন কেহ আছেন কিনা জানিনা, যাঁহার প্রাণে এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই অতৃপ্ত বাসনার উদ্রেক হয় নাই। যদি কেহ থাকেন, তিনি হয় মাননীয় প্রকৃতির অতীত, না হয় তাঁহার হৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয় নাই, একথা বলিতেই হইবে।

পত্নীর অকৃত্রিম পবিত্র প্রীতিতে মানবের প্রাণ উদারতর হয়, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দেয়, হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের আভাস উপলব্ধি করে। সন্তানের পবিত্র মুখকমল সন্দর্শন করিয়া, প্রিয়তমা পত্নীর নিঃস্বার্থ প্রীতি-বিস্ফারিত চক্ষুরাগ অবলোকন করিয়া নিতান্ত অবিশ্বাসীর প্রাণও ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হয়, স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট

হয়। এমন স্বর্গীয় সুখ শান্তির সোপান যে পবিত্র বিবাহব্রত, তাহা কি উপেক্ষার বিষয়? তাহা কি অন্যের পছন্দমতে স্থিরীকৃত হওয়ার বিষয়?—তাহা কি ঘটকের ঘটকালীর কর্ম্ম? যাহার উপর আমার ভাবী জীবনের সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি, ধর্ম্ম নীতি নিগূঢ় ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা কি তাচ্ছিল্যের বিষয়? কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত বিবাহ-প্রথা দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয়, বিবাহ যেন একটা খেলার জিনিস, আমোদের ব্যাপার, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপায়-বিশেষ! সংসার করিতে লোকের যেরূপ দশটা আস্‌বাবের দরকার, স্ত্রীও যেন তদ্রূপ একটা আস্‌বাব; গৃহকার্য্য নির্ব্বাহের যন্ত্র-বিশেষ! বিবাহের যে একটা উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে, এ দেশের বর্ত্তমান বিবাহপ্রণালী দেখিলে তাহা তো মনে হয় না।

স্ত্রী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যবস্থাকার মনু কি বলিতেছেন, তাহা এক বার শুনুন—

"নোদ্বহেৎ কাপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং।"

মনুসংহিতা, ৩য় অ। ৮ম শ্লোক।

"নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং নচ ভীষণ নামিকাং।"

ঐ—৯ম শ্লোক।

"অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশদশানাং মৃদ্বঙ্গী মুদ্বহেৎস্ত্রিয়ং॥"

ঐ—১০ম শ্লোক।

"কপিল-কেশা, অধিকাঙ্গী, চিররোগিনী, লোমবিহীনা বা অতিলোমা বহুভাষিণী (বাচাল), পিঙ্গল-চক্ষু কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প, দাস প্রভৃতি বাচক ও ভীষণ নামযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিবেনা।

অবিকলাঙ্গী, সুন্দর নাম যুক্তা, হংসবারণ-গামিনী, সূক্ষ্মলোমকেশদশনা এবং কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে।"

এতদ্ব্যতীত পাত্রীর গুণাগুণ সম্বন্ধে যে আর কিছু দেখিতে হইবে, কোথাও তেমন কিছু বলেন নাই। যে দুই একটী শ্লোক আছে, তাহাতেও এইরূপ শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং সংসারিক বিজ্ঞতার কথাই পাওয়া যায়। ইহাদের কোথাও প্রীতি প্রেমের নাম গন্ধ আছে কি? ধর্ম্ম ভাবের আভাস পাওয়া যায় কি? তবে অন্য একটী শ্লোকে আর একটী কথা আছে বটে—"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডপ্রয়োজনাৎ।" ইহাও মন্দের ভাল। পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য পুত্রের প্রয়োজন, এবং সেই পুত্র লাভার্থে ভার্য্যার প্রয়োজন; সুতরাং ঘটনাবশাৎ যে স্ত্রীর পুত্র সন্তান না জন্মে, তিনি হেয় ও অবজ্ঞার পাত্র। স্বামী সেই স্ত্রীর ভালবাসা প্রেমের মুখাপেক্ষা না করিয়া পুত্র কামনায় যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন;—ধর্ম্ম অথবা নীতির চক্ষে তাহা দোষাবহ নহে! হিন্দুশাস্ত্রে ইহার বিপরীত বা প্রতিনিষেধক কোন বিধি আছে কি? যদি থাকিয়াও থাকে, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা প্রতিপালিত হইতেছে কি? অথচ নবজীবন-সম্পাদক বিগত বৎসর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের যশোকীর্ত্তন করিতে যাইয়া মনুর এই ব্যবস্থাকে ধর্ম্ম নীতির উচ্চ আদর্শ-সম্ভূত বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। তাঁহার ন্যায় অপরাপর হিন্দুশাস্ত্রের নব ব্যাখ্যাকারগণও মনুর সমসাময়িক এবং বর্ত্তমান কালের প্রচলিত বিবাহপ্রণালীর মধ্যে ধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব, নীতির উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না! তাই বঙ্গের একজন খ্যাতনামা লেখক "ভালবাসার" কথা লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"আমাদের কবিরাও আজ বিধাতার সৃজিত অসংখ্য নর নারীর মধ্যে ভালবাসার পাত্র না পাইয়া কল্পনায় ভালবাসার পাত্র সৃষ্টি করিতেছেন এবং আমাদের নব্য সমাজসংস্কারকেরাও মনের মানুষ খুঁজিয়া বিবাহ না করিলে বিবাহে ভালবাসা হয় না এই মতের পক্ষপাতী হইয়া আমাদের প্রাচীন বিবাহ-প্রণালীর উপর খড়্গ হস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, মনের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ান, ভালবাসার পাত্র বাছিয়া বেড়ান অধার্ম্মিক ও অশিক্ষিতের কাজ; প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের কাজ নয়।" তিনি বলেন, হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সমাবেশ হইলে বিশ্ব সৃষ্টির সমুদয় পদার্থ তোমার চক্ষে সুন্দর দেখাইবে, যাকে তাকে তুমি ভালবাসিতে পারিবে। এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের লক্ষণই এই; কিন্তু

জিজ্ঞাসা করি, এ জগতে কয় জনের প্রাণে এরূপ উচ্ছ্বসিত বিশ্ব-জনীন ভগবৎ প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে? তিনি কি আশা করেন, "পৃথিবী শুদ্ধ সকল নরনারী এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেমে প্রেমিক হইয়া বিবাহ করিবে? তবে বোধ হয় এ জগতে হাজারে এক জনকেও আর বিবাহ করিতে হয় না! তারপর বিশ্বজনীন ভালবাসা আর দাম্পত্যপ্রেম, এই দুইএর মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই? এক জন যাকে তাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারে, যার তার মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারে, অথচ তাহাদের কাহার সহিতে উদ্বাহ-সূত্রে গ্রথিত হইতে অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা করিতে না পারে। সাধারণ ভালবাসা আর দাম্পত্য প্রেম যে এক জিনিশ নহে, উভয়ের মধ্যে যে অন্ধকার আলো তফাৎ, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বেশ বোঝা যায়।

দুঃখের বিষয় ইহাঁদিগের ন্যায় শিক্ষিতেরাও একথা বলিতে কুণ্ঠিত নহেন যে, বিবাহের পূর্ব্বে পতি পত্নীর মধ্যে কোনরূপ আলাপ পরিচয়ের বা ভালবাসা সঞ্চারের কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ ভালবাসা "ঠিক ভালবাসা নয়; তাহার প্রধান অংশ ঐন্দ্রিয়িক লালসা এবং রূপজ মোহ।" তাঁহারা বলেন, আমাদের যাহা আছে, তাহাই বেশ। পাত্র পাত্রীর অভিভাবকগণ বিবাহ সম্বন্ধ করিবেন, তোমাদের বিবাহ দিবেন; তোমরা বিশ্বজনীন ভগবদ্ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পরস্পরে পরস্পরকে ভালবাস, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর—ধর্ম্ম পথে বিচরণ কর। জানি না, এইরূপ বিবাহের অনুপাত ধরিলে কত সংখ্যক দম্পতীযুগলের প্রেম এইরূপ বিশ্বজনীন উদার আদর্শ-প্রেম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এদেশে এক সময় ছিল, যখন লোকে নিত্য-দ্বন্দ্বকারিণী, বিভিন্ন প্রকৃতি-প্রবৃত্তি-সম্পন্না গৃহিণী নিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কোন অসুখ অসুবিধা ভোগ করিত না; বৎসর ভরা মুখরা ভার্য্যার বাক্যবাণে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া বৎসরান্তে সাবিত্রীব্রতের ফুলচন্দন পাইয়া স্বামী আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিতেন; স্ত্রী দিবস রজনী ব্যভিচারী সুরাপায়ী স্বামীর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াও একমাত্র বসন ভূষণ পাইয়াই আপন অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতেন,—ভাবিতেন যে, তবুত আমার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ নাই,—স্বামীকে গুরু জ্ঞানে দুবেলা ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন, স্বামীর ভুক্তান্ন খাইয়া আপনাকে বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্তির অধিকারিণী মনে করিতেন। এখন আর সে কাল নাই; এখন

আর সেই মনুর ব্যবস্থার সময় নয়। দেশ কাল ভেদে সকল দেশে সকল সময় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তোমাদেরই বেদ-বর্ণিত সময় আর মনুর সময়ের ব্যবস্থা এক রূপ নহে। তবে আজ তোমরা নব্য সমাজ সংস্কারকদের উপর এত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতেছ কেন? যদি সময়ের গতির সহিত অগ্রসর হইতে না পার, তবে অপরের সৎসাহস ও উন্নতি দেখিয়া পরশ্রী-কাতরের ন্যায় তীব্র কটাক্ষপাত কর কেন? অযথা কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া রসনাকে কলুষিত কর কেন? অপেক্ষা কর, তাহাদিগকে ভাল করিয়া দাঁড়াইতে দাও; পরে দোষ গুণের সমালোচনা করিও। আর তাই বা বলি কেন, এদিকেত কাগজে কলমে সহস্রমুখে নিন্দা করিতেছ, অথচ তাহাদের পথে চলিতে বিরত নও। মেয়েটীকে লেখা পড়া না শিখাইলে ভাল বর মিলে না; ছেলে গুলি ধর্ম্মঘট করিয়া বাল্যবিবাহ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সুতরাং এখন আর "অষ্টবর্ষে ভবেৎ গৌরী নববর্ষে চ রোহিণী" র মত বজায় থাকে না; পাত্রীটীকে জামা জোরা পরাইয়া বিবাহের পূর্ব্বে বরের নিকট পরীক্ষা না দেওয়াইলে আর চলে না;—তবে আর কার্য্যতঃ নব্য সমাজসংস্কারকদের পদানুসরণ করিতে ছাড়িতেছ কোথায়? তবে কেবল পার্থক্য এই যায়গায়,—তোমরা জোর করিয়া ছেলে মেয়ে গুলিকে এঁচড়ে পাকাইতেছ, আর তাহারা উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে বলিতেছে।

এই প্রবন্ধ প্রেসে পাঠানের অব্যবহিত পরেই একটী ভদ্রলোক একটী নয় বৎসরের বালককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিলেন, আপনারা কি ইহার একটা কিছু করিতে পারেন? এই বালকটীর বিবাহ দেওয়ার জন্য ইহার পিতামতা উদ্যোগ করিয়াছেন; কিন্তু এ বালক কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি নয়। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি বিবাহ করিতে চাহিতেছ না কেন? সে বলিল, "আমি স্বাস্থ্য রক্ষায় পড়িয়াছি যে, বাল্যকালে বিবাহ করা উচিত নহে। আমি এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বিবাহ করিবনা বলিয়া বাবাকে চিঠী লিখিয়াছিলাম, তাতে মা আমাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছেন। সে জন্য বাড়ী হইতে পালাইয়া আসিয়াছি—গোলদীঘিতে লুকাইয়া থাকিব।" আইন মতে আমরা তাহাকে আশ্রয় দিতে পারিনা—সে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া, সমাজের শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া আমাদের চক্ষে জল

পড়িতে লাগিল। সে যে উপদেশ পড়িয়াছে, তাহার সরল প্রাণে যে সৎশিক্ষা মুদ্রিত হইয়াছে—অন্য দেশের মা বাপ হইলে সন্তানের মুখে তাহার কথা শুনিয়া চুমো খাইতেন, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতেন। আর এই হতভাগ্য দেশের পিতা মাতা তজ্জন্য পুত্রকে নির্য্যাতন করিতেছেন! আমাদের ভয় হয়, এখন হইতে শিক্ষা বিভাগের ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ পাছে স্বাস্থ্যরক্ষার ন্যায় দুর্নীতি প্রচারক বই গুলি পাঠ্যতালিকা হইতে খারিজ করিয়া দেন! এদেশের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।

তাই বলি, তোমরা দেশের পরম শত্রু। তোমরা যাহাদিগকে দেশের শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছ, তাহারা বাস্তবিক শত্রু নহে—তোমরাই প্রকৃত শত্রু। এই বাল্যকালে সন্তান সন্ততির বিবাহ দেওয়াতে, অনুপযুক্ত বয়সে তাহারা সন্তান সন্ততির পিতা মাতা হওয়াতে, পরিবার প্রতি পালনের উপযুক্ত সংস্থান উপার্জ্জনক্ষম হইতে না হইতেই তাহাদিগের স্কন্ধে পরিবার ভরণ পোষণের গুরুতর বোঝা চাপানতে, সন্তান সন্ততি প্রতিপালন ও তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব শক্তি-জন্মাইতে না জন্মাইতেই তাহাদের মস্তকে এ গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করাতে,—তাহাদের ভাবী বংশধরগণ দিন দিন হীনবীর্য্য ও ক্ষীণ-মস্তিষ্ক হইয়া পড়িতেছে, দেশ দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইতেছে, সমাজ নীতি বিহীন হইয়া উঠিতেছে। আজ তোমরা যাহাদিগকে ধরিয়া বিবাহ দিতেছ, তাহারা যে ইহার বিষময় ফল অনুভব করিয়া এক দিন এজন্য তোমাদিগকে অভিসম্পাত করিবে না, কে বলিতে পার? এমন অনেক দম্পতীযুগল দেখিয়াছি, যাহারা মনে করে, তাহাদের এ সম্মিলন না হইলে বরং ছিল ভাল; এই দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাতে তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, অসুখ অশান্তির আগুনে তাহাদের হৃদয় ক্ষত বিক্ষত। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও কি বলিব, আমাদের যাহা আছে তাহাই ভাল, আমাদের ভাবী সুখ দুঃখ পিতা মাতা অভিভাবকদের হস্তেই ন্যস্ত থাকুক? বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রীর চেনা পরিচয়ের ও ভালবাসা সঞ্চারের প্রয়োজন নাই? এদেশের বিবাহপ্রথা দেখিলে ছেলে বেলার সেই পুতুলের বিয়ের কথা মনে পড়ে—তাহারা যেন অভিভাবকদের হাতের ক্রীড়নক।

ক্রীড়নক ভিন্ন আর কি মনে করিব? পঞ্চাশ বৎসর পুর্ব্বে অর্থগৃধ্নু পিতামাতা অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট পঞ্চম বর্ষীয় বালিকাকে উৎসর্গ করিতে

কুণ্ঠিত হইতেন না—এখনও এই নৃশংস প্রথার একেবারে মূলোচ্ছেদ হয় নাই। বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত যুবকগণ অর্থের বিনিময়ে অভিভাবকদের আবদারে আপনাদের হৃদয়ের প্রীতি প্রেম অকাতরে বিক্রয় করিতেছেন; যে পাত্রীর পিতা যত অধিক অর্থ দিতে পারিবেন, তিনিই ভাল পাত্র পাইবেন—পাত্র যতটা পরীক্ষা পাস্ করিয়াছেন, কন্যার পিতাকে তত হাজার টাকা যৌতুক দিতে হইবে; তবে বরের এবং বরের পিতার মন উঠিবে। এইরূপে কত ধনবান্ লোক কন্যাদায়ে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন—প্রত্যেক শিক্ষিত লোক ইহার কুফল অনুভব করিতেছেন; অথচ কেহই এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহসী হইতেছেন না—অর্থ-লিপ্সা সংবরণ করিতে পারিতেছেন না! পাত্রীর গুণাগুণ যেরূপ পিতার অর্থের উপর নির্ভর করে, পাত্রের গুণাগুণ তেমনি পাস্ করার উপর নির্ভর করে; চরিত্রের প্রতি, ধর্ম্ম ভাবের প্রতি তত মনোযোগ দিতে কাহাকেও বড় দেখা যায় না। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আর তোমরা স্বামী স্ত্রীতে বিশ্বজনীন ভালবাসা সঞ্চারের, পরস্পরের সাহায্যে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির কি আশা করিতে পার?—তাহা হইলে নব্য সমাজ সংস্কারকদের কোর্টসীপের বিবাহে ঐন্দ্রিয়িক লালসা পরিতৃপ্তির যে দোষারোপ করিতেছ, তোমাদের প্রচলিত প্রথানুযায়ী বিবাহে সেই দোষ তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তিতেছে। দুইটী অজ্ঞাত কুলশীল পুরুষ রমণী বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইলেই যে, তাহাদের মধ্যে পবিত্র প্রেমের সঞ্চার হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তর প্রতিভূ আছে কি? যদি তাহা না থাকে, তবে এরূপ বিবাহে কি ব্যভিচার দোষ সংস্পর্শে না? কথা গুলি বোধ হয় বড় অপ্রীতিকর হইতেছে; কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে এরূপই দাঁড়ায়। তবে এখন শিক্ষিত নব্য হিন্দু-শাস্ত্রবেত্তাগণ একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন, নব্য সমাজসংস্কারকসম্প্রদায় এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারা ভ্রান্ত এবং দেশের প্রকৃত শত্রু।

যদি এই সকল, কুপ্রথা ও অনিষ্টকর রীতিনীতি দূর করিতে হয়, যদি বর কন্যাকে তোমাদেরই পুরাকালের স্বয়ম্বর প্রথানুযায়ী স্বামী স্ত্রী মনোনয়নের ভার দেওয়া ধর্ম্ম ও নীতি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে তোমাদিগকে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক বাল্যবিবাহ রহিত করিতেই হইবে—পুত্র দিগের ন্যায় কন্যাদিগকেও উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিয়া প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া

পর্য্যন্ত বিবাহের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অসবর্ণ বিবাহের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

সমাজ-সংস্কার।

(প্রথম খণ্ডের ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর)

সমাজ সংস্কার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তৎপূর্ব্বে যে আত্ম-সংস্কার অত্যাবশ্যক, তাহা সমাজ-সংস্কার শীর্ষক প্রথম প্রস্তাবে যথা সাধ্য দেখান হইয়াছে। ধর্ম্মময় জীবন ভিন্ন যে সমাজ সংস্কার সুচারু রূপে সমাধা হয় না, তাহাই এই প্রস্তাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। লোকের কোথায় কি ত্রুটি হইতেছে—বন্ধু বান্ধব অথবা সমাজের লোকে যে ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তাহা দ্বারা যদি সমাজের অপকার হয়, তবে তাহা নিবারণ করিবার উপায় আছে কি না, এ সকল চিন্তা করা সমাজ সংস্কারকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা অপেক্ষা শত গুণে গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য এই যে, সর্ব্বদাই সমাজ-সংস্কারক দেখিবেন যে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সাধনের পথে তাঁহার কোন কার্য্য অন্তরায় রূপে দাঁড়াইয়া আছে কি না। যিনি অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার সামান্য একটি অসদনুষ্ঠান অথবা ত্রুটি সমাজের সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে এবং এইরূপ অনুভব করিয়াই তিনি আপনার জীবনের দায়িত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়ত বিব্রত ও দৃঢ়ব্রত, তিনিই বাস্তবিক সমাজ সংস্কারের উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার কোন্ কার্য্যে সমাজের অপকার ও কোন্ কার্য্যে সমাজের উপকার হইতেছে, তিনি সমাজের পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে কতটুকু সহায়তা করিতে পারিতেছেন, তাঁহার জীবন স্রোতঃ সমাজ-ক্ষেত্রে কোন মূল্যবান্ সারবস্তু রাখিয়া গেল কিনা—এ চিন্তা সমাজ সংস্কারকের প্রাণে সর্ব্বোপরি স্থান পাইবে। তেমন ব্যক্তি আত্মপরীক্ষা দ্বারা দেখিবেন, তিনি জীবন পথে কতটুকু উন্নতি করিতেছেন।

আত্মসংস্কার করিতে গেলে লোকে যে পদে পদে বাধা পায়, তাহা

বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। মানুষের সাধারণ অবস্থা দেখিলে সহসা যেন বোধ হয়, পাপ ও অপবিত্রতা রাক্ষসীর বেশ ধারণ করিয়া মানব সমাজকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে—মনুষ্য জাতির গৌরব রক্ষা করিতে, মানব জীবনের গভীর দায়ীত্ব অনুভব করিয়া তৎসাধনে সমর্থ হইতে আমরা মানব জীবনে যে সকল সংগ্রাম দেখিতে পাই এবং যে সকল কারণে সেই সকল সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে কাম ক্রোধ লোভাদি রিপু নিচয়ের প্রদত্ত বাধাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আত্মসংস্কার করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে সেই সকল রিপু সংস্কার আবশ্যক। রিপু সংস্কার না হইলে মানব জীবন সংস্কৃত হইতে পারে না। তোমার রিপু সমূহ যদি তোমার বশে না আসিল, তুমি যদি তোমার এই পঞ্চভৌতিক দেহের কার্য্য কলাপের উপর তোমার আত্মার রাজত্ব স্থাপন করিয়া তোমার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলের শ্রেষ্ঠত্ব, প্রতি পাদন করিতে না পারিলে, তবে তোমার এমন কি শক্তি ও অধিকার আছে যে, তুমি সমাজের সর্ব্ববিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া জয়ী হও?

যদি দেখা যায় কলিকাতার রাজপথে কএকজন লোক একত্র হইয়া অশ্বসংযোজিত একখানি শকট স্কন্ধে বহন করিতেছে, তবে কি লোক বিস্মিত হইয়া তাহা দেখিতে আসিবে না? এবং দেখিয়া হাসিতে হাসিতে একথা কি বলিবে না যে, "লোক গুলো কি নির্ব্বোধ!" আমাদের অবস্থাও কি তদ্রূপ নহে? রিপুকুলের আশ্রয়ীভূত যে শরীর আত্মার বাহনের কার্য্য করিবে, তাহা কি আমাদের আত্মার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে না? আমাদের রিপুকুল কি আমাদের ঘাড়ে বসিয়া আমাদের পরিচালকের কার্য্য করিতেছেনা? আমাদের কিদুর্দ্দশা! অথচ এরূপ লোককেই আবার মনুষ্য সমাজ সংস্কারকের অভিনাষী হইতে দেখা যায়! এ দুঃখ, এ লজ্জা কোথায় রাখি? দুর্ব্বল মানুষ ভ্রমেও ভাবিও না যে,তোমার চেষ্টায় সমাজ সংস্কার হইতে পারে। তবে যদি হয়, সে তোমার গুণে নহে; ধর্ম্মবিহ পরম প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাতে প্রাণ মন উৎসর্গ করিলে একদিন হইতে পারে; কেন না সে শুভদিনে তোমার মানবীয় দুর্ব্বলতা চলিয়া যাইবে।

"আমরা রিপু পরিচারিকা দল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে সব সেবার আয়োজন;

ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে
তব প্রেম আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম ॥”

সরল প্রাণে ব্যাকুল হৃদয়ে যদি একথা বলিতে পার, হৃদয়ের সুর মিলাইয়া যদি এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিতে পার, তাহা হইলে একদিন তোমার দ্বারা একার্য্য হইলেও হইতে পারে। তোমার রিপু নিচয় ঈশ্বরের অনুগত দাস হইতেতোমাকে সহায়তা করিবে, তোমার অভিষ্ট সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হইবে, ইহাইত আত্মসংস্কারের শেষ নির্দ্দেশ।

সংসার-বুদ্ধি-প্রণোদিত-বিচারবাদী লোকে বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণকে পাগল ও তাঁহাদের উক্তি সকলকে প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকে! কিন্তু এই চিরগতিশীল মানব সমাজের সংস্কার কার্য্যে যাঁহারা হস্ত ক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামাবলী স্মরণ করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে মানব-কুল গৌরব সেই মহর্ষি খৃষ্টকেই মনে পড়ে। যাহারা তাঁহার প্রাণ বধ করিল, তাহাদের অজ্ঞতাস্মরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন,—

“Father forgive them, because they do not know what they do.” “পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর; কারণ ইহারা জানে না যে ইহারাকি করিতেছে।” এই ঊনবিংশশতাব্দীর শেষভাগে, মানব বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিস্তৃতরূপ বিকাশের দিনে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর যে, এমন মহাবাক্য অতি অল্প লোকেই বলিতে পারিয়াছে। এইরূপ বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতির দেব-চরিত্রের আভাপূর্ণ জীবনাবলী আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে যে, আত্ম-সংযম ভিন্ন মানুষ পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না। অগঠিত ও অসম্পন্ন জীবন লইয়া লোক-সমাজের কার্য্যে যাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, পরিশেষে সমূলে উৎপাটিত হইয়া বিস্মৃতির গভীর জলে নিমগ্ন হইয়াছেন।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রমশুদ্ধি—গীতসূত্রসারের সমালোচনাতে—১২০ পৃষ্ঠা, ২৪ পংক্তিতে “কিন্তু” শব্দের পরে “শ্রুতি যখন টিকিলনা, তখনত দেখিতেছি, “অতি” মহাশয়েরা নিতান্তই মাঠে মারা যাইতেছেন” বসিবে

ব্রহ্মচর্য্য।

আতপ-তাপিত পথিকের শীতল বায়ু-সেবিত-তরুচ্ছায়া স্বতঃই মনোহারী; সংসার-পীড়িত মানবের ব্রহ্মচর্য্য স্বতঃই প্রীতিপদ, মরু-মণ্ডলে কুসুম কানন, অন্ধকারে দীপালোক কাহাকে না আকর্ষণ করে? ঘর্ম্মপ্লুত, শ্রমকাতর সংসার-পীড়িত, শোক-ব্যথিত জরাজীর্ণ সংসারীকে ব্রহ্মচর্য্যের নির্ব্বাত-কম্পিত শান্তির স্বপনে সহজেই মুগ্ধ করা যায়। ছাত্র ক্রীড়া চাহে, রোগী রোচক চাহে, পাষণ্ড স্বাধীনতা চাহে; তাই বলিয়া কে বলিবে ছাত্রের পুস্তক-ভার ঘুচাইয়া দাও, রোগীর ঔষধ নিবারণ কর, কারারুদ্ধ দুর্বৃত্তদিগের কারাদ্বার উন্মোচন করিয়া দাও? যাহার যাহা নাই; সে তাহাই চাহে; ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হইতে চাহে, গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্যের গুণ গান করে। সুতরাং দৃশ্য-সুন্দর রূপের কমনীয়তা উপেক্ষা করিয়া অন্য কারণে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর, পরীক্ষা করিতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ড প্রধান বৈদিক যুগ অতীত হইলে লোকে জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করিয়াছিল। ঘাতের পর প্রতিঘাত, বিস্ফারণের পর সঙ্কোচন—স্বাভাবিক নিয়ম। বৈদিক যুগের কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কর্ম্মশূন্যতা। বৌদ্ধগণ উপনিষদের অনুসরণ করিয়া জ্ঞান-চর্চ্চা, অবিদ্যা বিনাশ স্বর্গ বা পরমপদ লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া ঘোষণা করেন। ধ্যান ধারণা সমাধি, নিবৃত্তি জ্ঞানের অবলম্বন, প্রবৃত্তি জ্ঞান বিরোধী, “নিবৃত্তশ্চ মহাফলা” ব্রহ্মচর্য্য এই সময়ে সহস্র মুখে কীর্ত্তিত হয়। এই সময়েই সর্ব্ব প্রথম সংসারী ও বৈরাগী; গৃহস্থ ও ভিক্ষু দুই বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়; এই সময়ে জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্ম নিকৃষ্ট; ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য হীনতর বলিয়া ব্রহ্মচারীগণ—জ্ঞানান্বেষীগণ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীতে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, প্রবৃত্তি-পরাহত ভণ্ড ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীগণ সমাজ ছার খার করিতে লাগিল। জ্ঞান মার্গের অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হইল। তখন লোকে অন্য পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এই সময়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া একটা রফা বন্দোবস্তের চেষ্টা হয়। জ্ঞান কর্ম্মের সহকারী, জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্ম সুষ্ঠু রূপে নির্ব্বাহ হয় না; একথা কে অস্বীকার করিবে? অপর পক্ষে কর্ম্মও জ্ঞানের সহকারী কে না জানে? কর্ম্মে পড়িয়া ঠেকিয়া শিখিয়া যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহার মূল্য অসামান্য, পুস্তক-সংগৃহীত বা গুরু-মুখ-লব্ধ জ্ঞান তাহার তুলনীয় নহে; দূরদর্শন সংসারেই পাওয়া যায়, কর্ম্ম সঞ্জাত জ্ঞান দৃঢ়মুষ্টি ও স্ফীতপ্রাণ, সহজে পরাহত হইবার নহে। এইরূপে কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহার সহিত ব্রহ্মচারীর নিবৃত্তি পরায়ণতার মিশ খাওয়াইয়া গৃহস্থ-ব্রহ্মচারী বৈরাগী-সংসারী সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি চাই, ব্রহ্মচারীর শান্তি চাই, পাশ্চাত্য কর্ম্ম-শীলতা ও প্রাচ্য শান্তি-শীলতা উভয়কে সমাবেশিত করিয়া কর্ম্ম-কর্ত্তব্যতার ঘোষণা এই সময়ে হয়। এই অবধি ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ভিন্ন হইয়া পড়ে। সংসারীকে সকল কার্য্য করিতে হইবে, বিবাহ করিতে হইবে, পুত্রোৎপাদন করিতে হইবে,বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে, অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রীতিকলহ প্রতিযোগিতা যজ্ঞ তপ দান সকলই করিতে হইবে,তবে কিনা ব্রহ্মচারীর ন্যায় করিতে হইবে। অর্থাৎ বাসনা সংযত করিয়া কর্ত্তব্য বলিয়া ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা বা আশঙ্কা না করিয়া সকলই করিতে হইবে। ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের এই অর্থ বৌদ্ধযুগের পরে পৌরাণিক সময়ে নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রহ্মচর্য্যের এই অর্থ গীতা ও পুরাণাদিতে বিবৃত হইয়াছে। এই গার্হস্থ্য ব্রহ্মচর্য্যে, যোগসন্ন্যাস, সন্ন্যাসী ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতর। এ প্রকার গার্হস্থ্য ব্রত পরিপালন দুঃসাধ্য, এজন্য গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী উভয়েই ইহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানীগণ গৃহশূন্য ব্রহ্মচর্য্য সহজ-সাধ্য বলিয়া অবলম্বন করিতে প্রয়াসী, গৃহস্থগণ আদর্শের অপলাপ করিয়া অত্যাকাঙ্ক্ষী ফলচিন্তা-পীড়িত স্বকৃত-শৃঙ্খলবদ্ধ নীচজনসাধ্য জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। কার্য্যে যে যাহাই করুক, আদর্শের উচ্চতা শ্রেষ্ঠতা মহত্ত্ব বা পবিত্রতার আলোচনা করিলে গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় আদর্শ জীবন আর অনুমান করা যাইতে পারে না।

গৃহস্থ জীবনে মানবীয় সকল বৃত্তির যুগপৎ অনুশীলন হয়, ব্রহ্মচারীর জীবনে কেবল মনোবৃত্তির চর্চ্চা হইয়া থাকে। গৃহস্থ-জীবনে শারীরিক বৃত্তির ন্যায় মানসিক সকল বৃত্তি গুলির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, ব্রহ্মচারী-

জীবনে শারীরিক বৃত্তির ন্যায় মনোবৃত্তির অন্তর্গত দয়া দাক্ষিণ্য প্রীতি সৌজন্যাদি কমনীয় বৃত্তি গুলি উপেক্ষিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধি বৃত্তির কর্ষণ হয়; সুতরাং গৃহস্থ-জীবন সর্ব্বথা ব্রহ্মচারী জীবনের শ্রেষ্ঠতর। তবে গৃহস্থ জীবনে বৃত্তি বিশেষের অতিমাত্র চর্চ্চা হইয়া অন্য কোন বৃত্তির হীনাদর না হয়, অতিচর্চ্চা-জনিত গ্লানি হেতু বিকৃতি না জন্মে, এই কারণে ব্রহ্মচর্য্যের শাসনে গৃহস্থ-জীবন অতিবাহিত হইলে, পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের সংশোধন হইলে, মানব প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে। যে গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্য উপনিষদে একটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

"ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্যে চির কৌমার্য্য চির বৈধব্যাদি সন্ন্যাসী বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, ইহারা শারীরিক বৃত্তি ও মানসিক কমনীয় বৃত্তি গুলির স্ফুরণের প্রতিবাদী। সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কে, এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য মার্কণ্ডেয় পুরাণে রুচি সংবাদ নামক একটী সুন্দর আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে।

কমনীয় মনোবৃত্তি পরিশূন্য, নিরহঙ্কৃত অত্রস্ত, মিতশায়ী, একাহারী, যজ্ঞশূন্য, গৃহশূন্য, আশ্রমশূন্য ও আসক্তিশূন্য রুচি নামে রাজা পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে বাস করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতৃদেবতাগণ একদিন বলিয়াছিলেন "হে পুত্র, পুণ্য দারপরিগ্রহ কেন তুমি করিতেছনা, তোমার স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের বিঘ্ন ঘটিতেছে। গৃহী ব্যক্তি দেবতা,পিতৃঋষি,অতিথি ও পূজনীয়গণের সেবা করিয়া উন্নত লোক প্রাপ্ত হন। তুমি পুত্রোৎপাদন বা দেবপিতৃ সৎকার না করিয়া মূর্খতা বশতঃ সুগতি পাইবার প্রত্যাশা করিতেছ।" এই কথা শুনিয়া রুচি বলিলেন,বিবাহ দুঃখ,পাপও অধোগতির হেতু, বিবাহে মোক্ষঃ নাই, নিয়মিত আত্ম-সংযম দ্বারাই মোক্ষ লাভ ঘটিয়া থাকে, জন্ম-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মপঙ্ক বুধগণ সদ্বাসনা সলিলে ধৌত করিতে সক্ষম হন।

অনন্তর পিতৃগণ গৃহস্থ ব্রহ্মচারী জীবনের কমনীয়তা ও মহত্ত্ব এবং পক্ষান্তরে সন্ন্যাসী-জীবনের আংশিকতা প্রতিপাদন করিয়া রুচিকে গৃহস্থ ব্রহ্মচারীরূপে পরিণত করিলেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ।

মহৎ জীবনের সাক্ষ্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, অভ্যাসই আমাদের চক্ষুর আবরণ স্বরূপ। মোহ আর কিছুই নহে; অভ্যাসই আমাদের চক্ষুর সমক্ষে এক অসত্য ছায়া রাখিয়াছে, যাহার অতীত সত্যরাজ্য আমরা দেখিতে অক্ষম। যাহা ভাল, সুন্দর বা উপকারী আমরা তাহাকে সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র দেখিনা; আবার যাহা মন্দ, কুৎসিৎ বা অনিষ্টকর তাহারও প্রকৃত দোষ আমাদের ভ্রান্ত চক্ষুর সম্মুখে নীত হয় না। অভ্যাসই মোহ স্বরূপ হইয়া সত্যকে আবরণ করিয়া রাখে। এই অভ্যাসের হাত হইতে আমাদের জ্ঞান চক্ষুকে নির্ম্মুক্ত রাখা কি সম্ভব নহে? কখন কি আমরা এ মোহের আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হইব না? এ মোহ অন্ধকার কি ঘুচিবেনা? এ ভ্রান্তদৃষ্টি কি ভ্রান্ত বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে না? অভ্যাসের বলের উপর আধিপত্য কি আর কাহার নাই?

কে বলিতে পারে—নাই? কে বলিবে বিধাতা মানুষকে ক্রীড়া পুত্তলিকা করিয়া সৃজন করিয়াছেন? তাহার প্রাণে আকাঙ্খা দিয়া তাহা পূরণ করিবার সামগ্রী দেন নাই? তাহাকে স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়াও চিরপরাধীনতার সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিয়াছেন? নিষ্ঠুরের ন্যায় স্বর্গের সমুন্নত গিরিশিখর হইতে জগৎবাসী নরনারীর এই বিষম অন্তর্দ্দাহ দেখিয়া আপন ঐশ্বর্য্যের মহিমায় গর্ব্বিত ও সুখী হইতেছেন? মানুষের প্রাণে চিরনূতনের অতৃপ্ত বাসনা দিয়া কখন তিনি তাহাকে অসুখী করিবার জন্য সৃজন করেন নাই।

ইতিহাস কি?—এই মোহনিদ্রা যে ভাঙ্গে, অভ্যাসেরও উপর যে আরও অধিকতর শক্তিশালী কিছু আছে,—তাহারই সাক্ষ্য; এই মহা-সত্যের প্রমাণ স্থল। ইতিহাস যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়াছে তন্মধ্যে ইহাই একটী প্রধানতম বিষয় যে—মানুষ চিরদিনের প্রচলিত প্রথা সমূহকে দেখিয়া প্রথমে শিক্ষা করে, পরে ক্রমে কোন অজ্ঞাত শক্তির সাহায্যে তাহাদের উপরে, অনেক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দূর হইতে আপনার

দিব্য দৃষ্টিতে তাহাদিগের প্রতি তীক্ষ্নভাবে চাহিয়া দেখে এবং অবশেষে ঐ সকলের মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও নীচতা দেখিয়া পরিত্যাগ করে ও মানব-জাতিকে ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতরূপে, পরিত্যাগ করায়। ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে ইহাই স্বীকার করিতেছে যে, যুগে যুগে সময় মানবাত্মাকে নিজ-পাশে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে ও মানবাত্মা তাহার পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত আকাশপথে বিচরণ করতঃ নিজ উপাদেয় আহার্য্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সময় ও তাহার সৈন্য সমূহের সহিত ঘোরতর সমর ঘোষণা করিয়াছে। বিশাল ধরণী মাঝে একক, অসহায় অবস্থাতেও মানবসন্তান নির্ভীক হৃদয়ে এই মহা সংগ্রামে উন্মত্ত হইয়া যে নৃত্য করিয়াছে, ইতিহাস কেবল সেই নৃত্যেরই সংবাদ। সেই ঘোর সংগ্রামের শুভ পরিণামে সময়ের অনুচরেরাও পরাজিত হইয়া শেষে বিজয়ীর বিজয় পতাকারই অনুসরণ করিয়াছে, এবং আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণাভি-প্রায়ে ঐ মহাসমরের সমাচার ও আপনাদের পরাজয়ের বিবরণ জগতে ইতিহাস রূপে প্রচার করিয়াছে।

মহাত্মা গৌতম কি বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? তাঁহার অন্নপানের সঙ্গে কি তিনি "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহোচ্চ নীতিশিক্ষা ও বৈরাগ্যের বিকটমূর্ত্তির অভ্যন্তরস্থ অনন্ত সুখের বৈদ্যুতিক সঞ্চালন অনুভব করিতে পাইয়াছিলেন? তাঁহার জন্য যে তাঁহার বাসস্থানের সন্নি-কটে রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, মৃত বা সন্ন্যাসী আসিতে বা থাকিতে পাইত না! তাঁহাকে যে পিতা শুদ্ধোদন বিলাসের সুকোমল শয্যায় পরমাসুন্দরী মনোহারিণী কামিনীগণের দ্বারা নিয়ত পরিবেষ্টিত রাখিয়াছিলেন। হায়! কোন্ শক্তি রাজরাজেশ্বরকে পথের ভিখারী ফকির করিল? ঐ যে কট্ কট্ করিয়া অভ্যাসের সুদৃঢ় বন্ধন ও বিলাসের সুকোমল পট্ট রজ্জু সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল! রাজ্য ঐশ্বর্য্য, আত্মীয় স্বজন, প্রাণাধিকা গোপা ও অন্যান্য রমণীগণ—কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, স্থিরতাই নাই! অভ্যাস অহঙ্কারে স্ফীতবক্ষ ও মহাদর্পে আস্ফালন করিতেছিল, মদমত্ত মহাগজের ন্যায় শুণ্ড আন্দোলন করিয়া গৌতমের প্রাণরাজ্যে মহা প্রলয়ের ব্যাপার আনিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছিল,—হায়! কোথা হইতে গুপ্ত তীর আসিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূধরোপম গজরাজকে নিস্পন্দ জড়পিণ্ডবৎ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিল? কেবল কি তাই? আবার দেখ, সেই গূঢ়

শক্তির চরণে অভ্যাসের নেতা ও গুরু শুদ্ধোদন স্বয়ংই নমস্কার করিতেছেন! ঐ দেখ, এই মহাশক্তির অবাধ-গতিকে অভ্যাসবলের দ্বারা অবরুদ্ধ-করন বাসনার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি স্বয়ং আজ সন্তানের হস্তে দীক্ষা-লাভ করিতেছেন। দেখ, দলে দলে, সহস্র সহস্র সময়দাস অভ্যাসদাস এই মহাশক্তির সংস্পর্শে যেন সুপ্তোত্থিতবৎ উঠিতেছে, বলিতেছে, দাঁড়াইতেছে, দেশ দেশান্তরে অভ্যাসের উপরেও যে রাজা আছে তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য ধাবমান্ হইতেছে! দেখ আজ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক ঐ একটা মানুষের অভ্যাসজয়ের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছে। ইঁহারাই আপনাদের পরাজয়ের সংবাদে ইতিহাসের পত্র পরিপূর্ণ করিতেছেন।

ওদিকে আর এক জনের জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী মস্তকে ধারণ করিয়া ইতিহাস সুবর্ণ ভূষায় অনুরঞ্জিত হইয়া পশ্চিমাকাশ আলোকিত করিতেছে। ইত্রেল জাতীয়েরা যখন একদিকে ঘোর আত্মাভিমান ও জাত্যাভিমানের মদগর্ব্বে উন্নত মস্তক হইয়া এবং অপরদিকে আশান্বিত নয়নে ভবিষ্যৎ "মেসাইয়া"র দিকে চাহিয়া, অভ্যাসের কঠোর শাসনে নিজেদের মস্তক পাতিয়া দিয়া কালাতিপাত করিতেছিল,—যখন স্বাধীন জীবন যে যাপন করা যায় এই বীজ সত্যটী কেবল স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া সকলে মনে করিত এবং পাপ ও স্বেচ্ছাচারের খরস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া ফ্যারিসীয়া মজিতেছিলও ইহুদী জাতির নর নারীকেও মজাইতেছিল,—সেই প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, সেই হিমাদ্রি সদৃশ বিপুল আবর্জ্জনা স্তূপের গুরুভারের মধ্য হইতে কে ঈশারত্বের সমুদ্ধার করিল? কোন্ শক্তি এই বহু শতাব্দী সঞ্চিত পাপ ও কুসংস্কার, ভ্রম ও ভণ্ডতার গভীর তিমিরাবৃত গহ্বর হইতে এই সত্যরশ্মির প্রতিভা ঈশার আত্মার মধ্যে প্রকাশ করিল? কোন্ শক্তির বলে আবার সেই ঈশা ঐ সত্যকণিকা স্পর্শে সমুজ্জ্বল হইয়া এতাদৃশ দীপ্তিশালী হইয়া উঠিলেন যে তাঁহার কথায় কথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল? কোন্ মহা শক্তির মহিমায় চুম্বক শলাকাস্ত্র ন্যায় সেই ঐন্দ্রজালিক সত্যদণ্ড হস্তে লইয়া তিনি যাহাকে স্পর্শ করিলেন সেই অমনি বহু শতাব্দীর সঞ্চিত মরিচারাশির মধ্য হইতে সজীব হইয়া লৌহপিণ্ডবৎ উহাতে সংলগ্ন হইয়া গেল? অভ্যাস ও তাহার মোহমুগ্ধ অনুচরগণ এই নবোদিত শক্তি স্ফুলিঙ্গকে নির্ব্বাপিত করিবার জন্য বিধিমতে কতই প্রয়াস

পাইল। বলপূর্ব্বক ঈশার প্রাণদণ্ডের দ্বারা উহা চিরদিনের জন্য নিষ্প্রভ করিবার আশায় তাহাও করিয়া দেখিল। কিন্তু কৈ? জীবনে এক ছিলেন যিনি, মৃত্যুর পর দ্বাদশটী হইয়া তিনি আরও সমুজ্জল হইয়া জগৎ আলোকিত করিলেন। অবশেষে শত কোটী হৃদয়ে ঐ মহাসত্য আসন লাভ করিল! আর অভ্যাস?—মহাপরাক্রান্ত সেই বীর?—তিনি এখন জীর্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ হইয়া গলিত-মাংস পলিত-কেশ বৃদ্ধের মত পথের এক পার্শ্বে পড়িয়া হায় হায় করিতেছেন। তাঁহারই সেবায় যারা নিযুক্ত ছিল, এখন দেখি তাহারাই এই নবশক্তির জয় ঘোষণায় জগৎকে নিনাদিত করিতেছে।

আর দৃষ্টান্তের আবশ্যকতা নাই। সকলেরই সুপরিচিত এই দুইটী ঘটনা দ্বারাই আমরা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিলাম যে, অভ্যাস সর্ব্বশক্তিমান্ নহে। তাহারও উপর আধিপত্য করিতে পারে এমন শক্তি আছে, এবং ঐ শক্তি মানবাত্মার মধ্যে অবতীর্ণ হয়। উহা কি, ও কিরূপে কখন্ অবতীর্ণ হইয়া মানবাত্মার মহত্ত্ব প্রদর্শন করে, তাহা পরে বিচার করিব। এক্ষণে এই মাত্র বলিব যে, ইতিহাস এক পক্ষে বাস্তবিকই মহৎ লোক সকলের জীবন-বৃত্তান্ত; আর মহৎ লোক তাঁহারাই, যাঁহাদের জীবনে প্রথমে এই শক্তির বিকাশ হইয়া পরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা চারিদিকে অভ্যাসের ঘোরতর শাসনের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও—আজন্ম মোহের অভেদ্য তিমিরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়াও, দেশব্যাপী ভ্রম, অজ্ঞান ও কুসংস্কারের বালুকারাশির সাহারা মধ্যে প্রোথিত থাকিয়াও—এক আশ্চর্য্য শক্তির বলে সেই শাসনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন অনন্ত জীবনাকাশে সত্যজ্যোতি দেখিয়াছেন, ও তদ্দ্বারা জীবনকে আলোকময় করিয়া জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন ও অবাধে নরনারীকে আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিয়া সত্যকিরণে বিভূষিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং ঐ মহাশ্মশান সম সাহারা মরুর মধ্যেই আপনারা প্রকৃতিজননীর স্নেহে লালিত পালিত হইয়া দিগন্তব্যাপী বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষে উত্থিত হইয়াছেন এবং শাখা প্রশাখা ও উপমূলোৎপন্ন নব নব বৃক্ষাবলি দ্বারা সমগ্র মরুক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া সেই সুশীতল ছায়াতে কোটি কোটি মানবাত্মাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন এবং কালক্রমে বিভীষিকাময় মরুভূমির শুষ্ক কঠোর বালুকারাশিকেই পরম উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তবে আপনাদের অভ্যন্তরস্থ

মহাশক্তির পরিচয় দানে ক্ষান্ত হইয়াছেন;—জগতের ইতিহাস এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সেই সমস্ত ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগেরই জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী ছন্দোবন্দে সংকীর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ এই একই শ্রেণীর মহাত্মা। নানক, কবির, চৈতন্য এই একই শক্তির উপাসক। এমন কি, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের গৃহের মধ্যে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র ইহাঁরাও ঐ একই মহাশক্তির আশ্রয় লাভ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়া গেলেন। ইহাঁদের প্রত্যেক মহাত্মার জীবন এই এক সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অভ্যাস মানব জীবনের নেতা নহে। সাময়িক, কেবল মাত্র দু দশ দিনের নেতা হইলেও হইতে পারে; শিশুকে যেমন তাহার রক্ষক ভূত প্রেতের ভয়ে আকুল করে, সেইরূপ কিছু দিনের জন্য মাত্র মানুষকে নিজ জীবনের মাহাত্ম্যে বিস্মৃত রাখিতে পারে; কিন্তু চিরদিন কখনও মানবাত্মাকে মোহে ডুবাইয়া রাখিতে পারে না। স্থায়ী নেতা সে কখনই হইতে পারে না। অভ্যাস সকলকে যেমন পুরাতন করিয়া দেয়, যেমন কোন বস্তুই ইহার নিকটে নূতন হইয়া অধিক দিন থাকে না,—সেইরূপ ইহা নিজেকেও পুরাতন করিয়া ফেলে। মানুষ অভ্যাসের দাসত্বে একদিন না একদিন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইবেই হইবে। অভ্যাসের ও মোহের দাসত্বে মানবাত্মা দু দশ দিন সুখ বা আমোদ পায় বটে, কিন্তু অভ্যাসের স্বভাবসিদ্ধ গুণবশতঃ উহা নিজেই ক্রমে পুরাতন, শুষ্ক ও নীরস হইয়া আসে; তখন আর মানবের নিত্য নূতন প্রিয় প্রাণ তাহাতে সুখ পায় না, তৃপ্তি পায় না। তখনই তাহার শুভ মুহূর্ত্ত।

কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে। অদ্য আমরা এই টুকু দেখিলাম যে—অভ্যাস মানবের প্রাণে স্থায়ী অধিকার লাভে কদাচ সমর্থ হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসের কেন্দ্র স্বরূপ মহাত্মাদিগের জীবন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। আজ এইখানে বিদায় গ্রহণ করি। অনেক কথা মনে পড়িতেছে; পারিত সময়ান্তরে বলিব।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ।

সংস্কারকদিগের প্রতি।

আমরা বিগত সংখ্যাতে নব্য হিন্দুসমাজের বিবাহ-প্রথার আলোচনা করিয়াছি;—আমাদের সমাজসংস্কারকগণ দেশপ্রচলিত বিবাহ-প্রণালীর যে সকল দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সংক্ষেপে তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু সেই সংস্কারকগণ বিবাহ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ—তাঁহারা লেখাতে এবং বক্তৃতাদিতে যেরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন তদনুরূপ—হইতেছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। এবার আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিচিত্রতায় পরিপূর্ণ। এই বিচিত্রতা দ্বারা বিশ্ব-রচয়িতা ব্রহ্মাণ্ডকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন বাহ্য-জগতে এই বৈচিত্র্য, অন্তর্জ্জগতেও তেমনি ইহার ক্রীড়া দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহারা মানব চরিত্র পাঠ করিয়াছেন—যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত, তাঁহারা জানেন, কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েই বিপরীত প্রকৃতিকে ভাল বাসে; সবল দুর্ব্বলকে, দুর্ব্বল সবলকে; উগ্র অনুগ্রকে, অনুগ্র উগ্রকে; গম্ভীর অগম্ভীরকে, অগম্ভীর গম্ভীরকে;—গম্ভীরে গম্ভীরে ভালবাসা হয় না, উগ্রপ্রকৃতি উগ্রপ্রকৃতিকে ভালবাসিতে পারে না, সবলে সবলে প্রেম সঞ্চার হয় না। সমগুণ-সম্পন্ন প্রকৃতিতে সৌহার্দ্দ্য সহানুভূতি সদ্ভাব শ্রদ্ধা স্নেহ মখ্যতা জন্মিতে পারে; কিন্তু "ভালবাসা" জন্মে না। ইহা যে কেবল স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারেই দেখা যায়, এমন নহে; তাহাদের সমজাতির ব্যবহারেও এই গূঢ় রহস্যের আভাস পাওয়া যায়। রমণী কি পুরুষ সকলেই আপনাদের সমজাতীয়দিগের মধ্যেও বিপরীত গুণ-সম্পন্নকেই অধিকতর ভালবাসে। কারণ, মানবপ্রকৃতির ধর্ম্মই এই যে, যার যা আছে সে তা চায় না—তাহাতে সে তৃপ্ত থাকিতে পারে না; তাহার যা নাই তাহার প্রাণ তজ্জন্যই লালায়িত ও ব্যগ্র হয়। অনেক সময় কোন শান্ত বিনীত প্রকৃতির স্ত্রী কি পুরুষকে, তাহার বিপরীত প্রকৃতি-বিশিষ্টকে গভীরতররূপে ভালবাসিতে দেখিয়া সাধারণ লোকে অবাক্ হইয়া হাসে আর বলে—এ লোকটা কি অন্ধ, মোহে কি মুহ্যমান! তাহারা সাধারণ বন্ধুত্ব ও প্রকৃত ভালবাসার পার্থক্য বুঝিতে পারে না,—মর্ম্মগ্রহণে

অসমর্থ হইয়া কত কথা বলে। কিন্তু ভাবুক সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার বিচিত্র লীলা দেখিয়া মোহিত হন।

ইহাত সচরাচর দেখিতেছি, কত লোকের সহিত আজীবন বাস করিতেছি, অথচ তাহাদের সহিত তেমন টুকু হইল না; জানি, তাঁহারা আমার বিপদে সহায়, সম্পদে সুহৃদ্, শোকে দুঃখে সান্ত্বনাদাতা, জীবন ভরিয়া তাঁহাদের উপকার ও স্নেহ মমতার ঋণ শোধিতে পারিব না;—অথচ প্রাণ ভরিয়া তেমন করিয়া তাঁহাদিগের কাহাকেও ভালবাসিতে পারিলাম না। আর একজনের সহিত কি মাহেন্দ্র ক্ষণে চারি চক্ষুর সম্মিলন হইয়াছিল—হয়ত একটী কথাও হয় নাই—আর অজ্ঞাতসারে আমি তাহার হইয়া পড়িলাম, সে আমার হইয়া পড়িল। হয়ত এ জীবনে আর তাতে আমাতে দেখা সাক্ষাৎ হইবে না,—অথচ যে ছবি সে আমার হৃদয়ে রাখিয়া গিয়াছে, তাহা আর কিছুতেই মুছিল না,—কিছুতেই মুছিবার নয়। তার সঙ্গে যেমনটী হইয়াছিল, তেমনটী আর কারো সঙ্গেই হ'ল না। এ কি কবির কল্পনা? প্রত্যেক প্রেমিকহৃদয় কি ইহার সাক্ষী নহে? তবে অনেক দার্শনিকের কূট তর্কজালে পড়িয়া হয়ত ইহার কত পার্থিব অপার্থিব কারণ নির্ণীত হইবে; কিন্তু কারণ যাহাই নির্দ্দেশিত হউক, প্রেমিক-জগতে যে অহর্নিশি এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমাদের মনে হয়, মেঘের ন্যায় মানব-প্রাণেও তাড়িতের ক্রিয়া হয়। অল্প তাড়িতবিশিষ্ট মেঘ অধিকতর তাড়িত-বিশিষ্ট মেঘের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে তাড়িতের সমতা রক্ষার্থ যেমন বিদ্যুৎ খেলে—যেমন দুইটী বিপরীত গুণ বিশিষ্ট তাড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তেমনি দুটী বিপরীত গুণবিশিষ্ট আত্মা পরস্পর সম্মুখীন হইলে, চোখে চোখে দৃষ্টিপাত হইলেই তাড়িতের ক্রিয়া হয়—প্রাণে প্রাণে বিদ্যুৎ খেলে, হৃদয় বিনিময় হয়। পবিত্র ও নিস্বার্থ ভাবে যদি কোন স্ত্রীপুরুষে এইরূপ হৃদয় বিনিময় হয়, তবে তাহা মণিকাঞ্চনের যোগ—সোণায় সোহাগা সদৃশ। অবিবাহিত ব্যক্তি পুরুষই হউন আর স্ত্রীই হউন, যতক্ষণ তিনি জগতে একেলা, ততক্ষণ তিনি পূর্ণ মানুষ নহেন। স্ত্রী পুরুষেতে, পুরুষ স্ত্রীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন। পুরুষে যাহা আছে স্ত্রীতে তাহা নাই, আবার স্ত্রীতে যাহা আছে পুরুষে তাহা নাই। যে পুরুষ স্ত্রীর সম্মিলনে—হৃদয় বিনিময়ে—এই অভাবত্মকের অভাবত্ব দূর হয়, তাহাই বিবাহ নামের বাচ্য। পতি

পত্নীর স্বাতন্ত্র্য বিলোপ বা একে অন্যে জলে যেমন জল মিশে তদ্রূপ মিলিয়া মিশিয়া যাওয়ার নাম বিবাহ নহে। মানুষের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য, অমরত্ব উপার্জ্জনের নিমিত্ত উভয় আত্মার যে স্বাভাবিক স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্মিলন, অন্য কথায় যে যোগে তাহাদের হৃদয়-নিহিত বৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ বিকাশ হয় বা বিকাশের সহায়তা করে, তাহারই নাম বিবাহ। এরূপ আদর্শ দম্পতী জগতে বিরল। কিন্তু বিরল বলিয়া আমরা তাহার পথ প্রশস্ত করিতে উদাসীন হইব না। আমাদের সংস্কারকগণের বর্ত্তমান বিবাহ-প্রণালী তাহার কতদূর অনুকূল ও নিকটবর্ত্তী এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

দেশ-প্রচলিত বিবাহের প্রধান দোষ, বিবাহে পাত্র পাত্রীর কোন হাত নাই;—আমাদের সংস্কারকদিগের বিবাহ-প্রথায় তাহা আছে কি? একেবারে যে নাই, একথা বল্‌বার যো নাই। কিন্তু যাহা আছে, তাহা প্রায় না থাকার মধ্যে। হিন্দু-সমাজে যখন বিবাহ হয়, তখন পাত্রীর বয়স ১২ বৎসর অতিক্রম করিতে বড় দেখা যায় না—আজ কাল পাত্রের বয়স একটু বাড়িতে চলিয়াছে; দোলায় চড়িয়া বিবাহ বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক পক্ষ যখন বিবাহের মর্ম্ম গ্রহণে ও দায়িত্ব অনুভবে অসমর্থ, তখন বিবাহে পাত্র পাত্রীর হাত থাকা না থাকা উভয়ই সমান ও হাস্যজনক। তবু পাত্র পাত্রীটির রূপাদি দেখিতে ছাড়েন না! কিন্তু সুধু রূপে গুণে কি প্রেম সঞ্চার হয়?—তবে অনেকে পরম রূপবতীর প্রেমে অনুরক্ত না হইয়া কুৎসিতার প্রেমে মুগ্ধ হয় কেন? পরম পণ্ডিতকে উপেক্ষা করিয়া নিজের অপেক্ষাও নির্গুণ পুরুষে আত্ম-সমর্পণ করিতে অনেক রমণীকে দেখা যায় কেন? কেবল যে অসৎ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাহারা এরূপ করিয়া থাকে, একথা বলিলে অনেক পবিত্র প্রেমেও কলঙ্কারোপ করা হইবে। আমাদের দেশীয় সংস্কারকেরা স্বামী স্ত্রী মনোনয়নে পাত্র পাত্রীকে যে ক্ষমতা প্রদানের ভাণ করেন, তাহা কার্য্যতঃ অতি অল্পই প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থানেই অভিভাবকেরা আগে পাত্রটী ঠিক করিয়া আনিয়া পাত্রীর নিকট উপস্থিত করেন—(হিন্দু-সমাজ পাত্রী ঠিক করিয়া পাত্রের নিকট উপস্থিত করেন)—সমাজের সচ্চরিত্র দশটী অবিবাহিতের মধ্য হইতেও একটী "মনের মানুষ" বাছিয়া লইতে তাহাদিগকে অবসর বা সুযোগ দেওয়া হয় না। যদি তাঁহাদের সমাজস্থ বিশ্বস্ত সচ্চরিত্র অবিবাহিত যুবক যুবতীগণ প্রকাশ্য

স্থানাদিতে কিম্বা পরিবারাদিতে মুক্ত ভাবে পরস্পরে মিলিতে মিশিতে ও কথোপকথনাদি করিতে পারিতেন, তবে তাঁহাদের আদর্শানুযায়ী বিবাহের যেরূপ সুবিধা ও সুব্যবস্থা হইত, বর্ত্তমান প্রণালীতে যে তাহা হইতেছে না, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখনকার বিবাহ দেশ-প্রচলিত বিবাহের ন্যায় প্রায়ই আর্থিক অবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর নির্ভর করিতেছে। আর্থিক অবস্থা বা বিদ্যাবুদ্ধির উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে না, ইহা দ্বারা কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, এগুলি প্রাধান্য লাভ না করিয়া "প্রেম" সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করুক। যাহার পরিবার ভরণ পোষণের সঙ্গতি বা উপায় নাই, তাহারত বিবাহের কথা ভাবিবারই অধিকার নাই। সমাজে দরিদ্রের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, সমাজের নীতি ও পবিত্রতা তত অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। জন সংখ্যা দ্বারা সমাজের শক্তি সামর্থ্য পরিমিত না হইয়া লোকদিগের মানসিক ও নৈতিক বলের পরিমাণ দ্বারা পরিমিত হওয়া উচিত। তা না হলে মর্ম্মণদিগের মত কেবলই যে বংশবৃদ্ধির উপায় দেখিতে হয়! অবিবাহিত থাকিলে পাছে নর নারীর চরিত্র স্খলিত হয়, এই আশঙ্কায় যে সকল বিবাহ হয়, তাহা বিবাহই নহে;—নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র।

পাত্র পাত্রীর অভিমতের আবশ্যক সম্বন্ধে কি বলিব? অনেক অভিভাবক পাত্রীর চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতেই পাত্রের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। আমরা দেখিয়াছি, স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হইলে অধিকাংশ বালিকাই ১৭।১৮ বৎসর বয়সে পৌঁছানের পূর্ব্বে বিবাহের প্রকৃত ভাব ও গুরু দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয় না। কাজেই অভিভাবক ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কার নিকট তাঁহার মনোমত যে পাত্রকে আনিয়া উপস্থিত করেন, সে প্রায়শঃ তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া বসে। ১৩। ১৪ বৎসর বয়সের বালিকার আবার একটা অভিমত কি? দোষ ফোরান মাত্র। এরূপ বিবাহও ঘটকালীর বিবাহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ "মধ্যবর্ত্তি-বাদের" বিবাহের আমরা ঘোর বিরোধী।

যদি সৌভাগ্য বশতঃ কোন পরিবারে দুই চারিটী অবিবাহিতের গতি বিধি থাকে, আর সেই পরিবারস্থ কোন অবিবাহিতার সহিত তাহাদের

আলাপ পরিচয় কিম্বা সৌহার্দ্দ্য সদ্ভাব জন্মে, তাহা হইলে সেই পরিবারের অভিভাবকগণ সর্ব্বদা যেন সশঙ্কিত থাকেন, পাছে তাহাদের কাহারও সহিত সেই রমণীর ভালবাসার সঞ্চার হয়—তাহার ভালবাসার পাত্র তাঁহাদের মনোমত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত না হয়। যদি অভিভাবকেরা অবিবাহিতদিগকে পরিবারে প্রবেশাধিকার দেন, তবে তাঁহাদের প্রস্তুত থাকা উচিত যে, ইহাদের মধ্য হইতে হয়তঃ যে কোন ব্যক্তিই সেই অবিবাহিতা কর্ত্তৃক মনোনীত হইতে পারেন। যদি কাহারও সম্বন্ধে তাঁহাদের অনভিমত থাকে, তবে প্রথম হইতেই তাহার প্রবেশাধিকার একেবারে বন্ধ থাকা উচিত। নতুবা এরূপ মুক্ত ভাবে মিশিতে দিয়া তাহাদিগের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইলে, তখন তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, উভয় পক্ষেরই নৈতিক অবনতির ও সাংঘাতিক পীড়ার কারণ হইতে পারে। পরন্তু ১৪।১৫ বৎসর বয়সের কালে বালিকাদের বিবাহ হওয়াতে এই পরিচিতদিগের মধ্য হইতেও পাত্রীর তাহাকেই মনোনীত করিবার অধিকতর সম্ভাবনা, যে পাত্রের প্রস্তাব অভিভাবকদের দ্বারা তাহার নিকট উপস্থিত হয়;—যে পাত্রের সম্বন্ধে তাহার অভিভাবকদের অধিকতর সদ্ভাব আছে বলিয়া সে বুঝিতে পারে। এরূপ অবস্থায় হয়ত অনেক সময় সে তাহার মনোমত পাত্রের সম্বন্ধে তখন নির্ব্বাক্ থাকিতেও পারে এবং ইহার বিষময় ফল সময়ান্তরে ফেলিলেও ফলিতে পারে। অধিক বয়স্কা হইলে এরূপ আশঙ্কার কারণ তত থাকে না। কারণ, এত অল্প বয়সে তাহার মনের তেমন দৃঢ়তা না জন্মানেরই সম্ভাবনা যে,—সে অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। আর একটী আশঙ্কা তাহার মনে এই থাকিতে পারে যে, সে যাঁহাকে অধিকতর ভালবাসে, সে যে তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে প্রস্তুত হইবে, তৎসম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়তা কি? এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় হয়ত অনেক বালিকা আপনার হৃদয় না বুঝিয়া অভিভাবকদিগের প্রস্তাবেই সম্মতি দিতে পারে। যে শিক্ষা পাইয়া যে বয়সে সংস্কারকদের অধিকাংশ মেয়ের বিবাহ হইতেছে, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে যে, ভালবাসার খাতিরে আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া তাহারা হৃদয়ে ভালবাসার পাত্রের পূজা করিবে। রমণীর কথা দূরে থাকুক, এত শিক্ষার ভাণ করিয়া এদেশে একটী পুরুষকেও ত আজ পর্য্যন্ত ভালবাসার খাতিরে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে, শুনিতে বা দেখিতে পাইলাম না;—তবু

বরং রমণীদের মধ্যে দুই একজন থাকিলেও থাকিতে পারেন। ভালবাসার দায়ে আজীবন অবিবাহিত থাকা চুলোয় যাক্, যাহাকে এক সময় পত্নীর প্রেমে বিহ্বল দেখিয়াছিলাম, সেই পত্নীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর তাহাকেই দ্বিতীয় ক্রমে তৃতীয় চতুর্থ পত্নী পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে দেখিতেছি! অথচ ইনিই আবার সমাজের নেতা ও শীর্ষ স্থানীয়ের একজন! ইহাঁদের মুখে পুরুষ রমণীর সমান অধিকারের কথা শুনিলে অনেক সময় হাসি পায়। আজ যদি একটী রমণী এরূপভাবে এক পতির মৃত্যুর পর নিঃসন্তান অবস্থায়ও প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়া ৪।৫ বৎসর করিয়া এক এক স্বামীর সহিত সহবাসের পর ক্রমাগত ৩।৪ জন পতি গ্রহণ করেন; তবে বোধ হয় এই সংস্কারকদিগের মধ্যেও ইহাঁর স্থান হয় না;—স্থান হইলেও ইহাঁকে অন্য শত গুণ সত্বেও হয়ত সকলের হেয় ও ঘৃণাস্পদ হইয়া থাকিতে হইবে।

এখানে একটী ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। একজন সংস্কারককে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণান্তর পূর্ব্ব মৃত পত্নীর মৃত্যু তিথি উপলক্ষে শ্রাদ্ধ করিতে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, ইহাঁর বর্ত্তমান পত্নী যদি তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর—এই রমণী বিধবাবস্থায় ইহাঁকে দ্বিতীয় বার পতিত্বে বরণ করিয়াছেন—শ্রাদ্ধ করিতে বসেন, তবে ইহাঁর বর্ত্তমান স্বামী ও অন্যেরা কি মনে করিবেন? তুমি পুরুষ, যা কর তা ই শোভা পায়!" কি পুরুষ কি রমণী যদি পূর্ব্ব পত্নী কি পতির স্মৃতি ও ভালবাসা বিস্মৃত হইতে না পার, তবে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত কর কেন? হৃদয়ে একজনের প্রেম প্রীতি লইয়া আর একজনকে পত্নীত্বে কি পতিত্বে বরণ করিয়া পবিত্র সমাজকে অপবিত্র করো না—ভাবী বংশধরদিগের মাথা খেয়ো না। এরূপ বিবাহোৎপন্ন সন্তানে সমাজ কলঙ্কিত হয়, দেশের দুঃখ দুর্গতি বাড়ে। যে পরিণয়ে প্রকৃত অকৃত্রিম প্রণয় না জন্মে, তদুৎপন্ন সন্তান সন্ততি মানসিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইবেই হইবে। কোন কোন জারজ সন্তানকেও যে ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ ও প্রবল প্রতিভান্বিত হইতে দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ তাহাদের পিতামাতার প্রণয়ের প্রাবল্য ও জন্মকালীন জন্মদাতাদের মানসিক পবিত্র ভাব।

সংস্কারকেরা মতে যাহাই বলুন, কাযে যে নর নারীর সমান অধিকার দেন না, ইহাঁদের বিবাহ-পদ্ধতিতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁরা

আজও বিবাহে পাত্রীটিকে খাট, পালঙ্ক, ঘটী, বাটী প্রভৃতি তৈজস দ্রব্যের ন্যায় পাত্রের হস্তে "সম্প্রদান" করিতে ছাড়েন না। যাঁহাদিগকে স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকারদাতাদিগের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া জানি, তাঁহাদিগকেও কত বিবাহে পুরোহিতের কাজ করার কালে এই "সম্প্রদান" করিতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কাহাকেও বা "প্রাচীনতার" মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া ইহা সমর্থন করিতে দেখা যায়। যাহা প্রাচীন, তাহাই যে পালনীয় একথা তাঁহারাও মানেন না, আমরাও মানি না; তবে আর প্রাচীনতার দোহাই দিয়া এই সম্প্রদান বজায় রাখিয়া একটী স্বাধীন, বিবেকশালী প্রাণীকে নির্জ্জীব জড় পদার্থে পরিণত করা হয় কেন? তবে যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা যখন স্বাধীন বিবাহ নয়; তখন "সম্প্রদান" শব্দ প্রয়োগই অধিকতর সত্যানুমোদিত। আর যদি বল, ইহা তেমন কিছু নয়—একটী পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা বিশেষ, তবেই মানিয়া লইতেছ, শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীজাতির যে স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেন না, তোমরাও তাহাই প্রকারান্তরে স্বীকার কর। তা না হলে, পাত্রীটীর ন্যায় পাত্রটীকেও কেন তাঁহার অভিভাবক পাত্রীর করে সম্প্রদান করেন না? সংস্কারকদের কোন বিবাহেত "পাত্র-সম্প্রদান" এপর্য্যন্ত কোথাও দেখিলাম না। তাইত বলি, সংস্কারকদের বিবাহেও পাত্রকে পাত্রী নির্ব্বাচনে যতটুকু স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাঁহাদের সমাজেও পুরুষের যতটুকু অধিকার প্রদত্ত হইয়া থাকে, পাত্রীকে—রমণীকে ততটুকু স্বাধীনতা বা অধিকার দেওয়া হয় না। তাঁহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ে, আবার ঠিক প্রচলিত হিন্দু সমাজের ন্যায় রূপগুণাদি দেখিয়া অর্থ বা বিত্ত দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে পাত্র পাত্রী কিনিয়া আনা হয়। ইহা অপেক্ষা নিন্দনীয় প্রথা ও ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ আর কি হইতে পারে? আশা আছে, যাঁহারা এত কুসংস্কার ও কুপ্রথার হাত এড়াইয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা এগুলির হাতও এড়াইতে পারিবেন।

অনেকেই হয়ত মনে করিতেছেন, কেবল কুৎসা কীর্ত্তন করিবার জন্যই আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি—আমাদের নিন্দুক চক্ষু ইহাঁদের বিবাহে কোন গুণই দেখিতে পায় না। বাস্তবিক তা নয়, এদেশীয়দিগের মধ্যে যত প্রকারের বিবাহ-প্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তন্মধ্যে আমরা ইহাঁদের প্রণালীকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করি বলিয়া ইহার

উন্নতির জন্য,এত গুলি কথা বলিলাম। যাহাতে ইহাঁরা বিবাহের উচ্চ আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাঁদের বিবাহের আর কোন গুণ কেহ স্বীকার করুন আর নাই করুন, অন্ততঃ ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা দ্বারা বাল্য বিবাহের বিষময় ফল কতক পরিমাণে নিবারিত হইতেছে। সুতরাং দেশ-প্রচলিত বিবাহের ন্যায় দম্পতী যুগলের মধ্যে গাঢ় প্রণয় সঞ্চার না হওয়ার দোষ সম্পূর্ণরূপে অপরের ঘাড়ে—একমাত্র অভিভাবকদের স্কন্ধে না পড়িয়া কতকটা স্বামী স্ত্রীর নিজের উপরও পড়িতেছে; তাঁহাদের অভি-সম্পাতের ভাগী অপর কেহ হইবেনা।

প্রস্তাব বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা আর কতকগুলি কথা বলিবার ছিল। সংক্ষেপে আমরা এইমাত্র বলিয়া উপসংহার করিতেছি যে, যাহাতে যুবক যুবতীগণের পূর্ণপ্রাপ্ত বয়সে অভিভাবকদের তীব্র তত্ত্বাবধানে স্বাধীন-ভাবে পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে পর-স্পরকে বিশেষভাবে জানিয়া শুনিয়া ভালবাসা ও প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া—অন্যের ঘটকালী দ্বারা নহে—নিজে নিজে ঘটকালী করিয়া বিবাহিত হইতে পারে, তাহার পথ প্রশস্ত ও উপায় উদ্ভাবিত করা হউক। অভিভাবকগণ যেন বিবাহে মধ্যবর্ত্তী না দাঁড়ান,—যাহাতে তাঁহাদের অধীনস্থ যুবক যুবতীগণ কুসংসর্গে না যায়, অসময়ে অসতর্কভাবে যদৃচ্ছা ক্রমে, নীতিবিরুদ্ধভাবে কাহার সহিত না মিশে, কেবল মাত্র তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। তবেই তাঁহা-দের আদর্শানুযায়ী বিবাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, নতুবা বর্ত্তমান প্রণালীতে তাহা কখনই সংসিদ্ধ হইবে না।

এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদের ভ্রম প্রমাদে পড়ার খুব সম্ভাবনা। যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের ভ্রমগুলি প্রদর্শন করন, তবে আমরা সুখী হইব।

AWAKE *

1

Sons of Ind, Why sit ye idle,
Wait ye for some Dava's aid ?
Buckle to, be up and doing !
Nations by themselves are made !

2

Are ye Serfs or are ye Freemen,
Ye that grovel in the shade ?
In your own hands rest the issues !
By themselves are nations made !

3

Ye are taxed, what voice in spending
Have ye when the tax is paid ?
Up ! Protest ! Right triumphs ever !
Nations by themselves are made !

4

Yours the land lives, *all*, at stake, tho'
Not by you the cards are played ;
Are ye dumb ? Speak up and claim them !
By themselves are nations made !

5

What avail your wealth, your learning,
Empty titles, sordid trade ?
True self rule were worth them all !
Nations by themselves are made !

অনুবাদ।

১

অলস হইয়া বসি ভারত সন্তান,
সাহায্য করিছ ভিক্ষা কোন্ দেবতার ?
সাধ কার্য্য—কর সজ্জা—করহ উত্থান,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

২

তোমরা কি চিরদাস অথবা স্বাধীন—
দিশেহারা অন্ধকারে ডুবে চিরদিন ?
তোমাদের (ই) হস্তে ইহা মীমাংসার ভার,
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৩

এই যে বসেছে টেক্স, ব্যয়ের সময়
মতামত দিতে পার—আছে অধিকার ?
সত্যের সর্ব্বদা জয় জানিও নিশ্চয়,
ওঠ, কর প্রতিবাদ, ভয় কি তোমার ?
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৪

যদিও বিপদাপন্ন সমস্তই হায়
তবু দেশ তোমাদেরি, তোমাদেরি প্রাণ—
সর্ব্বস্বই তোমাদের ; ক্ষমতা কোথায়
সাধিতে অহিত কিংবা করিতে কল্যাণ ?
বোবা কি তোমরা ? সবে চাহ অধিকার;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

৫

ঐশ্বর্য্যে কি উপকার ? কোন্ প্রয়োজন
হেন শিক্ষা শূন্যোপাধি নীচ ব্যবসার ?
মূল্যবান ততোধিক স্বায়ত্ত-শাসন;
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

---

* "Old man's Hope" নামক পুস্তিকার লেখক ভারতহিতৈষণায় উদ্দীপ্ত হইয়া গ্রন্থারম্ভে যে কবিতাটী লিখিয়াছেন, তাহা এবং তাহার অনুবাদটী প্রদত্ত হইল। পাঠক-গণ সেই পুস্তিকা খানি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন, লেখক বিদেশী হইলেও এদেশীয়ের ন্যায় প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু।

6

Are ye dazed, or are ye children,
Ye, that crouch, supine, afraid ?
Will your childhood last for ever ?
By themselves are nations made !

7

Whispered murmur darkly creeping.
Hidden worms beneath the glade,
Not by such shall wrong be righted !
Nations by themselves are made !

8

Do ye suffer ? do ye feel
Degradation ? undismayed
Face and grapple with your wrongs !
By themselves are nations made !

9

Ask no help from Heaven or Hell !
In yourselves alone seek aid !
He that wills, and dares, has all ;
Nations by themselves are made !

10

Sons of Ind, be up and doing,
Let your course by none be stayed;
Lo ! the Dawn is in the East ;
By themselves are nations made !

৬

তোমরা কি অন্ধ কিংবা শিশু সমুদয়
হামাগুড়ি দেয় যারা ভয়ে নত ভীত ?
থাকিবে কি চিরকাল শৈশব সময় ?
আপনার যত্নে জাতি হয় সংগঠিত।

৭

কানাকানি আর্ত্তনাদ চলেছে আঁধারে,
হামাগুড়ি দিয়া যায় ক্ষুদ্র কীট চয়,
সাধ্য কি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে
উপত্যকা-তলে যারা লুকাইয়া রয় !
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

৮

বোঝ কি এত যে ক্লেশ সহ অবিরাম ?
অপমান অনুভব করে কি হৃদয় ?
কর অন্যায়ের সঙ্গে নির্ভয়ে সংগ্রাম,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

৯

চেয়োনা সাহায্য স্বর্গ নরকের কাছে,
আত্মার ভিতরে খোঁজ সেখানেই আছে,
যে করে সাহস ইচ্ছা সর্ব্বস্ব তাহার
সংগঠিত হয় জাতি যত্নে আপনার !

১০

ভারত-সন্তান সবে হও হে জাগ্রত,
হও কার্য্যে অগ্রসর করি প্রাণপণ,
অবাধে কার্য্যের গতি কর প্রবাহিত,
প্রাণান্তে দিওনা তাহা রোধিতে কখন।
দেখ পূর্ব্ব দিকে চেয়ে অরুণ উদয়,
আপনার যত্নে জাতি সংগঠিত হয় !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ক্রমাধ্যায়।

আসেমানি ও বারোনিয় প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যাজকেরা বলিয়া থাকেন, খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আপষ্টল থোমা ও বার্থলেময় কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু "বৌদ্ধ-বন্ধুতে" দেখান হইয়াছে যে, উপরোক্ত ধর্ম্ম যাজকদিগের বাক্য বিশ্বাস যোগ্য নহে। কোন কোন প্রামাণ্য গ্রন্থকারও ইহার প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। (1)

পুরাকালে বৌদ্ধধর্ম্ম ইউরোপে প্রচারিত হইবার পর প্রসিদ্ধ ইতালিক সমাজ স্থাপিত হয়; উক্ত সমাজের জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউ-রোপে সভ্যতার উদয় হইয়াছিল। এই নিগূঢ় সত্যটী সপ্রমাণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে সভ্যতম ইউরোপ প্রাচীন লেখকদের লেখার প্রকৃষ্ট সমালোচনা করাতে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সভ্যতা এবং উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; মনুষ্য সমাজের বহু কালের সমাবদ্ধ কুসংস্কার রাশির অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু তথাপি এখনও ইউরোপ ভ্রমে আচ্ছন্ন। অস্মদ্দেশীয় বর্ত্তমান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আমরা যেমন অসমর্থ, ইউরোপে বহু সংখ্যক মানবও তদ্দেশের বর্ত্তমান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে তেমনি অক্ষম; সুতরাং সভ্য ইউরোপে এখনও যথার্থ পুরাবৃত্তের আদর অল্প বলিলে অসঙ্গত হয় না।

ইউরোপের সত্য পুরাবৃত্ত নির্ণয় করিতে হইলে পুরোহিতগণের লেখার উপর নির্ভর করা উচিত নহে। ইউরোপের আদি সভ্য হেলেনিক জাতি। সেই হেলেনিক জাতির আদি দর্শন শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মই সেই জাতির জ্ঞান ও সভ্যতা বিকাশের এক মাত্র কারণ। "উপষ্টন্তে" পিথাগোরসের দর্শন তত্ত্বের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্লেটোর মত সম্বন্ধে যাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তাহার আলোচনা করিব।

(1) "Christianity is said to have been introduced into Hindustan in the first century, according to some accounts by the Apostle Thomas and according to others by the Apostle Bartholemew. But there is very little dependence to be placed upon these statements."

P. C. See CHRISTIANITY.

কিম্বদন্তী আছে, প্লেটো বিশেষ কোন মত জনসমাজে প্রচারিত করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার প্রবন্ধ সকলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। তাঁহার নিজের মত তিনিই স্থাপনা করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। (2)

প্লেটো ইতালিক সমাজের শিষ্য ছিলেন, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার প্রণীত ফিলেবস্, রিপব্লিকা, কেড্রস্ ও টাইমিয়স্ প্রভৃতি প্রবন্ধে এতদ্দেশীয় বৌদ্ধ দর্শনের মত সকল দৃষ্ট হয়। (3)

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা পঞ্চশীল, অষ্ট শীল এবং আরও বহুশীল পালন করিয়া থাকেন, সুতরাং স্বভাব সংশোধনই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্ম-নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান। যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, হোম সকলি শীলের অন্তর্গত। শীল পালন করিতে হইলে মনোবৃত্তি সকলকে জ্ঞানের আয়ত্ত করিতেই হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই নীতি প্লেটো-তত্ত্বে বিদ্যমান। (4)

সাংখ্য, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন তত্ত্ব-গ্রন্থে আদিষ্ট হইয়াছে যে, বাসনা পরিত্যাগ ভিন্ন আত্মার দেহ-বন্ধন উচ্ছেদ হয় না। প্লেটোও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, বাসনাকে জ্ঞানের অধীন করাই পুণ্য-সঞ্চয়ের উপায়। (5)

(2) "In fact Plato's whole system is rather critical and eclectic than dogmatical and many of his dialogues are rather reviews of the speculations of former philosophers than formal enunciations of any doctrine of his own."

P. C. See PLATO.

(3) "The highest good as is hinted in the 'Philebus' and distinctly shewn in the 'Republic' is moral virtue : this principle is the basis of man's intellectual and moral constitution ; it is his good quo man, that is, as far as he is an intellectual and moral agent."

(4) "Moral virtue, according to Plato is the subordination of man's lower faculties to his reason as the sovereign faculty."

(5) "A man is virtuous, when the will acts as the servant of the reason in controlling the appetite. When this subordination is perfect in the individual, it constitutes his rectitude, righteousness, justice or in general, his virtue or goodness ; consequently his happiness in this world. When a corresponding subordination

সাংখ্য দর্শনের "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ" একটী সূত্র আছে, ঐ সূত্রে সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল সংসার উৎপত্তির আটটী বিশেষ কারণ বা উপাদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের চারিটী সাত্বিক ধর্ম্ম উল্লেখ করিয়াছেন। (6) যথা—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য। আমরা অল্প বুদ্ধিশীল বাঙ্গালি, ইউরোপের "ক্ল্যাসিক্" সম্বন্ধে কথা কহিবার আমাদের অধিকার না থাকিলেও আমরা বিনীত ভাবে বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা সহকারে বলিতেছি যে, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বুদ্ধির চারি প্রকার ধর্ম্ম ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কোথায় প্রাপ্ত হইলেন? ইহা কি ভারতের অপহৃত সম্পত্তি নহে? (7)

সাংখ্যের আর একটী সূত্র "ত্রৈগুণ্যম্" ; শাদা কথায় সত্ত্ব, রজঃ, তম (8)। প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিবিধ গুণের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের

exists in the state, that is to say, when the guards or millitary caste, in perfect subordination to philosophic rulers, assist the reasoning and governing power in regulating and controlling the passions of the populace, the state is a perfect one. The Republic of Plato is a developement of this analogy between the ideas of the perfect man and the perfect state."

(6) "This analogy depends upon the old and well known division of virtue into the four cardinal virtues as they are called ; *viz* :—

1 Prudence or wisdom ... ... *(Phronisis)*
2 Courage, constancy or fortitude *(Andria)*
3 Temperance, discretion or self-control *(Sophrosini)*
4 Justice or righteousness ... *(Dikaiosini)*"

(7) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা একাদশ কল্প, দ্বিতীয়ভাগ, পৌষ। ১৭৬ পৃষ্ঠা।

(8) "Plato recognised three distinct principles in the soul of man.

1 Logistecon, *(Rogistecon)*
2 Theocides,
3 Epethemeticon,

The first belongs to the rational part of the soul, the two last to the irrational. These three principles correspond in our philosophical language to the reason, the will and the appetite.

The second is often rendered the iracible principle that is will.

These three principles in the soul of man Plato considers to be analogous to the three classes in the perfect state. The philosophic

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে উক্ত গুণত্রয়ের এই ব্যাখ্যা আছে যে, সত্ত্ব গুণ হইতে আনন্দ, রজোগুণ হইতে প্রসক্তি বা বন্ধন এবং তম হইতে নাশ উৎপন্ন হয়! কর্ম্মগুণে জীব ঐ তিন গুণকে আশ্রয় করে। প্লেটোর গ্রন্থে আমাদিগের দেশের মহাতত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের প্রণীত দর্শন-শাস্ত্রানুযায়ী বৃত্তান্ত কি প্রকারে সন্নিবিষ্ট হইল? ত্রৈগুণ্যের আর আর বৃত্তান্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেখুন। (9)

শ্রুতি এ দেশের অতি প্রাচীন শাস্ত্র, সেই শ্রুতির এক স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ।
যস্তু তৎপদমাপ্নোতি সংসারাঞ্চাধি গচ্ছতি।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে।" (10)

rulers represent the reason, the standing army is the will, and the populace the appetite."

(9) একাদশ কল্প, তৃতীয় ভাগ, বৈশাখ। ১৪ পৃষ্ঠা।

(10) "These idea of the three principles in the human soul and of the subordination of the two inferior faculties to the sovereign reason is most beautiful and clearly worked out in the mythus which forms a prominent part of Plato's earliest dialogue the 'Phacdrus', (P. 246 Asiqq) where the soul is compared to a charioteer (reason) driving a pair of winged studs, one of which is well bred and well trained and the other quite the contrary : the quiet horse (the will) is obedient to the rein and strives to draw its wilder yoke fellow (the appetite) along with it and to induce it to listen to the voice of the charioteer (the reason)."

যে বুদ্ধিরূপ সারথি ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বকে চালাইতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে না পারে, তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না; যেমন লৌকিক সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল দুষ্টতা করে। আর যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বকে চালাইতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব সকল বসে থাকে ইত্যাদি। (11)

ভারতের পুরাকালের অতি যত্নের জিনিস, অতি গোপনীয় ধন, গ্রীক্ পুস্তকের মধ্যে কেন? বোধ হয়, কোন কোন আসেমানি, বারোনিয় বা বেণ্টলি এ প্রশ্নের এই উত্তর করিবেন যে, উহা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ হইতে গ্রীক্ সৈন্যেরা ভারতবর্ষে আনিয়া হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্রে গুঁজিয়া রাখিয়াছিল, অথবা জোর করিয়া সংস্কৃতের মধ্যে বসাইয়া গিয়াছে!

বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই তিনের উপাসনা করেন, ও উহাকে ত্রি-মহারত্ন বলেন। (12)

ইহার পালি ব্যাখ্যা যথা—

"অবোধ বোধশ্চেতিতি বুদ্ধঃ।
চত্বারি সর্ব্বানি বুঝ্ঝ্যাতি বুদ্ধঃ॥"

যিনি অবোধ্য বিষয় বুঝিতে পারেন, যিনি চারি মহাসত্য অবগত ছিলেন, তিনিই বুদ্ধ।

"চতুর আপায়েষু ধারেতি ধর্ম্ম।"

যাহার অবলম্বনে নরক হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই ধর্ম্ম।

"আরিয়ে অষ্টাঙ্গ মার্গয়েব লোকোত্তর।"

যিনি অষ্টাঙ্গিক মার্গ দ্বারা লোকাতীত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন, তিনিই সংঘ।

উক্ত বৌদ্ধ ত্র্যয়ত্বের সহিত প্লেটো ও খৃষ্টীয় ত্র্যয়ত্বের কিরূপ সাদৃশ্য আছে, স্থানান্তরে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

(11) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। একাদশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ, ফাল্গুন। ২১৫ পৃষ্ঠা।

(12) See Plato's Trinity.

প্লেটো ইতালীয় শিষ্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ সিসিরো বলিয়াছেন যে, প্লেটো ইজিপ্ট, ইটালি এবং সিসিলি প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া পিথাগোরসের দর্শন-তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা বিজ্ঞলোকেরা বিশ্বাস করেন না। (13) বরং বিশেষ বিশেষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি ইতালিক সমাজেরই শিষ্য ছিলেন। ইহার কয়েকটী উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শিত হইল।

প্রথমতঃ তিনি ইতালিক সমাজের নিকট উক্ত তত্ত্বের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইতালিক সমাজের শিক্ষার্থীগণকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইত, প্লেটোও সেই সকল নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (*a*)

(13) "That Plato visited Egypt also stated by Cicero in a remarkable passage (D. Republic I. 10) and the story is not in itself improbable especially if we admit the truth of his journey to Cyrene, it seems however exceedingly unlikely that he resided there so long as thirteen years, for he never speaks of Egypt like a person who was familiarly acquainted with the peculiarities of the country and his philosophy so much cultivated Alexandria in later times that be circumstancial like that which Strabo relates might easily have been fabricated on the spot. The other exaggerations with regard to Plato's travels in the East are highly absurd and can only be accounted for from the great importance attributed to his philosophy by the early christian writers and by their wish to make out that the apparent coincidences between his system and the christian revelation, were not anticipations so much as proofs of his acquaintance with some renowned with the traditions and prophecies of the East,"

"There is probably more truth in the statement that on his return from Egypt, he went to Torentum to visit or renew his acquaintance with some renowned teachers of the Pythagorian school ; he certainly did not go to Italy to learn the doctrines of this school, he might have learned nearer home, for the celebrated Pythagorian Philolous had been at Thebes (Ceciro, P, Fin. V. 29 ; Diog, Lacrt, V. III 46) and Plato shows in his earliest works that he was not unacquainted with the tenets of the Pythagorians."

(*a*) Plato applied himself to the society of Pythagorian philosophers and to the study of their system.

দ্বিতীয়তঃ তিনি মনকে মূল কারণ বলিয়া তাঁহার ফিলেবস্ গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইতালিক সমাজ উক্ত মত প্রচার করেন। (*b*)

ইতালিক সমাজানুযায়ী প্লেটোও সংখ্যা-বাদী ছিলেন। কপিল্ সূত্রকে সাংখ্য দর্শন বলা হয় কেন? বিজ্ঞ লোকেরা ইহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ইতালিক সমাজ সাংখ্যের মত অবলম্বন করিয়াছিলেন। (*c*)

বৌদ্ধেরা চারিটী মহা ভূত স্বীকার করিতেন, সেই মতটী পাশ্চাত্যে প্রচারিত হইয়াছিল, প্লেটো সেই চারিটী পদার্থকেই মহা ভূত বলিয়াছেন। (*d*)

মৃত্যুর পর আত্মা ভিন্ন দেহে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে, প্লেতো তাহা বিশ্বাস করিতেন। (*e*)

প্লেতো-তত্ত্বের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার কয়েকটা প্রমাণ আমারা দেখাইতে পারি। *

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(*b*) Plato both in the Timaeus and in the Philebus speaks distinctly of the mind as of the nature of the cause.

(*c*) Plato attached a great weight to the numerical theory of Pythagoras.

(*d*) See Plato's Works

(*e*) The migration of souls from one body to another also formed as is well known a leading feature of the Pythagorian doctrine and seems also to have been maintained by Plato.

*There is one field in which the immediate influence of Plato's philosophy has always been most specially active namely in Christian theology.

Many of the opinions which are stigmatised as heretical, may be traced to the Platonism of the early Fathers of the Church and is particularly the case with regard to the doctrine of the trinity.

"That the apparent coincidences between his system and the Christian revelation were not anticipations so much as proofs of his acquaintance with some renowned with the traditions and prophecies of the East."

ব্রহ্মতেজ।

(১)

জ্বলিছে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মতেজের প্রভায়,
অন্তরে বাহিরে প্রতি পরমাণু মাঝে ;
অনন্ত শক্তির স্রোত মহা বেগে ধায়,
সাজাইয়া প্রকৃতিরে নানা বিধ সাজে।
সেই তেজে জ্বলে রবি শশী তারাদল,
চমকে চপলা মহাবনে দাবানল।

(২)

তাহার প্রভাবে ছুটে ভীম প্রভঞ্জন,
উথলে জলধিজল গভীর গর্জ্জনে ;
ব্যোম-পথে মেঘমালা করে সঞ্চরণ
অশনি নিনাদ হয় গগনে গগনে।
বিদারি ধরণী-বক্ষ মহাদ্রুমরাজী ;
ঊর্দ্ধ শিরে উঠে পত্র ফুল ফলে সাজি।

(৩)

শূন্যে উড়ে যায় পাখি বিচিত্র বরণ,
ধরাতলে দলে দলে চরে পশুপাল ;
তটিনী নির্ঝর বহি যায় অনুক্ষণ,
ফিরে ফিরে ঋতুগণ আসে চিরকাল।
উচ্চ গিরি-শৃঙ্গ ডুবি যায় সিন্ধু-নীরে
জলধি ভেদিয়া গিরি উঠে ধীরে ধীরে।

(৪)

কেন ফুল ফুটে গাছে কেন ফল ধরে ?
কেন রবি শশী হাসে সুনীল গগনে ?
কেন ছোট ছেলে গুলি ছুটাছুটি করে,
কেন বা হিল্লোল উঠে বসন্ত পবনে ?
দেখি এক ব্রহ্মতেজ সৃষ্টির ভিতরে
পূজিত প্রকৃতি লোকে বিস্ময় অন্তরে।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

জগৎ মিথ্যা।

বেদান্ত যে বলে, "জগৎ মিথ্যা" একথার অর্থ কি? জগৎ যদি মিথ্যা হয়, 'জগৎ মিথ্যা' এই কথাও যখন জগতের অন্তর্গত, এই কথাও তবে মিথ্যা; অতএব জগৎ সত্য। আবার জগৎ যদি সত্য হয়, 'জগৎ মিথ্যা' যেহেতু এই কথাও জগতের অন্তর্গত, অতএব এই কথাও সত্য, অতএব জগৎ মিথ্যা। এইরূপে অনবস্থা দোষের এক চক্র চলিতে পারে। এই চক্রভেদ করিতে হইলে মিথ্যা শব্দের অর্থ স্থির করিতে হয়। মিথ্যা-জ্ঞান অথবা ভ্রম কাহাকে বলি? রজ্জুতে সর্প জ্ঞান, অথবা স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান; যাহা যেরূপ বস্তু নয়, তাহাকে সেইরূপ বস্তু মনে করার নাম ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান।

এই যে মাছিটি আমার সম্মুখে, আমি কি ইহাকে জানি? অথচ জানি, এই যে মনে করি, এই জ্ঞান মিথ্যা-জ্ঞান, অথবা ভ্রম। যাহা জানি না, তাহাকে জানি মনে করাতে, যে বস্তু যেরূপ নয়, তাহাকে সেইরূপ মনে করা হয়। যে জ্ঞান দ্বারা বাহ্য বস্তু জানিব, একই বস্তু সম্বন্ধে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ভেদে লোকের সেই জ্ঞানের ভেদ হয়। একই বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের বিচিত্রতা রহিয়াছে, অথচ বস্তু এক, অতএব সেই জ্ঞানের বিচিত্রতা ভ্রম বা মিথ্যা। কাহারও বস্তু-জ্ঞান, বস্তু যেরূপ সেরূপ হইতে পারে না। বাহ্য বস্তু জড়, জ্ঞান আত্মার অবস্থা, জড় এবং জ্ঞান

বিরুদ্ধ, অতএব জ্ঞান দ্বারা, বাহ্য জগৎ থাকিলেও জানা যায় না। তবে যে মনে করি, বাহ্য জগৎ নামে আমা হইতে পৃথক কিছু আছে, ইহা মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রম। জ্ঞানই আমাদের প্রত্যক্ষ, তাহার অতীত যদি জ্ঞেয় কিছু প্রত্যক্ষ কল্পনা করি, সে কল্পনা মাত্র,—এক জাগ্রৎ স্বপ্ন। জ্ঞান আমার আত্মার অবস্থা, তদ্দ্বারা আমাকেই জানিতে পারি; এই যে বাহিরে বৃক্ষটি যদি ইহা আমার জ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া না থাকে; বৃক্ষ যদি আমার ভিতরে, আমি যদি বৃক্ষের ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ না করি, আমি যদি বৃক্ষ না হই, বৃক্ষ যদি আত্মা না হয়, আমি বৃক্ষকে জানিতে পারি না, বৃক্ষ আমার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। আমি যাহা জানিয়াছি তাহা যদি বৃক্ষ হয়, তবে বৃক্ষ আমার জ্ঞান মাত্র, আত্মার অবস্থা মাত্র, বৃক্ষ আমি এক।

তবে যদি বল এই যে বৃক্ষ যখন আমি তাহাকে টানিয়া আমার কাছে আনিতে চাই, সে আসে না, এমন কি আমার প্রতিকূলে একটি শক্তি চালনা করে; অতএব বৃক্ষ যাহাই হউক আমা হইতে পৃথক একটা কিছু আছে। কিন্তু প্রতিকূল শক্তি চালনাতে বস্তুর পার্থক্য অনুমান হয় না; এই আমি পাপ চিন্তার বিরুদ্ধে সঙ্কল্প করিলাম, দেখিতে না দেখিতে এক পাপ চিন্তা আসিয়া আমাকে সঙ্কল্প ভ্রষ্ট করিল। আমি নিজে আমাকে আমার ইচ্ছামত চালাইতে পারি না, তাহাতে যদি আমা হইতে আমি ভিন্ন না হই, বৃক্ষের মধ্যেও আমা হইতে ভিন্ন কিছু কল্পনা করিবার কারণ নাই।

বৃক্ষ সম্বন্ধে যে কথা, তোমার আমার পরস্পরের সম্বন্ধেও সেই কথা। তোমার আত্মা যদি ওতপ্রোত ভাবে আমার ভিতরে প্রবেশ না করে, আমার আত্মা যদি তোমার ভিতরে প্রবেশ না করে, তুমি আমাকে জানিতে পার না, আমি তোমাকে জানিতে পারি না; তুমি যাহা জান তাহা যদি আমি হই, আমি যাহা জানি তাহা যদি তুমি হও, তবে তুমি আমার, আমি তোমার, আত্মার অবস্থা মাত্র। ঈশ্বর সম্বন্ধেও এই কথা। ঈশ্বর এবং জীব যদি এক না হয়, ঈশ্বর জীবকে এবং জীব ঈশ্বরকে জানিতে পারে না; ঈশ্বর যাহা জানেন তাহা যদি জীব হয়, জীব যাহা জানে তাহা যদি ঈশ্বর হয়েন, ঈশ্বর জীবের, জীব ঈশ্বরের আত্মার অবস্থা মাত্র। এ ভিন্ন মানুষ ধারণা করিতে পারে না। মানুষের ধারণাতে অদ্বৈত

ান ভিন্ন সত্য কিছু হইতে পারে না। দ্বৈত জ্ঞান মাত্রেই ভ্রম, মিথ্যা। ল মৃত্যুমেবাভিগচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—ভেদ জ্ঞান মাত্রেই আধ্যাক মৃত্যু। ব্রহ্মজ্ঞান সত্য, ব্রহ্মেতে জীব জড় সকলই ওতপ্রোত। জ্ঞানী ব্যক্তি যাহা কিছু দর্শন করে, ব্রহ্মজ্ঞানীও তাহাই দর্শন করে, কেবল অজ্ঞানী ব্যক্তি যে দ্বিত্ব কল্পনা করে, ব্রহ্মজ্ঞানী তাহা করে া। 'জগৎ মিথ্যা' অর্থ দ্বিত্ব-বোধ মিথ্যা। বেদান্ত এ কথা বলে না যে ব্রহ্মজ্ঞানে দৃশ্য জগতের জ্ঞান থাকে না; দৃশ্য জগৎ থাকে—অজ্ঞানীরও যেরূপ, জ্ঞানীরও সেইরূপ; কিন্তু অজ্ঞানীর ন্যায়, জ্ঞানীর বস্তুর পৃথকত্ব বোধ াকে না। "প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াং। ন কিঞ্চিদপি বষম্যমস্ত্যজ্ঞানীবিবুদ্ধয়োঃ।" পঞ্চদশী।

এক দিকে যদিও বলা যায় দ্বৈতজ্ঞান মিথ্যা, আর এক দিকে জ্ঞানকে মিথ্যা বলা কথাই বিরুদ্ধ! যষ্টিতে যষ্টিজ্ঞানও জ্ঞান, যষ্টিতে সর্প জ্ঞানও জ্ঞান; ইহার কোনটিকেই মিথ্যা বলা যায় না, হয় দুইটিকেই মিথ্যা বলিতে হয়, অথবা কোনটিই মিথ্যা নয়। স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তী এবং জাগ্রদ্দৃষ্ট হস্তী, জ্ঞানমাত্র মনে করিলে কোনটিই মিথ্যা নয়, অথবা আত্মা হইতে পৃথক কিছু মনে করিলে উভয়ই মিথ্যা। দৃশ্যজগৎ জ্ঞান মাত্র, যাহাকে ভ্রম বা মিথ্যা জ্ঞান বলা হয় তাহাও জ্ঞানই, কেবল আপেক্ষিক স্থায়িত্ব অনুসারে একটিকে সত্য, অপরটিকে মিথ্যা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানতা কোথাও নাই। জ্ঞানের অভাব—অজ্ঞান বলিতে যাহা বুঝায়,—যষ্টিতে সর্প-জ্ঞান তাহা নয়, স্বপ্ন-দৃষ্ট হস্তী তাহা নয়। অজ্ঞান এক আকাশকুসুম, যাহা কেহ কখনও ধারণা করিতে পারে না। স্থায়িত্ব ধরিলে এক-মাত্র ব্রহ্ম নিত্য, সত্য; আর সকলই মিথ্যা। বেদান্ত যখন ব্রহ্মকে অবিদ্যার আধার কল্পনা করে, কেহ মনে করিবেন না, তখন অবিদ্যা দ্বারা সেই আকাশ-কুসুম—জ্ঞানের অভাবকে লক্ষ্য করে; ভ্রম বা মিথ্যা যাহাকে বলা হয় তাহাও জ্ঞানই, সত্য ঘটনাই। যষ্টিতে যখন সর্প জ্ঞান করি, তখন সত্য সত্যই সর্প জ্ঞান করি। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের বিচিত্রতাই অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা, তাহা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; এবং ব্রহ্ম সেই বিচিত্রতারই আধার।

ভ্রম সম্বন্ধে শাস্ত্রকার সূত্র করিতেছেন "পৌর্ব্বাপর্য্যেন পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং।" ঐ যে একটি শিশু দেখিয়াছিলাম, প্রথমে তাহাকে পুতুল মনে করিয়া-

ছিলাম, পরে শিশু বলিয়া জানিলাম। পুতুল জ্ঞানও জ্ঞান, শিশু জ্ঞান জ্ঞান, অথচ পুতুল জ্ঞানকে ভ্রম বলা হয়; "পূর্ব্বজ্ঞানের সহিত পরজ্ঞানের বিরোধ হইলে পূর্ব্বজ্ঞান দুর্ব্বল," তাহাকেই ভ্রম বলা হয়। কিন্তু যেমন পুতুল জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া শিশুজ্ঞান লাভ করিলাম, কিছু দিন অন্তর সেই শিশু জ্ঞানও পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে যুবক, বৃদ্ধ ইত্যাদি জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। কালক্রমে শিশু জ্ঞানাদিও, তাঁহাদের আপেক্ষিক অধিকতর স্থায়িত্ব পরিত্যাগ করিলে, ভ্রম পদে বাচ্য হয়।

যাঁহারা আত্মপ্রত্যয়কে দ্বৈতবাদের ভিত্তি করেন, তাঁহারা আত্ম-প্রত্যয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা করেন না। আত্মপ্রত্যয় জ্ঞানের বিচিত্রতা মাত্র প্রতিপন্ন করে। আত্মপ্রত্যয় দ্বারা আমি এইমাত্র জানি যে, আমার একটী বৃক্ষজ্ঞান বা ব্যক্তিজ্ঞান হইয়াছে; কিন্তু আমার জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, জ্ঞাতার বাহিরে, বৃক্ষ বা ব্যক্তি কি, আত্মপ্রত্যয় বলিতে পারে না, বলে না। আত্ম-প্রত্যয় দ্বারা আমার জীব এবং ঈশ্বর **জ্ঞানেরই** ভেদ হয়; কিন্তু ব্যক্তির ভেদ হয় না। বরং আত্মপ্রত্যয় জীব সকল পরস্পরের, এবং জীবব্রহ্মের, বস্তু-গত অভেদই প্রতিপন্ন করে। আত্মপ্রত্যয় বলে আমার আত্মা যদি তোমার আত্মা না হয়, যদি বৃক্ষ না হয়, যদি ঈশ্বরের আত্মা না হয়, তবে আমাতে তোমাতে, আমাতে বৃক্ষেতে, আমাতে ঈশ্বরেতে ওতপ্রোত ভাব হইল না। আমার বাহিরে তুমি রহিলে, বৃক্ষ রহিল, ঈশ্বর রহিলেন। অতএব আমি তোমাকে, বৃক্ষকে, অথবা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। আবার আত্মপ্রত্যয় বলে, আমি তোমাকে, বৃক্ষকে, এবং ঈশ্বরকে জানিতে পারি। এই দুই আত্মপ্রত্যয়ের বিরোধ হইতে পারে না। তাহাও আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ। অতএব আমার আত্মাই তোমার আত্মা, বৃক্ষ এবং ঈশ্বরের আত্মা; তোমাতে, আমাতে, বৃক্ষেতে এবং ঈশ্বরেতে ওতপ্রেতে ভাব; আমার বাহিরে তুমি নাই, আমার বাহিরে বৃক্ষ নাই, আমার বাহিরে ঈশ্বর নাই। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে এবং তাহার ভাষ্যে স্বপ্ন ও জাগ্রতাবস্থার যে তুলনা করা হইয়াছে, তাহার সারাংশ এ কালের উপযোগী; কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন সহ এ স্থলে উদ্ধৃত করাযাইতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। স্বপ্ন পূর্ব্বে কি জাগ্রৎ পূর্ব্বে আমরা জানি না, দিন পূর্ব্বে কি রাত পূর্ব্বে কে বলিবে? স্বপ্নের পর জাগ্রৎ, জাগ্রতের পর স্বপ্ন, দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। কোন্‌টী

র্ব্ববর্ত্তী ঠিক না করিতে পারিলে, একটীকে আর একটীর কারণ বলা যায় । বরং স্বপ্নকে জাগ্রতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলে বলা যায়। মনের কার্য্য র্ব্বে আরম্ভ না হইলে বাহ্যজ্ঞান কে লাভ করিবে? যখন বাহ্যজ্ঞান আরম্ভ য় নাই, তখন মনের ক্রিয়া স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। প্নে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায়—কি বাহ্য ঘটাদি কি মানস সুখাদি, ণ্ডিতেরা সে সকলকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই হইতে ারে, স্বপ্নে যাহা কিছু দেখা যায় এই শরীরের মধ্যেই দেখা যায়; পর্ব্বত হস্ত্যাদিও শরীরের মধ্যেই দেখা যায়, শরীরের বাহিরে দেখিতে হয় । অথচ দর্শন-স্নায়ু দূরে থাকুক, সমস্ত শরীরেও হস্তী কি পর্ব্বতের স্থান য় না।

যদি বল শরীরের ভিতরে কেন পর্ব্বতাদি দেখিতে হইবে;—এই যে আমি কলিকাতায় শুইয়া বিলাতে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। দেহের বাহিরে স্থানান্তরে যাইয়া কেহ স্বপ্ন দেখে, এ কথা বলা যায় না। এই তুমি শুইলে, আর ক্ষণকাল মধ্যে শত যোজনান্তর স্থান স্বপ্নে দেখিতে াগিলে, সেখানে যাইতে হইলে হয়ত মাসাধিক কাল লাগিত। আর তুমি মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিলে! জাগিয়া তুমি নিজকে স্বপ্ন-দৃষ্ট স্থানে দেখ না, কলিকাতার দাস্যবৃত্তিতেই তোমাকে জাগিতে হয়। তুমি রাত্রিতে শুইয়া দিবালোক স্বপ্নে দেখিলে, স্বপ্নে বহু লোকের সহিত তোমার আলাপ হইল, জাগিয়া জানিলে যে তাহারা তোমাকে তখন দেখে নাই। অতএব স্বপ্নকালে দেহের বাহিরে কোথাও যাওয়া হয় নাই। শরীর ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যস্থিত নাড়ী আরও কত ক্ষুদ্র, সেই অতি সূক্ষ্ম নাড়ীর মধ্যে পর্ব্বতাদি কিরূপে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে? এইরূপে উপযুক্ত দেশকালের অভাবে স্বপ্নদৃশ্য বস্তু সকলকে মিথ্যা বলা হয়। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট এবং জাগ্রদ্দৃষ্ট এই উভয় বস্তুর মধ্যে দৃশ্যত্ব সাধারণ, যাহা কিছু দেখা যাইবে, তাহার সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের যোগ না হইলে দেখা যাইতে পারে না; যোগ হইতে হইলে সেই বস্তুকে শরীরের মধ্যবর্ত্তী দর্শন-স্নায়ুতে প্রবেশ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র স্নায়ু দ্বারা পর্ব্বতাকার স্থানকে পরিবেষ্টন করিতে হইবে; কিন্তু তা অসম্ভব। অতএব জাগ্রদ্দৃষ্টবস্তুও স্বপ্নদৃষ্টবস্তুরই তুল্য। গ্রাহ্য-গ্রাহকভেদ স্বপ্নকালে যেরূপ, জাগ্রতাবস্থায়ও সেইরূপ। জাগ্রৎ থাকিয়া আমি, তুমি, ইহা, উহা, ইত্যাদি যেরূপ ভেদ করিয়া থাকি, স্বপ্নকালেও

সেইরূপই করি। যদি বল স্বপ্নে আহার বা পানাদি করিয়া কাহারও ক্ষুধা বা পিপাসার নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় পান আহার দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়; একথাও ঠিক্ হয় না। জাগ্রতাবস্থায় আহার করিয়াও স্বপ্নকালে নিজকে ক্ষুধিত অনুভব করা যায়। জাগ্রতাবস্থার কার্য্যে জাগ্রতাবস্থারই প্রয়োজন সাধিত হয়। স্বপ্নাবস্থার কার্য্যেও স্বপ্নকালেরই প্রয়োজন সাধিত হয়। স্বপ্নের আহার যেমন জাগ্রৎকালে অলীক, আবার জাগ্রতের আহারও স্বপ্নকালে তেমনি অলীক।

স্বপ্নে অনেক সময় এমন ব্যাপার দেখা যায়, যাহা জাগ্রতাবস্থায় কখনও দেখা যায় না। হয়ত, তুমি স্বপ্নে নিজকে অষ্টবাহু, অথবা ত্রিনেত্র হইয়া গগনপথে চলিতে দেখিতেছ, অথবা চতুর্দ্দন্ত গজারোহণ করিয়া যাইতেছে। কিন্তু অষ্টবাহুই দেখ আর দ্বিবাহুই দেখ, এই দর্শন এবং দৃশ্য দর্শকেরই মনের অবস্থা মাত্র। কোন লোক যেরূপ তাহার পরিচিত স্থানে যাইয়া সেখানের বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে, স্বপ্নদর্শকও তদ্রূপ স্বপ্নরাজ্যের বিচিত্র ব্যাপার দর্শন করিয়া জাগ্রৎ রাজ্যে প্রত্যাগমন করে।

স্বপ্নদৃষ্টবস্তু সকল মিথ্যা, কারণ স্বপ্ন দর্শনের পূর্ব্বে সে সকল ছিল না, স্বপ্নান্তে সে সব থাকে না। কিন্তু 'ছিল না,' 'থাকে না' না বলিয়া 'দেখা যায় নাই,' 'দেখা যায় না' বলাই যুক্তিসঙ্গত। তবে জাগ্রদ্দৃষ্ট ঘটপটাদি ঘটজ্ঞানের পূর্ব্বে বা পরে কি থাকে? যখন যে বস্তুর জ্ঞান হয় না, তখন সে বস্তু থাকে কি না, কে বলিবে? জ্ঞানান্তে জাগ্রদ্দৃষ্ট ঘটপটাদিও 'দেখা যায় না,' জ্ঞানের পূর্ব্বে 'দেখা যায় নাই'। অথবা ঘটনির্ম্মাণের পূর্ব্বে ঘট, ঘট ছিল না, ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘট, ঘট থাকে না; যদিও এ অর্থে জাগ্রদ্দৃষ্ট ঘট স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘট অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকক্ষণ স্থায়ী, তথাপি উভয়ই অনিত্য। যাহা আদিতেও নাই অন্তেও নাই, মাঝে তাহা থাকিলেও, না থাকারই মধ্যে। স্বপ্ন-দৃষ্টই হউক, আর জাগ্রদ্দৃষ্টই হউক, সকলই মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় ক্ষণিক, অতএব মিথ্যা। এই যে বটকণিকা এখন দেখিতেছি, কাল দেখিব ইহার অঙ্কুর হইয়াছে, কিছু দিনান্তে একটী ক্ষুদ্র গাছ হইবে, ক্রমে প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবে। এই পরিবর্ত্তন প্রতি মুহূর্ত্তে হইতেছে; এক মুহূর্ত্তে যাহা দেখিতেছ, পর মুহূর্ত্তে ঠিক তাহা দেখিতেছ না। আবার দর্শকের মনের অবস্থা ও শক্তির উপরে দৃশ্য জগতের দৃশ্যত্ব নির্ভর করে। দর্শকের মনের অবস্থা ও শক্তি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অতএব দৃশ্য

জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে। এমার্সন বলিতেছেন "কোন বস্তুকেই একবার দেখিয়া আবার দেখা যায় না।" ক্ষণিকত্ব সম্বন্ধে জাগ্রদবস্থার সহিত স্বপ্নের কোন প্রভেদ নাই।

জাগ্রৎ কালে যেমন মনঃকল্পিত এবং বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই দুই প্রকার ব্যাপার দৃষ্ট হয়, স্বপ্নকালেও তাহাই দৃষ্ট হয়। জাগ্রৎ কালে যেমন মনঃকল্পিত ব্যাপারকে (Reverie) মিথ্যা এবং বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারকে সত্য মনে করা হয়, সেইরূপ স্বপ্নকালেও মনঃকল্পিত ব্যাপারকে মিথ্যা এবং স্বাপ্নচক্ষুরাদিগ্রাহ্য বস্তুকে সত্য মনে করা হয়; কিন্তু স্বপ্ন কালের সেই মিথ্যা সত্য উভয় ব্যাপারকেই মিথ্যা বলা হয়। অতএব জাগ্রৎ কালেরও এই মনঃকল্পিত মিথ্যা এবং চক্ষুরাদিগ্রাহ্য সত্য, এই উভয় ব্যাপারকেই মিথ্যা বলিতে হইবে।

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

প্রাধান্য কাহার?

(প্রথম প্রস্তাব)

এমন দিন ছিল যখন বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির মধ্যে সাহিত্য, সভ্যতা বা সত্য ধর্ম্মভাবের প্রচার হয় নাই। তখন মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ অতি অল্পই ছিল। তখন মনুষ্যের কোন প্রকার জ্ঞান লাভ বা কৌশল শিক্ষা হয় নাই, বুদ্ধি শক্তির তেমন বিকাশ হয় নাই। প্রকৃতি-প্রস্তুত বা স্বহস্ত খোদিত গিরিগহ্বরে বা ভূগর্ভে তখন তাহার নিবাস। এমন বুদ্ধি তখনও জন্মে নাই যে, মনুষ্য আপন আবাস স্থান প্রস্তুত করিয়া লয় বা গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ বা শীতের করকা পাত হইতে আত্ম রক্ষার্থ বস্ত্র বয়ন করে। দুর্ব্বল কি প্রবলতর জন্তুর সহিত তাহাকে সমকক্ষ ভাবে বাস করিয়া তখন হয়ত দেহের অভাব মোচন বা জীবন রক্ষার্থ তাহাদের সহিত অনুদিন সংগ্রাম করিতে হইত। সে তখন তাহার রক্ত মাংস অন্বেষণে ব্যাপ্ত হিংস্র শ্বাপদ হইতে দূরে থাকিত; যাহাদিগকে বশীভূত বা হত্যা করিতে পারিত তাহাদিগেরই রক্ত মাংসে নিজ উদর পূর্ণ করিত। সেই আদিম সময় মনুষ্য জীবনের নিরাশ্রয় বাল্যাবস্থা। ধীরে ধীরে সেই অবস্থা মনুষ্যকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। শারীরিক অভাব-প্রণোদিত

হইয়া খাদ্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থা এবং কি উপায়ে দৈব দুর্বিপাক বা জীব হিংসা অতিক্রম করিতে পারে, তাহাকে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইত। জীব জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধি স্বভাবতঃ প্রখরতর; কেবল সেই বুদ্ধি বলে কালক্রমে মনুষ্য জীবরাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। প্রস্তর, বৃক্ষ শাখা বা জীবাস্থি হইতে ক্রমে তাহাকে খাদ্য উপযোগী পশু বধের জন্য অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইয়াছিল এবং যে বীজ হইতে উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে এমন বীজ সকল রোপণ করিবার জন্য অল্প অল্প ভূমি কর্ষণ করিতেও শিখিতে হইয়াছিল।

সেই আদিম কালে মনুষ্যের বাক্য কথন ভাষারও বাল্যাবস্থা; তখন তাহার ভাষার শব্দ সংখ্যা অতি অল্প, সেই অল্প কয়েকটী শব্দের সাহায্যে এবং অধিকাংশ সময়ে কেবল ইঙ্গিত দ্বারাই তাহাকে মনোভাব প্রকাশ করিতে হইত। কালক্রমে মনুষ্যজাতি যতই অল্প বা অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল, তাহার ভাষারও প্রকৃতি ততই অল্প বা বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; কালক্রমে একটী ভাষার কতকগুলি শাখা উদ্ভূত হইল। ঠিক কত দিন পূর্ব্বে সমগ্র মনুষ্য জাতি এই আদিম অবস্থায় কালাতিপাত করিয়াছে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে মনুষ্য নিবাস যে একলক্ষ বৎসরেরও অধিক কাল ভূতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছেন, হয়ত বহু লক্ষ বৎসরও হইতে পারে। পৃথিবীর পঞ্জর স্বরূপ প্রস্তর স্তরে আদিম মনুষ্যগণের চরণ চিহ্ন ও মনুষ্যাস্থির ভগ্নাংশ ভূপৃষ্ঠের এত নিম্ন ভাগে পাওয়া গিয়াছে যে, অনেক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠে যে মনুষ্যের উদয় হয়, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। নদীর জলে বা সাগর-স্রোতে যে সকল চর বা মৃত্তিকা স্তূপের উদয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে লোমস হস্তী, গুহাবাসী সিংহ ভল্লুক, ব্যাঘ্র, ও ম্যামথ নামে প্রাচীন জগতের জীব জন্তুর সহিত মনুষ্যাস্থিরও সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল জন্তু সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্যেও ভূপৃষ্ঠে দেখা যায় নাই। দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল পর্ব্বতের জন্ম, সেই সকল পর্ব্বতের অভ্যন্তরদেশে মনুষ্য কঙ্কাল ও মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত অস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে।

মন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শত্রু ও মিত্র ভাবাপন্ন দেবতার সত্তায় মনুষ্যের বিশ্বাস উদয় হয়। ক্রমে তাহা হইতে জীব জন্তু, গ্রহ, নক্ষত্র ও প্রেত পূজার আরম্ভ। প্রাচীন পারস্য জাতি ও চ্যাল্ডিয়গণ সূর্য্য ও নক্ষত্রের উপাসনা করিত। ভারতবর্ষীয় হিন্দু ধর্ম্ম চ্যাল্ডিয় ও পার্সিক দিগেরও পূর্ব্বতন বলিয়া বোধ হয়। যে আর্য্য জাতি অতি প্রাচীন কালে আসিয়ার মধ্য ভাগে বাস করিতেন, হিন্দু ধর্ম্ম তাঁহাদিগেরই উদ্ভাবিত। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য জাতি ইরাণ দেশে বাস করিতেন, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। যত দিন না অধ্যবসায়শীল ইউরোপীয়গণ বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বাস পূর্ব্বক বিশেষ পরিশ্রমের সহিত প্রাচীন হিন্দু জাতির সাহিত্য ও ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াছিলেন, তত দিন ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসূত্র ও ইতিহাস জগতে অবিদিত ছিল।

এই অনুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্স, সার গডফ্রি হিজিন্স, বার্ণোক, সার কোবর্ণ টম্‌সন্, জ্যাকুলে, গোল্ডষ্টুকার ম্যাক্সমুলার প্রধান। ইহাঁদের অনেকে বহু দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বাস করিয়া ছিলেন; সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের সহিত আলাপ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সংস্কৃত ভাষায় আর্য্যগণ আপন আপন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা শিক্ষা করিয়াছেন; তবে স্তূপাকার ভারতবর্ষীয় সাহিত্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে অধিকারী হইয়াছেন। সংস্কৃত তন্ত্র, ব্রাহ্মণ, শিক্ষা, কল্প প্রভৃতি শাস্ত্র সকল প্রাচীন য়িহুদী ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষাও বৃহদায়তন। হিন্দুদিগের ধর্ম্মভাব মহান্ গভীর, এবং য়িহুদী শাস্ত্র রচিত হইবার বা য়িহুদী জাতির জন্মগ্রহণ করিবারও বহু পূর্ব্বে রচিত। বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, মহাভারত, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি সহস্র সহস্র গ্রন্থে হিন্দুদিগের মত ও বিশ্বাস প্রকটিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের শতাংশের একাংশও অদ্যাপি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত বা ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে যোগ, আধ্যাত্মিকতা ও গুহ্য রহস্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। যদি মহান্ উচ্চ গভীর বিচিত্র কাব্য কোন ধর্ম্মে কিছুমাত্র থাকে,—হিন্দুধর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার অনেক রহস্যের তাৎপর্য্য অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই; এই জন্য অসারগ্রাহী লোকদিগের নিকট আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুধর্ম্মের সত্য লইয়া অনেক ভবিষ্যৎ ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। ইহারই আচার; লক্ষণ ও কার্য্য কলাপ অনেক ধর্ম্মাবলম্বীরা গ্রহণ করিয়াছেন।

গত অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে ত্রিমূর্ত্তি লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা এত গৌরব করিয়াছেন, তাহার অঙ্কুরও হিন্দুধর্ম্মে; কুমারীর গর্ভে দেবতার ঔরষে যে নরদেবতার জন্ম হইতে পারে হিন্দুরাই তাহা প্রথমে উদ্ভাবন করেন। ঈশ্বর মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যজাতির সুখ ও পরিত্রাণের জন্য অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, এইমত ঋক্‌বেদের পুরুষ সূক্তে প্রথম উল্লিখিত দেখা যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হিন্দুদিগের ত্রিমূর্ত্তি; ব্রহ্মা স্রষ্টা, বিষ্ণু রক্ষক ও রুদ্র প্রলয়কর্ত্তা। বিষ্ণু দশবার নরদেহে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্য সন্তানকে অনেক গুরু সত্যের উপদেশ দিয়াছেন। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। দেবকীর গর্ভে বিষ্ণুর ঔরসে কৃষ্ণরূপে অষ্টম অবতারের জন্ম। মথুরায় দুর্বৃত্ত রাজা কংশাসুর দুর্ম্মতি-প্রমোদিত হইয়া শিশুকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; দৈবপ্রাপ্ত শিশু বয়স্ক হইয়া সেইখানে আপনার মহৎ কার্য্য-সাধণের আরম্ভ করেন। সেই খানেই এক দল শিষ্য তাঁহার নিকট বিনয়, নম্রতা, ও পবিত্রতা শিক্ষা করে। শিষ্যদিগের চরণ ধৌত করিয়া এবং তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্য দ্বারা কৃষ্ণ আপন শিষ্য-প্রিয়তার উদাহরণ দেখান। কৃষ্ণের জীবন নিষ্পাপ, * তিনি অনেক অমানুষিক ক্রিয়া সাধন করিয়াছিলেন। দেবীরূপে পীড়িতের ব্যাধি মোচন করিয়াছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিকেও জীবন দান করিয়াছিলেন। বিনয় ও সদ্‌গুণে কৃষ্ণ জগদ্বিখ্যাত। তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। তাঁহার স্ত্রী-শিষ্যগণ তাঁহাকে নিজস্ব দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং হৃদয়ের প্রীতি ও ভক্তি তাঁহাকে অর্পণ করিত। অবশেষে পাপ পুরুষ ঈশ্বর সন্তানকে পরাস্ত করে; কৃষ্ণ শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া বৃক্ষে বদ্ধ ও হত হন। কৃষ্ণের ন্যায় ভারতবাসীরা অন্য কোন দেবতাকে এত ভক্তি করে না। তাঁহার বিনয়, ভদ্রতা, সৎশিক্ষা, ও সুস্বভাবের জন্য অপর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে প্রীতি করিত। খৃষ্টধর্ম্ম উদয় হইবার শত শত বৎসর † পূর্ব্বেও লোকেরা কৃষ্ণকে মুক্তিদাতা বলিয়া

* বাস্তবিকই কৃষ্ণ নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। যৌবনে গোপীগণের সহিত রহস্যলীলা বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম মতে রূপক মাত্র। যাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় গীতায় পাওয়া যায়, তিনি লম্পট, এ কি সম্ভবে? ভাগবতে কৃষ্ণ যদি লম্পট প্রমাণিত হয়েন, তবে বাইবেলে খ্রীষ্ট বড় বিশুদ্ধ নহেন! বাইবেলে Songs of Solomon এ দেখিবেন "christ's Love for his church কিরূপে লিখিত। Monier william's Hinduism P. 144 দেখুন।

† Rev. J. P. Lundy বলেন খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে কৃষ্ণ ছিলেন, ইহ নিশ্চয়;

বিশ্বাস করিত; প্যালেষ্টাইনের (পালিস্থানের) খ্রীষ্টের সহিত ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণের সৌসাদৃশ্য অদ্ভুত। এই দুই জনের মধ্যে একজন অবশ্যই নকল, তাহার সন্দেহ হইতে পারে না। হিন্দুদিগের অন্যান্য শিক্ষকদিগের মধ্যে মানবধর্ম্ম-সংহিতাকার মনু সুবিখ্যাত। রাজনৈতিক, সামাজিক কি ধর্ম্ম-নৈতিক, সকল বিষয়েরই তাঁহার আদেশ ও উপদেশ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুর সুবিবেচনা ও সুনীতিশিক্ষার উদাহরণ দিতে হইলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে। যে পুরাকালে মনুর আবির্ভাব হয়, বিবেচনা করিলে তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রকার ও শিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার জন্মকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই; সহস্র হইতে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের লোক বলিয়া তাঁহাকে অনুমান করা হয়। আমাদের বোধ হয় তাঁহাকে মিসর দেশে মোলিস, গ্রীশদেশে মাইলস, পালিস্থানে মুসা বলা হইত। প্রাচীন সময়ে এক ধর্ম্মের রীতি, নীতি, মত, ও বিশ্বাস লইয়া যে অপর ধর্ম্ম রচিত হইয়াছে, মনু তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত, তিনিই সংহিতাকারদিগের আদিপুরুষ ‡। তাঁহারই অনুকরণে অন্যান্য দেশের শাস্ত্রকারেরা কল্পিত হইয়াছেন; তিনিই আসল, আর সকলে নকল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে মনোবিকাশের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তার গভীরতা ও দর্শনের অপৌরুষেয়তা আর কোন ধর্ম্মে এত অধিক নাই; অন্য ধর্ম্মের তুলনায় ইহাই পবিত্রতর ও মহত্তর। জগতের কোন রত্নই দোষশূন্য নহে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে পুরোহিতের সংখ্যা বড় অধিক। পুরোহিতের সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে পুরোহিত হইতে পারিতেছেন ও জাতিভেদ-প্রথা প্রচলিত থাকাতে পুরোহিতেরা শ্রেষ্ঠতর জীব বলিয়া গণ্য হইতেন। এই জাতিভেদ প্রথাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের কারণ। পুরোহিতেরা ক্রমে অলস, অসার ও ব্যভিচারী হইয়া উঠেন, ক্রমে প্রতিমা পূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয় লয়। ব্রাহ্মণদিগের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব, হিন্দুজাতির—হিন্দুধর্ম্মের পবিত্রতা বিনাশের কারণ হয় এবং পবিত্রতা পুনঃস্থাপনের জন্য নূতন সংস্কারের আবশ্যক হইয়া উঠে। সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সাধারণের প্রিয় হইয়াছে; অদ্যাপি পঞ্চদশ কোটী লোক ইহাতে বিশ্বাস করে; কিন্তু কালক্রমে এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠত্বের হ্রাস হইয়াছে।

এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। পূর্ব্বে যে ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইল, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার পরে উদ্ভূত হয় এবং অনেক বিষয়ে তাহা অপেক্ষা উন্নতর। ইউরোপে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সম্বন্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম

বোধ হয় খ্রীষ্টের জন্মের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে হোমারের সময়ে ছিলেন। Monumental christianity P. 151. Asiatic Researches i. 273.

Arrian ও Strabo (৫০খ্রী পূঃ) বলেন মথুরায় কৃষ্ণ বহুকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। Monier william's বলেন খ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে দেবতা বলিয়া পূজিত হয়েন।

‡ এবিষয়ে মত ভেদ আছে Swarvadhikari's Hindu Law of Inheritance P.191-193

স্মরণেই হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। জগতের যাবতীয় প্রাচীন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক শাক্য সিংহের ন্যায় পবিত্র শিক্ষক, নির্দ্দোষ মনুষ্য জগতে আর জন্মায় নাই। ভবিষ্যৎ শিষ্য-সম্প্রদায় বৌদ্ধের জীবনী অমানুষী ঘটনায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেও; তাঁহার জীবনের অনেক প্রকৃত ঘটনা অনেক গুহ্য রহস্যে সংগুপ্ত থাকিলেও, সূর্য্য-কিরণ সঙ্গমে মায়াদেবীর গর্ভকথা সত্য না হইলেও, তাঁহার জন্ম মুহূর্ত্তে এবং জীবনকালে অসাধারণ ঘটনা ঘটিবার কথা অপ্রকৃত হইলেও বুদ্ধ নামে যে একজন মনুষ্য ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং তিনিই যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক-সমাদৃত বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভাবক সে বিষয়ে নিসংশয়। বুদ্ধ সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান এবং বাল্যকালে অতি যত্নের সহিত সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বদেশীয় প্রথানুসারে ষোড়শ বৎসর বয়ক্রম কালে কুমারী যশোধারার পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। একমাত্র পুত্র রাহুলের জন্মের পরই পিতার রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভিক্ষুবেশে যোগধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। গৃহ পরিবার শূন্য হইয়া সন্ন্যাসীবেশে ধ্যানগত থাকিয়া তাঁহার অনেক দিন কাটিয়া যায়। ধর্ম্মানুমোদিত সপ্তমার্গ অবলম্বন করা হইলে পর সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে উপাধ্যায় বলিয়া স্বীকার করে; এবং অনতি বিলম্বে দেশ বিদেশে তাঁহার যশঃ বিস্তৃত হয়। তাঁহার মত ও বিশ্বাস মহান্, তাহাতে নীচতা বা বিলাসীতার লেশমাত্র নাই। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল দমন করিয়া পরোপকার ও অন্যান্য উপকার সাধন করিতে তিনি সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি যে সুনীতির শিক্ষা দিয়াছিলেন, জগতের আর কোন শিক্ষক তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা দিতে পারেন নাই। সকলকেই ভাল বাসিতে হইবে, ইহাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উপদেশ ছিল; এবং যাহাতে শান্তি, সন্তোষ, এবং আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, তিনি শিষ্যদিগকে সেইরূপে জীবন অতিপাত করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার ধর্ম্মমতের এই চারিটী মুখ্য সূত্র—

১। জন্ম-মাত্রেই কষ্টকর, প্রাণী মাত্রেই পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল।

২। কামনা ও তদনুগ অনিষ্ট অপরিহার্য্য নহে। যত্ন করিলে নির্ব্বাণ লাভ করা যায়, তখন উভয়েরই শান্তি হয়।

৩। অকিঞ্চিৎকর এবং ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের কামনাই অনিষ্টের আকর।

৪। নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিলেই অবাধে নির্ব্বাণ পদ লাভ করা যায়।

এই চারিটী সূত্র বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ;—(১) শান্তি, (২) কারণ, (৩) পরিণাম ও (৪) পথ। নির্ব্বাণ লাভের সোপান আট;—(১) সৎবিশ্বাস, (২) সদ্বিবেচনা, (৩) সততা, (৪) সদভিপ্রায়, (৫) সৎকার্য্য, (৬) সম্মাননা, (৭) সৎস্মৃতি এবং (৮) সৎসাধন।

সর্ব্ব সাধারণকে এই পাঁচটী কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে; ১—পরহিংসা,২,—পরদ্রব্য অপহরণ,৩—পরস্ত্রী গ্রহণ,৪—মিথ্যা কথা ও ৫—মদ্যপান সেবন। বুদ্ধ ব্রহ্মচারীদিগকে এই পাঁচটী কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতেন।

—অপরাহ্নে গুরু পাক আহার ২—নৃত্যাদি বা অভিনয়ে যোগ দেওয়া, বশ ভূষায় অলঙ্কার বা সুগন্ধির আয়োজন করা, ৩—বিলাসীয় শয্যায় য়ন এবং ৫—ভিক্ষা করিতে গিয়া স্বর্ণরোপ্য গ্রহণ করা। নির্ব্বাণ-পৃহা বৌদ্ধ মাত্রেরই লক্ষ্য, নির্ব্বাণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের চরম সাধন। কামনা ও ন্দ্রিয় নিগ্রহ দমন করিয়া শান্তি লাভ করাই নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত আত্মা এমনি শান্ত যে সত্তা বা বিনয়ে প্রভেদ করিবার উপায় নাই। এই নির্ব্বাণের অর্থ সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধেরা পরকালে বিশ্বাস করে না, এটী তাঁহাদের ভ্রম। মৃত্যুর পরেও শান্তি চৈতন্য স্বরূপ আত্মার সত্তায় বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করিয়া থাকে। আত্মার অমরত্ব বৌদ্ধ-ধর্ম্মে যেমন অকিঞ্চিৎকর, ঈশ্বরের সত্তাও তেমনি,—জগতের কার্য্যকরী শক্তিই বৌদ্ধদিগের ঈশ্বর।—নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট নরপ্রকৃতি সম্পন্ন ঈশ্বরে তাহাদের বিশ্বাস নাই। বৌদ্ধের ঈশ্বর প্রকৃতি—মহানুভব, মহিয়ান্। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেই মনুষ্য বুদ্ধ হয় এবং সেই বুদ্ধই বৌদ্ধগণের উপাস্য। তিব্বতে যে সকল প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অদ্যাপি প্রচলিত আছে, হাটে ঘাটে লোকদিগকে উপাসনা করিতে দেখা যায়। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, যাহাদিগের ধর্ম্ম স্বাধীন, সীমা ও পরিমাণ শূন্য, তাহারাও জীবনকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করে। যাহা সর্ব্বথা দূরে থাকা কর্ত্তব্য, সেই মঠ ও যাজক এইখানেই বহুল প্রচলিত দেখা যায়; অধিকন্তু বৈরাগ্য, অবিবাহ তাহাদের নিত্য পালনীয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ৫০০ বৎসর পরে খৃষ্টধর্ম্ম উদয় হয়। খৃষ্টধর্ম্ম উদয়ের ৩২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষের সহিত গ্রীশ ও আসিয়া-মাইনরে সর্ব্বদা যোগাযোগে চলিত; সুতরাং বৌদ্ধদিগের নিকট হইতেই যে খৃষ্টানেরা মঠ, যাজক, ভিক্ষুনী, রীতিনীতি অনুকরণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বুদ্ধ বা বোদ্ধি সত্ত্ব অদ্যাপি সেণ্ট জোসেফাট্ নামে প্রত্যেক রোমান্ ক্যাথলিক মন্দিরে উপাসিত হইতেছেন। জেসেফাট্ নামের সহিত বোধিসৎ নামের সৌসাদৃশ্য তত অধিক দেখা যায় না, ইহার একমাত্র কারণ আরবি ভাষায় 'বে' ও 'ইয়ে' এই দুই অক্ষরের প্রভেদ কেবল একটী বিন্দুতে। যাঁহারা বৌদ্ধ দেশ দেখিয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধ ও ক্যাথলিক ধর্ম্মের সাদৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। ফরাশী পাদরি হক তিব্বৎ দেশে উপস্থিত হইয়া তত্র বৌদ্ধ মন্দিরের ক্রিয়া কলাপ দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, শয়তান তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বে তিব্বতে যাইয়া 'সৎধর্ম্মের' অর্থাৎ রোমান্ক্যাথলিক ধর্ম্মের নকল দিয়া তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। নিম্ন লিখিত কয়েকটী কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ১ শান্তভাব—আজি প্রায় তিন সহস্র কাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত রহিয়াছে, কিন্তু এক দিনের জন্যও কোন বৌদ্ধ অস্ত্রের সাহায্যে আপন মত প্রচারের চেষ্টা করে নাই। অথচ অন্য সকল ধর্ম্মাপেক্ষা ইহার শিষ্য সংখ্যা অধিক। বৌদ্ধ ধর্ম্ম নরক বা যন্ত্রণার ভয় দেখাইয়া বা বিবেক বুদ্ধি বিড়ম্বিত করিয়া কাহাকেও শ্রেণী মধ্য হইতে

পলায়ন করিতে বাধ্য করে নাই। (২) শিষ্য সংখ্যানুসারে তুলনা করিলে আর কোন ধর্ম্মের পুরোহিতের সংখ্যা এত অল্প নহে। ইহাদের পুরোহিতের সংখ্যাও অল্প, তাহাদের অধিকারও অল্প। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সাধারণতন্ত্র, ধনী কি নির্ধন সকল শিষ্যই ইহার নিকটে সমান। (৩) অন্যান্য ধর্ম্মে যে সকল কুসংস্কার, কুরীতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মে তাহা অল্পই আছে। চল্লিশ কোটী লোকের ধর্ম্ম হইয়াও বৌদ্ধ ধর্ম্ম 'গোঁড়ামির' প্রশ্রয় দেয় নাই। এক বিন্দু রক্ত পাত ইহা কর্ত্তৃক ঘটে নাই, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্বাধীনতা হরণ করিতে বা তাহাদিগকে তাড়না করিতে চেষ্টা করে নাই। অনিচ্ছা সত্বেও নরনারীকে আপন ধর্ম্ম অবলম্বন করাইতে খৃষ্টধর্ম্ম সুলভ বিধর্ম্মী তাড়নার জন্য কল কৌশল, কারাগার, চক্র, শূল, জলন্ত লৌহ শৃঙ্খল বা মুকুট কখনও ব্যবহার করে নাই। যাহারা সাহস পূর্ব্বক আপন মত ও বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে চাহিয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাহাদের মুণ্ডপাত করে নাই। যদি দৈবানুগ্রহ বা শিষ্য সংখ্যানুসারে ধর্ম্মের সত্যতা নিরূপণ করিতে হয়, তবে বৌদ্ধধর্ম্মই দেবগণের অনুমোদিত বলিতে হইবে; কারণ এই সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা আর সকল ধর্ম্মাবলম্বীর দ্বিগুণ। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা, ঈশ্বরের বিশেষ সহযোগিতায় সৃষ্ট এবং অনুগ্রহে পালিত খ্রীষ্টধর্ম্ম শিষ্যগণের তিন গুণ।

তরবারির সাহায্যে প্রভূত রক্ত পাতে যিনি উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বাধীনতা ও সাম্য নীতি স্থাপনে অগ্রসর, লোক সমাজে তিনি নিন্দনীয়। সকলের সহিত সখ্য ভাবে থাকিয়া যিনি শান্তি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসি হাসি মুখে সংসার উচ্ছেদ যাইবার নীতি প্রচারেও যত্নবান্ তিনিও লোকের প্রিয় হয়েন। আমরা এমনই ক্ষীণ-বুদ্ধি ঘন ঘটায় বিজলি দেখিলে তরাসে আকুল হই; কিন্তু রাত্র আট ঘটিকা পর্য্যন্ত পচা পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া মধুর ম্যালেরিয়া বায়ু সেবনে প্রীতি লাভ করি। যিনি যে প্রকার উপদেশ দিয়াছেন, তিনি প্রায়ই সেই প্রকার আচরণও করিয়াছেন। স্বীয় উপদেশানুসারে আচরণে কেহই অন্যাপেক্ষা হীন নহেন। এ বিষয়ে খৃষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মহম্মদ, কনফুসে সকলেই সমান। যাঁহার যেমন শিক্ষা, তাঁহার তেমন ক্রিয়া। স্বীয় মানদণ্ডে সকলেই সমান ভারি।

দোকানদারের তুলায় দোকানদারের দ্রব্য মাপিয়া লইলে চলিবে কেন? তাহা পূরা ওজনের হওয়া সম্ভব নহে। খৃষ্টধর্ম্ম কিংবা এই দরের ধর্ম্ম মনুষ্যের উপযোগী কি না, স্বাভাবিক ধর্ম্ম কিনা, একবার দেখিতে হইবে। "খৃষ্টের ধর্ম্ম শান্তির ধর্ম্ম এমন ধর্ম্ম কখনও হয় নাই, হইবেও না। ঈশ্বর স্বয়ং এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা।"—খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ ধর্ম্ম আমাদের উপযোগী ধর্ম্ম নহে, ইহার সমুদয়ই প্রাক্তন ধর্ম্ম হইতে গৃহীত, ইহাতে মৌলিকতার লেশ মাত্রও নাই; ইহাপেক্ষাও উত্তম ধর্ম্মনীতি হইতে পারে।

শাস্ত্রের বাস্তবিক অর্থ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আলোচনার দ্বিতীয় খণ্ডের ৩য় সংখ্যায় "শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ" লেখকের যে দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যে যে অংশ উত্তর দেওয়ার যোগ্য, তাহা যথাক্রমে পার্শ্বে প্রতীক রূপে উদ্ধৃত করিয়া তদুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

"শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ।"

"পণ্ডিতগণ এইরূপ বুঝেন যে অধিকারী, দেশ, কাল, পাত্রভেদে ব্যবস্থা সকল ভিন্ন ভিন্ন। নতুবা শাস্ত্র সকলকে পরস্পর বিরোধী ভাবিলে এ যাবৎ কাল ভারতবর্ষে কোন শাস্ত্রের প্রামাণ্য থাকিত না।"

(শাস্ত্রের বাস্তবিক অর্থ)

অবস্থা ভেদে বিধি নিষেধ ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু সত্য ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণাদিতে সত্য বিষয়েও যে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তা কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ না জানেন? ইহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলে একখানা বৃহৎ গ্রন্থ হইতে পারে। সম্প্রতি কেবল উপনিষদ্ হইতে দু একটী দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি,—

"জিত্বা শৈনিনির্বাগ্বৈ ব্রহ্মেতি"

(বৃহদারণ্যকে ১।১।২)

অর্থ। "জিত্বা শৈনিনির (মত ছিল) যে বাক্যই ব্রহ্ম।"

"উদঙ্কঃ শৌল্বায়ণঃ প্রাণোবৈ ব্রহ্মেতি"

(বৃহদারণ্যকে ৪।১।৩)

অর্থ। "শৌল্বায়ণ উদঙ্কের (মত ছিল) যে প্রাণই ব্রহ্ম।"

"বক্কুর্বর্ষিশ্চক্ষুর্বৈ ব্রহ্মেতি।"

(বৃহদারণ্যকে ৪।১।৪)

অর্থ। "ব্রহ্মের অপত্য বক্কু ঋষির (মত ছিল) যে চক্ষুই ব্রহ্ম।"

এইরূপ শ্রুতির ও ঋষিদিগের মতভেদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। উল্লিখিত মতভেদ ব্যবস্থা বিষয়ে নহে, কিন্তু সত্য বিষয়ে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে ব্রহ্ম—বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, হৃদয়, অন্ন প্রভৃতি হইতে পারেন না।

"প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, অধিকার, শাখা, সম্প্রদায়, সমাজ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কেবলমাত্র শাস্ত্র দ্বারা নীয়মান হইবে না। কেবল শ্রুতি, স্মৃতি ও ঋষিগণের শাস্ত্র পড়িয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব অবধারণ করিবে না।"

এখন বুঝা গেল বাদী মহাশয় কেবল শাস্ত্রের দ্বা নীয়মান হয়েন না, স্বীয় সম্প্রদায় অনুসা শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ করেন। তবে আমাদের সহি তাঁহার শাস্ত্রার্থ মীমাংসা করিবার আবশ্যক কি? আমরা কোন সম্প্রদায় বা শাখার দা নহি; যাহা সত্য তাহাই আমাদের সম্প্রদা তাহাই আমাদের শাখা। বাদী মহাশয়ের সম্প্রদায় যদি "শাস্ত্রের অন্যা অর্থ" করে, তবে তাঁহাকে মান্য করিতে হইবে, আমরা তাহা মান্য করি বাধ্য নহি। বাদী মহাশয় শাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে পোপের অনুযায়ীরা লূথরের সময়ে বাইবল সম্বন্ধেও এইরূপ আপত্তি করিত

"যদি একই বেদের অন্তর্গত কোন এক শাখার কোন ব্যক্তি সেই বেদের অন্তর্গত শাখান্তরীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে মহাপাপ হয়।"

কেন মহাপাপ হয়? বাদী মহাশয়ের যে কথা কথায় মহাপাপ! সত্যকে যিনি জানিয়াছে তিনি ধর্ম্মকে নানারূপ দেখেন না। যাঁহা বাস্তবিক ধর্ম্মকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহা দিগেরই এরূপ ভ্রম হয়; যেমন গীতাতে উ হইয়াছে—

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দনঃ
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাং"

(গীতা ২। ৪১)

অর্থ। "হে অর্জ্জুন! নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই (শ্রেয়মার্গে) একই। প্রমাণজনিত বিবেক বুদ্ধি রহিত পুরুষদিগের বুদ্ধির অনেক এবং অনন্ত শাখা।" যেমন শঙ্করাচার্য্য অব্যবসায়ীর লক্ষণ করিয়াছেন—"ইতরা বুদ্ধয়ো যাষাং শাখাভেদ প্রচার বশাৎ" অতএব বাদীর এ বিষয়ে যে বিশ্বাস তাহা অব্যবসায়ী বা অজ্ঞানীদিগের। ধর্ম্ম-তত্ত্বদর্শীদিগের এরূপ বিশ্বাস হইতে পারে না। সকলশাখা সকলসম্প্রদায় যদি সত্য ধর্ম্মাবলম্বীই হইত, তবে তাহাদিগের পরস্পর মতভেদ হইত না; অধিক কি, তাহাদিগের উৎপত্তিই হইত না।

"মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন.....তাহারই অনুসরণ করিবেক।"

"তাহারই অনুসরণ করিবেক" ইহা বাদী মহাশয়ের 'অন্যায় অর্থ'; যেহেতু মূলে এ অর্থ জ্ঞাপক শব্দ নাই।

বন্ধকার মহাশয় বলপূর্ব্বক
ার অর্থান্তর কল্পনা করি-
ছেন।"

নি গুহা শব্দে 'অন্তর'
না মানবের মন বলিয়া
ণ করিয়াছেন। কোথা
তে এই অর্থ বাহির করি
ন তিনিই জানেন।"

ম 'গুহাশয়' কি প্রকারে হইল? উপনিষদের একটী উদাহরণ এই ঃ—

"সর্ব্বাননশিরো গ্রীবঃ সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১১)

"সর্ব্বভূতের গুহাতে সেই পরমাত্মা বাস করেন।" এখানে গুহা শব্দের র্থ অন্তর ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

আপনার "শাখা পতি কুলপতি" দিগেরই বা কোন্ স্থিরতা আছে? নের তো কিছু স্থিরতাই ই।"

এবং তৈত্তিরীয় সংহিতার প্রভেদ দেখ)

আমরা হিন্দু মতে বৈদিক াখাপতি কুলপতি গৃহ্য কর্ম্মা-ষ্ঠানের মূল পুরুষগণ ভিন্ন ন্যকে মহাজন বলি না।"

যাহারা আদিকালে বেদ ও তি শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অব-ত হইয়া তদনুযায়ী শাখা ও মাজ গঠন করিয়াছেন তাঁহা-দিগকে আমরা মহাজন বলি।"

ইহার প্রমাণ কি? বাদী মহাশয় যে স্বয়ংই এরূপ করিয়াছেন, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইল।

এ অর্থ লক্ষণা দ্বারা হইল, যে হেতু ধর্ম্ম-তত্ত্ব পার্থিব গুহা বা গোপন স্থানে নিহিত হইতে পারে না। গুহার অর্থ 'অন্তর' আমার কল্পিত নহে, উপনিষদ্ ও পুরাণে ইহার অনেক উদাহরণ আছে। গুহার লাক্ষণিক অর্থ যদি 'অন্তর' না হইত, তবে বিষ্ণুর

তবে যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস প্রভৃতি কি প্রকারে করিয়াছিলেন? যাজ্ঞবল্ক্যকে যে যজুর্ব্বেদের একটি শাখার রচয়িতা। ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে। এ বিষয়ে ঋগ্বেদ হইতেও কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

ব্যক্তি ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য বিশেষ দেব কৃপায় বেদ লাভ বা প্রচার করিতে পারেন না।"

আমরা হিন্দু মতে ধর্ম্মে মহান্ ব্যক্তি মাত্রকেই মহাজন বলি।

এখানে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহার মত সত্য ও ন্যায় বিশিষ্ট?

আদিকালের তাৎপর্য্য কি? শাখা কারকদিগের পূর্ব্বে কি সৃষ্টি বা জ্ঞান ছিল না? তাঁহারা সকলেই যদি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, তবে তাঁহাদের পরস্পর মত ভেদ কেন?

"উত ত্যামে যসসাশ্বৈত নাযৈব্যংতাপাং
তৌশিজোহবধ্যে। প্রবোণপাতমপাং কৃণুধ্বং
প্রমাতরা রাস্পিনস্যায়োঃ।" (১মং ১২২ সূঃ ৪)

অর্থ। "আমি উশিজের পুত্র (হে ঋত্বিক্‌গণ!) আমার উদ্দেশে অন্ন ভক্ষক ও স্তুতি ভাজন অশ্বিদ্বয়কে জগৎ শুভ্রকারিণী ঊষার কালে আহ্বান কর। উদকের নপ্তৃ (অগ্নি দেবকে) স্তব কর এবং মাদৃশ স্তবকারী মনুষ্যের মাতৃ স্থানীয় (অহোরাত্র দেবতাকেও) স্তব কর।"

"এতেনাগ্নে ব্রহ্মণা বাবৃধস্ব শক্তী বা যত্তি চকৃমা বিদাবা।
উত প্রণেষ্যভিবশ্যো অস্মান্তসংণঃসূজ সুমত্যা বাজবত্যা॥"

(১মং ৩১ সূঃ ১৮)

অর্থ। "হে অগ্নি! এই মন্ত্র দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আমাদিগের শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে আমরা ইহা রচনা করিলাম; ইহা দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ ধন প্রদান কর এবং আমাদিগকে অন্ন যুক্ত শোভনীয় বুদ্ধি প্রদান কর।" উক্ত প্রকার অনেক বেদ মন্ত্র আছে যাহার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, "ব্যক্তি ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য বিশেষ" বেদ লাভ ও প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন বেদার্থ ব্যাখ্যাতা যাস্ক মুনিও স্বীয় নিরুক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"ঋষির্দ্দর্শনাৎ স্তোমান্ দদর্শেত্যোপ মন্যবস্ত
দ্যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্মস্বয়ম্ভ্বভ্যান র্ষত্ত
দৃষিণা মৃষিত্বমিতি" (নিং ২অং ৩ পাং ২খং)

অর্থ। "উপমন্যু বংশীয় মুনিরা বলেন যে ঋষি শব্দ দর্শন হইতে হইয়াছে, যেহেতু ঋষিরা বেদ মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন (এ বিষয়ে ব্রাহ্মণেও কথিত হইয়াছে) যে ঋষিরা যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন বেদ স্বয়ং (তাহাদের অন্তরে) উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইল, সেই জন্যই ঋষিদিগের ঋষিত্ব হইল।

"প্রত্যেক কল্পারম্ভে ব্রহ্মাই তাহা (বেদ) লাভ করেন"।

বেদে কাহাকে ব্রহ্মা বলে, বাদী মহাশয় কি তাহা জানেন? প্রত্যেক যজ্ঞে "ব্যক্তি ধর্ম্মাক্রান্ত মনুষ্য

বিশেষ" ব্রহ্মাপদ প্রাপ্ত হইতেন (শ্রৌত সূত্র এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থ দেখুন।) ব্রহ্মার পর্য্যায় শব্দ প্রজাপতি, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু বেদে প্রজাপতি বৎসর বা যজ্ঞের নাম। এবিষয়ে পশ্চাৎ আরও লেখা হইবে।

"তাঁহারা (ঋষিরা) ভ্রম প্রমাদ রহিত বিধায় তাহার সহিত কিঞ্চিৎও কল্পনার যোগ হয় না।

ঋষিরা যে ভ্রম প্রমাদ রহিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? বৈদিক ঋষিরা তো ঠিক ইহার বিপরীত বলিয়াছেন। যথাঃ—

সে (যজ্ঞ ব্রতধারী) যে জন স্পর্শ করে তার কারণ এই যে মনুষ্য মাত্রই অসত্য ভাষণ হেতু অপবিত্র।" (শত পথ ব্রাহ্মণ ১কা০ ১অ০ ১ব্রা০১)

"এ (জগৎ) দ্বিবিধ, তৃতীয় আর নাই; অর্থাৎ সত্য এবং অসত্য। দেবতারাই সত্য এবং মনুষ্য মাত্র অসত্য।"

(শত পথ ব্রাহ্মণ ১।১।১।৪)

ঋষিরা যখন মনুষ্য তখন উক্ত বেদ মন্ত্রানুসারে তাঁহারাও ভ্রম বশতঃ অসত্য ভাষণ করিতে পারেন। শুক্র ঋষি ব্রাহ্মণ, মাংস মিশ্রিত সুরা ভ্রম প্রযুক্ত পান করিয়াছিলেন, ইহা পুরাণে প্রসিদ্ধ। ঋষিরা যদি ভ্রম প্রমাদ রহিত হইতেন, তবে এ প্রকার হইত কেন? পুরাণে এ প্রকার অনেক উপাখ্যান ঋষিদিগের ভ্রম প্রমাদের নিদর্শন স্বরূপ আছে।

"বেদে কেবল যদি ব্রহ্ম-জ্ঞান বা তাঁহার অভিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম মাত্র থাকিত, তবে ভারতীয় নিম্নাধিকারীগণের কি গতি হইত?"

ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন উচ্চাধিকারীর জন্য, তেমনই নিম্নাধিকারীর জন্যও যে যত গ্রহণ বা সাধন করিতে পারিবে, তার ততই উপকার হইবে।

"সৃষ্টি ও শাস্ত্র ঈশ্বরের। ইহার মধ্যে কি সত্য কি মিথ্যা তাহা তুমি বা আমি সহসা বলিতে পারি না।"

তবে শাস্ত্র বিষয়ে আমার কৃত শাস্ত্রার্থকে অন্যায় বা মিথ্যা বলেন কেন?

"আমাদের বুদ্ধির স্থৈর্য্য নাই।"

তবে বুদ্ধির দ্বারা শাস্ত্রার্থ মীমাংসায় কেন প্রবৃত্ত হইয়াছেন?

"শাস্ত্র কিন্তু ধ্রুব। কেবল গুরুদেবের কৃপায় শাস্ত্রীয় জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, নিরুপাধিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সৃষ্টি, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা রূপ ত্রিপুটী,

শাস্ত্র কি বুদ্ধির দ্বারা বিরচিত হয় নাই? গুরুদেব বুদ্ধি বিশিষ্ট কিনা? যদি হন, তবে আপনার কথা অনুসারে তাঁহার উপদেশেরই বা স্থৈর্য্য কি প্রকারে হইতে পারে?

জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয়, গুরুদেবের কৃপায়, যদি স্বপ্নবৎ

সর্ব্ব প্রকার উপাসনা, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ণ প্রভৃতি স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া যায়।"

অলীক হইয়া যায়, তবে এরূপ কৃপা হইতে আমরা যত শীঘ্র নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। জ্ঞাতা জীবাত্মা, জ্ঞান তার সর্ব্বোচ্চ গুণ, জ্ঞেয় পরমাত্মা, এতিনটিকে অলীক করা যদি আমাদের শাস্ত্র জ্ঞানের ফল বা সর্ব্বোচ্চ আশা হয়, তবে ইহা অপেক্ষা অধিক ভ্রম আর কি হইতে পারে! মায়াবাদী সম্প্রদায়ের এ ভ্রমাত্মক মত বটে, কিন্তু ইহাঁর দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করা "শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ" করা হয়। আমি 'উপনিষৎসার' নামক পুস্তকে, মায়াবাদ যে বেদের সিদ্ধান্ত নহে, ব্রহ্মবাদ বা ব্রাহ্মধর্ম্মই বেদের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ের বিস্তর শ্রুতি প্রমাণ দিয়াছি। সেই জন্য এই স্থলে সে সকল প্রমাণের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

"বিহায় শব্দ শাস্ত্রাণি যৎসত্যং তদুপাস্যতাম্ এই বচনটিতে 'সত্য' শব্দে ব্রহ্ম, শব্দ রূপীবেদ ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনাকর।"

"সর্ব্ব শাস্ত্রাণি" "শব্দকে" 'শব্দ শাস্ত্রাণি' বাদী মহাশয় কি জন্য করিতে চান? এবচনে সত্য শব্দের অর্থ যে কেবল ব্রহ্ম, তার প্রমাণ কি? জগতে যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন সত্য নাথাকে, তবে ভাগবতে ব্রহ্মকে 'সত্যস্য সত্যং' 'সত্যস্য যোনিং' কেন বলা হইয়াছে?

"যাঁহারা দ্বেষ পূর্ব্বক শাস্ত্র অমান্য করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এইরূপ বচনকি প্রশ্রয়ের স্থল নহে?"

কেমন করে জানিলেন যে, আমরা দ্বেষ পূর্ব্বক শাস্ত্র অমান্য করি? আমরা যদি বলি আপনারা দ্বেষ পূর্ব্বক সত্যকে অমান্য করেন, একথা যেমন অযথার্থ, বাদী মহাশয়ের কথাও সেই রূপ অযথার্থ। শাস্ত্র কি আপনাদের সম্পত্তি, আমাদের সম্পত্তি বা আদরের ধন নহে? কিন্তু আপনারা ইচ্ছা পূর্ব্বক যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়কে মিথ্যা করিতে চান, তখন এবিষয়েও আপনার জ্ঞান মিথ্যা হওয়া বিচিত্র নহে।

"দ্বেষ পূর্ব্বক তাঁহারা (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞানীগণ) বেদ নিন্দা করেন না।"

তাঁহারা করেন না বটে, কিন্তু বাদী মহাশয় সত্য বেদের কেন নিন্দা করেন? এবং বিনা প্রমাণে দ্বেষ রূপ দোষ আমাদিগের ঘাড়ে মিথ্যা কেন চাপান? মনুষ্য নিন্দা কি বেদ বিরুদ্ধ এবং পাপ নহে?

"তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক বেদ ত্যাগ করেন না।"

তবে বাদীমহাশয়েরা ইচ্ছা পূর্ব্বক বেদ ত্যাগ কেন করেন? ব্রহ্মোপাসনা বা যাগ যজ্ঞাদির স্থানে অবৈদিক প্রতিমার্চ্চনাদির পোষকতা করেন কেন?

"আমাদের লেখক মহাশয় ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া, এক মাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক হইয়া বেদ নিন্দা ও নূতন আধ্যাত্মিক বেদ প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর পাইতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য!"

ইহার উত্তর বাদী মহাশয়েরই দেওয়া উচিত। এক মাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক কি কখনও বেদ নিন্দা করিতে পারে? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া পৌত্তলিকতা বা মায়াবাদকে যাঁহারা বেদের সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে চান, তাঁহারাই বাস্তবিক কার্য্যত বেদের নিন্দা করেন!

"জগৎ রূপে প্রকটিত নামরূপ সমস্তই মিথ্যা।"

তবে বেদে যে ব্রহ্মের দ্বারা জগতের উৎপত্তি বার বার কথিত হইয়াছে এবং তাহাতে নাম রূপের যে সকল বর্ণনা তাহা সমস্তই কি মিথ্যা? ইহা কি বেদ নিন্দা নহে? পাঠকগণ দেখুন যে বেদ নিন্দা আমাদের মাননীয় বাদী মহাশয় করেন, না আমরা করি?

"যাহা দ্বারা জীব ব্রহ্মে ঐক্য জ্ঞান জন্মে, যাহা মোক্ষের এক মাত্র হেতু, তাহাই পরা বিদ্যা।"

জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান বেদের সিদ্ধান্ত নহে, উহা ভ্রম মাত্র; অতএব উহা পরাবিদ্যা হইতে পারে না ব্রহ্ম তো সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন, জীব একটি তৃণ ছিঁড়িয়া যোড়া দিতে অক্ষম; অতএব তাঁহাদিগকে এক কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যদি বলেন ভাগ ত্যাগ লক্ষণার দ্বারা ঐক্য করিবেন, তবে জানা উচিত যে, সে ঐক্য কাল্পনিক মাত্র; বস্তুতঃ ব্রহ্মের ভাগ ত্যাগ কখনই হইতে পারে না। যাহাকে লোকে মায়া বা উপাধি বলে, তাহা যথার্থ মায়া বা উপাধি নহে, তাহা ব্রহ্মের নিত্য গুণ। যথা—বেদে উক্ত হইয়াছে "পরাস্যে শক্তি বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচ।" অর্থ।—"তাঁহার শক্তি পরা এবং বিবিধা এবং তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া স্বাভাবিক।" যাহা স্বাভাবিক তাহা নিত্য, যাহা নিত্য তাহা মায়া বা উপাধি হইতে পারে না।

জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিম্ন লিখিত পরাশ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে:—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্ব্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরম ব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥

অর্থ। "ইন্দ্রিয় সকল হইতে তদীয় বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা (জীবাত্মা) শ্রেষ্ঠ, মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত (প্রকৃতি), অব্যক্ত হইতে পুরুষ (ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ, পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনি কাষ্ঠা, তিনি পরম গতি।"

"ইন্দ্রিয়েভ্য পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং। ৭।
অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি। ৮।"

(কঠ বল্লী ৭।৮)

অর্থ। "ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সত্ত্ব (বুদ্ধি) শ্রেষ্ঠ, সত্ত্ব হইতে মহান্ আত্মা (জীবাত্মা) শ্রেষ্ঠ, মহান্ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে (সর্ব্ব) ব্যাপী নিরাকার পুরুষ (ব্রহ্ম) শ্রেষ্ঠ, যাঁহাকে জানিলে জীব মুক্ত হয় এবং অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।"

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্ব পাশৈঃ"

(শ্বেতাশ্বতরোপনি ষদি ৬। ১২)

অর্থ। "নিত্য (আত্মা) দিগের মধ্যে যিনি নিত্য, চেতনদিগের মধ্যে যিনি চেতন, অনেকের মধ্যে যিনি এক (সকলের) কাম্য বস্তুর বিধান করেন, তিনিই সাংখ্য ও যোগ দ্বারা জ্ঞেয় (সকলের) কারণ। সেই দেবতাকে জানিলে (জীব) সকল পাশ হইতে মুক্ত হয়।"

"স বিশ্ব কৃদ্বিশ্ব বিদাত্ম যোনিঃ
কাল কারো গুণী সর্ব্ব বিদ্যঃ।
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি গুর্ণেশঃ
সংসার মোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ"

(শ্বতাশ্বতরোপনিষদি ৬।১৬)

অর্থ। "তিনি (ঈশ্বর) বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, আত্মাদিগের উৎপত্তি স্থান, কাল কারক, গুণী, সর্ব্বজ্ঞ, প্রকৃতি এবং জীবাত্মাদিগের অধিপতি সর্ব্ব গুণের ঈশ্বর, সংসার বন্ধন স্থিতি এবং মোক্ষের হেতু।"

"শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ" লেখক মহাশয়ের কথন যে, জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান মোক্ষের এক মাত্র হেতু; উক্ত পরাশ্রুতি সকলের এবং প্রত্যক্ষানুভবের বিরুদ্ধ হওয়াতে হেয়।

"অপরা বিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ম্মকাণ্ড। ... ...ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধন, উপাসনা, প্রার্থনা, বিধি পূর্ব্বক বেদ পাঠ, ও তৎ সমস্তের ফল স্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ, এসমস্ত তাহারই অন্তর্গত ... সামান্যতঃ তাহাই বেদ ও অপরাবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

বাদী মহাশয়ের এ সকল কথন ঠিক নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" "যাহার দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষের জ্ঞান হয় তাহাই পরাবিদ্যা।"

সৎকর্ম্ম, ধর্ম্ম সাধন, উপাসনা, প্রার্থনা, ঈশ্বর জ্ঞানের হেতু হওয়াতে পরাবিদ্যার অন্তর্গত; এই সকল ক্রিয়াকে অপরাবিদ্যার অন্তর্গত করা যুক্তি ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। "অধর্ম্ম সাধন" না পরাবিদ্যা, না অপরাবিদ্যা, তাহা কোন বিদ্যারই অন্তর্গত নহে। বাদী মহাশয় 'অধর্ম্ম সাধনকে' বেদের অন্তর্গত করিয়াছেন। তিনি যাহাকে বেদ বলেন, তাহাতে অধর্ম্ম সাধন থাকিতে পারে, এবং তাঁহার বেদের সে অংশ তিনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না আমরা জানিতে চাই; কিন্তু আমরা যাহাকে বেদ বলি তাহাতে অধর্ম্ম সাধন নাই।

"ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদ রাশি সচরাচর "বেদ" শব্দে উক্ত হয় না।"

ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ রাশি বেদ শব্দে উক্ত না হওয়াই অন্যায়। তাহা যাহাতে হয়, তাহাই আমার মূল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে:—

"বাসুদেব পরাবেদা, বাসুদেব পরাসখাঃ।
বাসুদেব পরাযোগা, বাসুদেব পরাক্রিয়াঃ॥"

(ভা০ ১ স্ক০ ২ অ০ ২৮)

অর্থ। "বেদ সকলের উদ্দেশ্য বাসুদেব (ব্রহ্ম প্রাপ্তি), যজ্ঞ সকলের উদ্দেশ্য বাসুদেব, যোগ সকলের উদ্দেশ্য বাসুদেব, (ধর্ম্ম) ক্রিয়া সকলের উদ্দেশ্য বাসুদেব।" ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ-রাশিই যথার্থ বেদ।

"স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরাদি রক্ষার্থ প্রবৃত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ডকে প্রেয় কহে... ইহার মধ্যে শ্রেয়ঃ পরাবিদ্যার অন্তর্গত এবং প্রেয়ঃ অপরা বিদ্যার অন্তর্গত।"

বাদী মহাশয় শ্রেয় ও প্রেয় শব্দের বা পরা ও অপরা বিদ্যা শব্দের যথার্থ অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। প্রেয়ের অর্থ যদি "স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরাদি রক্ষার্থ প্রবৃত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ড" হইত, তবে শ্রুতিতে এরূপ কথিত হইত না যে "হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে"—"যে প্রেয়কে গ্রহণ করে সে নষ্টার্থ হয়।"

"সমগ্র বেদই অপরাবিদ্যা নহে"

আমরাও তাহা বলি না।

"প্রবৃত্তির অধিকারে বেদ "অপরা" নিবৃত্তির অধিকারে "পরা।"

এ কথা ঠিক নহে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ই পরা এবং উভয়ই অপরা হইতে পারে। পরা বিদ্যার লক্ষণ এই "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" "যাহার দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষের প্রাপ্তি হয় তাহাই পরা" বিদ্যা বা শ্রুতি; অপর সকল বিদ্যা বা শ্রুতিই অপরাবিদ্যা। মুণ্ডকোপনিষৎ-কথিত এ অর্থ ছাড়িয়া "শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ" লেখক মহাশয়ের কল্পিত অর্থ আমরা স্বীকার করিতে পারি না। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দ দ্বয়ের তাৎপর্য্যও বাদী মহাশয় যথার্থরূপে বুঝিতে পারেন নাই। কূর্ম্ম পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই দুই শব্দের অর্থ এ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে।—

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকং
জ্ঞান পূর্ব্বং নিবৃত্তং স্যাৎ প্রবৃত্তং যদতোঽন্যথা
নিবৃত্তং সেবমানস্তু যাতি তৎপরমং পদম্
তস্মান্নিবৃত্তং সংসেব্যমন্যথা সংসরেৎপুনঃ।"

অর্থ। "বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্ত। জ্ঞান পূর্ব্বক যে কর্ম্ম তাহা নিবৃত্ত (সংজ্ঞক) হয়; ইহার বিপরীত (অর্থাৎ অজ্ঞান পূর্ব্বক যে কর্ম্ম) তাহা প্রবৃত্ত। জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মের আচরণ করিলে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়; সেইজন্য জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ করিবেক, নচেৎ পুনঃ সংস্থতি প্রাপ্ত হইবে।"

"পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গমানাং অর্থাৎ 'ভূত যোনি' শব্দের অর্থ সর্ব্বভূতের যোনি, জন্ম স্থান, কারণ ... ..."

ব্রহ্ম যখন স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ব ভূতের কারণ, তখন তিনি এবং জীব এক কি প্রকারে হইবেন? কার্য্য কারণ কি কখনও এক হইতে পারে? এই স্বাভা-

বিক আপত্তির উত্তর, বাদী মহাশয় মায়াবাদীদিগের মনানুযায়ী বাক্যে বলিয়াছেন, যথা—

"স্বীয় স্বরূপের অন্যথা না করিয়া সত্য স্বরূপ পর ব্রহ্ম, সর্ব্ব ভূতের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ মাত্র।"

অর্থাৎ তাহাকে বিবর্ত্ত বা পৃথক করিলে তিনি ব্যতীত এ জগতের নাম রূপাদি মিথ্যা হইয়া যায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত "আত্মতত্ত্ব-বিদ্যা" নামক পুস্তকে বাদী মহাশয় একথার উত্তর পাইবেন। ব্রহ্মকে বস্তুতঃ জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক কেহ করিতে পারিবে না, অতএব বাদী মহাশয়ের স্বীয় কথানুসারেও জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। অধিকন্তু ব্রহ্মকে বিবর্ত্ত উপদান কারণ বলিলেও জীব ব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হয় না।

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব" ইত্যাদি

"ব্রহ্মা দেবতা দিগের প্রথম, তিনি ব্রহ্ম বিদ্যা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে প্রদান করিয়াছিলেন", এ শ্রুতির তাৎপর্য্য বাদী মহাশয় পৌরাণিক বর্ণনানুসারে এই বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্মা তিন জন, ঈশ্বরের মধ্যে এক; তিনিই সমগ্র বেদ প্রকাশক। এই জন্য ব্রহ্মা শব্দের কিঞ্চিৎ বর্ণন এস্থলে আবশ্যক।

নিরুক্তকার যাস্ক মুনি ব্রহ্মা শব্দ বিশিষ্ট নিম্ন লিখিত ঋচা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—

"ঋচাত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্
গায়ত্রস্ত্বোগায়তি শকরীষু
ব্রহ্মাত্বো বদতি জাত বিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বিসিমীত উত্বঃ"

(ঋ, সং ৮।২।২৪।৫)

এই ঋচার ব্যাখ্যানে তিনি জানাইয়াছেন যে, যজ্ঞ কর্ম্মের যে চারিটি মহর্ত্বিজ হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মা একটি, তাঁহার সমস্ত বেদবিদ্যা জানা চাই। যথা:—

"ব্রহ্মৈকো জাতে জাতে বিদ্যাং বদতি,
ব্রহ্মা সর্ব্ব বিদ্যঃ সর্ব্বং বেদিতুম ইতি
ব্রহ্মা পরিবৃঢ়হঃ শ্রুততো ব্রহ্ম পরিবৃঢ়হং"

(নিরুক্ত ১ অ০ ২পা০ ৩ খ০)

অতএব ঋগ্বেদে ব্রহ্মা বিদ্যান্ মনুষ্য বিশেষের উপাধির নাম মাত্র।

ব্রহ্মা শব্দের আর একটি পর্য্যায় প্রজাপতি, শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি শব্দের অর্থ বারংবার বৎসর এবং যজ্ঞ কথিত হইয়াছে। (শতপথব্রাহ্মণের ১কা০ ১অ০ ১ব্রা০ ২০ম০, ১।২।৫।১২ ও ১৩ ইত্যাদি দেখুন) সেই শতপথ ব্রাহ্মণে আবার উক্ত হইয়াছে যে, দেবতা এবং অসুরগণ উভয়ে প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, যেহেতু বৎসর বা কাল সকলের উৎপত্তির কারণ।

বেদের দেবতাদিগের সংখ্যা ৩৩ টি মাত্র। যথা ঃ—

"যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যামেকাদশস্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনৈকাদশস্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমংজুষধ্বং॥"

(ঋ০ স০ ১ম০ ১৩৯ সূ০ ১১)

অর্থ। "যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমায় এই যজ্ঞের সেবা করুন।"

ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থলে, তৈত্তিরীয় সংহিতার ১।৪।১০।১তে, শতপথ ব্রাহ্মণের ৪।৫।৭।২তে এবং ঐত্তরেয় ব্রাহ্মণের ২।১৮তে এই তেত্রিশটি দেবতার উল্লেখ আছে। এই মূল হইতেই পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতা হইয়াছে। এই ৩৩টি দেবতা কাহারা? শতপথব্রাহ্মণ বলেন, ৮বসু, ১১রুদ্র, ১২আদিত্য, ১দ্যু অর্থাৎ আকাশ এবং ১ পৃথিবী। বিষ্ণু পুরাণে বলে ৮বসু, ১১রুদ্র, ১২ আদিত্য এবং প্রজাপতি ও বষট্‌কার। বেদের আকাশের স্থানে পুরাণে প্রজাপতি বা ব্রহ্মা হইলেন। বেদত্রয়ের সংহিতায়, যতদূর পর্য্যন্ত আমার মনে আছে, ব্রহ্মা নামক অন্য কোন দেবতা নাই।

পুরাণে কোন কোন স্থলে ব্রহ্মা শব্দ (সাংখ্যোক্ত) মহত্তত্ব অর্থাৎ বুদ্ধির নাম মাত্র। যথা—

"প্রধানাৎ ক্ষোভ্যমানাচ্চ তথা পুংসঃ পুরাতনাৎ
প্রাদুরাসীন্মহদ্বীজং প্রধান পুরুষাত্মকম্।
মহানাত্মামতি ব্রহ্মা প্রবুদ্ধি খ্যাতিরীশ্বরঃ
প্রজ্ঞা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ সংবিদেতস্মাদিতি তৎস্মৃতং॥"

(কূর্ম্ম পুরাণ ৪র্থ অং)

র্থ। "ক্ষোভ্যমান প্রকৃতি এবং পুরাতন পুরুষ হইতে প্রধান পুরুষাত্মক হাবীজ উৎপন্ন হইল। এই জন্য সেই (বীজের নাম) মহানাত্মা, মতি, হ্মা, প্রবুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ধৃতি, স্মৃতি, সংবিদ্ স্মৃত ইয়াছে।"

কোন স্থলে ব্রহ্মা শব্দ ঈশ্বরের সৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম, যথা ভাগবতে থিত হইয়াছে "স্থিত্যাদয়ে হরি বিরঞ্চি হরেতি সংজ্ঞা" স্থিতি উৎপত্তি এবং সংহারের নিমিত্ত হরি, ব্রহ্মা এবং হর (এক ঈশ্বরের) নাম াত্র।

কূর্ম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে——

"ত্রৈলোক্যমখিলং স্রষ্টং স দেবাসুরমানুষম্।
পুরুষঃ পরতোঽব্যক্তো ব্রহ্মত্বং সমুপাগমৎ॥
তস্মাদ্ব্রহ্মা মহাদেবো বিষ্ণু বিশ্বেশ্বরঃ পরঃ।
একস্যৈব স্মৃতাস্তিস্রস্তদ্বৎ কার্য্যবশাৎ প্রভোঃ॥"

(কূ০ পু০ ২য় অ০)

অর্থ। "অব্যক্ত পরম পুরুষদেব অসুর মনুষ্য সহিত অখিল ত্রিলোকী সৃজন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মত্ব রূপ ধারণ করিলেন। সেই জন্যই মহাদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং পরম বিশ্বেশ্বর এক প্রভুরই (এই) তিন (নাম) কার্য্য ভেদ হেতু স্মৃত হইল।"

অতএব পুরাণের ব্রহ্মা ব্রহ্মের একটি নাম মাত্র। জগৎকে এবং জগদ্ব্যাপী আত্মাকেও রূপক ভাবে ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। যথা ঃ—

"প্রাকৃতেঽণ্ডে বিবৃদ্ধেতু ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্ম সংজ্ঞিতঃ
সবৈ শরীরী প্রথমঃ সবৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদি কর্ত্তা সভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥
যমাহু পুরুষং হংসং প্রধানাৎ পরতঃ স্থিতম্।
হিরণ্যগর্ভং কপিলং ছন্দো মূর্ত্তিং সনাতনম্॥

মেরুরুল্বমভূত্তস্য জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ পরমাত্মনঃ ॥
.....
প্রজাপতেঃ পরামূর্ত্তিরিতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ
ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং সপ্তলোক বনান্বিতং ॥"

কূর্ম্ম পু০ ৪ চর্থ০

অর্থ। "প্রাকৃত অণ্ড যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন ব্রহ্ম সংজ্ঞক জীব প্রথম শরীরী হইলেন; তাঁহাকেই পুরুষ কহে। ভূত দিগের আদি কর্ত্তা ব্রহ্মা অগ্রে হইয়াছিলেন, যাঁহাকে পুরুষ ও হংস কহে—যিনি প্রকৃতির পরে অবস্থিত; তিনিই হিরণ্যগর্ভ, কপিল এবং সনাতন বেদমূর্ত্তি। সুমেরু পর্ব্বত তাঁহার গর্ভ আবরণকারী চর্ম্ম, পর্ব্বত সকল তাঁহার জরায়ুঃ, সমুদ্র সকল সেই পরমাত্মার গর্ভের জল হইয়াছিল।

এই সপ্তলোক যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রজাপতির পরম মূর্ত্তি ইহা বেদের শ্রুতি; ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে এবং অন্যান্য পুরাণেও ব্রহ্মা বা বিরাট মূর্ত্তির সবিস্তার বর্ণন আছে। ইহার মূল ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষ সুক্ত। এই সকল বর্ণন ঈশ্বর দত্ত বিবেচনার (Common sense) দ্বারা পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগতের একটি পৃথক জীবাত্মা কল্পনা করিয়া তাহাকেই পুরুষ বা বিরাট বা ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। অগ্নি, বায়ু, নদী, উদূখল, শকট, জাতা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা জীব বিশেষের অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান কল্পনার জালে আবদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী, তাঁহারা বেশ জানেন যে, বেদের রূপক ও রোচক আখ্যান সকল প্রকৃত নহে। পুরাণে যে প্রকৃত রূপে তাহার বর্ণন হইয়াছে, তাহা "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধু" প্রভৃতি অজ্ঞলোকদিগের নিমিত্ত। উপন্যাস (novel) বর্ণিত ঘটনা সকল যেমন সত্য হয় না, অন্য কোন উদ্দেশে লিখিত হয়, সেই রূপ বেদ পুরাণের অনেক আখ্যান গল্প মাত্র। ইহার যদি অধিক প্রমাণ আবশ্যক হয়, কোন একটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ

ঠ করিলেই পাওয়া যাইবে। অতএব ব্রহ্মার স্বীয় তনয়কে বেদ প্রদান রা একটি রূপকগল্প বা কিংবদন্তী মাত্র।

সমগ্র বেদ শাস্ত্র অপরা দ্যা মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু খক মহাশয় তন্মধ্য হইতে অপরা ঋগ্বেদো "এই বচনটি ত্র উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন" অতএব লৌকিক বেদ গ্রন্থ অপরা বিদ্যার মধ্যে গণ্য।" করিয়া থাকিব। লৌকিক বেদ গ্রন্থ অপরা বিদ্যার মধ্যে উপনিষৎকার ণ্য করিয়া তন্মধ্যে যে বাস্তবিক ব্রহ্ম বিদ্যা তাহাকে পরাবিদ্যা বলিয়াছেন। আমিও তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছি। এবং তাহাই আমার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য।

লেখক মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, পরা বিদ্যা মনুষের মন হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়। তাঁহার কথা যদি সত্য হইত তবে বেদ বেদান্ত পাঠের আবশ্যকতা উঠিয়া যাইত। এবং ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য স্থানের লোক, যাহারা ব্রত পূর্ব্বক বা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া বেদ বেদান্ত পড়েন না, তাঁহারা স্ব স্ব মন হইতে এত দিন বিস্তর পরাবিদ্যা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।"

আমার এ মত নহে। না আমি এরূপ কোথাও বলিয়াছি যে, পরাবিদ্যা সকল মনুষ্যের মন হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়। যখন অন্য কোন বিদ্যা এরূপ হয় না, তখন পরাবিদ্যা কি প্রকারে হইবে?

প্রত্যেক বিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব যেমন এক এক জন বিশেষ ধীমান্ ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া তত্তদ্বিদ্যার উন্নতি সাধনের হেতু হইয়াছে, সেইরূপ পরাবিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব সকলও ক্রমশঃ এক এক জন মহাত্মার দ্বারা ঈশ্বর কৃপায় আবিষ্কৃত হইয়া তদ্বিদ্যার উন্নতি করিয়াছে এবং করিতেছে। অন্য সকল বিদ্যায় যেমন তদ্বিদ্যা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ও শিক্ষকের আবশ্যক, পরা বিদ্যা বা ব্রহ্ম বিদ্যাতেও সেইরূপ; কিন্তু এ সকল থাকিলেও স্ব স্ব বিবেচনার ব্যবহার ব্যতিরেকে যেমন কোন মনুষ্য কোন বিদ্যার উন্নতি করিতে পারে না, সেইরূপ স্ববিবেচনার ব্যবহার ব্যতিরেকে কেহ ব্রহ্ম বিদ্যায়ও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বাদী মহাশয়ের দলের লোকেরা ঈশ্বরদত্ত বিবেচনার যথোচিত ব্যবহার করেন না বলিয়াই এত ভ্রান্তি-জালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সার কথা এই যে, প্রত্যেক আবিস্কার ঈশ্বর কৃপায় বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বুদ্ধি বা আত্মা দ্বারা হইয়া সাধারণের উপকার সাধন করে। ব্রহ্ম বিদ্যার

মেরুরুল্বমভূত্তস্য জরায়ুশ্চাপি পর্ব্বতাঃ।
গর্ভোদকং সমুদ্রাশ্চ তস্যাসন্ পরমাত্মনঃ॥
.....
প্রজাপতেঃ পরামূর্ত্তিরিতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ
ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং সপ্তলোক বনান্বিতং॥"

কূর্ম্ম পু০ ৪ চর্থ০

অর্থ। "প্রাকৃত অণ্ড যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন ব্রহ্ম সংজ্ঞক জীব প্রথম শরীরী হইলেন; তাঁহাকেই পুরুষ কহে। ভূত দিগের আদি কর্ত্তা ব্রহ্মা অগ্রে হইয়াছিলেন, যাঁহাকে পুরুষ ও হংস কহে—যিনি প্রকৃতির পরে অবস্থিত; তিনিই হিরণ্যগর্ভ, কপিল এবং সনাতন বেদমূর্ত্তি। সুমেরু পর্ব্বত তাঁহার গর্ভ আবরণকারী চর্ম্ম, পর্ব্বত সকল তাঁহার জরায়ুঃ, সমুদ্র সকল সেই পরমাত্মার গর্ভের জল হইয়াছিল।

এই সপ্তলোক যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রজাপতির পরম মূর্ত্তি ইহা বেদের শ্রুতি;" ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে এবং অন্যান্য পুরাণেও ব্রহ্মা বা বিরাট মূর্ত্তির সবিস্তার বর্ণন আছে। ইহার মূল ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষ সুক্ত। এই সকল বর্ণন ঈশ্বর দত্ত বিবেচনার (Common sense) দ্বারা পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগতের একটি পৃথক জীবাত্মা কল্পনা করিয়া তাহাকেই পুরুষ বা বিরাট বা ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। অগ্নি, বায়ু, নদী, উদূখল, শকট, জাতা প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা জীব বিশেষের অস্তিত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান কল্পনার জালে আবদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী, তাঁহারা বেশ জানেন যে, বেদের রূপক ও রোচক আখ্যান সকল প্রকৃত নহে। পুরাণে যে প্রকৃত রূপে তাহার বর্ণন হইয়াছে, তাহা "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধু" প্রভৃতি অজ্ঞলোকদিগের নিমিত্ত। উপন্যাস (novel) বর্ণিত ঘটনা সকল যেমন সত্য হয় না, অন্য কোন উদ্দেশে লিখিত হয়, সেই রূপ বেদ পুরাণের অনেক আখ্যান গল্প মাত্র। ইহার যদি অধিক প্রমাণ আবশ্যক হয়, কোন একটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ

পাঠ করিলেই পাওয়া যাইবে। অতএব ব্রহ্মার স্বীয় তনয়কে বেদ প্রদান করা একটি রূপকগল্প বা কিংবদন্তী মাত্র।

"সমগ্র বেদ শাস্ত্র অপরা বিদ্যা মধ্যে গণ্য নহে। কিন্তু লেখক মহাশয় তন্মধ্য হইতে "অপরা ঋগ্বেদো "এই বচনটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন" অতএব লৌকিক বেদ গ্রন্থ অপরা বিদ্যার মধ্যে গণ্য।"

আমারও এইমত নহে যে, সমগ্র বেদ শাস্ত্র অপরা বিদ্যা মধ্যে গণ্য। আলোচনার প্রথম খণ্ড এখন আমার নিকট এখানে নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না যে আমি 'অপরা ঋগ্বেদো' এই বচনটিমাত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। আমি সমগ্র শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া থাকিব। লৌকিক বেদ গ্রন্থ অপরা বিদ্যার মধ্যে উপনিষৎকার গণ্য করিয়া তন্মধ্যে যে বাস্তবিক ব্রহ্ম বিদ্যা তাহাকে পরাবিদ্যা বলিয়াছেন। আমিও তাহাই জ্ঞাপন করিয়াছি। এবং তাহাই আমার উদ্দেশ্য ও বক্তব্য।

"লেখক মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, পরা বিদ্যা মনুষের মন হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়। তাঁহার কথা যদি সত্য হইত তবে বেদ বেদান্ত পাঠের আবশ্যকতা উঠিয়া যাইত। এবং ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য স্থানের লোক, যাহারা ব্রত পূর্ব্বক বা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী হইয়া বেদ বেদান্ত পড়েন না, তাঁহারা স্ব স্ব মন হইতে এত দিন বিস্তর পরাবিদ্যা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।"

আমার এ মত নহে। না আমি এরূপ কোথাও বলিয়াছি যে, পরাবিদ্যা সকল মনুষ্যের মন হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয়। যখন অন্য কোন বিদ্যা এরূপ হয় না, তখন পরাবিদ্যা কি প্রকারে হইবে?

প্রত্যেক বিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব যেমন এক এক জন বিশেষ ধীমান্ ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া তত্তদ্বিদ্যার উন্নতি সাধনের হেতু হইয়াছে, সেইরূপ পরাবিদ্যার গূঢ় তত্ত্ব সকলও ক্রমশঃ এক এক জন মহাত্মার দ্বারা ঈশ্বর কৃপায় আবিষ্কৃত হইয়া তদ্বিদ্যার উন্নতি করিয়াছে এবং করিতেছে। অন্য সকল বিদ্যায় যেমন তদ্বিদ্যা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ও শিক্ষকের আবশ্যক, পরা বিদ্যা বা ব্রহ্ম বিদ্যাতেও সেইরূপ; কিন্তু এ সকল থাকিলেও স্ব স্ব বিবেচনার ব্যবহার ব্যতিরেকে যেমন কোন মনুষ্য কোন বিদ্যার উন্নতি করিতে পারে না, সেইরূপ স্ববিবেচনার ব্যবহার ব্যতিরেকে কেহ ব্রহ্ম বিদ্যায়ও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বাদী মহাশয়ের দলের লোকেরা ঈশ্বরদত্ত বিবেচনার যথোচিত ব্যবহার করেন না বলিয়াই এত ভ্রান্তি-জালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সার কথা এই যে, প্রত্যেক আবিস্কার ঈশ্বর কৃপায় বিশেষ বিশেষ মনুষ্যের বুদ্ধি বা আত্মা দ্বারা হইয়া সাধারণের উপকার সাধন করে। ব্রহ্ম বিদ্যার

প্রত্যেক আবিষ্কারও যে, সেই নিয়মানুসারে হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রেতিহাস দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক গোঁড়া ও তাঁহারা এই এ সত্য স্বীকার না করুন; কিন্তু এক সময় আসিবে যখন ব্রহ্মবিদ্যাও অন্য বিদ্যার ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্র (science) মধ্যে জনসমাজে পরিগণিত হইবে।

বাদী মহাশয় কি প্রকারে জানিলেন যে, ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য স্থানের লোকেরা (যাঁহারা বেদ বেদান্ত পড়েন নাই) পরা বিদ্যা প্রকাশ করিতে পারেন নাই? মহত্মা মূসা, ঈশা (খৃষ্ট) মহম্মদ প্রভৃতি বেদ বেদান্ত না পড়িয়াও কি প্রকারে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিলেন? বাদী মহাশয় কে বেদান্ত পড়িয়া কি তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী পরা বিদ্যা শিখিয়াছেন?

"আমাদের ধারণা এই যে বর্ত্তমান কালের যুক্তি সম্ভূত ঈশ্বর তত্ত্ব বা অন্য কোন দেশের পরমার্থ বিদ্যা কখনই ভারতবর্ষীয় বৈদিক পরমার্থ বিদ্যার নিকটেও আসিতে পারিবে না।"

এ ধারণা মিথ্যা গর্ব্ব মূলক। ভারতীয় বৈদিক পরমার্থ বিদ্যার উচ্চতম গ্রন্থ উপনিষৎ সকল। তাহাতে অনেক যথার্থ পরমার্থ তত্ত্ব আছে ইহা আমরা সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি; কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে ইহাও বলিতে হইবে যে, উক্ত গ্রন্থ সকলের মধ্যে কল্পনা, বৃথা বাক্য, এবং অশ্লীল বাক্যও স্থানে স্থানে আছে। এক জন পক্ষপাত রহিত বিদ্বান্‌কে একবার ছান্দোগ্য উপনিষৎ পড়িতে দেন এবং তার পর দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, গুরু নানকের গ্রন্থ, Precepts of Jesus, Imitation of Christ, Theodore Parker's works বা সীতা নাথ দত্তের পুস্তক পড়িতে দেন এবং জিজ্ঞাসা করুন যে, গ্রহণের অযোগ্য কথা ছান্দোগ্যাদি উপনিষদে অধিক, না শেষোক্ত প্রকার গ্রন্থে অধিক? তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে, বাদী মহাশয়ের দলস্থ লোকদিগের গর্ব্ব কেবল বৃথা। অথবা বাদী মহাশয় একটি মন্দিরে বসিয়া প্রতি সপ্তাহে (স্বীয় টীকা ছাড়িয়া) কেবল উপনিষৎ বা অন্য কোন বেদান্ত পাঠ করুন, অপর দিকে একজন আধুনিক পরাবিদ্যাবিতের বক্তৃতা হউক, তখন দেখিবেন অধিক লোক কোনটাকে রুচি পূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ করে।

"শাস্ত্রের কঠিন শাসন এই যে গৃহস্থ শিব তুল্য যোগী হইলেও মনেতেও সামাজিক আচারের লঙ্ঘন করিবেক না।"

আপনারা তবে কেন "শাস্ত্রের কঠিন শাসন" অনুসারে চলেন না? ঋষিদিগের সময়ে সামাজিক আচার ছিল যে, অতিথি গৃহাগত হইলে তাহাকে "মহোক্ষং বা মহোজং বা" মোটা গরু বা মোটা

গল আহারের নিমিত্ত দেওয়া যাইত। আপনারা কি এ সময়ে এ দ্দেশে অতিথিকে মোটা গরু দিতে পারেন? পুরাকালে গৃহস্থেরা ত যাগ যজ্ঞ করিতেন এবং দুর্গা কালী পূজা করিতেন না, এখন াহার বিপরীত কেন দেখা যায়? আগে নিয়োগের রীতি ছিল, এখন াহা নাই কেন? আগে যজ্ঞে গোমেধ নরমেধ পর্য্যন্ত হইত, এখন যদি কান হিন্দু তাহা করে, তবে কি সে হিন্দু বলিয়া সমাজে গণ্য হইবে? তিকারদিগের সময়ে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং চারিবর্ণের অন্ন ভাজন রীতি প্রচলিত ছিল, অধিক কি হিন্দু রাজ কন্যাকে বিবাহ করিতে ম্লেচ্ছ রাজারা পর্য্যন্ত আসিত। এখন এ সকল রীতি হিন্দু সমাজ কেন পরিত্যাগ করিয়াছে? পূর্ব্বে প্রত্যেক দ্বিজকে কতকাল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে থাকিয়া ভিক্ষা এবং বেদ পাঠ করিতে হইত, এখন পৈতের পরেই সমাবর্ত্তন কেন হয়? এককালে বেদ শাস্ত্রের চর্চ্চা করা শূদ্রের অধিকার ছিল না, অধিক কি ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের এক সঙ্গে বসিবার বা বেড়াইবার অধিকারও ছিল না, এখন শূদ্রে ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দেয় ও উপদেশ দেয়। বাদী মহাশয় স্বয়ংই তাহার প্রমাণস্থল। এখন বলুন দেখি, প্রাচীন সামাজিক আচারের লঙ্ঘন আপনারা করিয়াছেন কিনা? যদি আপনারা স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষের আচারের লঙ্ঘন করিয়াছেন, তবে আপনাদের বর্ত্তমান সামাজিক কুরীতিকে যদি অন্য সমাজহিতৈষীরা ত্যাগ করে, তবে কোন্ ন্যায় অনুসারে আপনারা তাহাকে দোষী করিতে পারেন?

"তিনি ব্রহ্মাদি গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত ঈশ্বর প্রণীত অপৌরুষেয় প্রবাহ রূপ নিত্য সত্য সার্ব্বভৌমিক সনাতন বেদ শাস্ত্রকে নিন্দা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে মানবের চঞ্চলা বুদ্ধি বৃত্তিকে এক নূতন প্রকার বেদের উৎপত্তি স্থান বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার যত্ন করিতেছেন। এই অভিসন্ধি অত্যন্ত অসৎ।"

বেদ শাস্ত্রের যে সকল বিশেষণ বাদী মহাশয় দিয়াছেন তাহা মৎকথিত বেদ শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার নিন্দা বাদী মহাশয় করিতেছেন, আমরা করিনা। 'চঞ্চলা বুদ্ধি'কে আমরা বেদের উৎপত্তি স্থান বলিনা। বেদের উৎপত্তি স্থান স্বয়ং ব্রহ্ম; ব্রহ্মোপাসকদিগের বুদ্ধি তাঁহার কৃপায় বিশুদ্ধ হইলে,—যে জন্য ঋষিরা "ধিয়োয়োন প্রচোদয়াৎ" প্রকারে প্রার্থনা করিতেন,—যথার্থ বেদকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

"কেবল হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু ব্রাহ্ম বিদ্যা ও হিন্দু শাস্ত্রকে রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

এ উদ্দেশ্যে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, যেহেতু সেই উদ্দেশ্যে আমিও স্ব সামর্থ্যানুসারে কিঞ্চিৎ কার্য্য করিয়া থাকি, এবং সেই

জন্যই বাদী মহাশয়কে এ প্রবন্ধের দ্বারা বিরক্ত করিতে বা হইলাম।

"তাঁহার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, শাস্ত্রীয় যে কোন বচন তিনি উদ্ধৃত করিবেন, তাহার শব্দার্থমাত্রে সন্তুষ্ট না হন।"

বাদী মহাশয়ের নিকটও আমার এই প্রার্থ যে, তিনিও শাস্ত্রীয় বচনের শব্দার্থ ত্যাগ করি কেবল সাম্প্রাদায়িক অর্থে মুগ্ধ না হন। কো এক হিন্দু সম্প্রদায়ের মত যদি সম্পূর্ণ ঠিক হইত তবে অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইত না।

"ঋষি, আচার্য্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাপক ও গুরু প্রভৃতি মহাজনেরা তাহার যেরূপ অর্থ প্রয়োগ ও যোজনার নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন, তাহা স্বতঃ পরতঃ জ্ঞাত হন।"

অবশ্য; বাদী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমার বহুকালাবধি অবগতি আছে। উচ্চ সত্য পাইয়াই জানিয়া শুনিয়া ভ্রান্ত ও কল্পিত সাম্প্রদায়িক মতকে ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের "সৎসঙ্গ" নামক সভাতে অনেক বার সেই সকল সত্যের আলোচনা হইয়াছে এবং অনেকে ক্রমশঃ ঈশ্বর কৃপায় ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। ঈশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যে, বাদী মহাশয়ও পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সত্যের শরণ গ্রহণ করুন।

"যদি স্বীয় মত কোন বচন দ্বারা প্রমাণ না হয়, তবে কোন যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিপাদনই করিবেন। আমাদের প্রার্থনা এই যে, যেন তাদৃশ স্থলে লেখক মহাশয় নিরপরাধী শাস্ত্রকে হত্যা না করেন।"

বাদী মহাশয়ের উপদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু আমারও এ স্থলে প্রার্থনা যে তাঁহার শাস্ত্রীয় বা সাম্প্রদায়িক কোন মত যদি স্পষ্ট রূপে সত্যের বিরুদ্ধ হয়, তবে তিনি যেন সম্প্রদায়ের পক্ষপাত করিয়া বা স্বয়ং ব্রহ্মাভিমানী হইয়া, নিরপরাধী সত্যকে হত্যা করিতে চেষ্টা না করেন।

শ্রীনবীনচন্দ্র রায়।

ও কার অথির মেয়ে খেলিয়ে বেড়ায় ?

১

অথির মেয়েটী কার ভাবের গুমরে
খেলিয়া বেড়ায়,
হাসির গড়ন হাসির বদন
হাসির চাওনি খানি নয়নে খেলায়;
ও কার অথির মেয়ে নেচে নেচে যায় ?

২

পাগলিনী নয় বালা তবু যে পাগল
পাগল হৃদয়,
হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া গাইয়া
আধ আধ কথা কেমন নাচনি-ময়!
এমন পাগল কবে কার ঘরে হয় ?

৩

ঘরের বালিকা নয়, স্বভাবের শিশু,
স্বভাবের কোলে
নাচিছে আপনি, নাচায় পরাণী,
নাচিছে সংসার ওপদ ঘুংঘুর-রোলে
নাচে জল নাচে স্থল বালিকার তালে।

৪

নাচে নদী সিন্ধু ত্যাগি ধরিয়া উজান
নীর নাচাইয়া।
মলয় সমীরে নাচে ধীরে ধীরে
লতা পাতা ফুল ফল ধীরে দোলাইয়া,
বালিকা সংসার দেখ দি'ছে মাতাইয়া!

৫

ফুলেরা যখন খুলে রাখে মুখখানি
পাতার আড়ালে।
ছোট হাত দিয়া পাতা সরাইয়া
অথির বালিকা যেয়ে বসে তার কোলে,
সুন্দরে সুন্দর তখন অমিয় ঢালে।

৬

তরাগে যখন ছোট খাট ঢেউগুলি
মলয় তাড়নে—
পিছি পিছি যায় ফিরে নাহি চায়
একেরে ধরিতে অন্যে কোমল চরণে,
সাঁতারে বালিকা সুখে উহাদের সনে।

৭

আকাশে হাসিলে চাঁদ ঢালিয়া চাঁদনি
জুড়াতে চকোরে।
সুখে উড়ে তারা যেন দিশাহারা
শ্বেতময়ী বসুন্ধরা কৌমুদ-অম্বরে,
বালিকা চকোর সনে খেলে সে সাগরে

৮

বনে বনে গায় পাখি, বনে গানগুলি
যায়রে মিশিয়া,
বালিকা তখন অথির জীবন
চুপি চুপি শুনে গান বনে লুকাইয়া।
বিজনে কাঁপেনা কভু বালিকার হিয়া।

৯

যুবতী যখন দোলাইয়া কেশগুলি
মন্থর গমনে।
পিছে পিছে যেয়ে আঁচল ধরিয়ে
বালিকা চাহিয়া থাকে হেসে তার পানে
পিছে যায়, চুপি আঁচল ধরিয়া টানে।

১০

ভীষণ সাগর-বক্ষ বিদারি যখন
বীচি খেলা করে
তীরেতে বসিয়া দেখেনা চাহিয়া
ঝাঁপ দেয় মত্তপ্রাণা উর্ম্মিময় নীরে,
মানস-মোহিনী বালা মানস-সাগরে।

১১

ভয় নাই প্রাণে,ভয় কি জানেনা বালা,
সদাই অথির।
বিজনের কোলে তুঙ্গ গিরিদলে
ভাসাইলে রাশি রাশি অভ্রভেদী শির
আরোহি নিরখে মূর্ত্তি থির প্রকৃতির।

১২

যমুনা-পুলিনে শ্যাম বাঁশরীর তানে
তুলিলে লহর।
যমুনা নাচিত গোপিনী ভুলিত
নাচিত তাদের সনে বালিকা-অন্তর,
বাজিত বাঁশরী সনে বালিকার স্বর।

১৩

বিরহ-বিধূরা যবে হুতাশ পরাণ
কুলবধূকুল।
ভাসে অশ্রুনীরে ব্যাকুল অন্তরে
সোহাগে বালিকা দোলাইয়া দুল,
আঁচলে মুছায়ে মুখ বেঁধে দেয় চুল।

১৪

সঙ্গীত-লহরী বাতাসে করিয়া ভর
উঠে তালে তালে
অদূরে অমনি শুনি প্রতিধ্বনি
বালিকা উন্মত্ত হৃদি আসি ধীরে ধীরে
লহর-কোলেতে বসি ভাসে শূন্যকোলে।

১৫

কে কবে দেখেছ এমন পাগল মেয়ে
এমন চঞ্চল!
সুহাস বদনী অথির নয়নী
অথির ভাবেতে গলা পরাণ কোমল,
কবিতা উহার নাম ভাবে টলমল।

১৬

ছুঁয়োনা উহারে কেহ,বড় মায়াবিনী,
প্রাণময় মায়া ;
শিয়রে বসিয়া কি যেন কহিয়া
সংসারের ছায়াপথ দেয় দেখাইয়া,
বিমানে মানস পাখী দেয় উড়াইয়া।

১৭

হাসিটী উহার নির্ম্মল চাঁদনিময়,
হাসায় জীবন;
ভাষাটী উহার লহর বীণার
সংসার-রবার হৃদে রয়েছে মগন।
মজায় বিদ্যুৎবেগে অমিয় বচন।

১৮

লতা পাতা ফুল ফল চাঁদিমা চাঁদনি
সাগরের জল
বনপাখী দল তটিনী সকল
কথা কয় ওর কাণে আহ্লাদে বিহ্বল,
তরল কথাটী করে পরাণ তরল।

১৯

কবিতা লো,—
ভাব-পুতলি তুমি এসো না হেথায়—
এ মরু হৃদয়ে,
বহিবেনা আর তটিনীর ধার,
বিশুষ্ক হৃদয় থাক্ হৃদয়ে মিশিয়ে,
কি করিব তোর হাসা তোর ভাষা দিয়ে?

শ্রীবরদাকান্ত সেন গুপ্ত।

আর্য্যপ্রকৃতির ক্রম বিকাশ।

প্রাচীন ইরান দেশ প্রাচীন আর্য্য সন্তানের প্রাচীন আর্য্যবাস। আর্য্য বাসে অবস্থান কালে আর্য্যসন্তান অনার্য্য বর্ব্বর বিভিন্ন জাতীর সমসূত্রে সখ্যে বা সংসর্গে বাস করিতেন। মধ্য আসিয়ার সকলের যে প্রকৃতি, প্রকৃতি নিয়ন্তা প্রাকৃতিক অবস্থান সকলের পক্ষে যাহা,তাহারা তাঁহার পক্ষেও সেইরূপ; অন্য সকলের প্রকৃতি যেরূপ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল আর্য্য সন্তানের প্রকৃতিও সেইরূপ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর্য্য প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল না। শিক্ষা বা সভ্যতা হেতু প্রকৃতিগত বিবর্ত্তন পরিমাণ অনার্য্যদিগের অপেক্ষা আর্য্য সন্তানের অধিক হইয়া থাকিলেও, প্রকার ভেদ ছিলনা। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে এখন যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, আর্য্যবাস-বাসী অনার্য্য ও আর্য্য সন্তানে সেই বিভিন্নতা তৎকালে পরিলক্ষিত হইত।

আর্য্যবাস পরিহার করিয়া আর্য্য সন্তান আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। দুর্ভেদ্য গিরিমালা, বিশাল বারিধি তাঁহাকে আবদ্ধ করিল। এমন দুর্লঙ্ঘ্য উন্নত অচল শ্রেণী,বহুপয়ঃ নানাশাখ সাগরান্তগা স্রোতস্বতী, বিশাল কান্তার, ঝটিকাময় মরুভূমি আতবাতের প্রাবল্য আর্য্যবাসে দেখা যায় নাই। "একা অকেতৎ সরস্বতী নদী নাম স্রুকিঃ যাতি গিরিভ্যাঃ আসমুদ্রাৎ।" (ঋগ্বেদ সপ্তম মণ্ডল সূঃ৯৫।১।২)। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন কাল সাপেক্ষ। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশে আর্য্য প্রকৃতি আর্য্যবাসে আর্য্য প্রকৃতির ন্যায় উগ্র ও বহির্মুখীছিল, সাংসারিক সুখ তাহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী আর্য্যসন্তান

দিন দিনের মুখাপেক্ষী। শত্রু নাশ, বিজয় লাভ, যাগযজ্ঞ, কৃষি কর্ম্ম আনন্দের সুখবাসরে, সন্তান সন্ততি কুটুম্ব ও পরিবারের সংসর্গে "আনন্দ রহো উদ্দেশে তাঁহার দিন পাত হইত। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি বাসী আর্য্য সন্তানে সাংসারিক সুখ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ক্রিয়া কলাপ সেই উদ্দেশ্যে সহকারী। তাঁহার আনন্দময় মনে প্রকৃতি আনন্দময়ী, ঋতু আনন্দময়, নীল নক্ষত্র খচিত আকাশ আনন্দময়। বহির্মুখ সাংসারিক সুখাভিলাষী প্রকৃতি মৃত্যু, পরাময়, দুর্দ্দৈব ঘৃণা করে। তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে নানাপ্রকার চেষ্টা করে।

ক্রমে সময় আপন প্রধান্য স্থাপিত করিল। প্রাকৃতিক মহানুভবতা আর্য্য প্রকৃতির উগ্রতা, বহির্ম্মুখতা বিনাশ করিয়া গভীরতা, অন্তর্মুখতা সম্পাদন করিল। আনন্দের উজ্জ্বলতা বিষাদের ছায়ায় আবৃত হইল। আনন্দ রহো আনন্দ অভিধান হরিবোল হরিবোলের ভৈরব কঙ্কাল রবে ডুবিয়া গেল, দিন দিনের মুখাপেক্ষী আর্য্য সন্তান দিন মাস অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হইল। সাংসারিক ঐহিক সুখ শ্মশানে হাস্যের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বা ঘৃণার্হ বলিয়া গণিত হইল। অনন্ত পরকাল তাহার চিন্তনীয় হইয়া উঠিল। যে দৈব দুর্ব্বিপাক মশক দংশনের ন্যায় তত্ত্ব পরিহারে প্রবৃত্ত হইত, পাঁড়া যন্ত্রণা মৃত্যুকে ঘৃণা করিত, এখন সে দৈবদুর্ব্বিপাক অকিঞ্চিৎকর পীড়া যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু স্পৃহণীয় বলিয়া চিন্তা করিত। দৈব যন্ত্রণার অভাব হইলে কৃত্রিম যন্ত্রণার অনুশীলন করিত।

আর্য্য সন্তানের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে ভারতবাসী অনার্য্যগণ অসামান্য সাহায্য করিয়াছিল। শস্যশালী উর্ব্বর ক্ষেত্র, বিথিকাময়ী নগরী হইতে আর্য্য-বলে তাড়িত হইয়া আর্য্য সন্তানের উপেক্ষিত ঘৃণিত বনভূম, গিরিগুহা বা মরুস্থল তাহাদের অবলম্বন হইয়াছিল। হিংস্র শ্বাপদের সংসর্গ আর্য্য সংসর্গের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। শীত-বাত তাড়িত, অনাবৃত প্রান্তর জনপণ্যময় নগরী অপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। অনার্য্য হৃদয়ের পৃষ্ঠাস্থি আর্য্য সন্তান চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। দারিদ্র্য দুর্দ্দশা দুর্দ্দৈব যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিষণ্ণতা, সংসারে অনাসক্তি। আনন্দ আর্য্য সন্তানের, ধনরত্ন আর্য্য সন্তানের, সম্পদ গৌরব আর্য্যসন্তানের। দারিদ্র্য যন্ত্রণা অনার্য্যের, বিপদ বিভ্রম অনার্য্যের, মৃতু পীড়া অনার্য্যের; একদিন নহে, নিত্য; এক জনের নহে, সকলের। আর্য্য গৃহে

নার্য্য গোলাম, অনার্য্য রমণী আর্য্য গৃহিণীর সেবিকা, আর্য্যের আনন্দ কোলা-লে অনার্য্য-রমণী সাপক্ষতা করিবার অধিকারিণী নহে। আনন্দ যজ্ঞের ত্রিসী-য় তাহাদের অঙ্গুলী স্পর্শ অবমাননা বা পদাঘাতের কারণ। সুবর্ণ অলঙ্কার বেশ সুপ্রাসাদ আর্য্য রমণীর, অনার্য্য রমণী কুটীর বাসিনী, অন্নমুষ্টি হেতু রমেয়বৎ প্রভু-পত্নীর প্রসাদ-ভিখারিণী। দারিদ্র্যের পল্বলের ন্যায় বিষাদের াকর আর কোথায়? পারলৌকিকতায় বর্ত্তমান উপেক্ষা, সংসারে বীতস্পৃহা, বরের শান্তি এ মরুময় জীবনের একমাত্র বাসনা। আর্য্য সন্তানের পাদ-ড়নে অনার্য্যের গৃহে বিষাদের উৎপত্তি; ক্রমে প্রাবৃট্ কালের মেঘের ন্যায় মুষল ধারায় আর্য্য গৃহে বর্ষিত হইয়াছিল। জগদ্দল পাষাণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় বিশাল প্রকৃতি আর্য্য পুরুষের বক্ষদেশে নিষ্পেষিত করিল, অনার্য্য গৃহ-সঞ্জাত বিষণ্ণতা তাহার পৃষ্ঠাস্থি জীর্ণ করিয়া দিল। আর্য্য প্রকৃতি সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইল। অনার্য্যেরা প্রতিহিংসা সাধন করিল।

"The oppressor oppressed the tyrent overthrown."

কাব্য দর্শন চিন্তা মহত্ত্বের আকর বিষাদ। বিলাসের কোমল শয্যায় কেহ কখন মহত্ত্ব সঞ্চয় করে নাই। যে ফুলে ফুলে মধু খাইয়া পাখা দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়ায়, সে প্রজাপতি—বালক ও যুবতীর মনোরঞ্জন হইতে পারে; কিন্তু একটী মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিবার তাহার সাধ্য নাই। একটী অনন্ত-স্পর্শী সঙ্গীত তাহার কণ্ঠে স্ফুরে না। যাহাতে স্থায়িত্ব আছে, দৃঢ়তা আছে, মহত্ত্ব আছে তাহাতে তাহা নাই। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিঃও দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে; যাহা দূরে, যাহা অনন্তের ক্রোড়ে, ভবিষ্যতের জঠরে তাহা তাহা দেখিতে দেয় না। ছায়াময় চন্দ্রালোকে দূরে দূরে, অতি দূরে দেখা যায়, অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহত্তর রূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুখ জ্বরোচিত চাপল্যের কারণ, বিষাদ প্রাণতা উৎপাদনে সমর্থ। দুঃখ দারিদ্র্যে যখন পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণ করিয়া দেয়, তখন লোক গৃহ হইতে বাহির হয়। বর্ত্তমান ছাড়িয়া অতীত ও ভবিষ্যতের অনুসরণ করে। অণু ছাড়িয়া বিশালতা সাপটিয়া ধরে; মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া অনন্তত্বে ডুব দেয়। বিষাদের পর্ণকুটীরে রামায়ণ ও মহাভারত, দর্শন ও উপনিষদের উৎপত্তি। ফুরেন্স নগরে কত দান্তে মাজিষ্ট্রেট হইয়াছে, কিন্তু বিষাদের নির্ব্বাসন ভিন্ন কে কবে "ডিভাইনা কমেডিয়া" উৎপাদন করিয়াছে? সুখের আলবালে সঞ্চিত বারিকণা অমৃতত্বের কারণ নহে। বিষাদের অজস্র প্রস্রবণ নিয়ত জীবন্ত-

স্রোত উদ্গার করিতেছে। যদি কারাগৃহের কঠোরতায়, তাঁহার বহির্মুখতা শাসিত না হইত, কে কবে মিরাবোর নাম মাত্র শুনিতে পাইত? অন্ধ হইয়াই জন্ মিল্টন "পারাডাইস লষ্ট" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথর্ব্ব বেদ ও উপনিষদের সৃষ্টিকারী বিষাদ-কাতর ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য সন্তান। অঙ্গুলী-ভারকাতর-কুসুমহার বিলাসিনীর কণ্ঠে শোভা পায়। আনন্দবাসর বিনা প্রীতির ঠুংরী কোথায় শুনিবে? যদি ভৈঁরোর রসাস্বাদনে বাসনা থাকে, প্রান্তরে পান্থনিবাসে তরুতলে বিনা তোমার সাধ মিটিবে না। রাজপ্রাসাদভোগী টেনিসন ও প্রায়র, শত্রু-পীড়িত যম-পীড়িত ব্যাধি-পীড়িত বা প্রেম-পীড়িত না হইলে দান্তে বা মিল্টন জন্মে না।

এইরূপে ভারতে উপনিষদ্ ও দর্শনের উৎপত্তি। ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথায়ও তাহাদিগকে পাওয়া যায় না, আর কোথায়ও তাহাদের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা অবস্থানের মর্ম্মস্পর্শ না করেন, তাঁহারা কবি নহেন; দার্শনিকও নহেন, ইতিহাস লিখিতে পারেন না। সংসার-পীড়িত প্রকৃতি-পীড়িত কুটীরবাসী কয়েকজন সন্ন্যাসী স্ব স্ব প্রধান হইয়া একাকী উঁহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই স্বানুগত মহাপুরুষদিগকে শাক্যসিংহ একত্র করিয়াছিলেন। বৌদ্ধদর্শন শাক্যসিংহের পূর্ব্বতন। শাক্য তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এক শাক্য সহস্র শাক্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি না জন্মিলে তাহারা অস্ফুট রহিয়া যাইত। শাক্য স্ব প্রধান মহাজনদিগকে একত্র করিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত করেন। শ্রমণাচার্য্যের সংঘ্য সংস্থাপন করেন। তিনিই অনার্য্য প্রকৃতির প্রতিনিধি, মূর্ত্তিমান বিবর্ত্তিত আর্য্যপ্রকৃতি। যাহা শত উৎসে একাকী উৎসারিত হইতেছিল, তিনি তাহা একত্র করেন; একত্র করিয়া প্রভূত পয়ঃস্রোতস্বিনী উৎপাদন করেন। শেষে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভাসাইয়া দেন।

সন্ন্যাসী প্রকৃতি স্বাবলম্বন-পরাঙ্মুখ, অদৃষ্টপরায়ণ, বর্ত্তমান-উপেক্ষী ভবিষ্যন্মুখ। দিন ছাড়িয়া তিনি অনন্ত গণনা করেন, আকার ছাড়িয়া আকাশের সেবা করেন, গৃহ ছাড়িয়া বিশ্ব অবলম্বন করেন। দু দিনের পীড়া, দু দিনের যন্ত্রণা, দু দিনের দুঃখ, দু দিনের পরাধীনতা তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ নহে। কত কোটী কোটী যুগ তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, আরও কত কোটী যুগের প্রায়শ্চিত্তে তাঁহার জন্মগত ব্যাধির উপশম হইবে। যন্ত্রণা যাহার চিরাভ্যস্ত, যন্ত্রণা যাহার নিত্য-ভাগ্য, যন্ত্রণার যন্ত্রণাত্ব যাহার

নিকট উপশম হইয়াছে, কে তাহাকে যন্ত্রণা দেয়, তাহা অবধারণ করিতে ও উৎসুক নহে। সে যন্ত্রণা কে রাজা হইল, কে করভারে পীড়ন করিতেছে, ভারতবাসী কৃষক পর্য্যন্তও তাহার অনুসন্ধান করে না। সহস্র সহস্র বৎসরে ভারতের প্রত্যেকেই সন্ন্যাসীবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। পথে ঘাটে এখনও এত দার্শনিক আর কোন দেশে মিলে না, মিলিবে না। ভারতবর্ষের ইতিহাস নাই, কারণ ভারতবাসী সংসার-স্পৃহ নহে। পরাধীনতা ভারতবাসীর পীড়াজনক নহে, কারণ দার্শনিকতায় তাহার পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণিত করিয়াছে। যন্ত্রণা তাহার অদৃষ্ট, রাজা কে হইল, কে যন্ত্রণা দেয়, তাহাতে তাহার ইষ্টানিষ্ট কি? মাসিদনপতি সিকন্দর ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, কখন? বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রচার হইবার পরে। যদি সন্ন্যাসধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার না হইত, যদি আধিভৌতিক ক্রিয়ামাত্র পরিহর্ত্তব্য বলিয়া গণিত না হইত, যদি সাংসারিক সুখ কীটময় শবের ন্যায় ন্যক্কার সহিত পরিত্যাজ্য না হইত, তবে কি সিকন্দর ভারতভূমি স্পর্শ করিতে পারিতেন? যদি বৈদিক প্রকৃতি আর্য্য সন্তানকে তখনও অনুপ্রাণিত করিত, তবে ভারতের মুখ আজ অন্যবিধ দেখিতাম। কবি সোৎসুক-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"তখন তাহারা ক'জন ছিল?"

তখন তাহারা পাঁচজন হইলেও, পাঁচজন অসুর ছিল। পরন্তন ভারতবাসী অসুরপ্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া দার্শনিক হইয়া পড়িয়াছিল। সংখ্যার পরিমাণ অধিক হইলেও প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। সিংহের ঔরসে গর্দ্দভ জন্মিলে কোটী গর্দ্দভ একটী সিংহের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ে ভারতবাসীদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম বিষাদের ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম আনন্দের ধর্ম্ম। খৃষ্টধর্ম্ম আনন্দের ধর্ম্ম। মুসলমান ধর্ম্ম সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম মাত্র। সুতরাং মূলপ্রকৃতি আনন্দশীলতা ফল-প্রকৃতিতেও সঞ্চারিত হইয়াছে। তাপাধিক মরুজীবন আরবদিগকে শীতপ্রধান দেশবাসী অপেক্ষা অধিকতর প্রফুল্ল করিয়াছে। ধর্ম্মসংস্কারকের প্রকৃতি ধর্ম্ম, প্রকৃতি ও ধর্ম্ম উপাসিত দেবপ্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করে। এজন্যও নেষ্টরিয়াল খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রফুল্লতর। যে কারণে আরবপ্রকৃতি প্রফুল্লতর করিয়াছে, পারস্য, আফগান ও মোগল প্রকৃতিও সেই কারণে কিয়ৎ পরিমাণে শাসিত করিয়াছে। জাতীয় প্রকৃতির প্রভুত্ব ধর্ম্ম-প্রকৃতির উপর যত অধিক, ধর্ম্ম-

প্রকৃতির প্রাধান্য জাতীয় প্রকৃতির উপর তাহা অপেক্ষা অল্পতর নহে। হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে আর্য্যপ্রকৃতি বিবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। সেইরূপ কারণেও মহম্মদীয় ধর্ম্ম মোগল ও পাঠানদিগকে হিন্দুদিগের অপেক্ষা প্রফুল্লতর করিয়াছে।

হিন্দু বৈরাগী ও মুসলমান সংসারী। গৃহশূন্য বৈরাগীর আশ্রয় অনন্তের ক্রোড়ে। একজন চিন্তা-পরায়ণ, অন্য বীর্য্য-পরায়ণ। হিন্দু বিষণ্ণ, মুসলমান প্রফুল্ল। হিন্দু পরার্থপরায়ণ, মুসলমান স্বার্থপরায়ণ। যাহার কেহ নাই সে পরের জন্যই ভাবিবে, হিন্দু পরকাল-প্রমুখ, মুসলমান বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত। বিশ্ব-সংসার মুসলমানের সুখের জন্য, হিন্দুর বিশ্বসংসার সেবার কারণ। হিন্দু ভিন্ন বসুধৈব কুটুম্বকম্ আর কে বলিতে পারে? গৃহশূন্য বৈরাগী ভিন্ন আর কাহার প্রাণ জগতের জন্য কাঁদে? মুসলমান সাম্প্রদায়িক, হিন্দু সার্ব্বজনীন। হিন্দুর একটী সদাচরণ লক্ষ্যকর।

"আব্রহ্মাণো যে পিতৃবংশজাতা
মাতুস্তথা বংশঃ ভবামদীয়াঃ
বংশদ্বয়ে যে মম দাসভূতা
ভৃত্যাস্তথেবাশ্রিত সেবকাশ্চ
মিত্রানি সর্ব্বে পশবশ্চ বৃক্ষাঃ
দৃষ্টাহ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ
তেভ্যঃ স্বধা পিণ্ডমহং দদামি।"

হিন্দুর ইতিহাস নাই, মুসলমানের ইতিহাস আছে। হিন্দুর স্বর্গে ধ্যান ধারণা। মুসলমানের স্বর্গ—সুরা ও বারবণিতা। হিন্দুর স্থাপত্য দেবমন্দিরে, মুসলমানের স্থাপত্য উদ্যানপ্রাসাদে। মুসলমান উপাসনা করিতে দল বাঁধে, হিন্দু চিরদিন একাকী। হিন্দুর পরিণাম শ্মশানের চিতা ভস্মে, মুসলমানের অন্তিমশয্যা মরকত-খচিত কবর কুট্টীমে। হিন্দুর স্বর্গবাস কষ্ট-সাধ্য, মুসলমানের সহজ-লভ্য। হিন্দু বিশ্বাস, মুসলমান কর্ম্ম; হিন্দু ধ্যান, মুসলমান সাধনা। বিষাদ প্রধানতঃ সাধারণ হিন্দুর জাতীয় চরিত্র, মহম্মদীয় ধর্ম্মের সংস্পর্শে হিন্দুর অনন্তপরায়ণতা কিয়ৎ পরিমাণে

হইয়াছে। দর্শন, উপনিষৎ ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমসাময়িক জাতীয় চরিত্র বিষাদ-প্রধান ছিল, এখন তত নাই। গীতার পৌরাণিক ধর্ম্মে বৈদিক ফুল্লতা পুনর্জ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ফলও হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় পৌরাণিক ধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডে ধান। বৈদিক ধর্ম্মে জড় চৈতন্যের, পৌরাণিক ধর্ম্মে শাক্ত চৈতন্যের পাসনা বিহিত হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মসংসর্গজনিত জারজ নক ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অবিষাদ-প্রধান। তথাপি ভারত-র্ষীয় হিন্দুর জাতীয় চরিত্র যে বিষাদ-প্রধান সন্দেহ নাই। বৈদিক ধর্ম্ম-রায়ণ পারসীর সহিত হিন্দুর তুলনা করিলে একটীকে যুবক ও অন্যটীকে দ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে। পারসী আর্য্য প্রকৃতি, হিন্দু অনার্য্য প্রকৃতি। হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম অদৃষ্টবাদিতা, জাতীয় চরিত্র বিষণ্ণতা। জাতীয় চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয় নহে, কিন্তু শতবৎসরেও অনুভবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে না। হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয় কি না?

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

চীনদেশীয় বেদ।

"যহ্ কিং।"

"হনরে চীন, আর হুজ্জতে বঙ্গালা," এই কথাটী বঙ্গদেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। কেবল বঙ্গ দেশে নয় উর্দ্দুভাষী আর্য্যাবর্ত্তেরও অনেক যায়-গায় প্রসঙ্গ স্থলে অনেকের মুখে একথা শুনিতে পাওয়া যায়। চীন দেশীয় লোকেরা যে শিল্প নৈপুণ্যে চতুর, ইহা অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীর প্রায় সভ্য জাতির মধ্যেই প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যেকের দ্বারাই স্বীকৃত। "চীনাং শুকমিব কেতো প্রতিবাতনীয় মানশু" কালিদাসের প্রসিদ্ধ শকুন্তলার অন্তর্গত এই উপমাটী আমাদের কথিত কথা অনেক পরিমাণে সপ্রমাণিত

যোগাইত। ইহা ছাড়া আমরা ইংরেজদের অনেক বইতেই পাইয়াছি, যাহা নাকি এখন ভাল রূপ স্মরণে আসিতেছে না যে, চীনারা সকলের আগে কম্পাস যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছে। যুদ্ধাদিতেও নাকি তাহারা অনেক প্রাচীন কাল হইতে তোপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া কাগজ, চিনাবাসন ও কাঠের বহুতর আশ্চর্য্যজনক বার্নিস করা চিত্রিত দ্রব্যাদি চীনারা অতি প্রাচীন সময় হইতে প্রস্তুত করিয়া অনেক ভিন্ন দেশীয় লোককে যোগাইতেছে। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা প্রায় ভাষারই মা বাপ মাসী পিসী নির্ণয় করিয়াছেন। এবং সেই ভাষার স্রোত ধরিয়া শাখা প্রশাখায় প্রায় জাতিরই সৃষ্ঠি স্থিতি প্রলয় ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু চীনাদের আশ্চর্য্য ভাষা ও অক্ষর পদ্ধতি যে কোথা হইতে অবতীর্ণ হইল, ইহার কোন মূল এক্ষণ পর্য্যন্তও কার দ্বারা সন্তোষজনক রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই বিশ্বজগতের অব্যক্ত মূলশক্তি যেমন মনুষ্য কল্পনা দ্বারা কোথাও ত্রিগুণে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ইত্যাদি রূপ ত্রিমূর্ত্তিতে পরিচিন্তিত হইয়াছে এবং অপর তেত্রিশ কোটি দেবতা ইহাদেরই যোগ বিয়োগের বিকার বলিয়া ধ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ ভাষা-জগতের অপরি-চিন্তনীয় নিগূঢ় মূলকেও যখন আমরা ঐয়োরোপীক বিজ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিতে যাই, তখন আমাদের চক্ষুঃ সম্মুখে আবার স্বয়ম্ভু গুণবিশিষ্ট ত্রিমূর্ত্তি আসিয়া ভাষা দেবের শিরোদেশকে অলঙ্কৃত করিয়া দণ্ডায়মান হয়। এক সংস্কৃত, দ্বিতীয় আরব্য এবং তৃতীয় চৈন। ভাষার এই তিন স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি যদিও ব্রহ্মার সৃষ্ঠিকাল হইতে লাগালাগি ভাবে এসিয়ার দুই বগল এবং বুক শোভা করিয়া বিরাজ করিতেছে, তবু জানি না সে কি নিগূঢ় কারণ যাহাতে ইহারা (আরব্য ও চৈন) ভারতের চিরপ্রতিবেশী হইয়াও এসিয়ার বক্ষোদ্বেলিত আর্য্য ভাষার স্বীকৃত জননী সংস্কৃত ভাষার (যাহা নাকি আইস্‌লণ্ডের বুকে পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়া নানা তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে একথা ভাষাবিৎদের সাক্ষ্যদ্বারা প্রমাণিত হয়) কথঞ্চিৎ রূপেও কোন জন্ম ধার ধারে না। কি আশ্চর্য্য!

চীনারা বাস্তবিকই এক অদ্ভুত জাতি। যেমন বিশ্বতত্ত্ব এবং ভাষা তত্ত্ব চিন্তাবিভ্রান্তিকর, সেইরূপ চীনাদের উৎপত্তি, স্থিতি, চিন্তাও মনের বিঘূর্ণাজনক। কত জঙ্গীজ্ খাঁই ইহাদের প্রমথন করিল এবং কত ইংরাজ ফরাসীই ইহাদের উপকূলে [illegible] কিন্তু কিছুতেই এই সনাতন

পুরাণ জাতির কোনও কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইল না। কন্‌ফিউসিয়সের ও অনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বকাল হইতে ইহারা একই ভাবে আপনাদের স্বর্গীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে। ইহারা যে আপনাদিগকে স্বর্গীয় জাতি বলিয়া লোকের কাছে গৌরব প্রকাশ করে সে গৌরবেতে বাস্তবিকই অনেক সত্য আছে সন্দেহ নাই। স্বর্গ যেমন মর্ত্ত্যের দুস্কর্ম্ম ও দুর্নীতাদি দ্বারা অস্পৃশ্য। ইহারাও সেইরূপ পৃথিবীর প্রবল জাতিদিগের আকাঙ্ক্ষার অত্যাচারাদি দ্বারা এক প্রকার অপরিধর্ষিত। কেহই ইহাদের উপরে কোনরূপ অত্যাচারের স্থায়ী ক্রিয়া করিতে সমর্থবান হন নাই। মুসলমান ভারতেও আসিয়াছে এবং চীনেও গিয়াছে, কিন্তু স্থায়ী অত্যাচার ভারতে যত আজিও রহিয়াছে ইহাদের দেশের বাড়ী ঘর মন্দিরে এবং আচার পদ্ধতিতে তাহার কোন চিহ্নও এখন খুঁজিয়া পাইবার যো নাই। ইহাদের ব্যবসায় বাণিজ্যাদি সত্যযুগ হইতে অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই জীবিত জাতির যখন সমস্ত আজিও প্রাণ স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে, এবং আপনাদের ভোগবিলাসোপযুক্ত প্রয়োজনীয় সকলই আছে, তখন যে ইহাদের ঘরে বেদের স্থানীয় এবং তাহার সমকক্ষ ও প্রতিযোগী কোন সামগ্রী সযত্নে সংরক্ষিত থাকিবে না এমন কথা কে বলিতে পারে? যখন ইহাদের ভাষা আছে, তখন সেই ভাষার কাব্য আছে, নাটক আছে, দর্শন এবং বিজ্ঞান আছে, বেদও আছে। এই চির প্রাচীন জাতির গৃহ খুঁজিলে কতই না প্রাচীন তত্ত্বের ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু খুঁজে কে? খুঁজিবার উপায় এবং অধিকারই বা কোথায়! ইহারা শত্রু মিত্র উভয়কেই সমসন্দিহানচিত্তে সমভাবে আপন গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে বাহিরে রাখে। বোধ হয় ইহাদের অনেক বয়স হইয়াছে বলিয়া এবং বহুকাল হইতে মানুষের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া দেখিয়া মনুষ্য-সামান্যের প্রতিই ইহাদের একটি সর্ব্বব্যাপী সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে। এবং সেই কারণেই কাহাকেও আপন ঘরের কোন কথা জানিতে দেয় না। পৃথিবীতে মানুষ যেরূপ মানুষের শত্রু, এরূপ শত্রু ইহ জগতে আর কোথাও তাহার আছে কি না, এ পর্য্যন্ত জানা হয় নাই। সকলকে মানুষ পার পাইতে পারে, কিন্তু মানুষের হাত হইতে মানুষের নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। চীনেরা যদিও চতুর বলিয়া এত দিন তাহাদের ঘরের কথা বার্ত্তা বাহিরের লোকের কাছ হইতে অতি

গোপনে সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজি চতুর হইতেও সুচতুর পাশ্চাত্য চরের পাল্লায় পড়িয়া তাহা একে একে ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিতেছে। আমরা চীন দেশীয় বেদের বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিতে এখানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহা এক আশ্চর্য্য পদার্থ। আমাদের বেদের সহিত ইহার অবস্থার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। 'ইহার নাম চীনা ভাষায় "য়হ কিং" অথবা কেবল "য়হ"। আমরা যে অর্থে কতকগুলি গ্রন্থকে বেদ নামে অভিহিত করি, চীনারা হয়তো অবিকল সেই অর্থে তাহাদের আদি পুস্তকের নাম "য়হ" অথবা "য়হ কিং" রাখে নাই। কিন্তু ইহার সমুদয় অবস্থা বেদের অবস্থারই সম্পূর্ণ তুল্য দেখিয়া আমরাই ইহার নাম চীন দেশীয় বেদ রাখিয়াছি। যখন আমাদের বেদ এতদিন এত সতর্কতার সহিত যজমান ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ দিগের খুঙ্গির ভিতরে, যবন ম্লেচ্ছ শূদ্র ও বর্ণশঙ্করাদির কর্ণকুহরের বহুদূরে অতি যত্নে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, তখন নব্যতা-বিদ্বেষী ঘোর সংশয়ী এই চীনাদের পুরাবরোধে "য়হ কিং" যে কত সাবধানতার সহিতই পরিরক্ষিত হইতেছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ধূর্ত্ত ম্লেচ্ছ আজি ব্রহ্মবাসী বেদকে তাহার মাতা গায়ত্রীর সহিত সংহরণ করিয়াছে, সে যে চিরকাল তাহাই তাহার প্রতিবেশী ভগিনী "য়হকিং" কে প্রাচীরাবরোধে পরদৃষ্টির অগোচররূপ পবিত্রতা-ব্রত প্রতিপালন করিতে দিবে, ইহা কোন মতেও সম্ভবপর নহে। প্রোফেসর জেম্‌স লেগ তাই আজি ইহাকে ভাষান্তররূপ পরিচ্ছদ পরাইয়া পৃথিবীর সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইনিই যে ইহার স্বজাতীয় পরিচ্ছদ প্রথম সংহরণ করিলেন, এমন বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহাঁর পূর্ব্বে জর্ম্মণ ফরাসী প্রোফেসরেরাও নাকি শুনিতে পাই তাঁহাদের আপন আপন দেশীয় ভাষাবস্ত্র পরাইয়া এক এক বার ইহাতে আপনাদের ইচ্ছানুরূপে বিহার করিয়াছেন। তবে জেমস্ লেগ সাহেব ইহাকে ইংরেজী গাউন পরাইবাতে ইংরেজি অভিজ্ঞদের পক্ষে ইহাতে কেলি করিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। আমরা লেগ সাহেবকে এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

"য়হকিং" চীনদেশীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক। ইহাকে তাহারা আমাদের দেশীয় বেদের মত সম্মান করিয়া থাকে। সংস্কৃত বেদের সহিত ইহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। কিন্তু বেদ সদৃশ অতিশয় পুরাতন। ইহারও উৎপত্তি কাল

বেদের মত তমসাচ্ছন্ন এবং সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। ইহাতে চীনদেশীয়দিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ঘটিত যে সকল দলীল পাওয়া যায়, তাহা অনেকে অনুমান করেন যে, কম হইলেও ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের হইবে। কারণ বেদ যেমন বেদব্যাস দ্বারা সঙ্কলিত বলিয়া প্রবাদ প্রসিদ্ধ,সেইরূপ"য়হ্‌কিং"ও খ্রীষ্ট জন্মিবার ১২০৫ হইতে ১৭৬৬ বৎসর পূর্ব্বের মধ্যে "হিয়া" নামক বংশীয়দের কাহারো দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধকৃত হইয়াছে বলিয়া চীনাদের কর্ত্তৃক নির্ণীত। ইহা কাহারও অনুবাদ কি অনুকরণ নহে। ইহা চীনাদের পূর্ব্ব পুরুষদিগের আত্মকর্ষণ ঘটিত স্বয়ম্ভু-প্রসূন। কাহারও সাহায্য কি পরামর্শ ইহাতে গ্রহণ করা হয় নাই। এই প্রাচীন গ্রন্থ ৬৪ অধ্যায় অথবা মণ্ডলে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়েরই শিরোদেশে ছয় ছয়টী সমানান্তরাল রেখার একটী করিয়া চিত্র আছে। কোন কোন রেখা মধ্য দিয়া বিচ্ছিন্ন। এই চিত্রের অব্যবহিত নীচে একটী করিয়া অক্ষর আছে। এই অক্ষর দ্বারা ঐ অধ্যায়েরই নাম নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। তৎপর এই অক্ষরকে অগ্রণী করিয়া আরও কতকগুলি অক্ষর ছয় ছত্তরে ক্রমশঃ শ্রেণীবদ্ধরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। "জেন্‌উইং" নামক ইহার বিস্তৃত টিপ্পনি মালার কতকভাগ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা ওয়েংওয়্যাং দ্বারা রচিত বলিয়া কথিত, এবং অপরাপর অংশ চীনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কন্‌ফিউসিয়সের কৃত বলিয়া প্রবাদে আনীত হইয়াছে। টীকাকারেরা সকলেই, যেমন সচরাচর সর্ব্বত্র হইয়া থাকে, মূল গ্রন্থের অর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত। গ্রন্থের পাঁচ ভাগই টীকা টিপ্পনী, আর একভাগ মূল! এই মূলভাগে ৪৫০ ছত্তর, এবং সমস্ত ছত্তরে ৪১৩৯টী অক্ষর! বোধ করি পাঠকবর্গের অনেকেই এটি জ্ঞাত আছেন যে, চীনাদের এক একটী অক্ষরে এক একটী কথা। সুতরাং সমগ্র গ্রন্থকে অন্য ভাষার কথাতে পরিবর্ত্তিত করিতে গেলে পুস্তকের স্বাভাবিক আকৃতি অনেক বড় হইবার সম্ভব। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় রাজা ওয়েংওয়্যাং যখন ১১৪৩ বৎসর খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কারানিবদ্ধ হন, তখন প্রবাদ যে তিনি সেই কারাগারে বসিয়া ধ্যানবলে এই মহাগ্রন্থের রেখা চিত্র এবং অক্ষরমালা সকলের নিগূঢ় অর্থ ও ভাব অতিশয় বিস্তৃত পদ্ধতিতে সর্ব্ব প্রথমে আবিষ্কার করেন। আর যত টীকাকারেরা, তাঁহার পরে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়।

যে ভাষাই হউক তাহার আরম্ভকালে প্রত্যেক শব্দ যে অর্থ বহন করে

এবং যে নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং যে কায়দা কানুনকে আশ্রয় করিয়া তাহার শব্দ সকল মনের ভাব সকলকে যে প্রণালীতে প্রকাশ করে, কাল-বিলম্বে সেই সকল শব্দের অভিধান এবং তাহার আশ্রয়ে মনের কথা প্রকাশের রীতি ও ব্যাকরণ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং কোন অতীব প্রাচীন কালের কোন গ্রন্থ যখন পরবর্ত্তী কোন দূরস্থ কালে কাহারও দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে আরম্ভ হয় এবং সেই গ্রন্থ যখন প্রাদুর্ভূত হইয়াছে তখনকার কোন কায়দা কানুন কি অভিধান কিছু জানা না থাকে, তাহা হইলে ব্যাখ্যারাজ্যে এক মহান্ অরাজক উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন "নাসৌ মুনির্য্যস্ত মতং ন ভিন্নং" ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তখন সেই গ্রন্থ এক নাওয়ারিসি মালের মধ্যে দাঁড়ায়। এবং ব্যাখ্যা বিষয়ে একের ধৃষ্ট ব্যবহার দেখিয়া অন্যে কোমর বাঁধে। যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই সে সে গ্রন্থের দ্বারা রচনা করে। আমাদের দেশে যে সম্প্রতি বেদের ব্যাখ্যা-বিপ্লব উপস্থি হইয়াছে এবং ইহার পূর্ব্বেও যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গের অনেকেরই অন্তঃরকণে বেশ জীবন্তভাবে চিত্রিত আছে। যাস্কী ব্যাখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সায়নী, মাহীধরী, ফৈরঙ্গী, সামশ্রমী, সারস্বতী, দয়ানন্দী এবং মাজেষ্টর ব্যাখ্যা পর্য্যন্তে আসিয়া নামিলে তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, সংস্কৃত বেদ এবং চীনাভাষার অসংস্কৃত "য়হ্কিং" ব্যাখ্যাকারদিগের হাতে পড়িয়া যেন অর্থে ও ভাবে আজি একই রূপ পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চৈন পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে কেহবা "য়হ্কিং"কে অধ্যাত্ম বিদ্যা ও যোগ প্রভৃতির নিগূঢ় তন্ত্র, কেহবা ধর্ম্মনীতিবাদ, এবং কেহবা জড় জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পরিবর্ত্তনাদির দৈবব্যাখ্যা মনে করিয়া সেই সেই ভাবে স্বীয় স্বীয় কল্পনামত অর্থ-সঙ্গতি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত চীনারা "য়হ্কিং"কে এক অতীব বিস্ময়কর এবং ব্রহ্মাণ্ডধর পুস্তক বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে যে এই অদ্ভুত গ্রন্থে না আছে, এমন বিষয় নাই। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্ এবং ধোঁয়াকল প্রভৃতি যাবতীয় আধুনিক বিজ্ঞান কি শিল্পের আবিষ্কার সকলেরই মূলসূত্র ইহাতে নিহিত। বুঝিতে কেবল একটু সতর্কতা এবং মনোনিবেশের সহিত পড়া আবশ্যক। ইউরোপীয় অধ্যায়ীরাও যে ইহার ব্যাখ্যা বিষয়ে অধিক কিছু কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, এরূপ দেখা যায় না। তাঁহাদেরও কারু দৃষ্টি কারু সঙ্গে মিলে না। পণ্ডিতবর 'সুমাচীর' ইহাকে চীনদেশীয়

ইতিবৃত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। "পাইপর" সাহেব ইহাকে নীতি গ্রন্থরূপে বর্ণনা করেন। "হেল্‌কেরিস্" ইহাকে ভাষা-বিজ্ঞান বলেন; ইহার রেখা চিত্র সকলকে (যাহা নাকি চীনাভাষায় "কা" নামে অভিহিত) চীনাক্ষরের ভিত্তিমূল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; "জোট্টলী" অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান বলিয়া অনেক ভাগ তর্জমাই করেন নাই এবং বলেন যে এ সকল অংশের কিছুই বুঝা যায় না। প্রোফেসর রিজিসের বিশ্বাস যে ইহাতে "চৌ" বংশীয়দের কোন পারিবারিক ঘটনামাত্র বর্ণিত হইয়াছে। ক্যানন ম্যাক্‌ক্লাল্‌চী অনুমান করেন যে, ইহাতে প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগদুদ্ভবতত্ত্ব লিখিত আছে। এবং মন্‌সিয়র ফিলাস্তর ইহাকে অতি নিগূঢ়-তত্ত্ব-বিষয়ক ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া মনে করেন। এবং ইহার ভিতরে তিনি তাড়িত-তত্ত্ব, রাসায়নিক বিদ্যা এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতির সাঙ্কেতিক বৃত্তান্ত সকল পাঠ করিয়া থাকেন। এই আশ্চর্য্য পুস্তকের যিনিই রচয়িতা হউন এবং যে উদ্দেশ্যেই তিনি ইহাকে লিখিয়া থাকুন, আমরা দেখিতেছি যে, ইহা কালে আজি বিজ্ঞগণের কল্পনাকাননে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ মূর্ত্তিতে দেশ বিদেশীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মনকে মোহিত করিতেছে। আমাদের দেশীয় বেদও ইহা হইতে কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন। তাঁহারও ব্যাখ্যা আজি পাশ্চাত্য জ্ঞানোদ্বোধিত বাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী কল্পনার আশ্রয় পাইয়া নানা মূর্ত্তিতে শিক্ষিত সমাজের নানা মনকে নানাবিধ প্রকারে বিমোহিত করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব বেদ এবং য়হ্কিং ব্যাখ্যাকারদিগের শব্দ বিমথনকারী উদুখল মূষলে একই ভাবে চূর্ণীকৃত এবং একই প্রণালীর ভাবনাপাবকে জারিত হইয়া আজি যেন একই আকারের গুণবিশিষ্ট মোদক হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

প্রাধান্য কাহার ?

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা প্রথম প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছি। আমরা তাহাতে প্রদর্শন করিয়াছি যে, খৃষ্ট ধর্ম্মের যা কিছু বিশেষত্ব, তাহা হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যেই রহিয়াছে ; যত প্রাচীন ধর্ম্ম জগতে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মই নির্ব্বিকার ও নিরাবীল। এবার আমরা খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টের উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। খৃষ্টের শিক্ষার সহিত অপরাপর ধর্ম্মাচার্য্যদিগের শিক্ষার তুলনা করিব।

খৃষ্ট ধর্ম্ম-সংস্কারকও নহেন, নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপকও নহেন। গোঁড়া ইহুদির সন্তান, প্রাচীন ইহুদি ধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার ব্রত (১)। Jehovah our God is the only god ইহাই তাঁহার ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। মৃতের পুনরুত্থান ও অগ্নিকুণ্ড নরকে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেন। কৃষ্ণ ও শাক্যসিংহেরও এইরূপ জ্ঞান ছিল। ইস্রেইলদিগের জন্যই খৃষ্টের জন্ম, I am not sent but unto the lost sheep of Israel. ইহুদি ভিন্ন অপর সকলকে কুকুরের ন্যায় দেখিতেন (২)। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য। তাঁহারাও ইস্রেইলদিগেরই নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতে গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েন। খৃষ্ট বিধর্ম্মীদিগের নিকট যাইতে নিষেধ করেন (৩)। খৃষ্টের চরিত্রে অনেক মাধুর্য্য লক্ষিত হয়। অকলঙ্ক জীবন সকলের প্রশংসনীয়। নানা প্রকার ক্লেশ ও যন্ত্রণা স্বীকার করিয়া পরের উপকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের নিকট তিনি দেবতুল্য। এই জন্য বহু দোষ সত্বেও পূজনীয়। কিন্তু এ বিষয়ে বুদ্ধ শীর্ষস্থানীয়। খৃষ্টে যে সকল দোষ লক্ষিত হয়, বুদ্ধে সে সকলের অভাব। খৃষ্ট স্বভাবতঃ শান্ত প্রকৃতি হইলেও মধ্যে মধ্যে ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিতেন। অল্পেতেই বিপ্রকৃতিস্থ হইতেন। রোগীগণ তাঁহার নিকট আরোগ্য লাভের আশায়

(১) Math V 17,18.
(২) Mark VII. 27. Math VII, 6
(৩) Math X 5, 6.

উপস্থিত হইলে তাহাদিগের প্রতি পরুষ বাক্য ব্যবহার করিতেন। অসময়ে বৃক্ষে ফলোদ্গম হয় নাই বলিয়া বৃক্ষকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। জেরুসেলামের মন্দির একটী তীর্থ স্থান। এই স্থানে নানাদেশ হইতে বহুলোকের সমাগম হইত। খৃষ্ট এই স্থানে একদল শিষ্যের সহিত লোকদিগের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করেন (৪)। কোপন স্বভাব বশতঃ পরোক্ষে ইহুদি ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি reptiles, a race of vipers, sons of hell ইত্যাদি নানা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

শিষ্যদিগের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্ট রোম রাজ্যের বিনাশ সাধন করিবেন। যখন হাই প্রীষ্ট কায়াফাসের সম্মুখে আনীত হয়েন, খৃষ্ট তখন বলেন আমি "মেসায়া" ইহুদিদিগের রাজা। রোমান বিচারপতি বিচারালয়ে যখন, তিনি ইহাদিগের রাজা কিনা ইহা জিজ্ঞাসা করেন, তখন খৃষ্ট উত্তর করেন "Thou sayest it"(the truth)। সুদানের মাধির ন্যায় আপনাকে রাজা মনে করিতেন। ঈশ্বর হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করিতেন। "I and my father are one." এক সময়ে রাজা হইবার ইচ্ছাটা বড় বলবতী হইয়া উঠে, সেই সময়ে বলেন "But those mine enemies that would not that I should reign over them, bring them hither and slay them before me."এই সব অপরাধে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়। যাঁহার হৃদয় অনুক্ষণ ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন থাকিত, ঈশ্বরের প্রেম ও দয়া ঘোষণাই যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, যিনি ঈশ্বর হইতে আপনাকে অবিযুক্ত মনে করিতেন, অন্যান্য সময়ে যিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, মৃত্যু সময়ে তাঁহার হৃদয় বিষাদে আকুল হইল,সেই প্রেম পিঞ্জরের পাখী গান ভুলিয়া গেল, সেই হৃদয় তন্ত্রী আর নির্ভরের লহরী উঠাইল না, হৃদয় গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গেল,চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিলেন,প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল"My God,my Godwhy hast thou forsaken me." খৃষ্টের শিক্ষা সন্ন্যাস ধর্ম্মের শিক্ষা। এই শিক্ষার জন্ম জাহ্নবীর কূলে, পরে ভূমধ্যসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতে ইহার জন্ম কখন, নির্ণয় করা যায় না। তবে সময়ে সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মনুর নিয়ম অনুসারে বৃদ্ধাবস্থায় যখন সাংসারিক করণীয় সমুদয়

(৪) Mark XI, 15. "To precipitate on the stalls of those necessary traffickers a band of rough galilians, overturning their counters, scattering their coin, knocking about their customers, was on the part of Jesus nothing

সমাপ্ত হইবে, তখন সন্তানাদির উপর সংসারের ভার দিয়া সংসার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে ভগবৎ চিন্তায় জীবন যাপন করিতে হইবে। এ অতি উত্তম নিয়ম। শাক্যসিংহ শিখাইলেন, জীবনের প্রারম্ভেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে, এই শিক্ষা ভারতে প্রচলিত হইল। পূর্ব্বের এ শিক্ষা খৃষ্ট কর্ত্তৃক পশ্চিম দেশে প্রচারিত হয়।

খৃষ্টের শিক্ষা আত্ম নিগ্রহের শিক্ষা, বোধিসত্ত্বের শিক্ষার ধুয়া মাত্র। খৃষ্টের ধর্ম্মনীতি উত্তমরূপে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন ইহুদিধর্ম্মের ভিত্তির উপর বুদ্ধের সন্ন্যাস ধর্ম্ম গঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য (৫)।

যাহা স্বাভাবিক, তাহাই দোষাবহ। প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইবে। আমাদের বাসনা, আমাদের বৃত্তিই আমাদের পরম শত্রু। জীবন ব্যাধি স্বরূপ, মৃত্যুই তাহার একমাত্র ঔষধি। ঐহিক সুখের অন্বেষণ মরীচিকা মাত্র। সুখ ভোগ মানবকে মায়াপঙ্কে অধিকতর নিমগ্ন করিয়া দেয়। স্বাধীন পাখী শৃঙ্খল ভার বহন করিতে চাহে না। শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইবে। জীবন-নিগড় হইতে মুক্তি লাভ ভিন্ন মানবের অন্য লক্ষ্য কি হইতে পারে? আমাদের বাসনা ও বৃত্তির জন্যই যত মোহে আবদ্ধ হই। বাসনা ও বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিলেই স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি। শরীরকে নানা প্রকারে পীড়িত করাই মুক্তির একমাত্র উপায়। বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়েই বিবাহের বিরোধী ছিলেন। বিবাহ ইতর ব্যক্তির কার্য্য। অকৃতদার ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত (৬)। শরীরই যত অনর্থের মূল, যত পাপের আকর। শরীরকে যদি বিকলাঙ্গ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে তাহাও উচিত (৭)। চিত্তের আনন্দভাব দূষনীয় "Blessed are they that mourn. Be afflicted and mourn and weep; let your laughter be turned into mourning and your joy to heaviness." যাঁহাদের স্নেহে যাঁহাদের যত্নে লালিত ও বর্দ্ধিত হইলে, যাঁহারা সকল প্রকার ক্লেশ কষ্ট তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তোমার

(৫) "The essence of the Christian religion is the centre dogma of Buddhism—the doctrine of the worthlessness of terrestrial life.....It was required by the necessity grafting the doctrine of Buddha upon the mythological dogmas at Judaism."—Schopenhauer.

(৬) Math XIX, 10, 11, 12. "It is good for a man not to touch a woman."

(৭) Mark IX, 43, 45, 47. [illegible]

[illegible] স্বচ্ছন্দের জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র, যাঁহারা তোমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত দানেও [illegible]ষ্ঠিত নহেন, পাষাণ হৃদয় হইয়া সেই মাতার স্নেহে পিতার যত্নে পদাঘাত [illegible]রিয়া সেই ভ্রাতা ভগ্নীর প্রীতি ও অনুরাগে বিমুখ হইয়া, সেই প্রিয়তমা [illegible]য়ার প্রেম উপেক্ষা করিয়া সেই পুত্র কন্যার হাসি হাসি মুখে বিষাদ [illegible]লিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নহিলে ভগবৎলাভের আশা কোথা?

"If any man come to me and hate not his father and mother [illegible]nd wife and children and brother and sister, yea his own life [illegible]lso, he cannot be my disciple."

শরীর ব্যাধিগ্রস্থ হইয়াছে, ভেষজ সেবন করিতে হইবে না। আত্মার [illegible]ক্ত শরীর যত্নের অধিকারী নহে। যুক্তি তর্কের আবশ্যকতা নাই, অন্ধ বিশ্বাসই স্বর্গের সোপান। তোমার বুদ্ধিতে কুলাইল না, বিশ্বাস করিতে [illegible]পারিলে না, অনন্ত নরক তোমার। যদি বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া, যুক্তিকে [illegible]পদদলিত করিয়া অসম্ভবও বিশ্বাস করিতে পার, স্বর্গ ভোগ তোমার (৮)। দুষ্টের দমন করিবে না, অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবে। যদি কেহ ক্ষতি করে তাহাকে অধিকতর ক্ষতি করিতে দিবে। দক্ষিণগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে বাম গণ্ড পাতিয়া দিবে। এই শিক্ষার প্রভাবেই অনেক আর্য্য জাতি এত হীন বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এত পদদলিত হইতেছে (৯)। যে দেশে দুষ্টের দমনের জন্য দেবতা মানব দেহ ধারণ করিতেন, যে দেশে বীরপুত্রেরা নিগ্রহকারীকে সমুচিত দণ্ড বিধানে সচেষ্ট থাকিতেন, স্বদেশ রক্ষার্থে অরির সহিত যুদ্ধে প্রফুল্ল চিত্তে প্রাণ দিতেন, সে দেশে এ শিক্ষার প্রভাব কোথা হইতে আসিল? নতুবা লোকে এত তোষামদ প্রিয় কেন? কেনই বা সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর অনাহারে আর্ত্তনাদ শুনিয়াও, বিদেশীর হস্তে ভ্রাতার লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ দেখিয়াও, তাহার কোন প্রতিকার না করিয়া অপকারীকে মিথ্যা চাটুবাক্যে সন্তুষ্ট করিবে? আর কেনই বা খানা দিয়া লোষ্ট্রবৎ ৫০ হাজার টাকা একবারে জলে নিক্ষেপ করিবে?

Luke XXIII., 29.

(৮) "Blessed are they that have not seen yet have believed."

"He that believeth and is baptized shall be saved, he that believeth not shall be damned.

(৯) Herbert spencer বলেন—"a defiant resistence to every form of injustice and official despotism is the price of liberty, & that resistance is incompatible with the spirit of a system that inculcates the duty of self [illegible]

আমাদের শিক্ষা অন্য প্রকার। একবার বিদ্ধস্ত হইলাম অন্যবার যাহাতে না হই তাহারই চেষ্টা করিব। আমরা বলি He who courts oppression shares crime. নিগ্রহ সহ্য করায় বীরত্ব আছে সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া টুপি কাড়িয়া লইলে কোটখানি দিতে হইবে (১০) এ কেমন নীতি! shellyর শিক্ষা খৃষ্ট অপেক্ষা উচ্চ।

"Stand ye calm and resolute,
Like a forest close and mute
With folded arms and looks, which are
Weapons of an unvanquished war."

খৃষ্ট প্রতিবাসীকে নিজের ন্যায় দেখিতে শিক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু যদি প্রতিবাসী তোমার ধর্ম্ম তোমার শিক্ষা অনুমোদন না করে, ঐ দেখ তোমার প্রেমের কমনীয় মূর্ত্তি সহসা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিল। তোমার গুরু তাহা অনুমোদন করিলেন (১১)।

খৃষ্টধর্ম্ম কর্ত্তৃক উপকার অল্পই হইয়াছে, অপকারের শেষ নাই। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম একত্রিত করিলেও তাহারা খৃষ্টধর্ম্মের এক চতুর্থাংশ রক্তপাত ঘটায় নাই। ভিক্টর হিউগো বলেন এক Inquistionএ ৫০ লক্ষ লোককে নৃশংস রূপে হত্যা করা হইয়াছে।

কোন্ ধর্ম্ম পৃথিবীর গতি আছে বলায় গ্যালিলিওকে কারাবদ্ধ করে? কোন ধর্ম্ম বহু গ্রহের সত্ত্বা প্রচারের জন্য ব্রুনোকে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করে? (১২) কোন্ ধর্ম্ম অন্তে সকলই পরমাত্মায় লীন হইবে এই মত প্রচারে সার্ভেটাস্‌কে তুষানলে দগ্ধ করে? কোন্ ধর্ম্ম ড্যানিনির জিহ্বা ছেদ করিয়া পৈশাচিক উল্লাস ধ্বনিতে গগন পূর্ণ করে? কোন্ বিদূষী অবলা হাইপেসিয়াকে রাজপথে বলপূর্ব্বক উলঙ্গ করিয়া তাঁহার কোমল দেহ মুক্তি দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করণান্তর আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক

(১০) "If any man will sue thee at the law & take away thy coat, let him have thy cloak also."

(১১) "Then ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomarrha in the day of judgement than for that city."

(১২) "What a contrast between this scene of manly honor, of unshaken firmness, of inflexible adherence to the truth, and that other scene which took place more than fifteen centuries previously by the fireside in the hall of caiaphas the high priest, when the cock crew and "the Lord turned and looked upon Peter." And yet it is upon Peter that the church has grounded her right to act as she did to P[illegible]" D[illegible]

জ্ঞানের অবসান করে? কোন্ ধর্ম্ম শৃগালের ন্যায় সমাধি স্থান হইতে ষ্টেয়ারের ও গ্যালিলিওর মৃতদেহ ভ্রষ্ট করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে? এই কল জঘন্য ব্যাপার কেবল সেই ধর্ম্মেই সম্ভবে, যে ধর্ম্মের ঈশ্বর ক্রুর, যাহার ায় বিচারের জ্ঞান নাই (১৩)।

মার্টিন লুথারের অভ্যুদয়ের পর হইতে প্রটেষ্টাণ্টদিগের দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের নেক দোষ সংস্কৃত হইয়াছে। এখনও বহুল পরিমাণে দোষ রহিয়া য়াছে। এখন ইউনিটেরিয়ান্‌রা যত্নবান হইলেই খৃষ্টধর্ম্ম নূতন ও রমণীয় র্ত্তি ধারণ করিতে পারে। আমরা দেখিলাম খৃষ্টের শিক্ষা অপেক্ষা বুদ্ধের শিক্ষা অধিকতর সাধু। তবে আমরা সন্ন্যাস ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহি; যাঁহারা হজীবনকে কেবল দুঃখময় ও মায়াময়ই দেখেন, তাঁহাদিগের সহিত ামাদিগের সহানুভূতি নাই।

সংসারে থাকিলে পাছে মন মোহে আবদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় যিনি ংসার পরিত্যাগে উদ্যত, তিনি ভীরু, তিনি কাপুরুষ। ইহাতে কেবল মানসিক দৌর্ব্বল্যই প্রকাশিত হয়। দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, সকল সহিব; সংসারের জন্য, পরের জন্য খাটিব; পরের উপকার করিব; তবেইত নিজের উপকার নিজের শান্তি হইবে। সংসার ছাড়িয়া কেবল আকাশের দিকে যে ধর্ম্ম দৃষ্টিপাত করিতে বলে, সে ধর্ম্ম মানবের উপযোগী নহে, সে ধর্ম্ম স্থায়ী হইবে না, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। দিনে দিনে মানব সাংসারিক হইয়া উঠিতেছে, দিনে দিনে ইহলোকেরই ভাবনা অধিক হইয়াছে। পরলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন। অজ্ঞানগর্ভে নিহিত পরকালের বিষয় তুমিও যেমন জান, আমিও তেমনই জানি; তবে কেন কেবল তাহা লইয়াই এত ব্যস্ত। সংসারের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আতঙ্কিত না হইয়া কেন সেই দুঃখ কষ্ট অপনীত করিতে সচেষ্ট হও না। "ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা?"

কৃষ্ণের শিক্ষাই ঠিক শিক্ষা—

আশক্তিই দোষমূলক। পরকালে সুখের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যে সব কাজ করিতে হইবে, তাহা নহে। ফল সুখই হউক বা দুঃখই হউক, কর্ত্তব্য বলিয়া করিব। সংসারে কাজ করিবে কর্ত্তব্য বোধে। কামনা শূন্য হইয়া তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও, চতুর্দ্দিক আনন্দময় মঙ্গলময় হইবে। জর্জ্জ ইলিয়টের বাক্য পূর্ণ হইবে "Then shall we join that choir invisible whose music is the gladness of the world."

কৃষ্ণ শিখাইয়াছেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে॥

(১৩) "They attributed to the Creater acts of injustice and barbarity which it would be absolutely impossible for the imagination to surpass, acts before which the most monstrous excesses of human cruelty dwindle insignificance, acts which are, in fact, considerably worse than any that theologians have attributed to the devil"—Lecky.

যস্ত্বিন্দ্রিয়ণি মনসা নিয়ম্যারভত্যেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥
* * * * * * * * * * * * *
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তোহ্যাচরণ্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥

শ্রী————বসু।

বিদায়।

আঁধার আসিছে ধীরে ধীরে
রবি ঐ আঁধারে ডুবে যায়,
জগতের সকলি ফুরায়—
শুধু এই জীবন না যায়!

প্রাণে কত ফুল ফুটেছিল
আশায় জীবিত ছিল যারা,
একে একে সকলে শুকা'ল,
বিদায় গেয়েছে কবে তারা!—

সকলি—সকলি চলে গেল,
কেহ গো না ফিরে চাহে আর—
শূন্য এ জগতে গো শুধু
সহচরী বিষাদ আমার!

সংসারের সবি দুদিনের!—
সকলি—সকলি চলে যায়,
আর যে গো পারিনে সহিতে—
কেন না এ জীবন ফুরায়?

মিটেনা গো প্রাণের পিয়াস,
বাড়ে গো শুধুই হাহাকার—
ভেঙ্গে শুধু যায় গো হৃদয়,
বহে শুধু শোক অশ্রুধার!

জীবনের সকলি ফুরা'ল,
ভেঙ্গে গেল আশার কুহক;—
তবে মোর আঁধার জীবন
যাক্ আজ যাক্ ডুবে যাক্!

আর যেন নাহি জাগে কভু
দুঃখ-গীত শুনাতে জগতে,
আর যেন নাহি বেঁচে থাকে
জগতের বিষাদ বাড়াতে।

আজ হ'তে হৃদয় আমার
রবি সাথে ডুবিল আঁধারে,
উঠিবেনা,—জাগিবে না আর,
ডুবে যাক্—যাক্ চির তরে!

কিছুই গো চাহিনা যে আর;—
সকলে আমারে ভুলে যাক্,
চির দুঃখ এনেছি ডাকিয়া—
তাই মোর সাথি হয়ে থাক্!

যাও তবে সব চলে যাও!—
কাঁদিব গো নীরবে একাকী
সংসারে আমার সুখ নাই,
থাকিগো আঁধারে ডুবে থাকি!

যোগ শাস্ত্র।

জ্ঞান দ্বারা যেমন অনেক ভাক্ত বিষয়ের কল্পিত গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অজ্ঞতা দ্বারাও অনেক অসার বস্তুর অনেক সময় ওজস্বীতা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন কালের লোকেরা এই জন্যই অনেক বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সংস্থাপন এবং সংরক্ষণাশয়ে সাধারণ লোকদিগকে শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখিতেন। বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অনেক ব্যাপারেরই ওজস্বীতা সেকালে নির্জ্জন, নীরব এবং গোপন ভাব দ্বারা রক্ষিত হইত। যে কথা, কি যে পুস্তকের অর্থ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া লোকেরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, সেই কথা, কি সেই পুস্তকই সাধারণ লোকেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মান্য করিয়া থাকে। এদেশে সাধারণ বাঙ্গলা ছন্দের উপদেশ অপেক্ষা সংস্কৃত ছন্দের উপদেশই অধিক আদরণীয়! সরল সংস্কৃত ভাষার কথা অপেক্ষা দুর্জ্ঞেয় জটিল বৈদিক ভাষার শব্দ সকল অধিক ওজস্বী। মন্ত্র তন্ত্র প্রভৃতি যতই কুটিল এবং অবোধ্য হয়, সাধারণের চক্ষে ততই তাহার মহিমা এবং বুজুর্গী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে!. যে ফকির কি বাবাজী সর্ব্বদা লোক-চক্ষের অপরিজ্ঞাত স্থানে বাস করেন, ক্বচিৎ কখন কাহাকে দেখা দেন, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে বলিয়া প্রায়ই কথা কহেন না এবং যাহাও কখন কহেন তাহাও এক প্রকার প্রলাপে জড়াইয়া কহেন, সেই ফকির কি বাবাজীর মহত্ত্ব এবং দেবত্ব, বাজারে বেড়িয়া বেড়ান ফকির সন্ন্যাসীগণের মহিমা হইতে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অধিক। এই গোপনীয়তা, দুর্জ্ঞেয়তা এবং অজ্ঞতা যে অনেক সময়েই ব্যপারাদির ওজস্বীতা এবং গুরুত্ব রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা আজি কালির সভ্যতাভিমানী ইউরোপীয় ফ্রীমেসন, (Freemason) থিওসোফিষ্ট (Theosophist) এবং স্পিরিচুয়েলিষ্ট (Spiritualist) দিগের ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যেও অতিশয় সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। বাইবেলেও জ্ঞানতরুর ফলাস্বাদন বোধ হয় এই জন্যই আদম হইতে নিষিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে! আমাদের দেশে যখন যোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়া কাণ্ড সকল এক সময় অতিশয় বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল, তখন তাহারও ব্যাপারাদির নিগূঢ়ত্ব বিষয়ে সাধারণ জনসমাজকে, অর্থাৎ যে সকল লোকের মধ্যে যোগ এবং সাধনের

আলৌকিক শক্তি প্রচার করিতে হইবে তাহাদিগকে, সম্পূর্ণরূপে অন্ধ এবং অন্ধ রাখা হইত। "গোপয়েন্মাতৃজারবৎ" মাতৃজারের ন্যায় সর্ব্বদা গোপন রাখিতে হইবে, প্রত্যেক সিদ্ধপুরুষ এবং যোগীকেই তখন এই শপথ নিতে হইত। কিন্তু ক্রমে যখন সাঙ্খ্য পাতঞ্জলের মূল সূত্র সকল অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠিল, মহানির্ব্বাণ এবং তন্ত্রসারাদির ভাষা, (যাহা নাকি সরল এবং সহজার্থে অশ্লীল; কিন্তু আজিকালির ঐকান্তিক আর্য্যপরায়ণ ভাবুকবাবুদের অনুমিত রূপকার্থে কি না জানি কি,) খোলসা রূপে বুঝান অতিশয় ভার হইল এবং যোগশাস্ত্রাদির নানা উৎকট ব্যায়াম ও তন্ত্রশাস্ত্রাদির শবারোহণ প্রভৃতি বিবিধ বিকট ক্রিয়া সকল লোকেরা করিতে করিতে কতকগুলি ক্লান্ত ও হতাশগ্রস্ত, আর কতকগুলি তাহাদের বি-করাল ও উগ্রভাব দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া পড়িল, আর এদিকে রাজ পরিবর্ত্তনে মখ্‌তব মৌলবীর শাসন যখন ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন প্রায় লোকই এই সমস্ত ব্যাপার হইতে এক প্রকার অবসর গ্রহণ করিয়া আপনাদের বিষয় কর্ম্মে মতি গতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহার যে কিছু পুথি পাঁজি ছিল, তাহা প্রায় সমুদয়ই শিষ্যব্যবসায়ীদের ও আগম নিগম-নিগূঢ়ে একান্ত কৌতূহলপ্রিয় কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়া রহিল। এবং অধ্যাপক প্রভৃতি শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রায় সকলেই অনাস্থা বশতঃই হউক, কি অন্য কোন কারণেই হউক, ইহাতে এক প্রকার স্পৃহাশূন্য হইয়া পড়িলেন। তবে বিশ্বাসীবর্গকে আশ্বাস প্রদান নিমিত্ত এখানে ওখানে কখন কখন দুচারিটি সিদ্ধ-পুরুষ ও যোগী আবির্ভূত হইতেন। মুসলমানেরা দরবেশ-প্রিয় ছিলেন। সুতরাং হিন্দুযোগী ও সিদ্ধ-পুরুষেরা দরবেশ বর্গেরই রূপান্তর হওয়াতে কোন কোন উদার বাদসাহের নিকট হইতেও অনেক সময় উৎসাহ এবং আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতে তাঁহাদের আবির্ভাব কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গজনীর মামুদ, নাদের সা, তেমুরলেং এবং মহম্মদ সা প্রভৃতির পৌনঃপৌনিক সংহার-কাণ্ডে ও লুণ্ঠন ব্যাপারে অনেক মারা এবং বাঁধা যাওয়াতে সংখ্যা বিস্তর কম হইয়া পড়ে। শুনা যায় যে সেই ভীষণ সময়ে অনেকেই নাকি বঙ্গদেশের কামাখ্যা প্রভৃতি নিবিড় ও নিরাপদ স্থানাদিতে এবং হিমালয়ের অন্যান্য গহ্বরাদিতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ভাবে সাত শত কি আট শত বৎসর চলিয়া যায়। অনেক বিঘ্ন বিপদ এবং

ভাঙ্গা চূরা ভারতের অদৃষ্টের উপর দিয়া পার হয়। লোকেরা এই সকল উদ্বেগ ও আপদরাশির মধ্যে যোগীদিগের যোগবল ও সিদ্ধ-পুরুষদিগের দৈবীবল হইতে যখন কোনও আনুকূল্য পাইল না, বরং সিদ্ধগণের মধ্যে অনেক-কেই যখন সেই দাসত্বে ও বন্ধন দশায় পতিত হইতে দেখিল, তখন তাহারা অনেকেই এক প্রকার শপথ-বিশ্বাস হইয়া পড়ে; এবং চূর্ণায়মান দেবমূর্ত্তি সকলের প্রতিও অনেক অল্পভক্তিমান হয়। শাস্ত্রাদির অবলম্বন প্রধান প্রধান বিদ্যাভূষণেরাও সে সময় হইতে আর এ সকল কর্ম্মে বড় একটা উৎসাহী রহিলেন না। আপনাদের ব্যবসায়ে কেবল "দুই কুড়ি সাত" রক্ষা করিয়া এবং কোন প্রকারে যজমান বজায় রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। যোগ ও সাধনাদি এইরূপে ক্রমে অন্ধকারে পতিত হইল। লোক-প্রবাহ, কিরূপে বাদসাহ ও নবাবদিগের অনুগ্রহ ভজন সাধনায় লাভ করিয়া অন্নযোগ সংস্থান করিবে, তাহারই ধ্যানে ধাবিত হইতে লাগিল। যোগ ও সাধন যে, কোন প্রকারের একটা কিছু অতিশয় উৎকট কাণ্ড, শাস্ত্রে অবস্থিতি করিতেছে, একথা একমাত্র জনশ্রুতিতে সাধারণের মনে রহিয়া গেল।

কিছুদিন পর ইউরোপীয়েরা ভারতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। স্থানে স্থানে তাঁহাদের কারু কারু অধিকারও স্থাপিত হইল। ইংরেজেরা ইহার অনেক স্থানই জয় করিলেন। তাঁহাদেরই হাতে শেষে সমুদয় ভারতবর্ষ গেল। যায়গায় যায়গায় স্কুল কালেজ স্থাপিত হইল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিবিধরূপ আলোক ধীরে ধীরে ছাত্রবর্গের মনে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রতিবর্ষে যুবক সকল নানা মত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে কৃত-বিদ্য হইয়া পালে পালে ভারতের নানা প্রদেশ ছাইয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিল। লোকের প্রচলিত সংস্কার সকলে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। একদিকে বিজ্ঞান-সৈন্য ও অপর দিকে কল্পনা এবং প্রাচীন প্রবাদের লাঠিয়ালদলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। শাস্ত্রের গৃহে যত চোরা ঢাপা কথা লুকান ছিল, ইংলণ্ডীয় গুপ্ত চরেরা একে একে সে সমস্ত অনু-বাদ সূত্রে বাহির করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। আত্মভাষা এবং আত্ম বিষয়ক সর্ব্বতত্ত্ব বিস্মৃত ভারতের সন্তান-সামান্য এই সুযোগে সেই সকল পড়িয়া শুনিয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি, নীতি এবং পদ্ধতি প্রভৃতিতে হুল স্থূল এবং মহা গণ্ডগোল প্রবেশ করিল। মনের কবাট ও খিড়কি চারিদিকে যত রুদ্ধ ছিল, শিক্ষার আঘাত পাইয়া

একে একে সকল খুলিয়া গেল। জনসাধারণের চক্ষু এখন চারিদিক দিয়া তাকাইতে লাগিল। যোগশাস্ত্রের তখন বড় একটা চর্চ্চা কোন খানে শুনা যাইত না। শাস্ত্রের এই অঙ্গ যদিও সে সময় অধ্যবসায়শীল উইল্‌সন প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা অনেকাংশে অনুবাদিত হইয়াছিল, কিন্তু তবু তাহার প্রতি শিক্ষিতবর্গের তত সমাদর প্রদর্শিত হইত না। কদাচ কেহ কখন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ঐ সকল অনুবাদিত বই পাঠ করিত। এই মহা প্লাবনের প্রথম তরঙ্গে যখন রামমোহন রায় বঙ্গদেশে সর্ব্ব প্রথমে ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য উদ্যোগী হন, বেদ উপনিষদাদি বহুল গ্রন্থ হইতে একেশ্বরোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে প্রমাণ সকল সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন, পৌত্তলিকদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ সঙ্কলন করেন এবং কিরূপে ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সহায়তায় ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি করা যাইতে পারে বিবিধরূপ পুথি এবং পত্রিকায় শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির সহিত প্রকাশ করেন, তখনও হঠ এবং রাজ যোগাদির বিষয়ে আমরা কিছু শুনিতে পাই না। বরং তখন এই সকল যোগশাস্ত্র এবং উচ্চাটন বশীকরণ ও প্রেতাবতরণাদির মন্ত্র তন্ত্র শিক্ষিত দলের নিকটে এক প্রকার বিদ্রূপেরই বিষয় ছিল। ভক্তি প্রেম এবং ভাবনা মাত্র দ্বারাই ঈশ্বর উপলব্ধ হন ইত্যাদি রূপ সংস্কার প্রেমিক-শিক্ষিত বর্গ দ্বারা তখনও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। ইহার পর দেবেন্দ্রবাবু এবং কেশব বাবুতে কলহ উপস্থিত হয়। এই কলহে সংস্কারকদল দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। এক অংশ প্রাচীনকালগত নানারূপ ভাক্ত সংস্কারাদির বহুলভাগ বজায় রাখিয়া ঈশ্বরারাধনায় রত থাকেন, আর এক অংশ সেই সমস্ত কার্য্য বাক্যে ও মনে সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হন। এবং এই শেষোক্ত দল অবশেষে আপনাদের মত দৃষ্টান্তে এবং উপদেশে সর্ব্বত্র প্রচার করিব বলিয়া দেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। বক্তার কণ্ঠরবে দেশের গ্রাম ও নগর চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হয়। শিক্ষিত যুবকদল সেই রবে প্রোৎসাহিত হইয়া সৈন্য প্রবাহের মত এদিকে ওদিকে ধাবিত হইতে থাকে। জরা এবং যুবসৈন্যে তখন আবার মহা হুলস্থূল। কর্ত্তব্য এবং মমতায় ঘোরতর বিবাদ। সমাজে মহা পরিবর্ত্তন। এই মহাগণ্ডগোলের সময় যখন বক্তৃতা স্রোত চতুর্দ্দিক হইতে নিরবচ্ছন্ন ভাবে লোকসামান্যকে বধির করিয়া তুলিতেছিল এবং সেই বেগে যখন জেন্দা-

বস্তা, কোরাণ, বেদ ও বাইবেল অবনীর চতুষ্কোণ হইতে ধূম ধামের সহিত আসিয়া আপনাদের সম্মিলন ব্যাপার মহাসমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন করিতেছিল, তখনও আমরা সাঙ্খ্য পাতঞ্জলকে গেরুয়া পরিধানে কোন বৈঠকে সমাদৃত হইতে দেখিতে পাই নাই। অথবা মৃত ব্যক্তির আত্মা সকলের সহিত কোন বিচক্ষণকে বড় একটা সাদরে আলাপ করিতে দেখি নাই। তখনও সমস্ত কার্য্য শুক্লবস্ত্র এবং চোগা চাপকানেই সম্পাদিত হইত। তাহার পর মহা পরীক্ষার সময় আসিল। কর্ত্তব্য, নানা জনের নানা আধার হইতে নানাদিক হইতে লোভ, স্বার্থ প্রভৃতি বহুতর রিপুসৈন্যে আক্রান্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহার পতন হইল। এই পতনাঘাতে সংস্কারকদলে বহুবিধ খণ্ড হয়। কোন খণ্ড আপনা হইতে যাইয়া আবার প্রাচীন প্রথা পদ্ধতি প্রভৃতি রূপ শত্রুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করে। কোন খণ্ড শত্রুভয়ে ভীত অথচ আত্ম সমর্পণে লজ্জিত হইয়া শত্রুপক্ষের বহুতর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক স্বর পরিবর্ত্ত করিয়া কৌশলে মিলন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কোন খণ্ড স্বাবলম্বনে আপনার স্বাধীন চ্ছন্দে বিচরণ করাকেই নির্বিঘ্ন জনক মনে করিয়া স্বাধীন চিন্তার শিবির আশ্রয় করে। কোন খণ্ড আপনাদের সমর সজ্জা শরীর হইতে এক কালীন খুলিয়া ফেলিয়া শত্রুমিত্রের প্রতি এক প্রকার উদাসীন ভাবে প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসাইয়া দেয়। আর কতকগুলি আপনাদের পূর্ব্ব সংকল্পিত সংস্করণ কার্য্যে এক প্রকার নিযুক্ত থাকিয়া মন্দ মন্দ উৎসাহে পৃথকভাবে শত্রুসৈন্য সহিত যুঝিতে থাকে। আমরা এসময়েও শেষোক্ত সামরিক দলে কাহাকে সাঙ্খ্য পাতঞ্জলির যানাসনাদি ও গেরুর অথবা পাশ্চাত্য প্রেতাবতারকদিগের আমদানীকৃত মৃতাত্মার সাহায্য গ্রহণ করিতে দেখি না। কিন্তু ক্রমেই যত কালবিলম্ব হইতে লাগিল, হৃদয়ের সাহস (যাহা নাকি কিছুদিন পূর্ব্বে নায়ক এবং অধিনায়কদিগের স্খলন ও পতনাঘাত জনিত সন্তাপে এক প্রকার দ্রবাবস্থাপন্ন হইয়াছিল) ক্রমে লোকের বুক হইতে চোঁয়াইয়া যাইতে লাগিল; সাহসের অবসান দেখিয়া নিরুৎসাহ এবং অবসাদ বায়ুও যখন আস্তে আস্তে সমরক্ষেত্রে সঞ্চরণ আরম্ভ করিল, এবং উদ্যমোষ্ণ তাবৎ নারীর পুরুষের শরীরকে একে একে স্পর্শ করিয়া গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে শিথিল করিয়া ফেলিল, আমরা তখন চারিদিক হইতে ভগ্নহৃদয় সকলকে কোথাওবা নিরাশে হঠ যোগ, কোথাও বা রাজযোগ, কোথা বা প্রেতাত্মা এবং কোথা বা লিঙ্গশরীর

বিশিষ্ট মহাত্মাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখি। যোগশাস্ত্র এবং প্রেত-
ত্মার সহিত এই আমাদের প্রথম দর্শন। কিন্তু এখানে এটি মনে রাখিতে
হইবে যে, তখন পর্য্যন্তও এসকল বিষয়ে লোকের চিত্ত ভাল করিয়া প্রেমিক
হইয়া উঠিতে পারে নাই। কেবল সূত্রপাত মাত্র। এক মাসের প
হইতে বিলাতি কাগজ পত্রে যাহা জড়াইয়া সরাইয়া আসিত, তাহাই এ
মাত্র তখনকার সম্বল ছিল।

কিন্তু এই হুলস্থূলের সময় ভারতেরও তখন যে অবস্থা, ইউরোপেরও
প্রায় তদ্রূপ। সেখানকার লোকেরও এই সময় মধ্যে বাইবেলে বিশ্বা
অত্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের দিন দিন আবিষ্কারে
তাহাদের মনেও প্রাচীন সংস্কারাদির অনেক পরিবর্ত্তন জন্মাইয়াছে
তাহাদের মধ্যেও অনেকে আর বাইবেলের লিখিত গল্প সকল বিশ্বাস
করিতে পারে না। যিশুখ্রীষ্ট নামে যে বাস্তবিক কেহ এই পৃথিবীতে
জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, অনেকে তাহারই আজি পর্য্যন্ত সুন্দর প্রমাণ পাইয়া
উঠিতেছে না। যিশু একজন কল্পিত পুরুষ বলিয়াই তাহাদের মনে বিশ্বাস
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। পো
পের নখর ভগ্ন। বিশপ ও পাদ্রিবর্গের শাসন-সাম্রাজ্যে এখন আর ব
বিচক্ষণ লোককে বাস করিতে দেখা যায় না। বিশ্বাস এবং মত রাজ্যে
অত্যন্ত বিপ্লব। প্রাচীনে নবীনে সেখানেও নিত্যকলহ। সমাজে দলা
দলি এবং পার্লিয়ামেণ্টে ঘুসা ঘুসি। তবে এই মাত্র বিভেদ যে, আমাদের
যত কিছু আন্দোলন এবং আস্ফালন সমস্তই কাষ্ঠ পুত্তলিকার নৃত্যবৎ
আর তাহাদের যত কিছু সকলই প্রাণ এবং বীর্য্যবান্ পুরুষের কার্য্য
যখন সেই প্রদেশ সমস্তেও এইরূপ নিত্য বিপ্লব উপস্থিত, তখন বাইবেলে
নিরাশগ্রস্ত অথচ অতিশয় বিশ্বাসপ্রবণ অনেক ভগ্নহৃদয়ও সেখানে
থাকিবার সম্ভব। বিশ্বাসপ্রবণ চিত্ত হইতে যখন এক প্রকারের বিশ্বাস
বলম্বন খসিয়া যায়, তখন যতটুকু কাল সে তাহার নিরবলম্বন মনের বিশ্বাস
হেতু অন্য অবলম্বন যোটাইতে না পারে, ততক্ষণ তাহার বড়ই কষ্ট। অনেক মন
আছে যে, বহুতর বিষয়েই বিশেষতঃ যেগুলি অমীমাংসিত একমাত্র সংশয়ের
উপর নির্ভর করিয়াই আজীবন কাটাইয়া যায়। কিন্তু বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয়
তাহা পারে না। সে অবলম্বনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে
হস্তপদ প্রসারণ করিতে থাকে। এবং যাহা হাতের কাছে পায় আঁটিয়া

র। ইউরোপীয়েরাও মানুষ এবং আমাদের মতই রক্তমাংসে গঠিত।
তরাং তাঁহাদের মধ্যেও যে সকল বিশ্বাসপ্রবণ চিত্ত আজিকার বৈজ্ঞা-
ক তত্ত্ব ও আবিষ্কারাদির বাতাবর্ত্তে পড়িয়া বাইবেলের হাল হইতে
সিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই আজি ম্যাক্সমূলর দ্বারা উদ্গীত বৈদিক
ষিদের ভাবনা কুসুমে, বৌদ্ধের যোগসাধনায়, সাঙ্খ্যের যানাসনে, গীতার
কাটিপ্পনীতে, এবং ভারতের যত প্রকার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত তন্ত্রে মন্ত্রে
বলম্বন পাইবার জন্য হস্তপদ প্রসারণ করিতে আরম্ভ করেন। কেহবা
াসটাকে অবলম্বন করেন, কেহবা তল্লাসে মাত্র নির্গত হন। ইউরোপীয়-
র এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মে।
ারণ যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদিগকে এক প্রকার অর্দ্ধসভ্য অজ্ঞানান্ধ
বং অজ্ঞ মনে করিত, আজি তাহাদের জাতীয় কোন কোন জ্ঞানলোভী
চক্ষণ ব্যক্তি যে, সেই অন্ধ জাতির অন্ধকারে জ্ঞান পিপাসায় হাতড়াই-
তছে, ইহা হইতে আমাদের চক্ষে আর সুন্দর দৃশ্য কি হইতে পারে?

যাহা হউক, ইউরোপে যখন এইরূপ অবস্থা এবং ভারতে ঐ রূপ, তখন
ারতবাসীরা যেমন একদিকে বাইবেলে সত্য এবং আপনাদের বিশ্বাসের
াশ্রয় খুঁজিতে থাকেন, বিলাতের সাহেবেরাও অপর দিকে সেই রূপ গীতা
ও যোগ শাস্ত্রাদির গ্রন্থে অবলম্বন তল্লাস করিয়া বেড়ান। কিছুদিন পর
অল্কট্ সাহেব ম্যাডাম ব্লাভেট্স্কির সহিত এদেশে পদার্পণ করিলেন। নানা
স্থানে তাঁহার বক্তৃতা হইতে লাগিল। ব্লাভেট্স্কী কাগজ ছাপাইতে
লাগিলেন। তাঁহার কাগজে যত প্রাচীন ভূত প্রেতের গল্প, হঠযোগ রাজ
যোগের ব্যাখ্যা, এবং নানা দিক্দেশের ফকির সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষদিগের
বুজুর্গী এবং প্রশংসা বাহির হইতে আরম্ভ হইল। শিক্ষিত মহলে এক
নূতন মলয় সঞ্চার। সাহেব এবং বিবি যাহা বলেন এবং লিখেন, তাহাতে
অনেকটাই বৈজ্ঞানিক শব্দের ভাজাল থাকে; সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে
পারদর্শী অভিনব যুবক বৃন্দের কর্ণে বড়ই ওজস্বী বোধ হইতে লাগিল।
প্রাচীন এবং অর্দ্ধ প্রাচীন সম্প্রদায় দেখিলেন যে, যে সাহেব এতদিন রাস্তায়
ঘাটে বলিয়া এবং গাইয়া বেড়াইয়াছে যে "তোদের যে ভগবতী তারে
মোরা খাই, সে নাদে, তার চার পা; আর একটা নেজ আছে" সেই
সাহেব-সন্ততি আজি ভগবদ্গীতা এবং সাঙ্খ্যের তল্লাসে যখন গলি গলি
খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং মহাপুরুষ ও যোগীদিগকে ব্রহ্মদৈত্য কবন্ধাদি

ভূত প্রেতের সহিত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে অবশ্য কিছু মহামূল্য দ্রব্য আমাদের অজ্ঞানতা দ্বারা উপেক্ষিত হইয়া আছে! আরও ভাবিতে লাগিল যে, বুদ্ধি বিঘূর্ণাকর এই যে সমস্ত রেলওয়ে টেলিগ্রাফ এবং বৈদ্যুতিক আলো, যাহা আজি পৃথিবীতে এক যুগ প্রলয় উপস্থিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা যখন 'সকলই সাহেবদের জ্ঞাতি কুটুম্বের মস্তিস্ক হইতে নির্গত;'আর এই যে বল বুদ্ধি এবং সাহস যাহার আজি আমরা কোন দিকদিয়াই কুল কিনারা পাইতেছিনা, তাহা যখন সমস্তই ইহাদের শরীরাধারে অধিবাস করিতেছে, তখন ইহারা আমাদের মন্ত্রতন্ত্র এবং কুম্ভক বিরেচনাদির মধ্যে যত শক্তি সামর্থ্য দর্শন করিতেছে,তাহা সমস্তই অবশ্য কোন দুর্লভ সত্য হইবে! কেবল আমরা খুঁজি না এবং বুঝি না বলিয়াই অবহেলায় পড়িয়া আছে! আমরা একস্থানে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি যে, আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধ জন সাধারণ মথ্‌তবের শাসন কাল হইতে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যোগ যে একটা কিছু উদ্ভট্টী ব্যাপার, যাহা সকলের করিবার শক্তি কি সামর্থ্য নাই, ইহা অনেকেরই শ্রুতিতে নিহিত ছিল; এখন সাহেব বিবিকে মুরব্বি পাইয়া ও তাহাতে অত্যন্ত রসিক দেখিয়া যোগ সম্বন্ধে সেই অনভিজ্ঞতা মিশ্রিত মনের একটু একটু গভীরভাব লোক সামান্যের অন্তঃকরণে চতুর্গুণ বেগে চাগাইয়া উঠিল। মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ভট্টাচার্য্যদিগের খুঙ্গির ভিতরে কীটদষ্ট যত ভাগবত, পুরাণ, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, গীতা, কারিকা ও মন্ত্র তন্ত্র পয়সা কড়ি পাওয়া যায় না বলিয়া উপেক্ষা এবং অবহেলায় পড়িয়াছিল, চারিদিক্ হইতে ছাপাখানায় আসিয়া স্তূপে স্তূপে জড় হইতে লাগিল। যে বাঙ্গলা কিতাবের দোকান-দার পূর্ব্বে চটে বসিয়া বটতলায় বই বিক্রয় করিত, সে এখন এই হুজুকে দোতালায় দোকান খুলিয়া বিজ্ঞাপনের সাহায্য বলে টানা পাখার তলে সুখ করিতে লাগিল! শিক্ষিত যুবাদলে হৈ চৈ। আজি এখানে আকাশ ঘণ্টার (Astral bell) রব! কালি ওখানে লিঙ্গপুরুষের আকাশাবলম্বন। পরশ্ব ঐ পাহাড়ে মহাত্মা দর্শন এবং রুমাল, কাচের বাটি ও চুরুট প্রভৃতির ইতস্ততঃ অলক্ষিত ভাবে সঞ্চরণ। আহা! যেদিকে দেখ, সে দিকেই যেন তখন ভানুমতি এবং ভোজ শ্মশান হইতে পুনরুত্থিত হইয়া ইন্দ্রজালে ভারতবক্ষকে ছড়াইয়া

বসিয়া আছে। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! কিছুদিন পূর্ব্বে যখন হরিদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় বাঙ্গালা কথায় আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "এগাছে একটা ভূত আছে আর ঐ কোণের বটগাছটাতে একটা ব্রহ্মদৈত্য আছে। শ্বাসরোধ করিয়া পেটকে জালার মত ফুলাইতে পারিলে আকাশে বেড়িয়া বেড়ান যায়। অভ্যাস বলে পেটের আঁতুড়ী বাহির করিয়া রোজ পুকুরে ধুইতে পারিলে এবং চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত চক্ষু মুদিয়া কোন বনের ভিতরে কিম্বা পর্ব্বত গুহায় ঊর্দ্ধ-পাদ কিম্বা ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়া থাকিলে, এই জগতের সমস্ত নিগূঢ় কারণকে দেখিতে পাওয়া যায়—ইত্যাদি"; তখন আমরা তাঁহার কথা একটুকুও বিশ্বাস করিতাম না। বরং খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিতাম, এবং চোখ মুখের নানা রূপ বিকৃত ভঙ্গি দ্বারা উপহাস ও ব্যঙ্গ করিতাম। হায়! আজি একটা সাহেব এবং মেমের কথা আমাদের সেই সকল রঙ্গরস এককালে উল্‌টিয়া ফেলিল! ইহাদের কি অদ্ভুত শক্তি! কি মিস্‌মেরিজমের বল! না হবে কেন? যখন আমরা ২০ কোটি, আর ইহারা ৭০ হাজার মাত্র।

এই সকল ক্রিয়া কাণ্ড দেখিয়া আমাদের মনে যখন এইরূপ আন্দোলন হইতে লাগিল, এবং ইচ্ছা হইল যে, যোগ শাস্ত্রটা বাস্তবিক কি তাহা একবার দেখি, তখন আমরা নানা বই খুঁজিতে লাগিলাম। সাঙ্খ্যের তখন অনেক সংস্করণ (edition) হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থ খুলিয়া দেখি যে,আসল মুনির কথা কারু বাবারও সাধ্য নাই যে এখন বুঝে। টীকাকারদের কথা কাটাকাটির উপরে সমস্ত ভর। ইহার কিছুদিন আগে বেদ পড়িয়া টীকাকারদের উপরে আমাদের মন অত্যন্ত চটিয়া রহিয়াছিল, এখন সাঙ্খ্যেও টীকাকারেরাই মূলের কর্ত্তা দেখিয়া ঐ গ্রন্থ পরিত্যাগ করিলাম। শেষে হটযোগ, রাজযোগ, কূর্ম্মযোগ এবং শবারোহণ প্রভৃতি বহুতর যোগশাস্ত্র ইংরাজি বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত টীকায় পাঠ করিলাম। কিছুতেই আমাদের বিশ্বাস জমিয়া বসিতে পারিল না। আমাদের মনে কেবল এই উদয় হইতে লাগিল যে, হাঃ! ভগবান্ কি আমাদের নানা রূপ উৎকট ও বিকটাসনে আরষ্ট ধরিয়া না বসিলে, নেত্র নাসিকাদি শক্ত করিয়া টিপিয়া প্রাণবায়ুর কুম্ভকে মর মর না হইলে অথবা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অচৈতন্য হইয়া মাটিতে না পড়িয়া গেলে এবং মনকে কোন প্রণালীতে উন্মত্ততায় আনিয়া প্রলাপ না বকিলে আমাদিগকে দর্শন দিবেন

না এবং কৃপা করিবেন না? এই যে শরীরের স্বাভাবিক অবিকৃত অবয়ব ইহাকি তাঁহাকে জানিবার জন্য অস্বাভাবিক, বিকৃত এবং সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত? তাঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার দুরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ কি অবশেষে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির আরষ্ট ধারণ রূপ চোঙ্গে, এবং মূর্চ্ছা ও প্রলাপের কাচে নির্ম্মিত হইল? এসব কি? এগুলি কি দশস্কন্ধ শতস্কন্ধ রাবণ ও ছিন্নমস্তা চামুণ্ডা প্রভৃতির ন্যায়ই কিছু, না ইহার অন্য কোন রূপ অর্থ আছে? মনের ভিতরে যখন এইরূপ তর্ক হইতেছিল, তখন কাছে খান দুই বই ছিল, তাহার উপরে হাত পড়িল। প্রথম খানা খুলিয়া দেখিলাম সেখানা ঋক্ বেদ। অত্যন্ত প্রাচীন এবং ভারতের আদি পুস্তক বলিয়া পৃথিবীতে সম্মানিত। দুঃখের বিষয় যে টীকাকারদের অধীনতা স্বীকার না করিয়া কোন প্রকারে বুঝিবার যো নাই। নিরুপায় হইয়া টীকারই আশ্রয় লইতে হইল। একে একে সমগ্র পুস্তকের সর্ব্বপ্রকারের টীকাই খুঁজিলাম। কোথাও তাহার মধ্যে কোন ঋষিকে তাহার দেবতার জন্য আরষ্ট ধরিয়া বসা কি দম বন্ধ করিয়া পড়িয়া থাকা অথবা চৈতন্যহীনভাবে প্রলাপ বকা অবস্থায় পাইলাম না। যেখানে দেখিলাম, সে খানেই মনের সরল অভীষ্ট এবং আকিঞ্চন সকল স্বাভাবিক শরীরে থাকিয়া কহিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। ইহাতে জানিলাম যে, সেই ঋষিদের দেবতারাও যেমন তখন স্বাভাবিক, সরল এবং প্রসন্ন দৃষ্টি ছিলেন, তাঁহাদের উপাসক ঋষিরাও ঠিক অবিকল তাঁহাদেরই প্রতিরূপ ছিল। দেবানুগ্রহ লাভ করিবার জন্য উপাসকের শরীরকে যে নানা প্রকার উৎকট এবং বিকট ভাবে সংস্থাপিত করিতে হইবে, তাহা তাহাদের দেবতাদের খামখেয়ালে তখন পর্য্যন্তও উদয় হইয়াছিলনা। দ্বিতীয় পুস্তক খানা খুলিয়া দেখি যে, সেখানা যড়োপনিষৎ। বেদেরই অব্যবহিত পরবর্ত্তী অঙ্গ। খুঁজিতে খুঁজিতে কঠোপনিষদের এক যায়গায় যোগের কথা বাহির হইয়া পড়িল। যথা,—

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে, জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি, তামাহুঃ পরমাঙ্গতিং ॥"

৬ ষ্ঠ বল্লী, ১০ ম শ্লো। অর্থ। যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত যুক্ত থাকে, আর বুদ্ধি বিচলিত হয় না, তখন তাহাকে পরম গতি করিয়া (পণ্ডিতেরা) বলেন। আবার তাহার পরেই যথা,—

"তাং যোগমিতিমন্যন্তে, স্থিরামিন্দ্রিয় ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি, যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥"

৬ষ্ঠ বল্লী, ১১শ শ্লো। অর্থ, এই যে স্থিরা ইন্দ্রিয় ধারণা, ইহাকেই যোগ হে। যোগকালীন অপ্রমত্ত হইতে হয়, কেননা যোগের উৎপত্তিও াছে, বিনাশও আছে। এই দুই শ্লোকের অর্থ হইতে আমরা তখন সার গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাও এখানে পাঠকবর্গকে নাইতেছি। তাঁহারা দেখিবেন যে, এইরূপ যোগে কোন প্রকারেরই ৎকট অথবা বিকট ক্রিয়া নাই। কারণ, কঠ শুধু এই কথা কহিতেছেন , "যখন ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাতে মনকে নিযুক্ত করিতে হইবে, তখন পঞ্চ ানেন্দ্রিয়ের দর্শন শ্রবণ স্পর্শনাদি রূপ পঞ্চ প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা মন যেন দিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত না হয়। মনের সহিত ইহারা যেন সকলেই ক প্রকার নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যোগ দান করে। মনই যেন খন কেবল তাহার আপন বিষয়ে ঐকান্তিক যোগের সহিত রত থাকে। দ্ধিও যেন সে সময় অন্য বিষয়াদির দ্বারা বিচলিত হয় না। আর মন, দ্ধি এবং নিষ্ক্রিয় ইন্দ্রিয় সকল তখন যেন সমবেতভাবে একতান বদ্ধ হইয়া রমাত্মার ধ্যানেই ধাবিত হয়। এইরূপ স্থির ইন্দ্রিয় ধারণার সহিত যে কান্তিক ভাবে মনঃ সংযোগ, তাহাকেই যোগ বলিয়া জান। যোগ কালীন মনের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে যদি কোনরূপ প্রমত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনের অতি চাঞ্চল্যতা বশতঃ যোগ ভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। অতএব প্রমত্ততারূপ চঞ্চলতা যাহাতে না জন্মে তাহা কর। মনঃ সংযোগের ভঙ্গই যোগের বিনাশ। আর তাহার আরম্ভ কালই যোগের উৎপত্তি।" এখন দেখ কঠের কথার যদি এইরূপ সরল ব্যাখা করা যায়, তাহা হইলে যোগ ক্রিয়াতে কোন রূপই অস্বাভাবিক লক্ষণ থাকিতে পারে না। ইহাতে পদ্মাসন প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই। এইরূপ যোগ আমরাও অনেক সময় অনেক বিষয়ে করিয়া থাকি। রুগ্ন শরীর না হইলে ইহাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার কোন কথা নাই অথবা উৎকট বিকট আসনাদি পরিগ্রহেরও কোন দরকার নাই। স্কুলের কোন সামান্য ছাত্র যখন তাহার কোন পুস্তকে অত্যন্ত মনোযোগ দেয়, তখন চক্ষু ছাড়া তাহার অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্থির এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে মনের সহিত সেই পুস্তকের বিষয়ে যুক্ত হইয়া থাকে, এবং বুদ্ধি অবিচলিত

ভাবে তাহাতেই লিপ্ত থাকে। কিন্তু তখন যদি পড়িতে পড়িতে তাহার মন কোনরূপে একবার প্রমত্ত অর্থাৎ অতি চঞ্চল হইয়া উঠে, অথবা কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় শব্দ স্পর্শাদি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়, অমনি তাহার যোগ ভঙ্গ হইয়া যায়; অতএব দেখ ছাত্রদিগকেও অধ্যয়ন কালে কঠ-যোগ অবলম্বন করিতে হয়। আর যাঁহারা কোন বিষয় কেবল মনের দ্বারাই অধ্যয়ন করেন, বাহ্যেন্দ্রিয়াদির কোনও আনুকূল্য চান না, তাঁহারা যখন একান্ত মনঃ সংযোগের সহিত তাঁহাদের সেই ভাবনার বিষয়কে ভাবেন, তখনও তাঁহাদের যোগ কঠের কথিত যোগ সদৃশ হইয়া দাঁড়ায়। এই যোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক যোগ। সত্যপ্রিয়, সরল এবং গুমর-শূন্য সেই আদি ঋষিরা ব্রহ্ম চিন্তা বিষয়ে লোক সকলকে এইভাবে মনঃসংগ্রহ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, আমরা ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম, এবং আরো খুঁজিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ উপনিষদেরই আর এক স্থানে দেখি—

"তন্দুর্দ্দশঙ্গূঢ় মনুপ্রবিষ্টং, গুহাতিতঙ্গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং, মত্বাধীরো হর্ষ শোকৌ
জহাতি॥

কঠ, ২য় বল্লী, ১২ শ শ্লো। অর্থ, সেই দুর্দ্দর্শ, অপ্রকাশ্যভাবে (সর্ব্বত্র) অনুপ্রবিষ্ট, গূঢ়ভাবে স্থিত, পুরাণ (পুরুষ), কে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা জানিয়া ধীর ব্যক্তি (এই সংসারের) হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।—যখন ইহা পড়িলাম, তখন ইহার ভিতরের অধ্যাত্ম যোগ কথাটা আবার কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। ব্যাস এই অধ্যাত্ম যোগ বিষয়ে একখানি ভগবদ্গীতা রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যোগের বহুতর কথারই বহুতর কথার সঙ্গে যোগ নাই। আর্য্যপ্রিয়েরা যেন না রাগ করেন। কারণ,তাঁহার কথা সকলের যোগভঙ্গ-দর্শন হয়তো আমাদের বোধনেত্রের ত্রুটিতেও হইতে পারে, অথবা অনেক কথা কহিতে গিয়া তিনিই শৃঙ্খলা হারাইয়াছেন, এই দোষেও হইতে পারে। যাহা হউক আমরা গীতা পড়িয়া অধ্যাত্ম যোগের বিষয়ে পরিষ্কার ভাবে কিছু ধারণা করিতে পারিলাম না। শেষে অভিধানে অধ্যাত্মশব্দের অর্থ খুঁজিতে লাগিলাম, এবং তাহাতে অধ্যাত্ম শব্দের অর্থ আত্মা,দেহ ও চিত্তের

অধিকরণ, পরব্রহ্ম ও স্বভাব, এতগুলি পাওয়া গেল। "স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে" তাহার এটুকুও তোলা আছে দেখা গেল। এখন এই নিঃসম্পর্ক খণ্ডবিশিষ্ট বোধোপকরণ সকলদ্বারা ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধির আলোকে অধ্যাত্ম যোগ সম্বন্ধে আমরা এখন যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহা এখানে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। আমাদের অর্থসঙ্গতি যুক্তি মূলক কি না, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বুদ্ধির আলোক-সাহায্যে বিচার করিবেন। অধ্যাত্ম শব্দ আত্মা, দেহ ও মনের অধিকরণকে বুঝায়। এই তিনের আধার কি? না, সেই ঈশ্বর অথবা পরব্রহ্ম। অতএব তাঁহার চিন্তা বিষয়ে যে ঐকান্তিক ভাবে মনঃসংযোগ,তাহাই অধ্যাত্ম যোগ। কিন্তু যখন পরব্রহ্ম আমাদের চিন্তাতীত, এবং জ্ঞানাতীত, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" যাঁহাকে বাক্য, মনের সহিত না পাইতে পারিয়া পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে। এবং কোন মতেই সোজাসোজিভাবে যাঁহাকে গাছ মাছ পর্ব্বতাদির ন্যায় স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার চিন্তাতে মনোযোগ কিরূপে হইতে পারে? এই কথা মীমাংসার জন্য আমরা এই স্থির করিয়াছি যে, অদ্বৈতবাদীদের মতে স্বভাব এবং পরব্রহ্ম যখন পৃথক নহেন, ওতপ্রোতভাবে দুইই যখন দুইয়েতে অবস্থিতি করিতেছে এবং একেরই স্থূল এবং সূক্ষ্মভাব যখন অপর, তখন স্বভাবরূপী এই অনন্ত প্রকৃতি-সমুদ্রের বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলীতে সেই সুমহান্ নিগূঢ় শক্তির জ্ঞান তেজ এবং ক্রিয়াদির অসীমত্ব, ঐকান্তিক মনঃসংযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে পারিলে এবং তদ্দ্বারা সেই অনন্তের অস্তিত্বাভাস কিয়ৎ প্রমাণেও হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলে অধ্যাত্ম যোগ হয়। এই শেষোক্ত প্রণালীর অধ্যাত্ম যোগ অনেক কারণে আমাদের নিকট অতিশয় প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্যাসও বোধ করি এই মনে করিয়াই স্বভাবকে অধ্যাত্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং তাঁহার গীতান্তর্গত অত আলাং-পালাতের ভিতরে আমাদের অনুমান হয়, যেন তিনি অস্পষ্টভাবে এই অনন্ত প্রকৃতি শরীরে ধ্যান ধারণাকে স্থাপন করাই অধ্যাত্ম যোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। ইউরোপ প্রভৃতিতেও আজি কালি উজ্জ্বল-মস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক যোগীরা এইরূপ যোগই করিয়া থাকেন, ইহার বিশুদ্ধানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ যেন একই কথা। যেহেতু, কারণের কার্য্য সকল হইতে যে আনন্দ আসে তাহা কারণেরই সম্ভূত জানিতে হইবে। যখন এই আনন্দসাগরে কারু মন একবার ডোবে, এবং ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারের অসীমত্বে আপনাকে হারাইয়া

যায়, তখন তাহার সেই অনণুমেয় ক্ষুদ্র সাংসারিক হর্ষ এবং শোক তাহাকে লাগাল পায় না। সে সেই যোগাবস্থায় পৃথিবী হইতে অনেক উপরে বাস করে। এবং তাহার সাধনার পথে যতই অগ্রসর হয়, ততই আবিষ্কাররূপ কত কিছু স্বর্গীয় বরে ভূষিত হইতে থাকে। প্রকৃত প্রকৃতি-প্রেমিক কখন তাহার ঈশ্বরের বিরহ অনুভব করে না। বোধ হয় এ কথা সকলেই জানেন যে, যখন কোন দুরপনীয় কারণে মন যারে সর্ব্বদা দেখিতে চায়, এরূপ কোন অতীব প্রিয়তমের সহিত যখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখা হইতে পারে না, তখন তাহার হস্তবিগলিত রুমাল কি অঙ্গুরি অথবা রচিত পুথি পাঁজিতে তাহাকে প্রকারান্তরে দেখিয়া ও তাহার সংসর্গ উপলব্ধি করিয়া মন যেরূপ তৃপ্তি লাভ করে, তাহার সঙ্গে একত্র থাকাকালীন হয়তো সেরূপ তৃপ্তি সুখ একদিনও মন লাভ করিতে পায় কি না সন্দেহ। কোন কবি এই জন্যই এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন,—

"সঙ্গম বিরহ বিকল্পে, বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যা।
সঙ্গে সৈব যদৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

অর্থ, মিলন এবং বিচ্ছেদের মধ্যে, বিচ্ছেদই বরং ভাল, মিলন ভাল নয়। কেন না, যখন তাহার সহিত একত্র থাকা যায়, তখন সে আর আমি এক হইয়া যাই; কিন্তু তাহার বিরহ সময়ে ত্রিভুবনময় কেবল তাহাকেই দেখি। অতএব যিনি যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক তিনি কখনও ঈশ্বর দর্শন হেতু চক্ষু মুদিয়া অন্ধকারে কিছু তল্লাস করেন না, অথবা যোগাসনাদির উৎকট অবস্থায় আপনার শরীরকে স্থাপন করিয়া বৃথা ক্লেশ ও পরিশ্রম উৎপন্ন করেন না। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে ও স্বাভাবিক শরীরে স্বভাবের যে অঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই অঙ্গেই শক্তি, তেজ ও কৌশলের অনন্ত ভাবে ডুবুডুবু হইয়া পড়েন। জিজ্ঞাসা কর, কিছুই বুঝাইতে পারিবেন না। কোনরূপ শৃঙ্খলা কি বাঁধুনীর মধ্যেই সেই অনন্তকে আনিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার চিত্ত এক অনির্ব্বচনীয় গুরুতর ভারে চারিদিক হইতে যেন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, এই মাত্র অনুভব করেন। এবং সেই অসীম ও অব্যক্ত ভারস্পর্শকেই তিনি তাঁহার প্রিয়তমের শরীর স্পর্শ মনে করিয়া বহুমন্যমান জ্ঞানে আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকেন। ইহা ভিন্ন ঈশ্বরকে ধ্যানে অন্য কোন ভাবে ধরিবার জন্য যদি আশা কর, তবে তাহা

বৃথা। কেন না, তিনি আবহমান কাল হইতে প্রেমিক জ্ঞানীদের দ্বারা সর্ব্বদাই একমাত্র "ভর্গে" ধৃত হইয়া আসিয়াছেন। তুমি যদি ব্রাহ্মণ হও এবং আপনার গায়ত্রী ভুলিয়া গিয়া না থাক, তাহা হইলে স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি প্রত্যহ তোমার ঈশ্বরের কি বিষয় ধ্যান কর। যথা,—

"ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ॥"

অর্থ, "সেই জগৎ প্রসবকর্ত্তা দেবতার বরণীয় ভর্গকে (তেজ,শক্তি,জ্ঞান ও মহিমা প্রভৃতিকে) আমি ধ্যান করি। যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল (নিত্য) প্রেরণ করেন।" দেখ, এখানে তুমি কোন মতেও তোমার দেবতার ভর্গের ওপিঠে যাইতে পার নাই। আর সেই ভর্গও তুমি এই প্রকৃতি ছাড়িয়া অন্যত্র কুত্রাপি এত অধিক জাজ্জ্বল্যতর রূপে দেখিতে পাও না। তোমার আমার পূর্ব্বে বহুতর মহা মহা জ্ঞানী ধ্যানে, যোগে ও তপস্যায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া এই পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়াছেন। এবং সাধন ভজনের পর সর্ব্ব শেষে যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই চারিটি কথা তোমাকে মনে করিয়া দিবার জন্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,

"যদিমন্যসে সুবেদেতিদভ্রমে বাপি নূনং ত্বং বেত্থ
ব্রহ্মণোরূপং।"

কেনোপনিষৎ, ১০ম শ্লো। "যদি মনে কর তুমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছ, তাহা হইলে তুমি অতি অল্পই জানিয়াছ। যেহেতু ব্রহ্ম কারু বিচারণীয় নহেন।" আবার

"যস্যামতং তস্যমতং, মতং যস্য নবেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাং॥"

কেনোপনিষৎ,১১শ শ্লো। "যাঁহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে,ব্রহ্মকে জানা যায় না তিনিই তাহাকে জানিয়াছেন। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে কিছুই জানেন নাই। জ্ঞানবান ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্মজ্ঞেয় হয়েন না। আর অজ্ঞ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, তিনি জ্ঞেয় হয়েন।" ঠিক এইরূপই সেণ্ট অগস্তিনও তাঁহার "ডি অর্ডিন"নামক পুস্তকের এক স্থানে কহিয়া গিয়াছেন। যথা, "Of Whom there is no knowledge in the human soul save to know how it

knows Him not." তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে মনুষ্য আত্মাতে কোন জ্ঞান নাই। তবে তার এই জানা দরকার যে, সে তাঁহার কিছুই জানে না।

যোগ এবং সাধনা দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষৎ কর্ত্তা মহামহোপাধ্যায় ঋষিরা পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যতদূর জানিয়া গিয়াছেন, তাহা এক প্রকার অতি সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে দেখান হইল। আর আমাদের যোগশাস্ত্র এখানে বিস্তার করিতে ইচ্ছা করি না। যোগ ত্যক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু কি জন্য আমরা এখানে এত যোগ কহিলাম, তাহার নিগূঢ় বোধ হয় পাঠকবর্গ ঘূণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। সম্প্রতি সেই রহস্য তাঁহাদের কাছে খুলিবার নিমিত্ত প্রস্তাবে অগ্রসর হইতেছি। পূর্ব্বে আমরা যত কহিয়া আসিয়াছি, সমস্তই প্রাচীন যোগের কথা। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দির যোগ ও সেই যোগজাত বল এবং ক্ষমতা যে কিরূপ, তাহার কিছুটা নমুনা কোন বন্ধুর পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকবর্গ ইহা দ্বারা আপন আপন কৌতূহল নিবৃত্ত করিবেন।

বন্ধু আমাদিগকে লিখিতেছেন—

"গোঁসাইজি এইবার নূতন বেশে ও নূতন ভাবে এখানে আসিয়া অনেক লোককে যোগশিক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

"গোঁসাই জির এবার গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, গেরুয়া বর্ণের পিরহন গায়, পায় জগন্নাথী জুতা, মুখে কেবল সর্ব্বদাই হরিবোল হরিবোল হরিবোল শব্দ অর্থাৎ উপাসনার সময় হরিবোল আল্লা বল এই শব্দ।

"উপাসনার সময় গোঁসাই বসিয়া বসিয়া কেবল হরিবোল হরিবোল বলেন, পরে যখন ব্রহ্মসংকীর্ত্তন আরম্ভ হয় তখন বসা হইতে দাঁড়াইয়া হরিবোল বলেন, পরে স্থিরভাবে চক্ষু মুদিয়া থাকেন।

"এবং তাঁহার সঙ্গীয় চেলারা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। গোঁসাই যখন পড় পড় হয়েন, তখন তাঁহার চেলারা গোঁসাইকে ধরিয়া একেবারে শোয়াইয়া ফেলে। গোঁসাই অজ্ঞানাবস্থায় চুপ করিয়া থাকেন। পরে কীর্ত্তন থামিয়া যায়, কিন্তু গোঁসাই অজ্ঞানই থাকেন। তাহার পর তাঁহার চেলাগণ যখন তাঁহার কাণের কাছে প্রায় ১০ কি ১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত হরিওঁ হরিওঁ শব্দ করে, তখন গোঁসাই অর্দ্ধ চৈতন্যযুক্ত হইয়া শোয়া হইতে উঠিয়া বসেন। প্রথম অস্পষ্টভাবে গোঁ গাঁ করিয়া কত কি বলিয়া থাকেন। কোন কোন দিন স্পষ্ট করিয়াও নানা কথা বলেন।

কোন দিন বলিয়া থাকেন "কাজি সাহেব! সোভান আল্লা, সেলাম, আসুন। (হাত অগ্রসর করিয়া) বলুন কেমন আছেন? এখানে কত দিন যাবৎ আছেন? আপনার কাজ কর্ম্ম কেমন চলিতেছে? আবার কবে দেখা হবে? এতদিন দেখা হয় নাই কেন? ইত্যাদি"। কোন দিন বলেন আসিয়াছেন? বেশ্ হইয়াছে। আমাকে আর পরীক্ষা করিবেন না। আমি পরীক্ষা দিতে পারিব না। আমায় ওসব আর করিবেন না। আমাকে ক্ষমা করুন। একবার আমাকে আপনারা পরীক্ষা করিয়া বিষমে ফেলিয়াছিলেন। যোগিনী মাতা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমাকে পরীক্ষা করার জন্য বলিয়াছিলেন যে, তুমি সিদ্ধা হও। সিদ্ধা হইলে অনেক রোগ আরাম করিতে পারিবে। এবং অনেক জহুরা দেখাইতে পারিবে। আমি তাহাই স্বীকার করিয়াছিলাম। তাহাতে আমার যোগিনী মাতা আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—য়! তুমি কি স্বীকার করিয়াছ? তুমি কি চাকুরি লইতে চলিয়াছ? তখন আমার জ্ঞান হইল। জ্ঞান হওয়াতে আমি সিদ্ধা হইতে অমত প্রকাশ করিলাম। বলিলাম, আমি সিদ্ধা হইতে চাহি না। ওসব আমার দরকার নাই। আমার চক্ষু আরো পরিষ্কার করিয়া দেও। আমি ঈশ্বরকে ডাকিতে পারি। এবং আমার তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকে, তাহা হইলেই হয়।" এই কথার পরেই ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। পরে গোঁসাইর নিকট একদিন নানা ব্যক্তি নানা মত প্রশ্ন করেন। তাহাতে আমার প্রশ্নের উত্তর তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাই নীচে লিখিতেছি।

"প্রশ্ন। আপনি উপাসনার পরে যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, তাহা কাহার সঙ্গে বলেন?

উত্তর। যে সকল যোগী অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষ আছে, যোগ বলে তাহাদের সহিত আমার দেখা হয়, আমি তাহাদিগের সহিত কথা বলি, তাহাই তোমারা শুনিতে পাইয়া থাক।

প্রঃ। উপাসনার সময় যখন অজ্ঞান থাকেন, তখন আপনার মনের ভাব কি রূপ?

উঃ। তখন আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ থাকি। তাঁহাকে দেখি; এবং

প্রঃ। ঈশ্বর দেখিতে কিরূপ ?

উঃ। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী নহেন। কিন্তু জড় পদার্থও নহেন। এক খণ্ড আলোময় মাত্র।

প্রঃ। যোগবলে আপনি যত জীবিত যোগী আছে কেবল কি তাহাদিগকে দেখেন, না আরো কিছু দেখেন ?

উঃ। যোগবলে সমস্ত দেখি। পরকাল দেখি, মৃত লোকের আত্মা দেখি এবং জীবিত লোক সকলের অন্তরের ভাব দেখি।

প্রঃ। জীবিত ব্যক্তি সকলের অন্তরের ভাব যদি আপনি দেখেন, তবে যাহার যাহা দেখিতে পান তাহা তাহাকে বলিলে তো ভাল হয়, সে সংশোধিত হইতে পারে। তাহা বলেন না কেন ?

উঃ। তাহা বলিলে সংসার থাকে না। এই জন্য সমস্ত ব্যক্তির অন্তরের ভাব জানিয়াও আমি কাহাকে কিছু বলি না।

প্রঃ। পরকাল যাহা আপনি দেখিতে পান, তাহা কিরূপ স্থান ?

উঃ। সকল জিনিস ও বৃক্ষ লতা গুল্ম কীট পতঙ্গ গৃহাদি সকলেরই সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর আছে। এখানে আপনারা স্থূল শরীর যেরূপ দেখিতে পান, পরকালে সেইরূপ সমস্তের সূক্ষ্ম শরীর আছে। ঘর বাড়ী বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সেখানে সকলই সূক্ষ্ম শরীরে আছে।

প্রঃ। পরলোকে স্ত্রী পুরুষ আছে কি না ?

উঃ। আছে। স্ত্রীলোক সকল যেখানে আছেন পুরুষ আত্মা সকল সেখানে যাইতে পারে না। কেবল যাঁহারা যোগবলে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সেখানে গণ্য হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই যাইতে পারেন। পুরুষ যদি ধার্ম্মিক হয় এবং স্ত্রীলোক অধার্ম্মিকা হয়, তথাপি স্ত্রীলোকের স্থান পুরুষ ধার্ম্মিকের স্থান হইতে উচ্চে নিরূপিত হয়।

প্রঃ। কালী দুর্গা মহাদেব ইহাদিগের ভজনা করিলে মুক্তি আছে কি না ?

উঃ। আছে। ঈশ্বর জ্ঞানে যে যাহার প্রতি সরল বিশ্বাস ও ভক্তি করে তাহারই মুক্তি হইবে। এবং ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারিবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রঃ। পুনর্জন্ম আছে কি না ? থাকিলে তাহা কিরূপ ?

উঃ। ঈশ্বরের শাসনে যেরূপ পৃথিবী দেখিতেছেন, সেই রূপ আরও অনেক পৃথিবী আছে যেমন সূর্য্যলোক চন্দ্রলোক এবং নক্ষত্রলোক

ইত্যাদি। এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সেই সব পৃথিবীতে যাইয়া জন্ম হয়। সেখানকার লোকের যেরূপ শরীর, সেই রূপ শরীর প্রাপ্ত হয়।

প্রঃ। আমরা মৃত ব্যক্তির আত্মা দেখিতে পারি কি না ?

উঃ। ঘোরতর পাপীকেও ৪ দণ্ডের মধ্যে আমি যোগবলে ঈশ্বর দেখাইতে পারি। কিন্তু তাহা করার এখনও সময় হয় নাই।"

প্রঃ। আপনার যিনি গুরু তাঁহার সহিত আপনার দেখা হয় কি না ?

উঃ। হয়। তিনি আমার উপাসনার সময় এই খানে প্রতি দিন আসিয়া যোগ দান করেন। তাঁহাকে কেবল আমি দেখি।

প্রঃ। আপনি যাহা দেখিতে পান, আমরা কেন তাহা দেখিতে পাই না ?

উঃ। এই চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইবেন না। আমি এই চক্ষে দেখি না। আর একটী চক্ষু আছে, যোগ করিতে করিতে সাধনবলে আমার তাহা খুলিয়া গিয়াছে। তাহা অন্তর্দিব্য চক্ষু। তাহা দ্বারা আমি দেখি। যাহার তাহা নাই, সে কি প্রকারে দেখিবে ?"

"গোঁসাই এবার এই সহরে আসিয়া অনেককে যোগ মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিয়াছেন। এই মন্ত্র এক এক জন করিয়া নির্জনে অতি গোপনে কাণে কাণে বলিয়া দিতে হয়। অন্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ। এই মন্ত্র দ্বারা প্রতি দিন তিন বেলা অতি নির্জ্জনে বসিয়া যোগ সাধন করিতে হয়। সেখানে অন্য লোক যাইতে পারে না। কিন্তু যাহারা ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যাইতে পারে। মন্ত্র গ্রহণকারীগণ একত্র হইয়া যোগ করিতে পারে। যাহারা যোগ লইয়াছে, তাহাদের কয়েকটী নিয়ন পালন করিতে হয়। কাহারো হুকায় তামাক খাইতে নিষেধ। কাহারো পাতের ছোঁয়া খাইতে পারিবে না। এবং অন্য কাহারো বস্ত্রাদি গ্রহণ কি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

"এখানে স্থানে স্থানে আত্মা আসে। তোমাকে তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ব্রাহ্মেরা যে আত্মা আনিয়া থাকে, সেই আত্মা দেখিতে গোঁসাই এক দিন গিয়াছিলেন। গোঁসাই সেই আত্মার নিকট যাইয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন। এবং আত্মা যাহার উপরে ভার হইয়াছিল, তাহাকে কোলে করিয়া অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যখন গোঁসাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, এই কাহার আত্মা এখানে আসিয়াছেন ?

আপনি কি ইহাকে চিনিতে পারেন? তখন গোঁসাই বলিলেন আমি ইহাকে চিনিয়াছি। কিন্তু এখন নাম বলিতে পারি না। কারণ, অন্যান্য যে সকল আত্মা এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা আমাকে নাম বলিতে বারণ করিতেছে। তাহার পর আত্মা চলিয়া গেলে বলিলেন যে, এ আমার পরম বন্ধু অঘোর নাথ গুপ্তের আত্মা।

"অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিলেন। গোঁসাই ইহাও বলিলেন যে, এই সহরে যে সকল বড় বড় বৃক্ষ আছে, তাহাতে আত্মা আছে। ঐ আত্মাগণ আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছে যে, তুমি এখানে আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমাদিগকে তুমি ঈশ্বরের নাম শুনাইয়া যাও। তখন গোঁসাইর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, আত্মারা সমাজে গিয়া ঈশ্বরের নাম শুনে না কেন? গোঁসাই উত্তর করিলেন, কতকগুলি খারাপ আত্মা আছে, তাহারা উহাদিগকে সমাজে যাইতে দেয় না। ঈশ্বরের নাম করিতে দেয় না। মুখ চাপিয়া ধরে, গতি রোধ করে। ঐ সকল বৃক্ষতলায় একবার কীর্ত্তন করিতে হইবে ইত্যাদি।

"এখানে—ল বাবু, তাঁহার কন্যাগণ, ও ৪ বৎসর বয়সের এক কন্যাও যোগ লইয়াছে।

"আর যে সকল লোক লইয়াছে, তাহারা তোমার চেনা লোক নহে। চেনার মধ্যে—স্ত বাবুর স্ত্রী—ক্ষীও যোগ লইয়াছে। ইহা ভিন্ন আমাদের দলের আর কেহ যোগ লয় নাই। অনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীও যোগ লইয়াছে।"

দেখিলেন, পাঠক বর্গ, কি কাণ্ড? দেখিলেন, আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দির যোগশাস্ত্র? আমাদের ঈশ্বরের অবস্থা; পরকালের চিত্র, এবং যোগবলজনিত শক্তি ও ক্ষমতা? দেখিলেন, দেশের প্রথা পদ্ধতি, সমাজ ও সংস্কারাদির সংস্করণ? দেখিলেন, কি লইয়া এবং কি ভাবিয়া জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় ইহারা গৃহে আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইয়াছিল এবং কি লইয়াই বা আবার সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীতে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে? ধর্ম্মের গভীর রঙ্গ ভূমিতে যে কত প্রকারেরই প্রহসন প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা দেখিলেন? দেখিলেন কিজন্য চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ এবং হতাদর হইয়া পড়িতেছেন? যাহা আপনাদিগকে জানান গেল

হা হইতেও অধিক রহস্য বন্ধুর পত্রে বর্ণিত ছিল, কেবল বিস্তারতার ভয়ে প্রকাশ করিলাম না।

গোঁসাইর পরকাল-পট এবং ঈশ্বরের রূপচিত্র দেখিয়া একটী কথা আমাদের মনে পড়িল। আরিষ্টটল এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডেতে যাহা, ঈশ্বরের হৃদয়েও তাহা। আর এই পৃথিবীতে যাহা, মানুষের মনেও তাহা। মানুষ যাহা কিছু ভাবে, চিন্তে সমস্তই এই দৃশ্য সংসারের দ্রব্যাদির প্রতিরূপ। তাহার মন এখানকার জিনিস পত্র ছাড়াইয়া আর কোথাও যাইতে পারে না। যদি সে কখনও এবিষয়ে জ্ঞান করে, কি ইহার অতীত কিছু দেখিতেছি বলিয়া গর্ব্ব অথবা ধৃষ্টতা প্রকাশ করে, তাহা হইলেই গোঁসাইর মত উল্লিখিত ভাবে বুদ্ধিমান্ লোকের নিকটে উপহাসাস্পদ হয়। বিড়াল যখন নিদ্রায় থাকে, তখন সে তাহার স্বপ্নরাজ্যে কেবল মূষিকেরই নৃত্য দেখে! এবং মৃত্যু শেষে পরকালেও কারু গৃহের কোণে কাণাচে খাপে বসিয়া মূষিকই ধরিবে আশা করে।

আমরা পাঠক বর্গের নিকটে এই সকল কথা আজি অত্যন্ত মনক্ষোভে পড়িয়া জানাইলাম। কাহাকেও উপহাস কি ব্যঙ্গ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ আমাদের হৃদয় অত্যন্ত গভীর দুঃখে তরঙ্গায়িত হইতেছে। আমাদের আশা, যেও এত দিন একটুকু লূতাতন্তুতে বাধিয়া রহিয়াছিল, তাহা আজি এই সকল বিভীষিকা দর্শনে প্রকম্পিত হইয়া সমূলে সমস্ত খসিয়া পড়িল। এখন জানিলাম যে, কালবৃদ্ধ ব্যাস তাঁহার যোগশাস্ত্রের যতপ্রকার শাসন, দমন, নিগ্রহ ও নির্ভৎসনাদি আছে, তাহা সমস্ত কহিয়া উপসংহার কালে যাহা কহিয়াছেন, তাহাই বাস্তবিক সার, আর সমুদয়ই যেন আলাৎপালাৎ। যথা,

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্বাঃ, প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহ কিং করিষ্যতি।" গীতা।

অর্থ, সহস্র জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইলেও সে আপনার স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুরূপই কার্য্য সকল করিয়া থাকে। প্রাণীরা সর্ব্বদাই আপন আপন স্বভাবকে অনুগমন করে; নিগ্রহাদি করিলে কি হইবে? বেকন সাহেবও এক স্থানে বলিয়াছেন "Nature is often hidden

আপনি কি ইহাকে চিনিতে পারেন? তখন গোঁসাই বলিলেন আমি ইহাকে চিনিয়াছি। কিন্তু এখন নাম বলিতে পারি না। কারণ, অন্যান্য যে সকল আত্মা এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা আমাকে নাম বলিতে বারণ করিতেছে। তাহার পর আত্মা চলিয়া গেলে বলিলেন যে, এ আমার পরম বন্ধু অঘোর নাথ গুপ্তের আত্মা।

"অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিলেন। গোঁসাই ইহাও বলিলেন যে, এই সহরে যে সকল বড় বড় বৃক্ষ আছে, তাহাতে আত্মা আছে। ঐ আত্মাগণ আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছে যে, তুমি এখানে আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমাদিগকে তুমি ঈশ্বরের নাম শুনাইয়া যাও। তখন গোঁসাইর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, আত্মারা সমাজে গিয়া ঈশ্বরের নাম শুনে না কেন? গোঁসাই উত্তর করিলেন, কতকগুলি খারাপ আত্মা আছে, তাহারা উহাদিগকে সমাজে যাইতে দেয় না। ঈশ্বরের নাম করিতে দেয় না। মুখ চাপিয়া ধরে, গতি রোধ করে। ঐ সকল বৃক্ষতলায় একবার কীর্ত্তন করিতে হইবে ইত্যাদি।

"এখানে—ল বাবু, তাঁহার কন্যাগণ, ও ৪ বৎসর বয়সের এক কন্যাও যোগ লইয়াছে।

"আর যে সকল লোক লইয়াছে, তাহারা তোমার চেনা লোক নহে। চেনার মধ্যে—স্ত বাবুর স্ত্রী—ক্ষীও যোগ লইয়াছে। ইহা ভিন্ন আমাদের দলের আর কেহ যোগ লয় নাই। অনেক হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীও যোগ লইয়াছে।"

দেখিলেন, পাঠক বর্গ, কি কাণ্ড? দেখিলেন, আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দির যোগশাস্ত্র? আমাদের ঈশ্বরের অবস্থা; পরকালের চিত্র, এবং যোগবলজনিত শক্তি ও ক্ষমতা? দেখিলেন, দেশের প্রথা পদ্ধতি, সমাজ ও সংস্কারাদির সংস্করণ? দেখিলেন, কি লইয়া এবং কি ভাবিয়া জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় ইহারা গৃহে আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইয়াছিল এবং কি লইয়াই বা আবার সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীতে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে? ধর্ম্মের গভীর রঙ্গ ভূমিতে যে কত প্রকারেরই প্রহসন প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা দেখিলেন? দেখিলেন কিজন্য চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ এবং হতাদর হইয়া পড়িতেছেন? যাহা আপনাদিগকে জানান গেল

হা হইতেও অধিক রহস্য বন্ধুর পত্রে বর্ণিত ছিল, কেবল বিস্তারতার য়ে প্রকাশ করিলাম না।

গোঁসাইর পরকাল-পট এবং ঈশ্বরের রূপচিত্র দেখিয়া একটী কথা মাদের মনে পড়িল। আরিষ্টটল এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, এই ব্রহ্মাণ্ডেতে যাহা, ঈশ্বরের হৃদয়েও তাহা। আর এই পৃথিবীতে যাহা, মানুষের মনেও তাহা। মানুষ যাহা কিছু ভাবে, চিন্তে সমস্তই এই দৃশ্য সংসারের দ্রব্যাদির প্রতিরূপ। তাহার মন এখানকার জিনিস পত্র ছাড়াইয়া আর কোথাও যাইতে পারে না। যদি সে কখনও এবিষয়ে বাহাদুরী করে, কি ইহার অতীত কিছু দেখিতেছি বলিয়া গর্ব্ব অথবা ধৃষ্টতা প্রকাশ করে, তাহা হইলেই গোঁসাইর মত উল্লিখিত ভাবে বুদ্ধিমান্ লোকের নিকটে উপহাসাস্পদ হয়। বিড়াল যখন নিদ্রায় থাকে, তখন সে তাহার স্বপ্নরাজ্যে কেবল মূষিকেরই নৃত্য দেখে! এবং মৃত্যু শেষে পরকালেও কারু গৃহের কোণে কাণাচে খাপে বসিয়া মূষিকই ধরিবে আশা করে।

আমরা পাঠক বর্গের নিকটে এই সকল কথা আজি অত্যন্ত মনক্ষোভে পড়িয়া জানাইলাম। কাহাকেও উপহাস কি ব্যঙ্গ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ আমাদের হৃদয় অত্যন্ত গভীর দুঃখে তরঙ্গায়িত হইতেছে। আমাদের আশা, যেও এত দিন একটুকু লূতা-তন্তুতে বাধিয়া রহিয়াছিল, তাহা আজি এই সকল বিভীষিকা দর্শনে প্রকম্পিত হইয়া সমূলে সমস্ত খসিয়া পড়িল। এখন জানিলাম যে, কালবৃদ্ধ ব্যাস তাঁহার যোগশাস্ত্রের যতপ্রকার শাসন, দমন, নিগ্রহ ও নির্ভৎসনাদি আছে, তাহা সমস্ত কহিয়া উপসংহার কালে যাহা কহিয়াছেন, তাহাই বাস্তবিক সার, আর সমুদয়ই যেন আলাৎপালাৎ। যথা,

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ, প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহ কিং করিষ্যতি।" গীতা।

অর্থ, সহস্র জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইলেও সে আপনার স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুরূপই কার্য্য সকল করিয়া থাকে। প্রাণীরা সর্ব্বদাই আপন আপন স্বভাবকে অনুগমন করে; নিগ্রহাদি করিলে কি হইবে? বেকন সাহেব এক স্থানে বলিয়াছেন "Nature is often hidden

sometimes overcome, seldom extinguished." লোকের প্রকৃ
সর্ব্বদাই লুকান থাকে, কখন কখন মাত্র তাহাকে দাবাইয়া রাখা যায়; কি
কদাচিৎ সে সমূলে উৎপাটিত হয়। আমরাও দেখিতেছি যে, লোকে যা
যাহা করিতেছে, হাজার শিক্ষা পাউক আর হাজার উপদেশ পাউক
আপনাদের স্বাভাবিক, মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতি অনুসারেই কা
তেছে। কোন রূপ নূতন অবস্থায় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জন্য মা
স্তম্ভিত ভাবে থাকে, কিন্তু আবার কাল প্রাপ্ত হইলে স্বীয় মূর্ত্তিতে দর্শ
দেয়। লোকের শরীর এবং মন যখন ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে রচিত, তখ
তাহাদের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রকৃতি-জনিত ভাবনা ও কার্য্যাদি
পৃথক পৃথক। সুতরাং সকলকে এক অবস্থা, একরূপ ভাবনা ও এ
প্রণালীর কার্য্যাদিতে আনিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বৃথা। তবে লোকে
এই মাত্র আশা করা কর্ত্তব্য যে, এই সংসারে সম্পূর্ণ না হউক আংশি
রূপে সদৃশ মন ও প্রকৃতির লোক ভগবান যখন যায়গায় যায়গায় অনে
সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, তখন চেষ্টা দ্বারা তাহাদের সঙ্গে সম্মিলন হইবা
অনেক সম্ভাবনা আছে। বাজারে বাহির হইলে কারু মিঠাই অবিক্রী
থাকে না। কারণ সমস্ত প্রকার রুচিই সেখানে যাতায়াত করে। লা
হইতে গুড় ছোলা সমস্তই সেখানে আগ্রহের সহিত গৃহীত হয়। পুরু
পরম্পরায় যে যে প্রকারের আহার বিহার ও ভাবনা চিন্তায় অভ্যস্ত হ
তাহাও কালে তাহার স্বভাব হইয়া পড়ে। বেকনও একস্থানে লিখিয়াছে
যে "custom, only, doth alter and subdue nature." দেশের প্র
দ্বারাই কেবল স্বভাব পরিবর্ত্তিত ও পরাজিত হয়। অর্থাৎ যে প্রথা এ
পদ্ধতির মধ্যে মনুষ্য জন্ম হইতে প্রতিপালিত হইয়া আসে, সে মনুষ্যে
যদি জন্মগত প্রকৃতি ভিন্নরূপও থাকে, তাহা হইলেও তাহার সেই সহ
স্বভাব দেশাচার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সহজে সে ইহা
দাগ ও পদ চিহ্ন তাহার শরীর মন হইতে ধুইয়া ফেলিতে পারে না।
আমাদের যে গেরুয়া বস্ত্র ও জগন্নাথী জুতার প্রতি অনুরাগ; দাড়ি, জট এ
গোপীযন্ত্রাদির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি; যোগী সন্ন্যাসী দেখিলে অমনি তাহা
জহুরায় কি কথায় অত্যন্ত বিশ্বাস এবং মন্ত্র দেওয়া মন্ত্র নেওয়া শিষ্য কর
ও শিষ্য হওয়াতে অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ, তাহা কেবল পুরুষ পরম্পরাগত
অভ্যাসের ফল। দাড়ি ও জটাভস্মের প্রতি এ জাতির এত ভক্তি

তাহাতে শত দুষ্ক্রিয়া ও দুর্নীতি জড়ান থাকিলেও ভক্তির কোন রূপ
লাঘব হয় না। দেখ তারকেশ্বরে সে দিন কি কলঙ্কের ঘটনাই হইল,
কিন্তু তবু সে দুরাচারীর পদরেণুতে লবলেশ ও মাহাত্ম্যের হ্রাস হইল না।
দেশের যত দলাদলি কেবল ভাল মানুষকে নির্য্যাতন ও নিষ্পীড়ন করিবার
জন্য; দুর্বৃত্তক দমনের জন্য নহে। কিছু দিন হইল দেশের কতকগুলি
লোককে হঠাৎ হৈ চৈ করিয়া উঠিতে দেখিয়া এবং তাহাদের বাক্যছন্দের
অভিঘাত ও হস্ত পদাদির আস্ফালন, শ্রবণ ও দর্শন করিয়া সংশয় মিশ্রিত
হইলেও মনে এক প্রকার আশা জন্মিয়াছিল; কিন্তু ক্রমে এই সকল
ব্যাপার বিভীষিকা দেখিয়া আজি হাত পা এককালে পেটের ভিতরে
প্রবেশ করিয়াছে। মনের দুঃখ লজ্জায় কাহাকেও জানান যায় না।
বিরুদ্ধবাদীর মুখ আজি সম্পূর্ণ উজ্জ্বল।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

তুমি কি আমার ?

গোধূলির ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে উদাসের ছায়ায় মনটা যখন ছাইয়া ফেলে, চিন্তার বায়ু থাকিয়া থাকিয়া বুকের উপর দিয়া যখন বহিয়া যায়, কে আমার—কে আমার নয় যখন গণিতে আরম্ভ করি, সংসারের মরুভূমে কয়েকটী তাল বৃক্ষ মাত্র যখন মাথাগুলি উচ্চ করিয়া দাঁড়ায়, যাহা কিছু মোহময়, যাহা কিছু রঙ্গিল, যাহা কিছু চপল চঞ্চল সাঁঝের আকাশের কুয়াশার মত মেঘের সঙ্গে সঙ্গে যখন দূরে দূরে চলিয়া যায়, দূর যখন নিকট হয়, নিকট যখন দূরে যায়, অতীত বর্ত্তমান হয়, বর্ত্তমান অন্তর্দ্ধান

"তুমি কি আমার"? আমার আর কেহই নাই, আঁধারে সকলি ছাইয়াছে, যাহা কিছু উজ্জ্বল নিবিয়া গিয়াছে, যাহা কিছুতে ভুলিয়াছিলাম উড়িয়া গিয়াছে; পথ হারার একটী তারা, আঁধারের একটী আলো, প্রাণে একটী ভরসা, বুক পূরাইবার একটী জিনিস, সন্তান হীনের একটী সন্তান, বিধবার একটী শিশু, জগতের একটী প্রাণ, সমুদ্রের একটী নঙ্গর; পৃথিবীর যাহা কিছু,—তখন তুমিই প্রভু, তুমিই দাস, তুমিই পিতা, তুমিই পুত্র, তুমিই মাতা, তুমিই কন্যা, তুমিই স্বামী, তুমিই স্ত্রী; তখন তুমিই আমার সর্ব্বস্ব প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তমা প্রেয়সী; তোমাকে বুকের ভিতর পূরিয়া জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি আমার"? সদাই অমূল্য, সে সময়ে তুমি অমূল্যতর। জানি তুমি আমার, তবু যখন সকলে উপেক্ষা করে, আপনার বলিয়া আর ফিরে চায় না, শ্মশানে একাকী ফেলিয়া সকলেই যখন চলিয়া যায়, তখন ভয়ে ভয়ে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি, সে মধুর কোমল শান্তিময় মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকি, প্রাণের ভিতর হইতে প্রাণ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি আমার? আমার চিরদিনের"? তখন একটা নিশ্বাস ফেলিতে ভয় হয়, পাছে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। আমার অমূল্য নিধি, জীবন-সর্ব্বস্ব, অনিমেষে চাহিয়া থাকি, মুখে কথা ফুটে না, প্রাণে প্রাণে জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি আমার"?

যখন কণ্টকে বুক ফুটিয়া যায়, কশাঘাতে পৃষ্ঠ ফাটিয়া যায়, মর্ম্ম পীড়ায় ধূলায় লুঠাইতে থাকি, তখন হাসি মুখে কাছে বসে, একটী কথা কয়ে, গায়ে একবার হাত বুলাইয়ে সকল জ্বালা ভুলাইয়া দাও! তোমাকে এতই ভাল বাসি! তুমিও এত ভাল বাস! বিপদে আপদে ডাকিতে না ডাকিতে, আপনি ডেকে নিয়ে কাছে বসায়ে, আমাকে শান্তি দেও! তুমি ধনবান্ আমি দরিদ্র, তুমি সুবেশ আমি ছিন্নবাস, তুমি রাজরাণী আমি ভিখারিণী, ভয় করি পাছে ঘৃণা কর। মুখ ফুটে ডাকিতে সাহস হয় না। তোমার মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা দূরে থাকুক, মন্দিরের দেয়ালে মাথা কুটিতে ভয় হয়। কত দিন তোমার প্রাসাদের দিকে দূর হইতে চাহিয়াই চলিয়া গিয়াছি; কিন্তু তুমিত ঘৃণা কর নাই, তোমার হাসিত কমে নাই, তোমার আদর চিরদিন একই মত দেখিলাম। তুমি এইত ভাল বাস! যখন পায়ের ধূলা মাথায় তুলিতে বুক কাঁপিয়াছে—পাছে আমার স্পর্শনে [illegible]

আছে আমার মুখ নিঃসৃত বায়ুতে তোমার মন্দির গরলিত হয়, তখন তুমি আপনি ডাকিয়া কাছে বসাইয়া সোহাগ করিয়াছ! তুমি এইত ভালবাস! সবই জানি, তবু অবিশ্বাসী প্রাণ শোনে না, হাতটী ধরিয়া মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি আমার"? কথাটী শুনিয়া তুমি গম্ভীর হইলে কেন? আমার অবিশ্বাসে আঘাত পাইলে? আশঙ্কা যে আমার বাড়িল। বলনা, কখনত ফুটিয়া বল নাই; যদি বলিয়া থাক ভুলিয়া গিয়াছি, যদি বুঝাইয়া থাক বুঝি নাই, আমি যে অবোধ! আমি মূর্খ; অথচ পণ্ডিতের মত অবিশ্বাসী। আমাকে আর একবার মুখ ফুটিয়া বল না? আর হয়ত জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু তোমার মুখে ওকথাটা আর বার শুনিতে এতই ইচ্ছা হয় যে, যদি চিরদিনই বল, তুমি চিরদিনেরই আমার, তবুও হয়ত আবার জিজ্ঞাসা করিব, "তুমি কি আমার"? শুধু শুনিতে মিষ্ট লাগে বলিয়াই কি? তুমি এত অমূল্য, পাছে তোমায় হারাই; তাই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

অনেকে যে তোমার আরাধনা করে! সবাইকে যে তুমি হাসি মুখে আদর কর। আমাকে যেমন ভালবাসা দেখাও, সবাইকে ঠিক তেমনি দেখাও। সবাইকে কি দরিদ্র বলিয়া দয়া কর? আমি যে তোমার দয়া চাহি না, আমি তোমার ভালবাসা চাই। তা পাই কি? আমাকে যা দেও, সবাইকে যে তাই দেও? সবাইকে কি ভালবাসা দেও? ভালবাসা ত একজনের অধিককে দেওয়া যায় না! আমি যে সবার দলে যাইতে চাহি না। আমি তা চাই, যা আর কেহ কখন পায় নাই, পাইবে না। আমি দশজনের একজন হইব না। তুমি সকলকে স্নেহ কর, দয়া কর, তাতে আমি বাধা দিব না। কিন্তু আমার ভালবাসার সপত্নী কাহাকেও রাখিব না! তোমাকে এত ভালবাসি, হয় একা তোমাকে পাইব, দিবানিশি বুকে বুকে তোমাকে রাখিব; না হয়, উঃ বুক ভাঙ্গিয়া যায়! না হয় মরিব, তোমাকে না পাইলে, মৃত্যুও ভাল। সে মৃত্যু যত কঠোর হয়, ততই ভাল। আত্মহত্যাই তখন পুণ্য বলিয়া বোধ হইবে। তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক যাহা, তাহাও ইচ্ছা করিব। তবু সপত্নী রাখিব না। রাধিকা বালিকা—প্রগল্‌ভা, প্রেম জানে নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণকে পদাঘাত করিয়াছিল। তাই চন্দ্রাবলির কথা শুনিয়া আত্মহত্যা করে নাই, কুব্জাকে কৃষ্ণ দিয়া কাঁদি-

সখী সঙ্গেও তোমার সহিত সহবাস করিব না।” আমার অতুল সুখ কাহাকেও দেখাইব না, দেখিতে দিব না। তুমি আর আমি—আর কেহ নাই। অতুল নীল আকাশের গভীরতায় তুমি আর আমি। বনে বনে, সৈকত-পুলিনে তুমি আর আমি। মন্দিরে, সিংহাসনে তুমি আর আমি। জ্যোৎস্নার ভিতরে, গভীর অন্ধকারে, ফুলের কৌটাতে, লতার শিশিরে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, মলয় পবনের উচ্ছ্বাসে, বিহঙ্গের সঙ্গীতে, সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে তুমি আর আমি। পৃথিবী নির্ম্মানব হউক, নির্জ্জীব হউক, জগৎ শ্মশান হউক, চন্দ্র সূর্য্য তারা মুছিয়া যাউক; সপত্নী কেহ না থাকে, দেখিবার কেহ না থাকে, চক্ষুষ্মান্ কেহ না থাকে,—অনন্ত জগতে তুমি আর আমি; অনন্ত কাল তুমি আর আমি। আচ্ছা, দুজনে কেন এক হই না, অঙ্গে অঙ্গে? যথা “জল-বিন্দু সিন্ধু-জলে?”—না; তুমি মহৎ আমি ক্ষুদ্র? ছিছি, তাহলে কি ভালবাসা হয়? সমান সমান; তুমি যদি সিন্ধু হও, তবে আমিও সিন্ধু হইব; বিন্দু কেন? তাই বলিতেছিলাম, দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে, “হরি-হর” নহে; একটু চেনা থাকিবে না, কেহ দুই বলিয়া ধরিতে পারিবে না। তখন সবই তুমি বা সবই আমি। তুমি আমি নাই। বিশাল বিশ্ব শূন্য,—সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, আলো নাই, আঁধার নাই, কাল নাই পল নাই;—স্থানে অনন্ত, সময়ে অনন্ত, প্রাণ একটী। সেটী পদার্থ নহে, প্রাণ নহে, গানের একটী রাগিনী মাত্র।

তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিবে, রাক্ষস বলিবে। যে তোমাকে ভালবাসিতে চায় তাহার মৃত্যু কামনা করিতেছি দেখিয়া আমাকে ঘৃণা করিবে। স্বার্থ-পরতায় ধিক্কার দিবে। বল দেখি তুমি কি? নিষ্ঠুর রাক্ষস নহ? কতদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে ফিরিয়াছি, তবু দেখা দেও নাই; বিদেশে কতকাল আমাকে ছাড়িয়া কাটাইয়া আসিলে, মনে আছে কি? পত্র লিখিলে উত্তর দাও নাই, মনে পড়ে কি? আবার বিদেশে পলাইবে বলিয়া কথায় কথায় ভয় দেখাও, এই কি তোমার ভালবাসা? আমাকে কাংশ্য দিয়া অন্যদের সুবর্ণে রঞ্জিত কর, এই কি ঐকান্তিক প্রেম? একটা কুরূপকে আমার স্কন্ধে চাপাইয়া বলিয়া দিলে ইহার সঙ্গে সুখে দিন কাটাও, গণ্ডা কতক সন্তান বুকের উপর চাপিয়া বসিল, সংসারের শৃঙ্খলে

চিবাইতে দিল? আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, “কেলে সর্ব্বনাশী আমাকে গৃহ-বাসী করিল।” কে আমাকে স্বাধীনতা বলিয়া দাসত্বে প্রবঞ্চিত করিতে চাহে, কে আমাকে স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া নরকের পূরীষ ভক্ষণে মুগ্ধ করিতেছে? রাক্ষসি, আমার অতুল ভালবাসা তুমি তাচ্ছিল্য করিতেছ, আমি কি' বুঝি না? ধনবান্ বিদ্বান্ গুণবানকে তুমি যে ভালবাস, আমাকে কি তেমনি ভালবাস? তবে কাছে আসিতে বারণ কর কেন, ডাকিলেই দেখা দেও না কেন, চাহিলেই পাই না কেন? প্রাসাদ বলিয়া আমাকে পাগলের গারদে দিতে চাহ, তুমি এমনি বন্ধু! সাধে কি তোমাকে অবিশ্বাস করি? দয়া দিয়া, স্নেহ দিয়া আমাকে ভুলাইবে, আমি কি বালক? আমাকে ভালবাসা দিবে না, আমি কি এতই জঘন্য? তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িলাম, তোমার জন্য মায়ের বুকে আঘাত করিলাম, স্ত্রীকে কাঙ্গালিনী করিলাম, সাধের ছেলে মেয়েগুলিকে ভিখারীর সন্তান করিলাম, সমাজকে পদাঘাত করিয়া দণ্ড পাইলাম, তোমার জন্য সর্ব্বস্ব দিলাম। তবুও তোমাকে পাইলাম না। তোমার জন্য পাগল হইলাম, কত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিলাম; তবুও তোমাকে পাইলাম না। সকলের কৃপার পাত্র ঘৃণিত হইলাম, তবুও তোমাকে পাইলাম না। অহো, অহো, মৃত্যুই শেষে প্রার্থনীয় হইল।

না, না। তুমি আমার ভাল বাসা পরীক্ষা করিতেছ। প্রিয়তম, আমি দাসী হইয়া চিরদিন তোমার চরণ সেবা করিব। আমি তোমার ভালবাসার উপযুক্ত নহি। আমি দীন দুঃখী, কাতর উন্মাদ। আমার প্রলাপ ক্ষমা করিও। তোমার চরণের দাসী হইয়া রহিব; চিরদিন সেবা করিতে দিও। তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইব। “চরণ ছাড়া করো না”। তোমা বিনা আমার কেহ নাই। তোমার সেবা করিতে পাইলেই আমি সুখী হইব। আমার সেবা তাচ্ছিল্য করিও না। অন্যকে লইয়া সোহাগ কর, যে তোমার ভালবাসার উপযুক্ত তাহাকে ভাল বাসা দেও। আমি হিংসা করিব না। তুমি মহান্, আমি ক্ষুদ্র। যখন চোখের জল পায়ে পড়িবে, একবার হাসি মুখে চাহিও। যদি পদস্পর্শে কলঙ্কিত হও, দূর হইতে স্মরণ করিতে দিও। স্মৃতি শূন্য যেন না হই। বিস্মৃতি মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। দূর হইতে স্মরণ করিব, অপূর্ব্ব রূপরাশি কল্পনায় উপভোগ করিব, দাসীর এ ধৃষ্টতাটী ঘৃণা করিও না।

একদিন তোমার ভালবাসা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। ? আশা ফুরাইয়াছে। দূরদর্শনে জ্ঞানী হয়, হতাশ হইলে প্রবীণ হয়। তোমা দেখিবার আগেই কলঙ্কিত হইয়াছিলাম, অমৃত আছে জানিবার পূর্ব্বে গরল পান করিয়াছিলাম,আপনি কর্ম্মদোষে তোমার ভালবাসা হারাইয়াছি মলিন আমি, পবিত্র তুমি; তোমাতে আমাতে এক হইবার সম্ভাব কোথায়? তখন তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি কলঙ্কিত হইতে, আমার কুলটা বলিয়া লোকে নিন্দা করিত। সমাজের চক্ষে আয়ান ঘোষই আমার স্বামী। আমিত সর্ব্বস্ব ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলাম। জানিতাম, কুল মান জাতি পরিত্যাগ না করিলে, কলঙ্কের ডালি মাথায় না বহিলে, বিবসনা হইলে, তোমাকে সর্ব্বস্ব না দিলে, ত্বন্ময় না হইলে, তোমাকে পাইব না আমিত তাই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তবুও পিছাইলাম! আমার স্বার্থ হেতু তোমাকে কেন কলঙ্কিত করিব? কৃষ্ণকামী রাধিকার কলঙ্ক। আমার কর্ম্মফল আমিই মাথা পাতিয়া বহিয়াছি, তোমার ভালবাসা হারাইয়াছি। তুমিত সকলই বুঝ, আমার একথাটী কি বু নাই? আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি,তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর নাই। "ে ছিল দাসের দাসী, সে হল রাজ মহিষী, স্বর্ণ শশী রাই রূপসী ধূলায় লুঠায়

তখন ভাবিয়াছিলাম, সখী হইয়া তোমার অনুসরণ করিব; আমি সুখী নাই বা হইলাম। আমার আবার সুখাসুখ কি? মনে মনে তোমাকে স্বর্ব্বস্ব করিয়াছি। তুমি সুখী হইলেই আমার সুখ হইবে। তোমাকে সকলে সোহাগ করিবে আদর করিবে, যত্ন করিবে ভালবাসিবে, তুমি তাদের ভালবাসা দিবে, দেখিয়া আমি সুখী হইব। পরীক্ষা বড় কঠিন ঈর্ষার জ্বালা সহিতে পারিব কি না, ভাবিয়া এক একবার আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু তোমা হইতে দূরে অন্ধকার। সে অন্ধকার অপেক্ষা ঈর্ষার জ্বালা লঘুতর। তাই সখী ভাবে তোমার পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কপালে তাহাও ঘটিল না। তোমার সংসর্গে যে থাকিবে তাহার যে মহত্ত্ব থাকা উচিত। আমার তাহাও ছিল না। আমার দুর্ব্বলতা আমাকে অপদস্থ করিল। তোমার পরিচারিকা হইতে হইলেও গুণবতী হইতে হয়। আমার সে গুণও ছিল না। অধোগতির লম্ব-রেখা। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে আর দাঁড়াইতে পারা যায় না। কর্ম্মফলে সখী ভাবেও বঞ্চিত হইয়াছি।

তথাপি দুরাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি হয় নাই। তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহারও কাছে যাইতে চাহি না। তোমার মত যে আর নাই! প্রতিকৃতি যে আর মিলে না;—"তোমার মত বঁধু তুমিই গুণমণি।" এখন তাই শেষ প্রার্থনা—তোমার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিতে দাও। আমাকে তাড়াইয়া দিও না। তোমার দ্বারে পড়িয়া অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তবু তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

আশা করিয়াছিলাম, জিজ্ঞাসা করিব, "তুমি কি আমার?" তোমাকে আর উত্তর দিতে হইল না। আপন ভাগ্যদোষে চিরদিনের জন্য তোমাকে হারাইয়াছি। আমি কিন্তু পাপে পুণ্যে, সুখে দুঃখে, দূরে নিকটে—চিরদিনই তোমার।

"শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন;
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়;
যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন।"

হরপার্ব্বতী সংবাদ।

ভগবান ভবানীপতি ভাঙের নেশায় বিভোর হইয়া কৈলাস পর্ব্বতের রমণীয় কন্দরে সুখশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এমন সময়ে পার্ব্বতী প্রস্রবণস্নাতা ও পট্টবস্ত্র-পরিহিতা হইয়া আসিয়া সপ্রেম ভাবে কহিলেন—"নাথ, গাত্রোত্থান করুন।"

গত রাত্রে ধূস্তুরের পরিমাণটা কিছু অধিক হইয়াছিল বলিয়া ধূর্জ্জটির গভীর নেশা হইয়াছিল, নাসারন্ধ্রের প্রবল গর্জ্জনে পার্ব্বতীর সিংহ বারবার চমকিয়া উঠিয়াছিল। এখন তত নেশা নাই বটে, পাকা গোলাপী নেশা আছে, তাই শিব পার্ব্বতীর কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। পার্ব্বতী কিছু [illegible]

এবার শব্দ মহাদেবের কাণে গেল। মহাদেব চক্ষু মেলিতে পারিলেন না, চক্ষু মুদিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"Good morning my dear, চাই কি ? এখনও ঢের রাত্রি আছে যে।"

পার্ব্বতী—"মরণ আর কি! রাত্রি আছে, না বেলা সাতটা বেজে গেল, ঐযে তোমার মুখের উপরে রোদ পড়েছে।"

মহাদেব তখনও চক্ষু মুদিয়াই আছেন। চক্ষু মুদিয়াই বলিলেন—"বটে, তবু এত শীত! এই শীতের মধ্যে তোমার এত গরজ কেন ? ভাল, বলই না ব্যাপারটা কি।"

পার্ব্বতী—"নূতন বৎসর আরম্ভ হলো, কাল বলেছিলে নব পঞ্জিকা শুনাবে, তাই আজ প্রাতঃস্নান করে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। আজ তাই শুনাতে হবে।"

শিব—"নূতন বৎসর! Wat do you mean my good wife? অগ্রহায়ণ মাসে নূতন বৎসর !!

পার্ব্বতী—"তোমার যেন কিছু মনে থাকে না। ঐযে এখন পৌষের শেষ থেকে বৎসর গণনা হয়। কলির শেষ ভাগে এরূপই নিয়ম হয়েছে। ১৮ই পৌষ যে নিউ-ইয়ার্স-ডে, তা কি ভুলে গিয়েছ ?

শিব—"তাইত, আমার কি সকল কথা মনে থাকে ? এজন্যই লোকে আমাকে ভোলানাথ বলে। তা ১৮ই যদি Newyear's day, তবে তার আগের দিন কি চড়ক পূজাটা হবে ? বলি—গৃহজাত কিঞ্চিৎ দধির ব্যবস্থা করেছ ত ?"

পার্ব্বতী, কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"রহস্য ছেড়ে দাও, কাজের কথা বল।"

শিব মনে করিয়াছিলেন যে, আজও একটা ওজর আপত্তি দিয়ে ফাঁকি দেবেন ; তা প্রেয়সীর জেদ দেখিয়া সেরূপ করিতে সাহস পাইলেন না। বলিলেন—

—"আচ্ছা কি শুনিবে, জিজ্ঞাসা কর। That old task again, I shall finish it soon !.

পার্ব্বতী—"হাঁ গোটা চার কথাই জিজ্ঞাসা করিব। বলতো এবার রাজা কে, মন্ত্রী কে, রাজ ফল কি ?"

দেবতা ছিলেন, বিজ্ঞানের প্রভাবে তাহারাই রূপান্তর ও নামান্তর গ্রহণ করিয়া এখন সংসারের স্কন্ধে ভর করিয়াছেন ; নূতন রকম ধর্ম্ম ব্যবস্থা, নূতন রকম ফলাফল—বলা বড় কঠিন।

পার্ব্বতী—তা যত দূর হইতে পারে, বল।

শিব—You know my dear, কতক কাল লিটন রূপ শনির রাজ্য ছিল। তখন দিল্লীতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড, মান্দ্রাজে বড় দুর্ভিক্ষ আর মুদ্রা যন্ত্রে বিষম মহামারি উপস্থিত হইয়াছিল।

পার্ব্বতী—সেত পুরাতন কথা, এবার কার ফলা ফল বল।

শিব—লিটন রূপ শনির পরে রিপণ-রূপী সোমের রাজত্বে লোক পরম সুখে বাস করিয়াছিল, শেষ ভাগে যদিও ব্যারিংরূপী বৃহস্পতি মন্ত্রির পরিবর্ত্তনে কথঞ্চিৎ অমঙ্গল হইল, তথাপি রিপণ-রাজ্যে প্রজার বড় সুখ ছিল। এখন আবার ডফারিণ-রূপী বুধ রাজা হইয়া শনির রাজত্বের পুনরভিনয় করিতেছেন।

পার্ব্বতী—আচ্ছা রাজ-ফলটা ত বেশ শুনিলাম। একবার আসল কথাটা বল দেখি। নর লোকের ধর্ম্ম কর্ম্মের সঙ্গেই আমাদের যাহা কিছু স্বার্থের যোগ। বল দেখি এবার ভারতের ধর্ম্ম ফলটা কি ?

শিব ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—"ধর্ম্মফল তাল-পুষ্করিণী বৎ।"

পার্ব্বতী—এযে নূতন ভাষা, পরিষ্কার করিয়া বল।"

শিব—তবে শোন, এক গ্রামে একটা বড় পুকুর ছিল। পুকুর পাড়ে তাল গাছ ছিল। অনেক দিন সে তাল গাছ মরিয়া গিয়াছে, তথাপি লোকে এখনো সে পুকুরটাকে তাল পুকুর বলে। সেইরূপ ভারতে পূর্ব্বে ধর্ম্ম ছিল, এখন নাই ; কিন্তু তথাপি পঞ্জিকায় ধর্ম্মফল লিখে।

পার্ব্বতী—এ যুগের অবতার কে ?

শিব—অবতার কল্কি। এই কেবল আরম্ভ।

পা—শুনিলাম, মুর্ত্ত্যে না কি আবার কৃষ্ণ অবতার হবে।

শিব—কৃষ্ণ ? কে বলিল ? কোন্ কৃষ্ণ ?

পা—সেই যে কৃষ্ণ, কংশারি মুকুন্দমুরারি, শ্রীমধুসূদন হরি।

শিব—বটে, সেই কৃষ্ণ ? সেই, যশোদার ননীচোরা, ব্রজগোপীর মন-হরা, কাল বসন পীত ধড়া ? সেই যে মিথ্যা কথার আঁধি, যার বালাই লয়ে

TIGHT BINDING

এইবলিয়া মুদ্রিত নয়নে উরুতে চাপড় দিয়া গোবিন্দ অধিকারীর সুরে শিব গাইতে লাগিলেন—

—"Let me see ওরে দ্বারি,
কোথা তোদের বংশীধারী ;
ব্রজের Shepherd হয়েছে king,
I know he is very cunning !"

গাইতে গাইতে শিব উঠিয়া বসিলেন, আবার দুই হাতে উচ্চ করতালি দিয়া গাইতে লাগিলেন—

ভাস্‌লোরে প্রেমের তরী সাধের যমুনায়,
গোপীর কুলে থাকা হলো দায়।
ব্রূরঠো ! ব্রূরঠো ! ব্রূর ঠো ঠো ঠো !!

পার্ব্বতী ব্যস্ত হইয়া প্রাণেশ্বরের হস্তে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"ও কি কর, পাগল হইলে নাকি ?"

মহাদেব শান্ত হইয়া বলিলেন—"না না, অনেক দিনের পুরাতন কথা মনে পড়িল, যৌবনের আনন্দ মনে উথলিয়া উঠিল। তাই একবার গীত গাইলাম। তা, তোমার পায়ে পড়ি, কিছু মনে করো না।" এই বলিয়া শিব আবার শুইলেন।

পার্ব্বতী—আবার দুপর বেলায় ঘুমালে নাকি ? আমার কথার উত্তর দাও।

শিব—সেই যমুনার লহরীর আনন্দেই বিভোর ছিলেন, ভালরূপে পার্ব্বতীর কথা না শুনিয়া বলিলেন—Beg your pardon.

পার্ব্বতী—"অবতার কৃষ্ণ কি কল্কি, তা ঠিক করিয়া বল।"

শিব—কৃষ্ণই কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। ক-কারে ক-কারে মিল দেখিতেছ না কি ?

পার্ব্বতী—এ অবতারে ধর্ম্ম কত, অধর্ম্ম কত ?

শিব—অধর্ম্ম ষোল আনা, ধর্ম্ম নামমাত্র। "লোকহিত।"

পার্ব্বতী—ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কর। ধর্ম্মমতগুলি সংক্ষেপে বল।

শিব—I can't give you the details, they are too many, অত পারবো না।

শিব—এ ধর্ম্মের মত এই যে ঈশ্বর নামে কোন পদার্থ আছে কি না জানা যায় না। থাকিলেও মানুষের চৌদ্দ পুরুষও তাহার সন্ধান পাইবে না।

পার্ব্বতী—তবে লোকে দেব দেবীর পূজা করে কেন ?

শিব—নব ধর্ম্মের মত এই যে, তাহা না হইলে লোক-স্থিতি রক্ষা পায় না। তরমুজক্ষেত্রে যেমন খড়ের মানুষ তৈয়ের করিয়া মাথায় কাল হাঁড়ি দিয়া শূকর তাড়ায় ; নব ধর্ম্মের মতে, সমাজের অমঙ্গল তাড়াইবার জন্য সেইরূপ জুজুর ভয়ের প্রয়োজন। জুজু তৈয়ের করিতে হয়।

পার্ব্বতী—এ ধর্ম্মের অপর মত কি ?

শিব—অপর প্রধান মত এই যে, লোকহিতের জন্য মিথ্যা কথা বলা যায়, মিথ্যা-ব্যবহার করা যায়।

পার্ব্বতী—তা প্রকাশ করে বল।

শিব—তবে তা বলি শোন। বিশেষ মনোযোগ দিয়া শুনিতে হইবে, নচেৎ বুঝিতে পারিবে না। মনে কর রাম বাবু নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, রাম বাবু বড় ধর্ম্মভীরু—ধর্ম্ম কাপুরুষ। দেশের মূর্খ আইনকর্ত্তারা এই বিধি করিল যে, বিধবার জারজ সন্তান তাহার পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তি পাইবে না। রাম বাবু পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে তৃতীয় বারে একাদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ম্যালথাস-মন্ত্রে দীক্ষিত ; তিনি বলেন, বিধবার বিবাহ হইলে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া লোকের বড় অহিত হইবে। এজন্য রাম বাবু তাহার পঞ্চদশ বর্ষীয়া বিধবা ভগিনীর বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বিধির চক্রে রাম বাবুর একটী ভাগিনেয় জন্মিয়াছে। রাম বাবুর ভগিনীর পূর্ব্ব স্বামীর বিস্তর সম্পত্তি। রাম বাবু মনে করিলেন, ঐ সম্পত্তিটা হাতে করিয়া বিলক্ষণ লোকহিত করিবেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, কাশীতে শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সুন্দরীর বিবাহ হইয়াছিল। লোকহিতের জন্য মিথ্যা কথায় দোষ নাই।

পার্ব্বতী—নব ধর্ম্মের আর কোন মত আছে কি ?

শিব—অনেক আছে। আর একটীমাত্র তোমাকে কহিব। সেটীও বিশেষ প্রধান মত।

পার্ব্বতী—সে মত কি ?

TIGHT BINDING

পার্ব্বতী—বটে, বটে! এই মতের কোন যুক্তি আছে কি?

শিব—বিলক্ষণ যুক্তি আছে। এই মতের প্রচারকেরা বলে যে "আমরা যদি মর্কট বংশাবতংস না হইব, তাহা হইলে আপনারা কালিয়া কোপ্তা ভক্ষণ করি, আর পিতৃপুরুষদিগকে কদলি তণ্ডুল উৎসর্গ করি কেন?

পার্ব্বতীর আর ধর্ম্মমত জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই নবধর্ম্ম প্রচার করিল কে?

শিব—ব্যাস, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ।

পার্ব্বতী—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রাদি কি বানর ছিলেন? তাঁহারা যে মনুষ্য-রত্ন ছিলেন।

শিব—তাহাদের বংশই বানর হইয়া আবার মানুষ হইয়াছে।

পার্ব্বতী—এও কি হয়?

শিব—হয় বৈ কি? তোমার পড়া শুনা কম, জান না। বিজ্ঞানের দুইটা প্রণালী আছে—Involution আর Evolution অর্থাৎ বিবর্ত্তন ও সঙ্কোচন বাদ। প্রকাশ করিয়া বলি—যথা, ক্রমে বিকাশ হওয়া আর ক্রমে লোপ পাওয়া। খুল্লে গেলেই মানুষ, আর চেপে গেলেই যেই বানর সেই বানর।

পার্ব্বতী—তা বিজ্ঞান বলে সকলই হইতে পারে। কিন্তু মানুষ যদি কখনও বানর হইতে পারে, তা এখনই হইয়াছে।

এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী কিঞ্চিৎ ভাবনাযুক্তা হইয়া নীরবে রহিলেন। প্রেয়সীর প্রসন্ন মুখ পরিতপ্ত দেখিয়া পশুপতির প্রাণে ব্যথা লাগিল। শিব বলিলেন Don't be sorry my darling. অনর্থক কি ভাবিতেছ?

পার্ব্বতী—"কি আর ভাবব? বলি কয়েক দিন যাবৎ শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, ভারতে নূতন যুগে নূতন ধর্ম্মের নূতন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, মনে কিছু আশা হইয়াছিল। হায়! এই কি সেই ধর্ম্ম? আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের এত লাঞ্ছনা!

শিব—নবধর্ম্ম কথাত শুনিলে, বলি এবার আশ্বিনে একবার বঙ্গভূমে যাবে কি?

পার্ব্বতী—প্রিয় বঙ্গদেশে একবার যাব বৈ কি? তা পরে যাই হউক, একবার যেয়ে দেখে আসব।

পার্ব্বতী—কেন?

শিব—বৃদ্ধ বয়সে আমার বলীবর্দ্দটী হারাইলে বড় ক্লেশ হইবে। এখন কেবল ছাগ শাবকে শরতের উৎসব শেষ হয় না। নবধর্ম্মমতে উহাতে নিষেধ নাই।

পার্ব্বতী সিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বল কি, বল কি? হিন্দুর দেশে হিন্দুর ঘরে ঐ সর্ব্বনাশ! পার্ব্বতীর মুখে আর কথা সরিল না। তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

শিব পার্ব্বতীকে রুরোদ্যমানা দেখিয়া ঝটিতি গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রিয়তমাকে কোলে করিয়া ভরসা দিয়া কহিলেন—Ah Parvati, never mind, never mind, we shall manage matters. Eat, drink and be merry.

পথিকচন্দ্র কবিরত্নেন।

শ্মশানে।

এ দুঃখ জর্জ্জরিত, তাপদগ্ধ, ভারবহ জীবনে এস্থানে বড়ই শান্তিময় বোধ হয়। এস্থান সংসার কোলাহলের অতীত,—গম্ভীরতা পরিপূর্ণ,—শান্তিপ্রদ। এখানে সংসারের মায়া নাই, মোহ নাই;—প্রলোভন নাই, পাপ নাই;—দুঃখ নাই, শোক নাই;—সর্ব্বত্রই যেন শান্তি বিরাজিত। ঊর্দ্ধে অনন্ত নৈশ আকাশ অগণ্য হীরক খণ্ডে খচিত হইয়া নীরবে জ্বলিতেছে, নিম্নে চন্দ্রমার সুকোমল শুভ্র জ্যোৎস্নায় ধরা নিস্তব্ধ ভাবে মগন রহিয়াছে; চারিদিক্ নিস্তব্ধ, নীরব,—নিস্পন্দ,—যেন কি এক মোহ মন্ত্রে সমস্ত আবদ্ধ। ঊর্দ্ধে অনন্ত নৈশ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করি,—হৃদয় কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হয়; নিম্নে চন্দ্রকর-বিধৌত পৃথিবীর দিকে তাকাই,—প্রাণ উদাস হইয়া যায়; চারিদিক শূন্যময় বোধ হয়, যেন কি এক মহাশূন্য চারিদিক্ অধিকার করিয়া রহিয়াছে! এ গাম্ভীর্য্য,—এ শান্তিময়—শূন্যময় ভাবে প্রাণ ডুবিয়া যায়, হৃদয়ের ভার অন্তর্হিত হয়,—জ্বালা যন্ত্রণা, দুঃখ শোক সমস্তই ভুলিয়া যাই। প্রাণ কি এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ হয়,—নয়ন আপনা আপনি নিমীলিত হইয়া আসে,—হৃদয় স্তম্ভিত হয়,—চিত্ত বৃত্তি গুলি যেন নিরুদ্ধ হইয়া আসে;—সমস্ত ভুলিয়া

যাই—আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই,—হৃদয় একাগ্র হইয়া একমাত্র অনন্তের দিকে ধাবিত হয়,—একমাত্র সেই অনন্তের চিন্তায় ডুবিয়া যায়।

এস্থান উপদেশপূর্ণ,—এখানে বসিয়া যখন স্থির চিত্তে চিন্তা করি, তখন মনুষ্য দেহের নশ্বরতা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। মানুষ যে মরীচিকা ধরিবার উদ্দেশে অবিরাম অবিশ্রাম এই মরু-প্রান্তরে ব্যগ্রভাবে ফিরিতেছে, তাহার অসারতা সম্যক উপলব্ধি করি। মানুষের অহঙ্কার—মানুষের আত্মাদর—মানুষের স্বার্থপরতা,—এখানে আসিলেই সকলই খর্ব্ব হয়—সকলই সঙ্কুচিত হয়। মনে হয় এ অনন্ত বিশ্বে আমি কি?—অনন্ত বিস্তৃত সাগরের অগণ্য তরঙ্গমালার মধ্যে একটি জলবিম্ব, যে মুহূর্ত্তে উঠিলাম হয়ত তাহার পর মুহূর্ত্তেই অনন্তকালের জন্য অগণ্য তরঙ্গমালার মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইব। কেহ হয়ত দেখিবে না—কেহ হয়ত একবার ফিরিয়াও চাহিবে না। তবে আমি কে?—আমার এ ক্ষণিক অস্তিত্ব কিসের জন্য?—এ অনন্ত বিশ্বে আমি কতটুকু?—আমার কিসের অহঙ্কার?—সামান্য জলবিম্বের ন্যায় যাহার জীবনের অস্তিত্ব—যে পলকে উঠে আবার পলকে লয় পায়—তার আবার কিসের অহঙ্কার?—ধন বল, জ্ঞান বল; ক্ষমতা বল, প্রভুত্ব বল; বুদ্ধি বল, প্রতিভা বল—মানুষের যাহা কিছু পার্থিব সম্পত্তি—এস্থানে আসিলে সমস্তই চিরদিনের জন্য লয় পায়—সমস্তই চূর্ণ হইয়া যায়। আজ হউক কাল হউক অথবা দুই দিন পরে হউক, এ নশ্বর দেহ এই মৃত্তিকায় মিশিবেই মিশিবে—তাহা অপরিহার্য্য,—তবে এত অহঙ্কার কেন?—আজ যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমস্ত জগৎ কম্পিত, ত্রাসগ্রস্ত ও স্তম্ভিত, কল্য হয়ত দেখিব তাহার দেহ এই মৃত্তিকায় মিশিতেছে; যে স্বকীয় পরাক্রমে মহা বলশালী সিংহকে ত্রাসযুক্ত করিয়াছে,—সে আজ নিস্পন্দ, নিশ্চল, সামান্য শৃগাল কুক্কুরের পদাঘাতের প্রতিবিধান করিতেও অসমর্থ। তবে এ অহঙ্কার কিসের জন্য? জগতে অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য ব্যক্তিরও যে অধিকার তোমারও সেই অধিকার; তবে যে তুমি সে ব্যক্তিকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব তাহার উপর বিস্তার করিয়া মনে করিতেছ, চিরদিনই এই ভাবে কাটিবে, সে তোমার ভ্রম। তোমার এ অন্যায় প্রভুত্ব ক্ষণস্থায়ী—বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে রহিয়াছে—পর মুহূর্ত্তে নিশ্চয় জানিও কখনই থাকিবে না। এই স্থান—যেখানে মহৎ ক্ষুদ্র নির্ব্বিশেষে উচ্চ নীচ

নির্ব্বিশেষে সমস্ত জিনিসেরই সমাধি হয়—এই স্থানের এ উপদেশ জীবন্ত। এখানে সকলেই সমান—এখানে ধনী দরিদ্রে প্রভেদ নাই, পণ্ডিত মূর্খে প্রভেদ নাই—এখানে আসিলে সবই এক। মানুষকে এই মহৎ শিক্ষা দিবার জন্য—মানুষের স্বকৃত বৈষম্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্মশান জলন্ত ভাবে অনন্তকাল ইহা প্রচার করিতেছে—অনন্তকাল প্রচার করিবে, যাঁহার দর্শন শক্তি আছে, তিনি এই মহাসত্য দর্শন করিয়া ধন্য হয়েন—যে মোহে অন্ধ সে দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না। এস্থান সাম্যের অদ্বিতীয় প্রচারক—সাম্যের এমন প্রচারক আর নাই। প্রকৃত জ্ঞান লাভের এই প্রশস্ত স্থান—জগতে ইহার তুলনা নাই। এস্থানের উপদেশ অমূল্য, জ্ঞান অপরিমেয়, শিক্ষা অনন্ত।

এস্থান মানুষকে মানুষ হইতে শিক্ষা দেয়। হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতায় পূর্ণ করিয়া দেয়,—স্বার্থপরতা চূর্ণ করিয়া অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দেয়। হৃদয় অনন্ত আকাশের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সংকীর্ণ বিষয়ে আর দৃষ্টি থাকে না। কুল্ কুল্ করিয়া সুখ দুঃখের কাহিনী গাহিত গাহিতে, অনন্ত কালের স্মৃতি লইয়া সম্মুখে জলরাশি সাগরোদ্দেশে চলিয়াছে, ঊর্দ্ধে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে খচিত হইয়া অনন্তকালের ঘটনাবলীর সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে, নিম্নে বিপুলা পৃথিবী অগণ্য মানবকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া প্রসারিত রহিয়াছে;—যে দিকে দৃষ্টি ফিরাই সেই দিকই অনন্ত। এ মহা অনন্তের মধ্যে আমি কত ক্ষুদ্র—কত সামান্য? যখন চিন্তা করি তখন আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই,—তখন বুঝিতে পারি এ অনন্তবিশ্বে একাকী আমি কিছুই নহে;—আমার জন্যই যে আমি নহে—মানুষের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে আমার অস্তিত্ব, ইহা তখন স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করি। তখন বুঝি যে প্রাণ খুলিয়া, হৃদয় প্রসারণ করিয়া যদি মানুষকে আলিঙ্গন করিতে পারিলাম—একজন নহে, দুই জন নহে, সমগ্র মানব জাতিকে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে পারি, মানুষের জন্য যদি দাঁড়াইতে সক্ষম হই, তবেই আমার অস্তিত্ব স্বার্থক, তবেই আমার জীবন স্বার্থক, নতুবা বিজন মরুজাত ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় আমার অস্তিত্ব, আমার জীবন বিফল;—প্রাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের সংকীর্ণতা লইয়া দুই দিনের জন্য "আমি আমি" করিয়া সংসারে ফিরিলাম বটে কিন্তু তদপেক্ষা যে বাতাসে উঠিয়া

ছিলাম সেই বাতাসেই সংসারের তরঙ্গমালার মধ্যে অনন্ত কালের জন্য লয় প্রাপ্ত হইলেই ছিল ভাল। নতুবা এ ক্ষুদ্রকে লইয়া এত যত্ন এত আয়াস ভাল দেখায় না। এ ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যদি জীবনের কর্ত্তব্য পরিসমাপ্তি হয়, তবে মনুষ্য জন্মের তদপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি সম্ভবে! কেনইবা এজগতে আসিয়াছিলাম? মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া,—এত ক্ষুদ্র হইয়াও যে একটু মহত্ত্বের অধিকারী হইয়াছিলাম, সে টুকুর যদি সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলাম, আপন অধিকার টুকু যদি বুঝিয়া লইতে না পারিলাম, তবে বৃথা জীবন ধারণের ফল কি? তবে কোন্ সুখে কোন্ আশায় এ দেহের ভার, এ বিড়ম্বিত জীবন বহন করিব? যে এজগতে কর্ত্তব্য দেখিতে পাইল না, তাহার অস্তিত্বে প্রয়োজন? যে আপনাকে ভিন্ন অন্যকে চিনিল না—আত্মসুখ ভিন্ন অন্যের সুখ বুঝিল না—যে জগৎ কেবলই আত্মময় দেখিল—তার মনুষ্য সমাজে কি প্রয়োজন? সমাজমধ্যে বাস তারপক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা মাত্র। অন্যের অশ্রুজল যদি নিজ অঞ্চলে মুছাইতে না পারিলাম, অন্যের বিপদের সময় যদি পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে না পারিলাম, নিজ হৃদয়ের প্রেম টুকু যদি অন্যকে প্রাণ খুলিয়া দিতে না পারিলাম—অন্যকে যদি হৃদয়ের অধিকারটুকু না দিলাম, তবে এ দুদিনের জীবনের স্বার্থকতা কি?—তবে যে এ বিপুলা পৃথিবীতে দুদিন বাস করিলাম, কার জন্য—কিসের জন্য?—নিজের জন্য?—মূর্খ আমি—অন্ধ আমি, তাই বুঝিলাম না, দেখিলাম না। আপনাকে অন্যের না করিতে পারিলে—আত্মদান না করিতে পারিলে যে কণামাত্র সুখও নাই তাহা বুঝিলাম না,—সুতরাং হৃদয়ের আশাও মিটিল না—হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না। বুঝিলাম না যে "আমি আমি" করিয়া এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও সুখ খুঁজিয়া পাইব না; যত "আমি আমি" ভুলিতে পারিব ততই সুখের পথ দেখিতে পাইব—যত আপনাকে ভুলিতে পারিব ততই সুখের অধিকারী হইব। এঅমূল্য শিক্ষা আমাকে কে দান করিবে—এঅমূল্য সত্য জগৎকে কে শিক্ষাইবে? কবে জগৎ এ শিক্ষার মূল্য বুঝিবে?—কবে জগৎ এ সত্যের পূজক হইয়া স্বর্গে পরিণত হইবে?—হায়! সে দিন কি আসিবে?

এস্থানে সকল পদার্থের সমাধি হয়। ভাল হউক মন্দ হউক, সৎ হউক অসৎ হউক—সবই এই একই পথ দিয়া এ দুদিনের সংসার পরিত্যাগ করিয়া আর এক রাজ্যে চলিয়া যায়;—কোথায় যায়?—যাহারা যায় তাহারাই

লিতে পারে;—আর যাহারা পড়িয়া থাকে, তাহারা মোহের কুজ্ঝটিকা দ করিতে অসমর্থ হইয়া হাহাকার করিতে থাকে। কাহারও জীবনের বলম্বন, সংসার অন্ধকারে একমাত্র আশার আলোক এই মৃত্তিকায় শিয়াছে; কাহারও নয়নের জ্যোতি হৃদয়ের প্রতিমা, জীবনের ধ্রুব-রা,—এই স্থানে সমাধি হইয়াছে। মানুষের যাহা কিছু আছে সবই এই নে লয় প্রাপ্ত হয়। চিরপ্রবাহমান কালস্রোতে দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, র্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলে পলে সবই ভাসাইয়া লইয়া বিস্মৃতির অন্ধকারময় অতল র্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছ বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আর তাহা ই—বর্ত্তমানে যাহা দেখিতেছ, ভবিষ্যতে আর তাহা দেখিতে পাইবে । যাহা গেল—চিরকালের জন্য কোন অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল—এ খিল ব্রহ্মাণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া কোথাও আর তাহা পাইবে না—প্রাণ লেও আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না। সবই বিস্মৃতির তিমির গর্ভে বিয়া যায়—থাকে কেবল সুখদুঃখময় স্মৃতি—থাকে কীর্ত্তি। ম্যাট্‌সিনী, ্যারিবল্ডি, ওয়াসিংটন ইহাঁরা আজ কোথায়?—কে বলিতে পারে কোথায়? কিন্তু এক প্রান্তে ইটালী অপর প্রান্তে আমেরিকা, কালের প্রস্তর-পটে লৌহ ক্ষরে ইহাঁদিগের কীর্ত্তি লিখিয়াছে, শতকোটী বৎসরেও তাহা বিলুপ্ত ইবার নহে। চৈতন্য গিয়াছেন—তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রেম রহিয়াছে, খৃষ্ট গিয়াছেন—তাঁহার নির্ভর, তাঁহার বিশ্বাস এখনও জগতে জলন্ত রহি-য়াছে; বুদ্ধ গিয়াছেন—তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" আজ জগতের লোক অনুসরণ করিতেছে।

স্নেহময়ী জননী হৃদয়ের ধন প্রাণসম পুত্র হারাইয়া হাহাকার করিতে-ছেন; কেহ বা প্রাণের প্রিয়তম সুহৃদ হারাইয়া কেবলমাত্র স্মৃতিটুকু লইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন; কোন অবলার হৃদয়ের প্রিয়তম দেবতা, জীব-নের একমাত্র অবলম্বন এই মৃত্তিকায় মিশাইয়া গিয়াছে। তাই বলিতে ছিলাম সবই যায়, থাকে কেবল কীর্ত্তি—থাকে কেবল সুখ দুঃখময় স্মৃতি। যে যায় সে সুখে যায়,—এ জগতের দুঃখ শোকের হাত এড়াইয়া, মায়া মোহের হাত এড়াইয়া, পাপ প্রলোভনের হাত এড়াইয়া, এমন এক রাজ্যে চলিয়া যায় যেখানে দুঃখ নাই শোক নাই, মায়া নাই মোহ নাই, পাপ নাই প্রলোভন নাই। সে স্থান সংসারের সমস্ত পদার্থের অতীত—সে স্থান কেবলই আনন্দময়—

কেবলই শান্তিময়। আর যে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—যে বিগত জনের স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে থাকে—তাহার হৃদয়—যিনি কখনও অনুভব করিয়াছেন—তিনিই বুঝিতে সক্ষম হইবেন—তাহা বুঝাইবার নহে। সে জগতে বড় দুঃখী—এ অখিল সংসারে কোথাও তার বিন্দুমাত্র সুখ নাই—বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। কিন্তু এই স্থানে—এই শ্মশানে—যেখানে তার প্রিয়জনের সমাধি হইয়াছে—এস্থান তাহার পক্ষে বড় শান্তিপ্রদ—বড় সুখপ্রদ। সে এখানে আসিলে বড় শান্তি পায়—সে এখানে নিজ বাসস্থান করিতে চায়,—এই শ্মশান-বক্ষে চিরদিনেরমত বিশ্রাম লাভ করিতে চায়—নিদারুণ স্মৃতির সমাধি করিতে চায়।

এস্থান ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ—এস্থানের ধর্ম্মোপদেশ জ্বলন্ত। আস্তিক হও আর নাস্তিক হও, জড়বাদী হও আর অজ্ঞেয়তা বাদী হও—এস্থানে আসিলে তোমার দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে আকৃষ্ট হইবেই হইবে। তোমার প্রাণ অজ্ঞাতসারে সেই অনন্তের দিকে ধাবিত হইবেই হইবে। আর সেই দিন—সেই শেষ দিন—তাহা অপরিহার্য্য, পলাইয়া নিস্তার নাই, সেই দিন স্মরণ হইবে—তখন অলক্ষ্যে তোমার হৃদয় ঈশ্বরের কৃপা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে থাকিবে। নীরব নিশীথে অনন্ত বিস্তৃত আকাশ তলে এই সমাধি স্থানে বসিয়া একবার চিন্তায় নিমগ্ন হইও, দেখিবে তোমার প্রাণ সংসারের সকল চিন্তা হইতে বিমুক্ত হইয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাবে পরিপূর্ণ হইবে। ক্ষণ কালের জন্য সংসার ভুলিয়া আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া, নিশ্চল, নিষ্পন্দ, একাগ্র হইয়া একমাত্র সেই অনন্তের চিন্তায় ভুলিয়া যাইবে।

এ স্থান ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থান। এই শ্মশান পরলোক প্রবেশের দ্বার। মানুষ সংসারে ক্লান্ত হইয়া কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এ স্থানে আসিয়া চির দিনের মত বিশ্রাম লাভ করে—এ স্থান শান্তিময়। যাহা কিছু পার্থিব, যাহা কিছু অনিত্য, সমস্ত এ স্থানে পরিত্যাগ করিয়া মানুষ অনন্তলোকে চলিয়া যায়। যখন যায় তখন অমূল্য উপদেশ দিয়া যায়।

তা মুড়িবেন না

প্রতিমা।

সকল দেশে সকল লোকে প্রমিতার পূজা করে। অজ্ঞান জুলু ও জ্ঞানী স্পেন্সার সকলেই প্রতিমার উপাসক। প্রতিমা পূজা স্বাভাবিক। কল্পনায় মনুষ্যত্ব; ভাবশূন্য জীব নাই।—কাহারও ফুটে, কাহারও ফুটে না। কিন্তু এমন কেহ নাই, কি যেন গানের মত যাহার কাণের কাছে একেবারে বাজে না। ফুলের হারে কোনটী কলি, কোনটী ফুটন্ত ফুল।

ফুল লইয়া মানুষের চিরদিনের কারবার। ফুল দিয়া শিশু পুতুল সাজায়, কুমারী ফুল দিয়া বনদেবী সাজে, যুবতী সপত্র বেলের কলি বুকের উপর গুঁজিয়া রাখে, প্রাচীনা ফুলের হারে ও গঙ্গাজলে দেবতার পূজা করে। হৃদি-ফুলভার নিদ্রার আবেশ সঞ্চার করে; মানুষের প্রাণটী ফুলের রাণী, শিশুর হাসি তাহার নিদর্শন। তাই মানুষ ফুলের এত সোহাগ করে, দেবতার পায় ফুলের অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হয়। ফুলের স্বপন কি মধুর! সে স্বপন যেন স্বপন না হয়। ধীরে ধীরে ফুলটী ছুঁইতে হয়; সে যে ফুলের ঘাও সহিতে পারে না! শীতল বায়ু ধীরে ধীরে তার হাতটী ধরিয়া তার সঙ্গে খেলা করে। তার প্রাণটী বড় কোমল, অতি কোমল লতিকার শিশিরের শীতল জলে নিশির শীতল ছায়ায় তাহার জন্ম। মধু লোভে চঞ্চল অলি চারিদিকে কত ছুটিয়া বেড়ায়, কুসুমের কাছে পৌঁছিলেই তার চঞ্চলতা দূর হয়, অতি ধীরে ধীরে সে ফুলের মুখ খানি চুম্বন করে, যেন তার ঘুমটী না ভাঙ্গে; সে এতই কোমল যে তার দিকে চাহিতে ভয় করে, পাছে আমার খর দৃষ্টির চাপে শুকাইয়া যায়,—আর না ফুটে। "চাহি বনা কুসুম পানে, চাহিব না আর; চাহিলে পরে শুকিয়ে যাবে, ফুটবে না সে আর।" সে যে হৃদয় মাত্র, হৃদয়ের প্রতিকৃতি ফুল। গঙ্গা পূজা করিতে গঙ্গাজল চাই। হৃদয়ের পূজা করিতে হইলে ফুল দিতে হয়, ফুল হৃদয়ের প্রতিনিধি; ফুল দিলে হৃদয় দেওয়া হয়,—শুধু ভাল বাসা নয়, শুধু স্নেহ নয়, শুধু ভক্তি নয়; সমস্ত হৃদয়টা, হৃদয়ের সবটা দেওয়া হয়। ভক্তির চেয়েও পবিত্র, ভালবাসার চেয়েও কোমল, আমার যুঁথী, জাতী, মালতী। ফুল ছাড়া পূজা, আর কাণু ছাড়া কীর্ত্তন, দুই ই প্রলাপ। কথা শুষ্ক, নিশ্বাসে গরলিত কথা দিয়া পূজা একটা উদ্ভট্ট রহস্য। হৃদয়ের

মধ্যে আশা যখন ঘোমটা দিয়া থাকে,—বড় কোমল, বড় পবিত্র; গলার শ্লেষ্মা, নিশ্বাসের ধূলি দাঁতের কঠোরতার মধ্য দিয়া কথা রূপে যখন বাহির হয়, তখন তাহার সতীত্ব ঘুচে, সে তখন বারবনিতা। বারবনিতা উপহার দিয়া দেবতার পূজা? এ কলিকালে, এ শুষ্ক অপবিত্র বিষের মরুভূমে সকলই শোভা পায়!

হৃদি-ফুল হার দেবতার গলায় দিব। বর-মাল্য দিয়া তাঁহাকে বর সাজাইতে বড় সাধ হয়। দেবতা আমার মত। কল্পনা তাঁহাকে আমার মত করিয়াছে। জ্ঞান তাঁহাকে আমার হইতে দেয় না। জ্ঞান শুষ্ক, কল্পনা কোমল; কল্পনার কোয়াসায় আমি কত ছবি দেখি, সূর্য্যের কিরণে কত বিচিত্র বর্ণ প্রতিভাত হয়, কত শিশু ক্রীড়া করে। সে 'নিতুই নব'; কত তরঙ্গ ছুটে, আনন্দ ফুটে, বিষাদ টুটে। উচ্ছ্বাসের ফেণ-রাশি দিশি দিশি ধাওয়ে। গেঁটে ও সেক্সপিয়ার, যব ও ইসায়া, দান্তে বা পেটরার্ক, রাফেল বা ফিড়িয়াস, সাধ্য কি সে অপূর্ব্ব চিত্র তুলিকায় চিত্রিত করিবে? সে অর্দ্ধফুটন্ত মালা, তার অর্দ্ধেকটা জানা গিয়াছে। মুহূর্ত্ত-ফটোগ্রাফে সে চিত্র উঠে না। সে যে চুরি করে চায়, চোখের চাহনিটীত ধরিতে পারি না। চোখে চোখে দেখা হইলে যে ছুটিয়া পলায়। ফটোগ্রাফে উঠিবে কি? ফটুয়া ধরিবে কি? সে আধ-ফুট হাসি কল্পনার নিজস্ব ধন।

সে কোয়াসার কোমল কান্তি, ঊর্ণনাভের লুতাতন্তু জ্ঞান কঠোর অঙ্গুলি ঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়। শীতল ছায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দোর্দ্দণ্ড কিরণে মস্তক দগ্ধ করে। সে দীপ্তশিরার অভিষেক আর হয় না। আশার কোমলতা মরিয়া পড়ে, প্রবৃত্তির মোহ চলিয়া যায়, স্বপনের আবেশ ভাঙ্গিয়া যায়; একটা সহরের গোলমাল মাথায় ঢুকে, সাহারার আগুনে-বাতাসে প্রাণের প্রাণ যায়। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া যায়। মানুষ মরিয়া দেবতা হয়। দেবতা মরিয়া ভূত হয়। নিরাকার!!! আকাশের মতও নহে, আকাশের প্রতিধ্বনি সাগরের মতও নহে। বজ্রের মতও নহে, মৃত্যুর মতও নহে। নিরাকার!!! কেন আমাকে জ্ঞান দিয়াছিলে? সয়তান হইয়া আমাকে জ্ঞানের ফল কেন খাওয়াইয়াছিলে? অনন্ত পিয়াস মেটে না; বুক ফাটিয়া যায়। অনন্ত তুষানল নিবে না। পলে পলে অণুর পর অণু ঝলসিতেছে। অনন্ত

কালই অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। নাস্তিকতা বা আত্মহত্যা জ্ঞানের পরিণাম। কেন আমাকে জ্ঞান দিয়াছিলে? চিরদিন কেন শিশুর মতন রহিলাম না? আরত তেমন করিয়া তোমার কোলে বসিতে পারি না, মুখ খানি ধরিয়া চুম দিতে পারি না, চুল গুলি লইয়া খেলিতে পারি না। মা বলিয়া ডাকিতে পারি না। রাঙ্গা চরণ দুখানি ধরিয়া বুকে তুলিতে পারি না। মান অভিমান, হাসি তামাসা, ক্রীড়া কৌতুক, সব ফুরাইল। আর তুমি আমার হইবে না। জ্ঞান—জ্ঞান—জ্ঞান, মৃত সমুদ্রের পাঁশ ফল; যে জ্ঞান চায়, সে লউক; আমিত চাহি না। নির্ম্মল, নির্হৃয়, কালা বোবা কাণা ভূত মুসলমানের মামদ, সন্ন্যাসীর নিবৃত্তি, সাংখ্যের পুরুষ, কণাদের শিলাকণা, তুমি নাস্তিকের স্কন্ধে চাপিয়া বস। আমি কল্পনাকে লইয়া দুদিন খেলিয়া লই। তোমাকে ফুলের মালায় প্রতিমা সাজাইয়া মনুষ্যত্ব সার্থক ধরি। শিশুর সরলতা, অজ্ঞানতা, কল্পনা-প্রবণতা, ক্রীড়া-প্রিয়তা যেন জন্ম জন্ম আমার থাকে। এস একবার সোহাগ করি। আমি মনুষ্য, মনুষ্যত্বই আমার আদর্শ। দার্শনিকের কাছে তোমার দেবত্ব খাটাইও, আমার কাছে গৌর হয়ে এস, আমি তোমাকে বালভোগ খাওয়াইব, শোয়াইব, বসাইব। আদর করিব, অপমান করিব, কখন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব, আবার কখন হৃদি-সিংহাসনে বসাইব। তুমি আমার গরু চরাইবে, বাধা বহিবে, কখন গোবর্দ্ধন ধরিবে, কখন বাঁশী বাজাইবে। ধানের কনক শিরে দুলিবে, কমল বনে বীণার ঝঙ্কার দিবে, কখন করে অসি—গলে মুণ্ডমালা দিয়া আমার শত্রু শাসন করিবে। আমাকে পৌত্তলিক বলিয়া পণ্ডিতে উপহাস করুক সে ভাল, আমি নাস্তিক বলিয়া দার্শনিকের গৌরব আকাঙ্খা করি না।

তোমার নাকি হৃদয় নাই। আমার চোখের জল গুলি বালিতে শুকাইয়া যায়। আমার মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপ বাতাসে উড়িয়া যায়। তোমার কান নাই শুনিবে কি? চোখ নাই দেখিবে কি? আমার প্রাণের অনন্ত পিপাসা, হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা চিরদিন অতৃপ্ত রহিবে, বনফুল শুকাইয়া বনভূমে শুকাইয়া পড়িবে, কোমল লতিকা নিদাঘ-তাপে মাটীতে মাথা লুটাইবে। কারণ, তোমার হৃদয় নাই, আকাঙ্খা নাই, হৃদয়বানের সহিত সহানুভূতি নাই। আমি পরকালেও অবিশ্বাস

করিতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্ব ঘুচাইতে পারি না। বরং আত্মহত্যা করিয়া একদিনে সকল যাতনা ঘুচাইতে পারি, কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া অনন্ত দিনের অনন্ত যাতনা সহিতে পারি না। হৃদয়ের বাসনা শুকাইতে হইবে, যে ছেলে গুলি যত্ন করিয়া বুকে পুষিয়া দীর্ঘকাল মানুষ করিয়াছি, চোখে দেখিয়া হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিতে হইবে, আর তাহারা আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে, একটা নিশ্বাসও ফেলিতে পারিবনা। তাহা হইলে নিবৃত্তি হইল কৈ?!!! এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিবনা। তাহা হইলে নিষ্কাম হইল কৈ?!!! কাজ নাই, তাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম্মে, তোমার নিবৃত্তি মার্গে; আমার গৃহস্থের সংসার ভাল। তোমার সন্ন্যাস, তোমার যোগ, তোমার সংযমন, তোমার থাক্; আমি মনুষ্যত্ব চাহিব। প্রবৃত্তির তরঙ্গের উপর হাত পা ছাড়িয়া বুক পাতিয়া সাঁতার দিব, কখন পর্ব্বতের চূড়ায় চড়িব, কখন অতল জলে ডুবিব। পর্ব্বতের আঘাতে কখন বুক চূর্ণ হয় সেও ভাল, আমি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প শুষ্ক নিরাপদতা চাহি না। শ্বাপদ-সঙ্কুল বন ভূম, শুষ্ক বালুময় নির্জ্জীব মরুভূমি অপেক্ষা প্রিয়তর। আমি কাপুরুষ নহি, সংযমন সন্ন্যাসকে ভয় করি না; আবশ্যক হইলে অকাতরে তোমার পায়ের উপর প্রাণটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু জ্ঞানের চাক্‌চিক্যে প্রতারিত হইয়া সজ্ঞানে আত্মহত্যা কেন করিব? সাধ করিয়া পাগল হইব? যে মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করে, সে আত্মঘাতী। যে দেবত্বের প্রয়াস করে, নরকে তাহার চিরবাস ঘটে। আপনার প্রকৃতি ও আপনার ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিও না,—গীতার এই মহান্ উপদেশ।

আমি জানি না তুমি দেবতা কি না। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, তুমি হৃদয় শূন্য। যদি তাহাই হও; সন্ন্যাসী, বাতুল ও উন্মাদের নিকট হইও। আমার নিকট চিরদিন হৃদয়বান্ মানব-প্রকৃতি হইয়া থাকিও। যদি না হও, আমি তোমাকে ছাড়িয়া মনুষ্যের পায়ে আত্ম সমর্পণ করিয়া মনুষ্যত্ব সার্থক করিব, উৎকট পিপাসার শান্তি করিব। আমার নূতন জন্ম, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা পাইতে মনুষ্যই আমার উপযুক্ত আদর্শ। যদি আদর্শ মানব রূপে আমার চোখের সামনে দেখা দেও, তুমি আমার জন্ম সার্থক করিবে, আমার ইষ্ট গুরু হইবে। আর নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ম্মম হইয়া সপ্তম স্বর্গে বসিয়া থাক, তোমার প্রতি

মূর্ত্তি গড়িয়া তোমার ফটোগ্রাফ লইয়া তাহার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিব। মনুষ্যত্ব ঘুচিলে তখন তুমি কাছে আসিও। কেবল একটা অনুরোধ, প্রতিকৃতি যে তোমার অনুরূপ নহে, এইটা বুঝিতে দিও না।

দেবতা লইয়া আমি কি করিব? আমার মত যাহার আকার নহে, সে কদাকার; আমার মত যে সুন্দর নহে, সে কুরূপ; আমার মত যে কোমল নহে, সে পাষাণ; আমার মত যার হৃদয় নাই, সে রাক্ষস; তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি নাই। সে আমার সখা হইবে কি রূপে? তাহার পায় বিকাইব কেন? হৃদয় তাহাকে চাহে না। যে আমাকে তাহার করিতে চায়, সে আমাকে আমি যাহা চাই, তাই দিয়া ভুলাইবে। আমি মানুষ, আদর্শ মানুষ চাই। দেবতা চাহি না, অবতার চাই। আর আমি যাহাকে চাই, তাহাকে না পাইলে অন্যকে—হোক না সে রূপবতী, হোক না সে গুণবতী তাহাকে——কেন ভাল বাসিব? তোমার সপ্তম রাজ্যের অতুল ধন তোমার থাক্, আমি তাহা চাহি না; তোমার স্বর্গের নন্দন-কানন তোমার থাক্, আমি তাহা চাহিনা। আমাকে এই শ্যামাঙ্গিনী তরুলতা-কুঞ্জকানন-শোভিনী পৃথিবী ভাল লাগে; এমন ঘাস পাতা, এমন ফুল ফল, এমন পশু পাখী, এমন নীলাকাশ, এমন চন্দ্রাতপ, আর এমন প্রিয়জন কি তোমার স্বর্গে আছে? আমায় তৃষ্ণায় জল দেয়, ব্যথায় হাত বুলায়, কাছে বসাইয়া সোহাগ করে,——এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এমন অমৃত রাশি, এমন মনুষ্য কি তোমার স্বর্গে আছে? আমি মানুষ, আমি মানুষে মুগ্ধ; ভূত প্রেত দেব দানব চাহি না,——হইতে পারে তারা রূপবান্; কিন্তু রূপত আমার চোখে? আমার চোখ লইয়া দেখ দেখি, এরা সুন্দর কি তারা সুন্দর? আমার হৃদয়টা লইয়া দেখ দেখি, কিসে তৃপ্তি হয়?

মানুষের কাছে বসিলে আমার নেশা হয়। হেমন্তের শিশির কণার মত মদিরা-কণা আমার অজ্ঞাত সারে প্রাণটা ছাইয়া ফেলে। নেশায় বিভোর হই; যত পাই তত খাই, যত খাই তত চাই। পিপাসা মেটেনা—কেবল বলি, ঢাল ঢাল, আরো ঢাল, আরো আরো। এমনি যখন মাতাল হই, তখন আমাকে লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এ বড় সহজ উপায়। তাহার মত চোখ দুটী লইয়া, তেমনি মুখ খানি লইয়া আমার কাছে আসিও; তাহার পর আমি মাতাল হইলে, তোমার পায়ে

দিয়া আমার প্রাণটা পূর্ণ হইলে যথা ইচ্ছা পঞ্চম বা সপ্তম, যে স্বর্গে ইচ্ছা লইয়া যাইও। প্রথমে সহানুভূতি দেখাইও, আমার দুর্ব্বলতায় একটু প্রশ্রয় দিও, তাহার পর ক্রমে ক্রমে শাসন করিও। ক্রম-বিকাশ না হইলে পূর্ণ-বিকাশ হইবে না; ফুড়ুক করিয়া তুঙ্গ শৃঙ্গে উড়িয়া বসিলে চলিবে কেন? আমাকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে। মাথা বেড়িয়া নাক দেখাইতে হইবে। ধীরে ধীরে হাতটী নাড়িয়া ঘুমটী ভাঙ্গাও। আমি তোমা দ্বারা শাসিত হইতে চাই, তোমার অবাধ্য হইব না। শাসনের কোঠরতা প্রথমতঃ একটু কোমল কর; আমি যে মনুষ্য, দেবত্বের পূর্ণ কঠোরতা আমাকে ত্রাসিত করে। হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে সঙ্গে লইয়া চল, আমার দুর্ব্বলতাকে উপহাস করিও না; তাহা হইলে চলিবে কেন? অযুত তরঙ্গঘাতে একটু টলিবে না, এমন হিমাচল হইলে চলিবে কেন? পাষাণের সঙ্গে কি ভাব হয়? যখন ধন চাহিব ধন দিবে, যশ চাহিব যশ দিবে, আয়ুঃ চাহিব আয়ুঃ দিবে। বালককে পুতুল দিয়াই ভুলাইতে হয়। পাথর কুচি তাহার রুচিবে কেন? যখন বড় হইব, তখন আপনিত পুতুল ছাড়িব; আর চাহিব না। শিশুকে পুথী দিয়া কি ভুলান যায়? যখন বড় হইব, তখন আশা উচ্চতর হইবে; তাই বলি যত দিন মানুষ থাকিব, মনুষ্যত্ব ভাল বাসিব; মানুষের প্রবৃত্তি, মানুষের হৃদয় দেখাইয়া আমাকে শাসন কর। যখন দেবতা হইব, তখন তোমার নিষ্কাম দেবত্বের প্রয়াসী হইতে পারি। ধর্ম্মের সার্থকতা জীবনে; যে ধর্ম্মে জীবন যায়, সে ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে? তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন করিতে আমার মনুষ্যত্বের অবসান হইবে। তখন আমি আর আমি থাকিব না। আমি যদি না রহিলাম, আমার যদি মৃত্যু ঘটিল, তবে নিষ্কামতা কাহার লাভ হইবে? পরের জন্য আমার প্রাণটা দিব কেন? এমন কবিতা পূর্ণ জীবন, এ কি ছাড়া যায়? এখন আমার মালা ছড়াটী গলায় পর, হাসিয়া একবার সোহাগ কর। নিরাকারতা, নির্ব্বিকারতা, নিষ্কামতা, ঘট পটতা গিরি গুহায় ফেলিয়া দাও। মানুষে যেন খুঁজিয়া না পায়। সম্বর সম্বর, জ্ঞানের জ্যোতিটা একটু কমাইয়া বাঁধ, ঘরে একটু আলো-আঁধারে হউক, নতুবা ধাঁধাঁ লাগিবে। মনুষ্যত্বের কাঁচা মাটীর উপর দেবত্বের প্রাসাদ টেকিবে না। কি একটা কিম্ভূত কিমাকার হইবে। বালক পুতুল [illegible] আমার প্রতিমা চূর্ণ করিয়া

আমাকে হৃদয়হীন করিও না। হৃদয় আমার সর্ব্বস্ব। আর কিছু না থাকিলে, আমার এই হৃদয়টী তোমাকে দিতে পারিব; এই হৃদয়ের উপর তোমার পদাঙ্ক আছে। ইহা পবিত্র স্থান, দেবমন্দির। চণ্ডাল না হইলে কি মন্দির ভাঙ্গিতে আর কেহ সাহস করে? সব ছাড়িতে পারি, হৃদয় ছাড়িতে পারি না; কারণ, উহাই আমার মনুষ্যত্বের উপাদান। হৃদয় বড়, না জ্ঞান বড়? হৃদয় বড়। জ্ঞানে দেবতা, হৃদয়ে মনুষ্য। মানুষের কাছে মানুষ বড়, দেবতার কাছে দেবতা বড়। সিংহ শৃগালের আদর্শ নহে, ব্যাঘ্র হরিণের আদর্শ নহে, দেবতা মানুষের আদর্শ নহে, মানুষের আদর্শ মানুষ। আদর্শ যত উচ্চ হইবে, উন্নতি তত অধিক হইবে; সেই জন্য আমার আদর্শ দেব-নর বা নর-দেব। দেবতা মানব রূপ ধারণ না করিলে, মানবীয় আকার মানবীয় ব্যবহার, মানবের ন্যায় শোক দুঃখ জন্ম জরা জীবন মৃত্যুর অধীন না হইলে, আজ মানব সমাজ কোথায় থাকিত? প্রতিমা পূজা কেবল স্বাভাবিক নহে, উহা মানব সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির মূল হইয়াছে; প্রতিমা পূজা করিয়াই লোকে দেবতাকে পাইয়াছে। প্রতিমা না থাকিলে ঈশ্বর থাকিত না, এবং এমন দিন হইবে না, যখন প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ভাব শূন্য জীবন শূন্য দেবতা মানব সমাজে রাজত্ব করিবে। যেখানে ভাব নাই, সেখানে জীবন নাই; জল শূন্য নদী, উচ্ছ্বাস শূন্য জল আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক। যে দেবতাকে হৃদয় শূন্য করিতে চাহে, সে দেবতাকে মারিতে চাহে। আমার দেবতা জীবন্ত মানব প্রকৃতি সম্পন্ন। আমার সঙ্গে কাঁদেন, আমার সঙ্গে হাসেন। তিনি জীবন্ত প্রতিমা; তাঁহাকে বুকে বুকে রাখি, চরণ ধরিয়া কাঁদি। আমার দেবতা প্রতিমা, আমার পূজা কবিতা। ফুলের দেবতা, ফুল দিয়া পূজা; ফুলের সৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ। কল্পনায় আবাহন, কল্পনায় বিসর্জ্জন। প্রতিমা পূজা মধুর কবিতা। পুরোহিত সকলেই সুদক্ষ;——হোমর, যব, ইস্কাইলাস, ইসায়া, দান্তে, রাবিলে, কালিদাস ও সেক্সপিয়র। প্রতিমা দর্শন ফুলের ঘ্রাণ ও কাব্য পাঠ জগতের উৎকৃষ্ট পূজা। কবিতা ফুল ও প্রতিমা—অপূর্ব্ব সম্মিলন! "তথা গয়া গঙ্গা বারাণসী, সকল তীর্থ মিলে আসি, প্রভাস প্রয়াগ ও বরাঙ্গ পদতলে।"

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

কাউণ্ট ডিএল ভিএলা ও ব্রাহ্মসমাজ।

কাউণ্ট গব্‌লেট্ ডিএলা ভিএলা ব্রাসেল্‌স নগরের বিশ্ব বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যাপক। ইতি পূর্ব্বে তিনি বেলজিয়াম দেশের প্রতিনিধি সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কোন প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সম্ভুক্ত নহেন, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসায় নিযুক্ত সেই সকল লোকের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। অনেক বৎসর হইতে ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সংস্কারের যে সমস্ত চেষ্টা হইতেছে, তিনি তাহা অধ্যয়ন করিতেছেন। সেই আলোচনা ও অধ্যয়নের ফল স্বরূপ তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থ খানির নাম "Contemporary Evolution of Relgious thought in England, America and India." অর্থাৎ ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে ধর্ম্ম চিন্তার সমকালীন ক্রম বিকাশ। এই গ্রন্থে তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে প্রাগুক্ত স্থানত্রয়ে যে সমস্ত আন্দোলন হইতেছে তদ্বিবরণ সন্নিবেশ করিয়াছেন এবং তৎসম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটীকে শ্রেষ্ঠ বা অপরকে হীনকক্ষ জ্ঞান করেন না। তিনি বলেন "এই সমস্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য বিষয়ে একতা এরূপ প্রবল বলিয়া বোধ হয় যে, তাহাদের বাহ্যিক লক্ষণ বিষয়ে বিভিন্নতা গণনার মধ্যেই আসে না।" তিনি যে অত্যন্ত উদার সার্ব্বভৌমিক মত অবলম্বন করেন, তাহা স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডে ডাক্তার মার্টিনোর নিকট আমি আপনাকে ইউনিটেরিয়ন, মিষ্টার ভয়সির নিকট একেশ্বরবাদী, বোষ্টন নগরে থিওডোরপার্কারের নিকট ট্রেনসেণ্ডেণ্টেলিষ্ট, নিউইয়র্ক নগরে আডলার সাহেবের নিকট খৃষ্টকে মনুষ্য জ্ঞান, এবং কলিকাতা নগরে ব্রাহ্মদিগের নিকট ব্রাহ্মসদৃশ জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত নহি। যদি আমি উপরোক্ত সম্প্রদায়ের কোন একটীতে জন্ম গ্রহণ করিতাম, সম্ভবতঃ আমি তাহার মধ্যেই

থাকিতাম, যেহেতু তদ্দ্বারা আমার নৈতিক ও মানসিক উন্নতির কোন বিঘ্ন উৎপাদিত হইত না।"

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ যে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় না, কিন্তু যাহারা কেবল শুষ্ক ধর্ম্মমত লইয়া তর্ক বিতর্ক করে তাহাদেরই পক্ষে উহা গ্রহণীয়, এই আপত্তি যে অমূলক কাউণ্টডিএলভিয়েলা ভারতবর্ষে আসিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তিনি প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজ দর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যদি খৃষ্ট ধর্ম্মের বাহ্যিক চিহ্ন ক্রুশাদির অভাব না থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগকে কোন খৃষ্টীয় উপাসক মণ্ডলী বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইত। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির দর্শন করিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদয় হইয়াছিল, তাহা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"১৮৭৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসের শেষ রবিবারে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট দিয়া গমন করিতে করিতে আমি এক প্রকার নূতন গথিক আকারের উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলাম। তথায় তিন চারি শত ব্যক্তি শুভ্র লম্বমান শাল দ্বারা আবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিল। প্রাচীন কালে গ্রীক জাতি টোগা পরিধান করিলে যে রূপ দেখাইত এই তাম্রবর্ণ বাঙ্গালীরা শুভ্র বসনাবৃত হইয়া সেইরূপ শোভা ধারণকরিয়াছিল। তন্মধ্যে দ্বাদশাধিক স্ত্রীলোক দৃষ্ট হইল না এবং ইহারা মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। কিন্তু গেলারির পর্দ্দার অন্তরাল হইতে যে শব্দ আসিতে ছিল, তদ্দ্বারা বোধ হয় উপাসক মণ্ডলীতে কেবল পুরুষ জাতিই নহে। দ্বারের সম্মুখেই বেদী, ঐ মার্ব্বেল নির্ম্মিত উচ্চ আসনে আচার্য্য শুভ্র বসনাবৃত এবং আসনপিড়ে হইয়া বসিয়া আছেন।"

যাঁহারা কখন ভারতবর্ষে আসেন নাই, এদেশের বসন ভূষণ, উপবেশনাদি তাঁহাদের চক্ষে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু কেহ কেহ যেমন পূর্ব্বে এই সমস্তকে অসভ্যতার লক্ষণ বলিতেন, এখন আর সেরূপ নাই। দূরদর্শী পণ্ডিতগণ আমাদের আচার ব্যবহারে সরলতা ও বসন ভূষণাদিতে প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন নিরীক্ষণ করেন। আমরা অনেক সময়ে ঐ অদূরদর্শী লোকদিগের ন্যায় স্বদেশীয় বসন ভূষণকে অসভ্যতার পরিচায়ক বলিতে শিখিতেছি! কাউণ্ট গবলেট যে সামান্য উড়ণী দেখিয়া "flowing showls" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, আমরা যথার্থ শালকে এখন অসভ্যতার চিহ্ন মনে করি। এ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এখন থাকুক।

ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে একেশ্বরবাদ কিরূপে প্রচলিত হইয়াছিল, হিন্দু ধর্ম্ম উদারভাবে কিরূপে সেশ্বর নিরীশ্বর, দেশীয় বিদেশীয় সকল প্রকার ধর্ম্ম ও দর্শনের মত স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইতে দিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তারের বিবরণ গ্রন্থকার অতি বিশদ রূপে স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" শব্দের এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন "Rule of theism"। এস্থলে বলা আবশ্যক, যে গ্রন্থখানি আমরা পাঠ করিতেছি ইহা অনুবাদ মাত্র। প্রকৃত গ্রন্থ ফরাসিস্ ভাষায় লিখিত; সুতরাং এই অনুবাদ গ্রন্থকারের না হইতে পারে, ইহা অনুবাদকের ভ্রম হওয়াও অসম্ভব নহে।

রাজা রামমোহন রায় কিরূপে একেশ্বরবাদী হইলেন, তাঁহার ধর্ম্মানুসন্ধানের প্রথম ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার একস্থলে লিখিয়াছেন যে, "তিনি বেদান্ত হইতে ঈশ্বরের একত্ব ও পরকালের অস্তিত্ব শিক্ষা করিয়া ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাকে একেশ্বরবাদী বলা যায় না।" কাউণ্ট ডিএল ভিয়েলার সংস্কার এই যে, রামমোহন রায় অদ্বৈতবাদী ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এই ভ্রমে পতিত হইতেন না।

গ্রন্থকার আর একটী ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল একটী বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত মাত্র ছিল। তাঁহার এপ্রকার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে ব্রাহ্মগণ পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা গৃহে সমস্ত পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতেন এবং ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তখন তাঁহাদের বিশ্বাস এরূপ প্রগাঢ় হয় নাই, যদ্দ্বারা ত্যাগ স্বীকারে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। যদি কেবল এই সামাজিক ক্রিয়া কলাপে ধর্ম্মবলের অভাব হেতু ব্রাহ্মধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মকে ধর্ম্মনামের উপযুক্ত বলা যাইতে পারে না। সহস্র ব্রাহ্মের মধ্যে কয় ব্যক্তি সামাজিক বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় লইয়াছেন? শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিজ্ঞানের সীমা হইতে যে উন্নত করিয়াছিলেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। রাজা রামমোহন রায়ের সময় ধর্ম্মবিজ্ঞান

লইয়া ব্রাহ্মগণ সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রূপে পরিণত হয়। তিনি ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মদিগকে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত করিবার জন্য ধর্ম্ম গ্রহণ প্রতিজ্ঞা প্রণয়ন করেন এবং তদবধি ব্রাহ্মগণ একটী সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার সময়ে প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বর প্রেম, জীবন্ত বিশ্বাস এবং বিশুদ্ধ জীবন ব্রাহ্মদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। স্বতন্ত্র ধর্ম্মের যে কয়েকটী উপকরণ আবশ্যক, তাহা তিনি ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিলেন। যথা,—ধর্ম্মগ্রন্থ, উপাসনা-প্রণালী, বীজমন্ত্র, অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও ধর্ম্ম গ্রহণ প্রতিজ্ঞা। অপৌত্তলিক উপাসনা এবং গৃহানুষ্ঠানও তিনি সর্ব্ব প্রথমে প্রচার করেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম গ্রহণ প্রতিজ্ঞার প্রথম প্রতিজ্ঞা ত্রয় এই;—

১। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, মঙ্গল স্বরূপ, নিরবয়ব, একমাত্র, অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি দ্বারা এবং তাহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

২। পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।

৩। রোগ বা কোন বিপদ দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।

তিনি কেবল নিয়ম ও প্রণালী প্রণয়ন করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। আপনার জীবনে তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পৌত্তলিক উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার গৃহে কোন দেব দেবীর পূজা হইত না, প্রতিদিন পারিবারিক ব্রহ্মোপাসনা হইত। সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়েরও তিনি প্রথম দৃষ্টান্ত দেখান। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে তাঁহার কন্যার বিবাহ নিজ প্রণীত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হয় না।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্ররোচনায় এই সামাজিক অনুষ্ঠান সকল ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে যখন পৌত্তলিক জাতি নিষিদ্ধ হয়, তখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ

করেন নাই। ঐ প্রতিজ্ঞা যে ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ অপৌত্তলিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়ের সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃতরূপে সংস্থাপিত হয় নাই। তিনি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল, কুসংস্কার বর্জ্জিত লোকদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমিক উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন; কিন্তু ঐ উপাসকগণ গৃহে সকল প্রকার কুসংস্কার ও পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায় নিজে কুসংস্কার বর্জ্জিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত জ্ঞান সম্পন্ন ও উদার-চিত্ত ব্যক্তি যে পৌত্তলিকতাকে বাল ক্রীড়া স্বরূপ মনে করিতেন, তাহা তাঁহার বেদান্তের অনুবাদ, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার প্রথম সংস্কারের সময় বিচার ও আলোচনার সময়, পুরাতন কুসংস্কার বিনাশের সময়। তিনি নূতন কিছু গঠন করিবার অবকাশ পান নাই। কিন্তু যাহা কিছু তিনি করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে যে, ইংলণ্ড হইতে যদি তিনি প্রত্যাগমন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে গঠন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

সাধের মেয়ে।

(১)

সাধের মেয়ে, আদর পেয়ে,
হেসে কুটি কুটি;
মায়ের কাছে, সদাই নাচে,
তুলি হাত দুটী।

(২)

পবনে উড়ে, বদনে পড়ে
কুঞ্চিত কুন্তল,
তাহার মাঝে, মধুর সাজে
নয়ন যুগল।

(৩)

নাকের কোলে, নোলক দোলে,
মাধুরী বিকাশ;
হাসির ঘায়, কাঁপিয়া যায়
সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বাস।

(৪)

সোহাগে গলে, টলিয়া চলে,
পাগল পরাণ;
চকিত চায়, কখন গায়
ভাঙ্গা ভাঙ্গা গান।

(৫)

অঠিক সব, সঙ্গীত নব,
আধ আধ স্বর ;
সুধুই হাসে, স্বপন ভাষে
ভরিয়া অন্তর।

(৬)

ভোরের বেলা, ঊষার খেলা
হেরিলে নয়নে,
বাগানে গিয়া, কুসুম নিয়া,
খেলে এক মনে।

(৭)

মায়ের স্বর, শুনিলে পর,
আনন্দ লহরি
তুলিয়া, ধায়, চঞ্চল পায়,
গৃহ আলো করি।

(৮)

সকল ঘরে, আঁচল ধরে
ভ্রমে মার সাথ,
পড়িয়া উঠে, আবার ছুটে,
নাহি দৃষ্টি পাত।

(৯)

সাঁঝের করে, কনক সরে,
ডুবিলে তপন ;
গরবী মেয়ে, বাবারে পেয়ে,
চুমাতে মগন।

(১০)

গলায় দুলি, জগৎ ভুলি,
খেলার কাহিনী,
পিতার কাণে, ভগন তানে
ঢালে, সোহাগিনী।

(১১)

রজনী হেরে, জননী তারে,
পিতৃ-কোল হতে,
লইয়া সুখে, চুমিয়া মুখে,
চাহে ঘুমাইতে।

(১২)

আহ্লাদ ভরে, শয্যার ক্রোড়ে,
বালিকা-রতন,
স্নেহের সনে, পুলক মনে,
ঘুমায় তখন।

শ্রীমতী নীহারিকা।

বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান।

বিবেক কি, মানবের ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য তাহার কর্ত্তব্যই বা কি, ইহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করা গেল। বিষয়টি এত কঠিন, মানবজীবনে ইহার ফলাফল এতদূর গুরুতর যে, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে ভয় হয়, পাছে কেহ হিতে বিপরীত বুঝেন। কিন্তু সত্যই পরম মঙ্গল, সত্যাপেক্ষা কাম্য বস্তু কিছুই নাই। তাই সত্যের নামে আজ এই গুরুতর বিষয়টির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

বিবেক কি? এ বিষয়ে নানা প্রকার মতভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ বা বিবেককে অতি সামান্য স্থান প্রদান করিয়াছেন, ইহাকে বাল্য শিক্ষার ফলমাত্র বিবেচনা করেন, ও কুসংস্কার জনিত ভয়ই ইহার প্রাণ মনে করেন। অন্যপক্ষে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিবেককে মানবের বৃত্তি সমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াও তৃপ্ত নহেন, তাঁহারা ইহাকে মানবীয় বৃত্তিই বলিতে চাহেন না—ইহাকে মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎবাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিবেকের উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদুভয় শ্রেণীস্থ লোকই অতি সহজে মীমাংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু উভয়ই প্রমাণ-সাপেক্ষ। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মতে শিক্ষাই সর্ব্বশক্তিমান—যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, চরিত্র ও মত ঠিক তদনুরূপই হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক স্থলে আমরা ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। অনেকে অসৎ সংসর্গে পড়িয়াও স্বীয় মৌলিক চরিত্র গুণে তৎসমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চরিত্র-মহিমা বিস্তার করিয়াছেন। অপর পক্ষে অনেকে সৎ সঙ্গে থাকিয়াও এবং সৎশিক্ষা পাইয়াও সময় ও সুবিধা উপস্থিত হইলেই স্বীয় চরিত্রের মালিন্য দেখাইয়া সাধু সঙ্গের মহিমা হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দর্শনের সাহায্যে এ বিষয়টির বিচার করিলেও ইহার ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করা অতি সহজ। এই শ্রেণীর লোকেরা বিবেকের মূল অন্তরে নির্দ্দেশ না করিয়া সম্পূর্ণ রূপে বাহিরের শিক্ষার উপর স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু "যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" যাহা আমার অন্তরে নাই

তাহার অস্তিত্ব আমার বাহিরেও নাই—থাকিলেও তাহা আমার নিকট অসৎ। শিক্ষার কথা বলিতে গেলেই শিক্ষাগ্রহণোপযোগী কিছু আমার অন্তরে থাকাও নিতান্ত প্রয়োজন—যাহা আমার অন্তরে বীজরূপে বর্ত্তমান আছে, শিক্ষা আমাকে তাহা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। শিক্ষাবলে জন্মান্ধের বর্ণ-জ্ঞান জন্মাইয়া দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের মতে মানবের ভাল মন্দ বুঝিবার কোন ক্ষমতা নাই—তাই ঈশ্বর কৃপা করিয়া মানবকে এই ভ্রম প্রমাদ ও পাপ পূর্ণ সংসারে পাপের পথ ত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে বিচরণ করিবার জন্য একটি বিশেষ শক্তি দিয়াছেন—সেই শক্তি মানবের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বদাই তাহাকে সদসৎ বিচার করিয়া দিতেছে। মানব সেই বাণীর প্রতি কর্ণপাত করে না বলিয়াই পাপে পতিত হয়; আর যদি সে সেই বাণীর আদেশ শ্রবণ করিয়া চলিতে বাসনা করে, তাহা হইলে সে অভ্রান্ত ভাবে পুণ্যের পথে চলিতে সক্ষম হইবে। এই মতের প্রতিকূলে সাংঘাতিক আপত্তি আছে। মানবের যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই ঈশ্বর প্রদত্ত; সে-ভাবে হিতাহিত জ্ঞানের শক্তিও ঈশ্বর প্রদত্ত। কিন্তু ইহাতে যে বিশেষত্ব প্রদান করা হয়—সে বিশেষত্বের প্রমাণ কি? মানবের অন্যান্য বৃত্তি সমূহ মানব প্রকৃতির অঙ্গীভূত, কিন্তু এই বিবেক বৃত্তি যে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাদত্ত, ইহার কোনও সাক্ষৎ প্রমাণ নাই। বোধ হয় কেহ এরূপ প্রমাণ দিতে সাহসীও হইবেন না। তবে যদি এরূপ প্রমাণিত হয় যে, মানবের অন্যান্য জ্ঞান-বৃত্তি ভ্রম প্রমাদ সঙ্কুল, কিন্তু বিবেকের বাণী অভ্রান্ত (আর যদি ইহা ঈশ্বরের বাণীই হয়, তাহা হইলে অভ্রান্ত না হইয়াই পারে না; কারণ, ঈশ্বরে ভ্রম প্রমাদ স্পর্শ করিতে পারে না), তাহা হইলেও বিবেকের বিশেষত্ব অনুমান সিদ্ধ। বিবেক যদি ঈশ্বরের বাণী হয়, তাহা হইলে ইহা দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বর নিত্য সত্য, তাঁহার আদেশও নিত্য সত্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিবেকের আদেশ অভ্রান্ত নহে—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে ইহা ভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যাহা একজনের নিকট সত্য, তাহা অপরের নিকট অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এমন কি একই ব্যক্তিকে যাহা এক সময়ে পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে, অন্য সময়ে তাহাই আবার মহা অসত্য বলিয়া ত্যাগ করিতে দেখা যায়। প্রত্যেক

ব্যক্তির জীবনের এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভ্রম সংস্কুল বিবেককে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন না। যদি কহে করেন, তবে তাঁহার সহিত যুক্তি তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই প্রকার সম্পূর্ণ বিরোধী মতের মধ্যবর্ত্তী নানা প্রকার মত রহিয়াছে। এখন একে একে তাহাদেরই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিবেককে সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া স্বীকার করেন না ও ইহার বিশেষ বিশেষ আদেশকে অভ্রান্ত মনে করেন না বটে, কিন্তু ইহাকে বুদ্ধি বৃত্তির উপরে স্থান প্রদান করিয়া থাকেন ও ইহার আদেশে একটা বিশেষ পবিত্রতার (Sanctity) ভাব আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য মনে না করিলেও ইহাকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন ও ইহার আদেশ লঙ্ঘন করাকে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনের ন্যায় মহা পাপ বলিয়া মনে করেন। বিশেষ বিশেষ কার্য্যে এই বৃত্তির ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হইলেও এবং শিক্ষাভেদে ও অবস্থা ভেদে ইহার পরিবর্ত্তন হইলেও তাঁহারা ইহাতে কিছু ঐশী ভাব আরোপ করিতে পরাঙ্মুখ হন না, অথচ স্পষ্টরূপে ইহাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অভ্রান্ত বাণী বলিতেও কুণ্ঠিত হন। অন্যপক্ষে যদিও স্বীকার করেন যে, বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা ও পরিশুদ্ধির উপর এই বৃত্তির বিকাশ ও উজ্জ্বলতা নির্ভর করিতেছে, তথাপি ইহাকে বুদ্ধি বৃত্তির সংস্কার বিশেষ বলিতেও প্রস্তুত নহেন। ইঁহারা মনে করেন যে, বিশেষ বিশেষ কার্য্যে বুদ্ধি বৃত্তিই ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেয় ও বিবেক বৃত্তি বুদ্ধির সেই বিচারে কিঞ্চিৎ পবিত্রতা (Sanctity) কিঞ্চিৎ অবশ্য কর্ত্তব্যতার ভাব ঢালিয়া দিয়া ইহাকে অতি মানবীয় করিয়া তুলে। বিবেকের বিশেষ বিশেষ আদেশে বুদ্ধির বিচারাংশটুকু ভ্রান্তি মূলক হইতে পারে, কিন্তু বিবেকের ভাবাংশটুকুর পরিবর্ত্তন নাই—এইরূপে বিবেকের অভ্রান্ততা কতক পরিমাণে দণ্ডায়মান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিবেক সম্বন্ধে মতামত নিতান্ত অস্পষ্ট—একটু সন্দেহ সমাচ্ছন্ন। ইঁহারা বুদ্ধিবৃত্তির মস্তকে পদস্থাপন পূর্ব্বক ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অতি মানবীয় করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মানবীয় বৃত্তি বলিয়া ইহার বিশেষ ঐশিক পবিত্রতা নষ্ট করিতেও সাহসী হন না,—পাছে লোকে

বিবেকের বন্ধন ছিন্ন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলমার্গে বিচরণ করে। ইঁহারা এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া দার্শনিক সঙ্গতি (Philosophic consistency) রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা বিবেককে বুদ্ধিবৃত্তি নিরপেক্ষ একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ও ইহাতে ঐশ্বরিক ভাব আরোপ করেন, তাঁহাদের দেখান উচিত যে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যে আমরা প্রধানতঃ বুদ্ধির কার্য্যই দেখিয়া থাকি। একটি কার্য্য উপস্থিত হইলে বুদ্ধি তাহার সকল দিক দেখিয়া ভালমন্দ স্থির করিয়া দিল। এপর্য্যন্ত বিবেকের কার্য্য নহে, বুদ্ধিরই কার্য্য। যাহাকে ভাল বলিয়া স্থির হইল তাহাই করিতে আমাদের প্রাণ স্বতাবতঃই উন্মুখ হয়—তদনুযায়ী কার্য্য করিলে আমরা আত্ম-প্রসাদ লাভ করি, তদ্বিপরীত করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। এখানেই আমরা বিবেকের কার্য্য দেখিতেছি। এখন যাঁহার বুদ্ধির এই ভালমন্দ বিচার যত সুস্পষ্ট বা যাহার এই বিচার যত কিন্তু-রহিত, তাঁহার প্রাণেই বিবেকের আধিপত্য সেই পরিমাণে সমধিক; তাঁহার প্রাণে আত্ম প্রসাদ বা আত্ম গ্লানির তীব্রতা সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি ম্লান, যাঁহার ভাল মন্দ বিচার অস্পষ্ট বা যাঁহার বিচারিত বিষয়ের উভয় পক্ষই ভালমন্দ মিশ্রিত, নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা নিরবচ্ছিন্ন মন্দ কোনও দিকেই নাই—তাঁহার পক্ষে বিবেকজ আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি সেই পরিমাণে তীব্র হইতে পারে না। এই বিষয়টী একটু অনুধাবন করিয়া চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে, যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতার উপর বিবেকের উজ্জ্বলতা নির্ভর করে, একের হ্রাস বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই Concomitant variation দ্বারা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, বিবেক বুদ্ধিবৃত্তিরই অংশ বিশেষ।

কেবল যে ভাল মন্দের গুণ গত বিচারে আমরা বুদ্ধির কার্য্য দেখিতে পাই, তাহা নহে—ভাল মন্দের পরিমাণ গত বিচারে বুদ্ধির কার্য্য আমরা আরও সুস্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই। যে স্থলে বিচারিত বিষয়ের একদিকে নিরবচ্ছিন্ন ভাল, অপর দিকে নিরবচ্ছিন্ন মন্দ অর্থাৎ যে স্থলে বুদ্ধির বিচার সুস্পষ্ট ও কিন্তু-রহিত সে স্থলে বিবেকের আদেশও সুস্পষ্ট ও কিন্তু-রহিত; কিন্তু যে স্থলে বিচারিত বিষয়ের উভয় দিকই ভালমন্দ মিশ্রিত, ভালর সহিত মন্দটুকু মিশিয়া রহিয়াছে, সত্যের সহিত অসত্য মিশিয়া রহিয়াছে—সে স্থলে বিবেক সন্দেহে দোলায়মান—কোনও দিকেই সুস্পষ্ট

আদেশ দিতে পারিতেছেন না, তখন বিবেককে রায় দেওয়া স্থগিত রাখিয়া ভালমন্দের পরিমাণ গত বিচারের জন্য পুনরায় বুদ্ধির নিকট যাইয়া উপস্থিত হইতে হয়। বুদ্ধি তখন ভাল মন্দর পরিমাণগত বিচার আরম্ভ করিলেন। উভয় দিকের ভাল ও মন্দ যদি এক জাতীয় হয়, তবে কোন্ দিকে কতটুকু ভাল ও কোন্ দিকে কতটুকু মন্দ, বিচার করিয়া স্থির করিলেন; কিন্তু যদি উভয় দিকের ভাল ও উভয় দিকের মন্দ ভিন্ন জাতীয় হয়, তবে বিভিন্ন জাতীয় ভালর আবার মূল্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে—কোন্ ভালতে কতটুকু লাভ, কোন্ মন্দে কতটুকু ক্ষতি গণনা করা প্রয়োজন। এখন ভাল আর ভাল বলিয়াই ভাল নহে, মন্দ আর মন্দ বলিয়াই মন্দ নহে—ভালমন্দ এখন ক্ষতি লাভ গণনাতে পরিণত হইল। এই ক্ষতিলাভ গণনায় ভালমন্দর বস্তুগত পার্থক্য (Eternal distinction) নষ্ট হইল, ভাল মন্দর বিশেষ পবিত্রতা (Sanctity) ও বিশেষ অবনতি (Degradation) সরিয়া গেল। আর এই ক্ষতিলাভ গণনাই বা কি? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, ইহা মানবের সুখ দুঃখ গণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাল মন্দ বিচার এখন সুখ দুঃখ গণনায় পরিণত হইল, শেষ কালে হিতবাদ (Utilitarianism) এর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এরূপ জটিল বিষয়ে বিবেকের রায় বুদ্ধির এই পরিমাণ গত বিচারের অনুযায়ী—যে দিকে মন্দ অপেক্ষা ভালর ভাগ অর্থাৎ দুঃখ অপেক্ষা সুখের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক, বিবেকও সেই দিকে রায় দেন—কিন্তু এ রায় নিঃসংশয় নহে। এরূপ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় একটু খিন্ন থাকিয়াই যায়।

হয়ত কেহ কেহ ভাল মন্দর পরিমাণ গত বিচারেই আপত্তি করিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, ভাল ভাল-বলিয়াই ভাল; মন্দ মন্দ-বলিয়াই মন্দ। তাহার আবার তারতম্য কি? যাহা ভাল তাহা সর্ব্বথা গ্রহণীয়, যাহা মন্দ তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। ভাল মন্দ বিচারে ক্ষতিলাভ গণনাকে তাঁহারা হয়ত অত্যন্ত নীচ কার্য্য মনে করিবেন, (Utilitarianism) কে তাঁহারা হয় ত (Pig philosophy) নামে অভিহিত করিবেন। আচ্ছা দেখা যাউক, তাঁহাদের মত গ্রহণ করিলে বিবেকের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়? যে প্রশ্নের উভয় দিকই ভালমন্দ মিশ্রিত, সে প্রশ্নে বিবেক কোন্ দিকে রায় দিবে? উভয় দিকেই ভাল আছে; সুতরাং উভয় দিকই বিবেকের

নিকট গ্রহণীয়; উভয় দিকেই মন্দ আছে, সুতরাং উভয় দিকই পরিহার্য্য। আর সকল ভাল সকল মন্দই ইঁহাদের মতে তুল্য মূল্য। সুতরাং এরূপ জটিল প্রশ্নে বিবেক মূক। তবে হয় ত কেহ কেহ এরূপ ভালমন্দের বিমিশ্রণই সম্ভবপর মনে করেন না—তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন।

আমি এপর্য্যন্ত বুদ্ধির বিচার ও বিবেকের আদেশকে দুইটি বিভিন্ন কার্য্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহারা দুইটি পৃথক কার্য্য নহে—একই কার্য্যের দুটি পার্শ্ব। একটি কার্য্য ভাল বলিয়া স্থির হওয়া ও তাহা কাম্য, এ দুইই এক কথা। যাহা কিছু যাঁহার নিকট ভাল, তাহাই তাঁহার কাম্য; আর যাহা কিছু যাঁহার কাম্য, তাহাই তাঁহার নিকট ভাল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাম্য বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ, অপ্রাপ্তিতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যদি সেই কাম্য বস্তুর প্রাপ্তির জন্য আমাদের উচ্চতর বৃত্তির পরিচালন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সুখ আত্মপ্রসাদের আকার ধারণ করে; কিন্তু যদি আমাদের উচ্চতর বৃত্তির পরিচালনের অভাবে বা কোন নিম্নতর বৃত্তির পরিচালন দ্বারা সেই কাম্যবস্তু আমাদের হস্তান্তর হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমাদের আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়। আর যদি অন্যরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা স্বত্বেও আমরা এরূপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে আত্মগ্লানির সীমা পরিসীমা থাকে না। বিচারের ভ্রম বশতঃ যদি আমরা মন্দকেই ভাল বোধে কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকি ও পরে ভ্রম বুঝিতে পারি, তবে যাহা সামান্য ক্ষোভের আকার ধারণ করিত তাহাই জ্ঞানকৃত হইলে অর্থাৎ মন্দকে মন্দ জানিয়াও কার্য্যে পরিণত করিলে আত্মগ্লানি রূপে পরিণত হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুদ্ধির কার্য্য ও বিবেকের কার্য্য পৃথক নহে—একই, তবে অবস্থা ভেদ মাত্র। কাম্যকে ও ভালকে আমি একই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কেহ হয় ত প্রবৃত্তি নিবৃত্তির নামে ইহার প্রতিবাদ করিবেন। হয় ত বলিবেন—কাম্য ও ভাল এক না হইয়া বরং তদ্বিপরীত। কাম্য প্রবৃত্তি রূপে ও ভাল বা বিবেকের আদেশ নিবৃত্তিরূপে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত। কাম্য বা প্রবৃত্তি আমাদিগকে নরকের পথে লওয়াইতেছে, কিন্তু নিবৃত্তি বা বিবেক আমাদিগকে স্বর্গের অভিমুখে টানিতেছে। আমাদের কামনা স্বভাবতঃই নিম্নাভিমুখী, পাপই তাহার লক্ষ্য,

বিবেক নিবৃত্তি রূপে সর্ব্বদাই আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরোধী, তন্মধ্যে প্রবৃত্তি আমি ও নিবৃত্তি আমি-নহি অর্থাৎ বিবেক বা ঈশ্বরের বাণী। একটু তলাইয়া দেখিলেই এই আপত্তির অসারতা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে পাপ ও পুণ্যের সহিত এক করাতেই এই মহা ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইঁহারা আমাদের কামনাকে প্রবৃত্তির সহিত ও কাম্যকে পাপের সহিত এক করিয়া মানব প্রকৃতির অবমাননা করিয়া থাকেন। মানব প্রকৃতি স্বভাবতঃই পাপ-প্রবণ নহে। ইহা যেমন পাপপ্রবণ, তেমনই পুণ্যপ্রবণ; মানব প্রকৃতিতে পাপ যেমন স্বাভাবিক, পুণ্যও তেমনই স্বাভাবিক। একজন পাপীর পক্ষে পাপ কার্য্য যেমন সহজ, একজন পুণ্যবানের পক্ষে পুণ্যকার্য্য করাও তেমনই সহজ। মানব প্রকৃতি ভালমন্দে মিশ্রিত—প্রবৃত্তি যেমন মানব প্রকৃতি প্রসূত, নিবৃত্তি তেমনই মানব প্রকৃতি প্রসূত। আর একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে প্রকৃতি গত পার্থক্যও সরিয়া যাইবে—ইহারা প্রকৃতপক্ষে একই বস্তু—উভয়ই কামনা। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির পার্থক্য বস্তুগত নহে—অবস্থাগত। নিবৃত্তি দূরদর্শী, কিন্তু প্রবৃত্তি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ;—আপাত সুখে মত্ত বলিয়া প্রবৃত্তি ভবিষ্যৎ দর্শনে অক্ষম। আমরা যখন আপাত সুখের আশায় কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে যাই, তখন বুদ্ধি সেই কার্য্যের ফলাফল বিচার করিতে থাকে—বুদ্ধির বিচারে যদি ঠিক হয় যে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে ভাবীফল দুঃখময় হইবে অথবা বর্ত্তমান সুখ হইতে নিবৃত্তি হইলে ভবিষ্যতে অধিকতর সুখের সম্ভাবনা, তাহা হইলে বুদ্ধি আমাদিগকে সে কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দেয়: তাহাই আমাদের নিকট নিবৃত্তি বা বিবেক রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কার্য্যের ফলাফল বা সুখ দুঃখরূপী ক্ষতি লাভ গণনার ফল বিবেক রূপে পরিণত হয়। আমরা এ বিচারেও দেখিতে পাই যে, বিবেক বুদ্ধিবৃত্তিরই অবস্থাভেদ বই আর কিছুই নহে। একটি দার্শনিক ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হইয়া কেহ কেহ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে দুই ব্যক্তির বাক্য শুনিতে পান। সেই দুই ব্যক্তি কদাপি এক ব্যক্তি হইতে পারে না; সুতরাং তন্মধ্যে একজন আমি বা জীবাত্মা অন্যতর জীবাত্মায় ঈশ্বরের বাণী। কিন্তু বস্তুতঃই কি ইহা দুই পৃথক ব্যক্তির বাণী, না একই ব্যক্তির দুইটি ছায়া?

নিরবলম্ব আমি বা অস্মিতা কখনও আমাদের চিন্তা বা বিচারের বিষয় হইতে পারে না—আমরা কখনই তাহার স্বরূপ জ্ঞানের বিষয় করিতে পারি না বা সেই নিরবলম্ব "আমিকে" ধরিতে পারি না। যখনই আমরা অস্মিতাকে জ্ঞানের বিষয় করিতে চাহি, তখনই তাহার নিরবলম্বত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তখনই এক ভাঙ্গিয়া দুই হইয়া যায়—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইরূপে আমরা যখনই যে কার্য্যে ব্যাপৃত হই—সেই সেই কার্য্যের সহিত একটা করিয়া আমির প্রতিবিম্ব মিশিয়া থাকে, এক ভাঙ্গিয়া শত আমি হইয়া পড়ে। ভগ্ন দর্পণ খণ্ড সমূহে আত্মমুখ দর্শনের ন্যায় আমরা তখন প্রত্যেক কার্য্যে একটা করিয়া পৃথক আমি দেখিতে পাই—আমাদের দৃষ্টিভ্রম উপস্থিত হয়। তাই আমরা প্রবৃত্তি নিবৃত্তির মধ্যে একই ব্যক্তির কার্য্য না দেখিয়া দুই ব্যক্তির কার্য্য দেখিতে পাই ও এই বিষয়ে ভ্রান্তিজালে জড়িত হই।

এই শ্রেণীর বিবেকবাদীদের মতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভালমন্দ বিচারের জন্য বুদ্ধিই দায়ী, কিন্তু সেই বিচারানুসারে মন্দ ত্যাগ করিয়া ভাল কার্য্য করা বা না করার জন্য দায়ী বিবেক। ইঁহাদিগকে মতের সঙ্গতি (Consistency) রক্ষা করিতে হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কার্য্যে বিশেষ দোষ বা গুণ কিছুই নাই—তবে মনের যে ভাব হইতে সেই, কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারাই ইহার সুদসদত্ব বিবেচিত হয়। যদি বুদ্ধি ভ্রান্তি বশতঃ অত্যন্ত অসৎ কার্য্যকেও অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহাকে অসৎ বলে সৎ বলিয়া সিদ্ধান্ত করে ও তদনুসারে কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা কেবল বুদ্ধির ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হইবে; কিন্তু তজ্জন্য কোন নৈতিকদোষ বা পাপ আত্মাকে স্পর্শ করিবে না। অপর পক্ষে যদি কেহ কোন সৎকার্য্যকেও (অর্থাৎ যাহাকে সাধারণতঃ সৎকার্য্য বলে) অসৎ কার্য্য জ্ঞানে অনুষ্ঠান করে, তবে তাহাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে। ইহাঁদিগকে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, কেহ কোন পাপকার্য্যের অর্থাৎ বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে কিনা, তাহার বিচারের ভার তাহার নিজের হাতে, অপরের সে বিষয়ে বিচার করিবার কোন অধিকার বা উপায় নাই। যদি সে অসৎ বুঝিয়াও কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তবে তাহার প্রাণে আত্মগ্লানি উপস্থিত না হইয়াই পারে না এবং যাহার এই সদসৎ বিচার যত সুস্পষ্ট তাহার প্রাণে সেই পরিমাণে অধিক আত্মগ্লানি

উপস্থিত হইবে। অন্য কথায় যে ব্যক্তি যত বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিল অর্থাৎ যে যত পাপী, তাহার আত্মগ্লানিও তত অধিক। এই যুক্তিটিকে অন্য দিক হইতে দেখিলে ইহা বলাই যুক্তি সঙ্গত যে, যাহার আত্মগ্লানি যত কম, সে তত কম বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে অর্থাৎ সে তত কম পাপী। আমরা দেখিতে পাই যে যাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল, সদসৎ জ্ঞান পরিমার্জ্জিত, একটু সামান্য বিবেক বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাঁহাদের আর আত্মগ্লানির সীমা পরিসীমা থাকে না। অপর পক্ষে যাহাদের সদসদ্ বিচার মলিন, যাহারা পাপে চিরাভ্যস্ত,তাহাদের প্রাণে গুরুতর পাপানুষ্ঠান করিলেও আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না। যুক্তি পরম্পরায় অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিতে হইলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, শেষোক্ত শ্রেণীর লোকই অধিকতর পুণ্যবান ও প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকই অধিকতর পাপী। আমরা যে যুক্তি মার্গানুসরণ করিয়াছি, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী।

তবে আমাদের এই অপসিদ্ধান্তের কারণ কি? আমরা যে শ্রেণীর বিবেকবাদীগণের মত লইয়া বিচার করিতেছি, তাঁহারা কার্য্যকে এক প্রকার ফলাফল বিবর্জ্জিত করিয়া কেবল কর্ত্তার মানসিক ভাবকেই সর্ব্বস্ব বলেন। তাঁহাদের এই একদেশদর্শনের জন্যই এই যুক্তি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কার্য্য ফলাফল বিবর্জ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, কার্য্যের ফলাফল, গুরুতর—কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগ্রাম স্থল।

কিছু দিন গত হইল, কোন একটী রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন জর্ম্মণ দেশীয় লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহাকে সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষায় শিক্ষিত বলিয়া বোধ হইল। ইনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া নানা ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। আমার সহিত যখন ইহাঁর সাক্ষাৎ হয়, তখন ইনি বেনারস গমন করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি বোধ হয়, ইয়োরোপের অধিকাংশ দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন কয়েকটী ভিন্ন আমি ইয়োরোপ খণ্ডের প্রায় সকল দেশেই বেড়াইয়াছি। আমি তখন বলিলাম, তবে আপনি বলুন দেখি, বর্ত্তমান সময়ে ইয়োরোপের ধর্ম্মভাব কিরূপ? তিনি বলিলেন প্রায় সর্ব্বত্রই সংশয়বাদ এবং অবিশ্বাসের প্রভাব প্রবল। ধর্ম্মের জন্য যে লোকের তত একটা পিপাসা (earnestness) আছে, তাহা বোধ হয় না। তথাকার ধর্ম্ম এখন একরূপ eat, drink and be merry অর্থাৎ খাও, দাও, আনন্দ কর। আমি বলিলাম আপনি বলিতে পারেন, এরূপ হওয়ার কারণ কি? তিনি উত্তর করিলেন, জড়বাদের (Materialism) বহুল প্রচারই ইহার একমাত্র কারণ। আমার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইল। আমিও ইতি পূর্ব্বে এ বিষয়ের এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। বাস্তবিক, এই যে ইয়োরোপীয় সভ্যতা, ইহা অন্তঃসারশূন্য প্রাণহীন সভ্যতা মাত্র। কে বলে ইংলণ্ড! তুমি সভ্যদেশ, কে বলে ফান্স তুমি সভ্য? প্রকৃত সভ্যতার আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া, তোমরা ঘোরান্ধকারের মধ্যে পতিত রহিয়াছ। বহির্বিষয়ের উন্নতি বিধান এবং এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের শোভা ও পারিপাট্য সাধনই যে সভ্যতার প্রাণ, সে সভ্যতা, সভ্যতা নামের কলঙ্ক মাত্র। যে জাতি বলে (comforts and convenience of life) জীবনের সাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধাই, মানব জীবনের সারসম্পত্তি এবং লক্ষ্য, সে জাতি সভ্যতার

মানব জাতির স্বাধীনতাহরণ যে জাতির নিত্যব্রত, এবং সকল অনর্থ এবং অধোগতির কারণস্বরূপ পরাধীনতার লৌহময়ী শৃঙ্খল কোটি কোটি নর নারীর কণ্ঠে চিরজীবনের জন্য পরাইয়া দিতে পারিলেই যাহারা আপনাদিগকে ক্ষমতাপন্ন এবং গৌরবান্বিত মনে করে, ইহা নিশ্চয় যে, সে জাতি এখনও অসভ্যতার গভীরকূপে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যদি পরমেশ্বরের রাজ্যে প্রথম শ্রেণীর অপরাধী কোন জাতি থাকে, তবে সেই জাতি, যাহারা মনুষ্যকে স্বাধীনতাধন হইতে বঞ্চিত করে। একবার ইয়োরোপ খণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, শোণিতলিপ্সু উন্মত্ত শার্দ্দূল যেমন এক স্থানে বসিয়া অরণ্যপ্রান্তে দৃষ্টি যোজনা করিয়া দেখে, কোন্ স্থানে কোন্ শিকারের বস্তু আছে; ঠিক সেইরূপ শার্দ্দূলস্বভাব ইয়োরোপীয় নরপতিবর্গ সিংহাসনে আসীন হইয়া লোলুপ নয়নে পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতেছে, কবে কোন্ রাজ্য হরণ করিব, কবে কোন্ জাতিকে দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ করিব! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; (free love) স্বাধীন প্রণয় রূপ বিষবৃক্ষ যে সভ্যতার ভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহা কি বর্ব্বরতা অপেক্ষাও হেয় এবং জঘন্য নয়? যে সভ্যতা মানবের অন্তরের নিকৃষ্ট ভাব সকলকে খর্ব্ব করিয়া দেবভাব সকলকে জাগ্রত না করে, যে সভ্যতা আপনাকে ভুলিয়া, স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন দিয়া, মনুষ্যকে নর নারীর সেবার জন্য প্রবৃত্ত না করে, যে সভ্যতা মানব হৃদয়ের পশুত্ব বিমোচন করিয়া তাহার মনুষ্যত্ব বিধান না করে, কিন্তু অকিঞ্চিৎকর শরীরের শোভা এবং সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য, অতর্পনীয় বিলাসলালসা পরিতৃপ্তির জন্য এবং ভোগসুখে বিষয়ামোদে মত্ত থাকিবার নিমিত্ত,যে সভ্যতা মনুষ্যকে প্রণোদিত এবং উত্তেজিত করে, ধিক্ ধিক্ সে সভ্যতা, তাহা অচিরে মানবরাজ্য হইতে বিলুপ্ত হউক। বর্ত্তমান সময় ইয়োরোপ খণ্ডে যে নাস্তিকতা এবং অবিশ্বাসের প্রভাব এত দূর প্রবল, তাহার কারণ এই অন্তঃসারশূণ্য বহির্মুখীন সভ্যতার বহুল প্রচার; এই সভ্যতা মনুষ্যের দৃষ্টিকে অন্তর হইতে বহির্দ্দিকে লইয়া যায়; সুতরাং মনুষ্য অন্তর্দৃষ্টি বিহীন হইয়া পড়ে। হৃদয় মনের অবস্থা তোমার যেরূপ থাকে থাক, তুমি তোমার বাহিরের শোভা এবং সচ্ছন্দতা বিধানের জন্য প্রস্তুত হও, ইহাই এই সভ্যতার উচ্চ উপদেশ। এই সভ্যতা দ্বারা আরও সামাজিক বিবিধ

স্বার্থপরতা এবং চতুরতা, এই সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল। এসকল বিষয় অদ্য আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা দেখিতেছি এই বাহ্যিক চাক্যচিক্যশালী অসার পাশ্চাত্য সভ্যতা-স্রোত বর্ত্তমান সময়ে ভারত ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষিত দলের মধ্যে যে, অল্পে অল্পে অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার প্রভাব দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ এই পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাব। এক দিকে এই, অপর দিকে ঠিক ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন আর একটী স্রোত আসিয়া আমাদের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি ভূমি পুরাতন হিন্দু ঋষিদিগের চিন্তা এবং উপদেশ, হিন্দু শাস্ত্র—বেদ বেদান্ত। দুই দিক হইতে দুই প্রকাণ্ড প্রবাহ আসিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত, ভারত ভূমিই এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংগ্রাম স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ ইহার কোন্‌টীকে গ্রহণ করিবেন? ইহার একটী অপরটীর সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রাচ্য সভ্যতা বলিতেছে, মায়াময়মিদখিলং হিত্বা। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মায়াময়, এ জগতের যাহা কিছু দেখিতেছ সমস্তই ভ্রম, সর্পেতে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, শুক্তিকাতে যেমন রজতভ্রম হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রম মাত্র; বিশ্বচরাচর আর কিছুই নহে, অবিদ্যামায়া-বিজৃম্ভণ মাত্র। হে মনুষ্য! এই তোমার দেহ, এই যে তোমার জীবন, ইহা নলিনীদলগতজলবত্তরলং অর্থাৎ পদ্মপর্ণস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় এই আছে এই নাই। অতএব এই সকলের উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হওয়া অর্ব্বাচীনতা—মূঢ়তা মাত্র। হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি পরিচ্ছেদে এই উপদেশ, এই শিক্ষা। কি মহাভারত কি গীতা কি সাংখ্য কি পাতঞ্জল সকলেই সমস্বরে মনুষ্যকে শিক্ষা দিতেছে—জগৎ মিথ্যা, এই বিষয় সম্পদ আত্মীয় স্ত্রী-পুত্র সমস্তই মিথ্যা; অতএব এ সকলের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিও না। এই ভাব এদেশীয় লোকের ভিতরে এরূপ দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে যে, একজন অশিক্ষিত বর্ব্বর কৃষকের নিকট গিয়া প্রচার কর যে, এই জগৎ মিথ্যা এই পুত্র ধন জন এ সকলই মায়া; সে ব্যক্তি ইহার প্রতিকথায় সম্মতি দান করিবে; ঐ সকল কথা তাহার হৃদয়ের সহিত মিলিবে। কারণ, এই ভাবে সে উৎপন্ন, এই ভাবে সে শিক্ষিত, এই ভাব সে ব্যক্তির বংশগত, সংস্কারগত। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মূলমন্ত্র এই নিত্য-শাশ্বত অমর যে তোমার আত্মা, হে মনুষ্য

তুমি তোমার সেই আত্মার উন্নতির জন্য জীবন নিয়োগ কর। যাও সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া, গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সেই নির্জ্জন কোলাহল পরিশূন্য গিরিকন্দরে, এবং তথায় গিয়া সেই পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসনে এবং আত্মার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হও, ইহাই জীবের মুখ্য কর্ম্ম, সকল কর্ত্তব্যের সার কর্ত্তব্য, ইহাই মানব জীবনের লক্ষ্য। হিন্দুর নিকট এক জন উদ্যোগী কর্ম্মপরায়ণ সংসারী পুরুষ একান্ত নিন্দনীয় এবং ঘৃণার পাত্র; কিন্তু এক জন সংসারত্যাগী ধ্যানরত যোগী-পুরুষ ভক্তি ও সম্মানের মুখ্যপাত্র। হিন্দু সভ্যতা মনুষ্যকে আসক্তির পরিবর্ত্তে বিরক্তি, কর্ম্মিষ্ঠতার পরিবর্ত্তে ধ্যানপরতা শিক্ষা দেয়, গৃহস্থকে পথিক করে এবং অনুরাগীকে বৈরাগী করিয়া তোলে। সেই জন্য কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছেন Worship is the work of the east, and work is the worship of the west, বাস্তবিক ইহাই ঠিক। প্রাচ্য সভ্যতা অন্তর্মুখীন পাশ্চাত্য সভ্যতা বহির্মুখীন। এই সংসারবিরোধী মায়াবাদমূলক হিন্দু সভ্যতা যে সমাজের পক্ষে সর্ব্বাংশে মঙ্গলকর তা নয়; ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক অনর্থ সাধিত হইয়াছে, অধিক কি ভারতের এই যুগব্যাপিনী পরাধীনতার বীজও এই মায়াবাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কেবল ধ্যানও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নয়, কেবল কর্ম্মেও সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। কেবল বহির্জ্জগতের উন্নতিতেই উন্নতির পরিসমাপ্তি নয়, আর কেবল অমরণ ধর্ম্মা আত্মার কল্যাণই সার্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ নহে। একদিকে যেমন এই প্রাচ্য সভ্যতার দ্বারা ভারতের বিবিধ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, আর দিকে সেইরূপ বাহ্যাড়ম্বরসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারাও অনেক ভীষণতর অকল্যাণ উৎপন্ন হইতেছে। ইহা অতি নিশ্চয় ও ধ্রুব যে, এই পশ্চিমাগত তেজস্বী স্রোতের বেগকে যদ্যপি আমরা ফিরাইয়া অন্য দিকে দিতে না পারি, তবে অচিরকাল মধ্যেই সমগ্র ভারতভূমি অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার করাল রাক্ষসীকরে সমর্পিত হইবে। কেবল যে ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা তিরোহিত হইতেছে, তা নয়; এই পাঞ্চভৌতিক শরীর হইতে যে, সচেতন গুণময় আত্মা স্বতন্ত্র, এবং তাহা বিনাশ ও ক্ষয়রহিত শাশ্বত পদার্থ, এই সর্ব্ববাদিসম্মত অকাট্য সত্যেতেও সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। কেবলই জড়ের আলোচনা করিয়া সকলই জড়ময় বোধ হইতেছে,

জড়েরই রাজত্ব, জড়েরই পরাক্রম সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতালোকমণ্ডিত অনেক শিক্ষিত পুরুষ এদেশে এবং ইউরোপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কেবল কি ইহাতেই শেষ তা নয়, কিন্তু ইহাদ্বারা আমাদের দেশে জীবন-সংগ্রাম (Struggle for existence) অত্যন্ত ক্লেশকর এবং কঠোরতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, লোকের দৈনন্দিন অত্যাবশ্যকীয় উদরান্নের সংস্থান নিতান্ত দুরূহব্রত হইয়াছে, সকল গুণগ্রাসিনী দরিদ্রতা, স্বার্থপরতা এবং শঠতার শক্তিও অল্পে অল্পে আমাদের সমাজমধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। এবং যতই এই স্রোত উন্মুক্ত এবং অপ্রতিহত থাকিবে, ততই পুঞ্জ পুঞ্জ অনর্থের আবর্জ্জনা সকল ভাসিয়া আসিয়া সমাজমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে। আমাদের এখন উপায় কি? ভারতবর্ষের এখন কর্ত্তব্য কি? ভারত বর্ষ এখন এই উভয় স্রোতের কোন্ স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন? কেবল জড়বাদ কি কেবল অধ্যাত্মবাদে কখন মানব-জীবনের সম্পূর্ণ কল্যাণ হইতে পারে না। কেবল কর্ম্ম অথবা কেবল ধ্যান ধারণায় মানুষ কখন পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। উভয়ই চাই। এই পরস্পর বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিধাতাপ্রেরিত এক মহাশক্তিশালী পুরুষ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি জন্মাবধি বলিতেছেন, আমি সামঞ্জস্য বিধানের জন্য, মিলনের রাজ্য স্থাপনের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমা দ্বারা সকল বিরোধী-ভাবের বিরোধীমতের সামঞ্জস্য হইবে। আমি এমন এক ভূমি আবিষ্কার করিব, যাহার উপরে আসক্তির সহিত বিরক্তি, অনুরাগের সহিত বৈরাগ্য, সংসারের সহিত ধর্ম্ম এবং পূর্ব্বের সহিত পশ্চিম এক হইয়া মিলিয়া যাইবে। আমি এই ধর্ম্ম অবনীমণ্ডলে প্রচার করিব, যাহা সকল সামঞ্জস্যের আকর, যাহাতে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, পুরুষ রমণী-সকলে এক এক সূত্রে অনুস্যূত হইবে। ইনি আরও বলিতেছেন, জ্ঞানের সহিত প্রেমকে এবং জ্ঞান ও প্রেমকে কর্ম্মের সহিত মিলাইয়া এক অভূতপূর্ব্ব মহাসমন্বয়ের ভাব আমি জগতকে দেখাইব। যাহা হউক ইহার উপরে আমাদেরও আশা আছে যে, যদি কখন এই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সভ্যতাদ্বয়ের সমন্বয় বিধান হয়, তবে এই ব্রাহ্মসমাজ রূপ বিরাট পুরুষের দ্বারাই হইবে। কিরূপে এই উভয়ের মিলন করিতে হইবে? আমরা নিশ্চয় রূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, পাশ্চাত্য

সভ্যতাও এক অংশে সম্পূর্ণ হীন, এদেশীয় পুরাতন হিন্দু সভ্যতাও এক অংশে সম্পূর্ণ হীন। একের যাহা নাই, অপরের তাহা আছে; কিন্তু এই উভয়ে যদ্যপি মিলিত হইয়া যায়, তাহা হইলে একটী সম্পূর্ণাবয়ব পদার্থ হইতে পারে। ইংরাজ কেবল বহির্ব্বিষয়ের উন্নতি সাধনেই তৎপর, আর হিন্দু কেবল আধ্যাত্মিক জগতের কল্যাণ বিধানেই ব্যস্ত; কিন্তু এই উভয়ে, ইংরাজ, হিন্দুতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যে যদি এক হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা কি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর দেখায়! আমাদের এক্ষণে তাহাই করিতে হইবে, পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের পরিণয় স্থাপন করিয়া দাও, ভারতের প্রাচীনা ধর্ম্মগতপ্রাণ ঋষিগণের ঈশ্বরপ্রেম, জ্বলন্তবিশ্বাস এবং অনুরাগকে ইয়োরোপীয় কর্ম্মিষ্ঠতার সহিত মিলাইয়া দাও; নচেৎ ভারতের পরিত্রাণ হইবে না। বহির্ব্বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি যেমন এক দিকে ঠিক নহে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিহীন হইয়া কেবল জড়ের উন্নতি করাও অপর দিকে ঠিক নহে। কিন্তু এ উভয়ের একত্র সমাবেশের ভাবই ঠিক। এই উভয় সভ্যতার সমীকৃত সংমিশ্রিত ভাব যাহা তাহাই আমাদের মধ্যে আনিতে হইবে, তাহাতেই এদেশের কল্যাণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

চৈন দার্শনিক মহাত্মা কং।

ভারতে যখন মহা বিপ্লব; ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব রবি যখন অস্তমিত হইতেছিল, যজ্ঞধূমে অন্ধীভূত ভারতাকাশ পরিচ্ছন্ন হইতেছিল, জাতিভেদের লৌহ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া যখন সকলে এক মন এক প্রাণ হইতেছিল, অজ্ঞান তিমির ভেদ করিয়া জ্ঞানের কমনীয় ছটায়—ধর্ম্ম ও নীতির বিমল আভায় যখন ভারতের সুদিনের প্রভাত হইতেছিল, চীনদেশে তখন ঘোর অশান্তি। তখনকার চীন এখনকার চীনের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র। এক সম্রাটের শাসনাধীনে তেরটী বৃহৎ ও অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে চীন বিভক্ত ছিল। প্রায় পাঁচ শত বৎসর হইতে সম্রাটের আধিপত্যের হ্রাস হইয়াছে। প্রায় পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ, বংশে বংশে বিবাদ অনুক্ষণ

লিতেছে। এই অবস্থায় দুর্ভিক্ষেরও প্রাবল্য। প্রজাগণ যুদ্ধ বিগ্রহের কষ্টে জর্জ্জরিত, দুর্ভিক্ষের দারুণ যন্ত্রণায় নিগৃহীত। তখন চীনের সামাজিক অবস্থারও বড় অবনতি। বহু বিবাহের প্রাচুর্য্য, স্ত্রী জাতির অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা। চীনে তখন বিশেষ কোন ধর্ম্ম-শিক্ষাও লক্ষিত হয় না। তখন যে যুদ্ধ বিগ্রহে, ভ্রাতৃ হত্যায় ও বন্ধুহত্যায়, নানা প্রকার কদর্য্য ও বীভৎস কাণ্ডে, ঘৃণিত ও জঘন্য আচারে চীন কলঙ্কিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সম্রাট চৌ বংশীয়। চৌ চীন-ইতিহাসে রাজ বংশাবলীর তৃতীয় বংশ। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধিপগণ ইংরাজি ডিউক, মার্কুইস্, আর্‌ল্, কাউণ্ট্ ও ব্যারণ্‌দিগের ন্যায় আয় ও অনুচর সংখ্যা অনুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই সকল সর্দ্দার গণের সম্রাটকে বাৎসরিক কর দিতে হইত, এবং সম্রাটের আদেশ মাত্রেই তাঁহার নিমিত্ত যুদ্ধের জন্য স্বসৈন্যে প্রস্তুত হইতে হইত। সম্রাটের প্রভুত্বের হ্রাস হইলে, করদ রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিবেই ঘটিবে। চীনেও তাই হইয়াছিল; তখন চীন দুর্গতির আবাশ স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময়ে চীনে এক গ্যারিবল্ডি রত্নের জন্ম হয়। দেশের দুর্গতি মোচনের জন্য, ব্যভিচার ও অনাচার দূরীভূত করিবার জন্য, স্বদেশ বাসীকে পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, চীন মাতাকে ধন ধান্যে বিভূষিত করিবার জন্য ইহাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়। ইহাঁর নাম কং ফুজি। লূ প্রদেশে ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে শীতকালে কংফুজির জন্ম। কং ইহাঁর গোত্র নাম। "ফুজি" অর্থ দার্শনিক বা প্রভু। ইঁহার পিতা হী একজন অসম সাহসী বীর সৈনিক ছিলেন। মহৎ ব্যক্তি দিগের জন্ম বৃত্তান্ত যে রূপ অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকে, ইহাঁরও জন্ম বিষয়ে সেই রূপ অনেক আশ্চর্য্য ও অমানুষিক ঘটনার গল্প প্রচলিত আছে। মাতা স্বপ্ন দেখিতেন,—স্বর্গদূতগণ আসিয়া তাঁহাকে চামর ব্যজন করিতেছে ও সশস্ত্রে গর্ভ রক্ষা করিতেছে; তাহাদিগের নিকট হইতে পুত্রের গুণ জানিতে পারিয়াছিলেন—এই রূপ বিশ্রুতিও আছে।

কংফুজির বাল্য জীবনের কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বালক কাল হইতেই যে পূজার বাহ্যিক আড়ম্বরে অনুরক্ত ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমের সময়ে জ্ঞানার্জ্জনে মনোনিবেশ

করেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইতিহাস পাঠের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। বিশ বৎসর বয়সের সময়ে সং প্রদেশীয় এক কামিনীর পাণি গ্রহণ করেন। কিন্তু দার্শনিক ও সাহিত্যব্যবসায়ীদের ভাগ্যে যে স্ত্রী সুখ হয় না, ইনি তাহার একটী প্রমাণ। দাম্পত্য সুখ ইঁহার কপালে ঘটে নাই। কয়েক বৎসর একত্রে বাস করিয়া অবশেষে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

চীনবাসী সকলেই ইহাঁর গুণে আকৃষ্ট হয়েন। বিবাহের অল্পকাল পরেই ইনি চীনের সাধারণ শস্যাগারের রক্ষক নিযুক্ত হয়েন। পর বৎসর পদোন্নতি হয়। এসময়ে চীনের দুরবস্থা ও ব্যভিচার দেখিয়া চকিত ও দুঃখিত হয়েন এবং পুনঃ সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনদ্বারা দেশের কল্যাণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েন। দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ক্রমের সময়ে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হয়েন। পুরাতত্ত্বের ও প্রাক্তন ধর্ম্ম নীতির বিষয় অবগত হইতে অনুসন্ধিৎসু বহুযুবকজনের সমাবেশে তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত। অধ্যাপনার পরিশ্রম স্বরূপ শিষ্য বর্গের নিকট হইতে যে দক্ষিণা পাইতেন, তাহা অনেক সময়ে অকিঞ্চিৎকর হইলেও তিনি কখনও শিক্ষা দানে বিরত হইতেন না। ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য ঔৎসুক্য থাকিলেও তাঁহার শিক্ষার দ্বারা উপকার লাভ করিতে শিখিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। কংফুজি শান্ত, সৎস্বভাব ও প্রিয়ভাষী ছিলেন। নীতি উপদেশ দিবার তাঁহার এক বেশ সহজ ও উত্তম উপায় ছিল। যখন যে ঘটনা হইত, তাহা হইতে কিছু না কিছু নীতি বাহির করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। একদা সি প্রদেশে গমন কালে টাই পর্ব্বতে একজন স্ত্রীলোক একটী সমাধির নিকট বসিয়া বিলাপ করিতেছে দেখিয়া, তাহাকে তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিল "এই স্থানে আমার শ্বশুর এক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। এই স্থানে আমার স্বামীও ঐরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই স্থানেই অবশেষ আমার পুত্রও ব্যাঘ্র মুখে পতিত হইয়াছে।" ঐ ভয় সঙ্কুল স্থান পরিত্যাগ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটী উত্তর করে, "এখানে কোন অত্যাচারী রাজা নাই" তখন কংফুজি শিষ্যদিগকে বলেন, দেখ, অত্যাচারী রাজা শ্বাপদ অপেক্ষাও হিংস্র, প্রজাগণ তাহাকে ব্যাঘ্র অপেক্ষা অধিক ভয় করে।

কংফুজি বহু স্থান পর্য্যটন করেন ও সর্ব্বস্থানেই সম্মানিত হয়েন। সি প্রদেশের রাজা কিং তাঁহার গুণের সমাদর করিয়া তাঁহাকে লিংকিউ

নগর প্রদান করেন। কংফুজি তাহা গ্রহণে অসম্মত হয়েন। তিনি বলেন সৎ ব্যক্তিরা কোন কর্ম্মের বিনিময় ব্যতীত কোন পুরস্কারই গ্রহণ করেন না। আমি রাজা কিংকে উপদেশ দিতেছি, তিনি এখন পর্য্যন্তও সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করেন নাই, অথচ আমাকে পুরস্কৃত করিতেছেন! এক বার 'উই' প্রদেশে যাইবার সময়ে পথিমধ্যে প্রবল বিপক্ষদল কর্ত্তৃক সশিষ্যে আক্রান্ত হয়েন। আক্রমণকারীরা প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয় যে, তিনি আর উই প্রদেশে যাইবেন না। কিন্তু প্রতিজ্ঞা স্বত্বেও তিনি সুবিধা পাইবা মাত্র উই প্রদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে শিষ্যেরা বিস্মিত হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করে, আপনি আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন, সরলতা ও বিশ্বাস ধর্ম্ম নীতির মূল সূত্র; অথচ আপনি নিজে প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন না। কংফুজি উত্তর করেন, আমি স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞা করি নাই, বল পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করাইলে সে প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য নাই, সে প্রতিজ্ঞা দেবতারা শ্রবণ করেন না।

কংফুজির জীবন সাধু, কলঙ্কের কণা মাত্র তাঁহাকে স্পর্শে নাই। তাঁহার মহৎ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মানবের চরিত্রগত উন্নতি। তাঁহার যত শিক্ষা, যত উপদেশ, সকলই ঐহিক উন্নতির জন্য। পরকাল ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথাই কহেন নাই। ঈশ্বর বিষয়ে তিনি বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাক্। আর্নল্ড এবং অন্যান্য লেখকগণ বলেন, তিনি ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিতেন না। কংফুজির দর্শন সাংখ্য দর্শনের ন্যায়। "নাবস্তনো বস্তু সিদ্ধিঃ"। হ্যামিল্টনের ন্যায় তিনিও বলিয়াছিলেন, অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি অসম্ভব। তাঁহার বিশ্বাস জড় প্রকৃতির আরম্ভ নাই, অনন্ত কাল হইতে বিদ্যমান। এই জড়ের 'লী' (principle) জড়ের সমসাময়িক। জড়ের ন্যায় ইহাও অজর, অনন্ত, অক্ষয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি। আকাশ এই শক্তির কেন্দ্র স্থল। এই আকাশ হইতেই ঐ শক্তি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হইয়াছে।

মানব শরীর দুই প্রকার পদার্থে গঠিত একটী সূক্ষ্ম, অরূপ, ও লঘীয়ান; অপরটী স্থূল, সরূপ ও গুরু ভাবাপন্ন। এই দুই পদার্থের বিয়োগে প্রথমটী ঊর্দ্ধে বায়ুতে মিলিয়া যায়, অপরটী পৃথিবীর সহিত এক হইয়া যায়। মৃত্যু শব্দ চীনবাসীরা ব্যবহার করে না। কেহ মরিলে তাহারা বলে, তিনি তাঁহার পরিবার বর্গের নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। মৃত আত্মা

মানবকে কখন কখন দেখা দেয় ও আশীর্ব্বাদ করে, কংফুজি ইহা বিশ্বাস করিতেন।

কংফুজি সামান্য সামান্য ত্রুটি সত্বেও যে এক জন মহৎ লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম সংস্থাপক দিগের ন্যায় আপনাকে তিনি ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বর প্রেরিত মহা পুরুষ বলেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় তথাপি এই ধর্ম্ম পৃথিবীর একটী মহা প্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। কিন্তু ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাস কিম্বা তাহা ঈশ্বর প্রেরিত ভাণ না করিয়া কোন দার্শনিক নীতি-শিক্ষা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে মনে হয় না।

নূতন সত্য প্রচার বা নূতন ধর্ম্ম স্থাপনে তাঁহার ব্রত ছিল না। কুসংস্কার দূর করিয়া প্রাচীন সত্য, প্রাচীন যাহা কিছু ভাল—যাহা কিছু মাত্র মানবের হিতকরী, তাহাই রক্ষাকরা ও প্রচার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পিতা মাতাকে ভক্তি ও সম্মান করিতে ইনি যত উপদেশ দিয়াছেন এত কেহই দেয় নাই। ইনি পিতৃ পুরুষদিগকে পূজা করিতে পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন।

আধ্যাতিকতা বাদ দিয়া যদি কোন ধর্ম্মনীতি কোন জাতিকে উচ্চ ও জীবন্ত ভাব দিয়া থাকে, তবে তাহা চীনদিগের ভাগ্যেই হইয়াছে। এবিষয়ে চীনেরা সকলের প্রশংসনীয়। সামাজিক উন্নতি ব্যতীত মানবের সৎ হইবার অন্য কোন প্রলোভন বা উদ্দেশ্য এ ধর্ম্মে নাই।

নিম্নে ইঁহার কতকগুলি শিক্ষা প্রদত্ত হইল।

সমাজ-বন্ধন দৃঢ় রাখিবার জন্য পিতৃমাতৃবৎসল ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞাবহ হইবে।

ঐক্য ও কৃপালু হৃদয়ের দৃষ্টান্তের জন্য জ্ঞাতি কুটুম্বের সহিত সদ্ভাব রাখিবে।

বিবাদ বিসম্বাদ দূরীকরণের জন্য প্রতিবেশিদিগের সহিত শান্তি সংস্থাপন করিবে। কৃষি কার্য্যের মহত্ব বুঝিবে এবং আহার্য্য ও পরিধেয়ের প্রাচুর্য্যের জন্য তুঁতের চাষ করিবে।

পরিমিত ব্যয় করিবে। অর্থের অপব্যয় করিবে না।

সত্য নীতি প্রচারের জন্য কুসংস্কার ও কদর্য্য নীতির অনাদর করিবে।

পুত্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সৎশিক্ষা দিবে, যেন তাহারা কুপথে অগ্রসর না হয়। ক্রোধ দ্বেষ জয় করিতে শিক্ষা করিবে। ব্যহিক শিষ্টাচার ও অতি প্রিয় ভাষণ সৎ ধর্ম্মের বিরোধী।

যাহা জান, তাহা স্বীকার করিবে। যাহা জান না, তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাকেই জ্ঞান কহে।

নিজে অপরের নিকট যে রূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, অপরের সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিবে।

ধার্ম্মিক হওয়া কঠিন ব্যাপার নহে। ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছা কর, ধার্ম্মিক হইবে।

ন্যায় বুঝিয়া সেইরূপ না করা কাপুরুষের কার্য্য।

সাধুরা সর্ব্বদাই শান্ত চিত্ত হয়েন। দুষ্টেরা সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকে।

অনুৎকৃষ্ট তণ্ডুলের অন্নে জীবন ধারণ করিয়া শয্যায় উপাধানের পরিবর্ত্তে বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়াও লোকে সুখী হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত শান্তি কোথায়!

হে নৃপতি, রাজ কার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য দুষ্ট বধের আবশ্যকতা কি? নিজের ইচ্ছা যদি সৎপথে থাকে, আপনার প্রজারাও সৎ হইবে।

ইঁহার শিক্ষা বুদ্ধের শিক্ষার ন্যায় উচ্চ। প্রেম ও অহিংসা শিক্ষায় কোন অংশে বুদ্ধের শিক্ষাপেক্ষা হীন নহে। বরং অন্যান্য বিষয়ে আমাদিগের নিকট ভাল বলিয়াই বোধ হয়। ইঁহার শিক্ষা খৃষ্ট বা বুদ্ধের শিক্ষার ন্যায় আত্ম নিগ্রহের শিক্ষাও নহে। তিনি জীবনকে দুঃখময় বিশ্বাস করিতেন না। সংসারে কিরূপে সুখে থাকিব, কিসে সামাজিক উন্নতি হয় তাহাই দেখিব, এই তাঁহার শিক্ষা। এ বড় মহৎ শিক্ষা, এই শিক্ষাই মানবের উপযোগী। তাঁহার সকল শিক্ষাই দোষ শূন্য, কেবল তিনি স্ত্রী জাতিকে নিতান্ত অবলা ও অপদার্থ জ্ঞান করিতেন। তাহারা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পুরুষের অনুগত হইয়া চলিবে, এই উপদেশ তত উচ্চ মনের উপযুক্ত নহে। ৪৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কৈফিয়ৎ।

বিগত সংখ্যক "আলোচনাতে" "যোগ শাস্ত্র" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপসংহার ভাগে লেখক মহাশয় তাঁহার কোন বন্ধুর পত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত যোগ ও তাঁহার মত সম্বন্ধে কতকগুলি কথা প্রকাশ

করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। বিশেষ রূপ না জানিয়া না শুনিয়া—গোস্বামী মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সেই প্রবন্ধ প্রকাশ করাতে, কেহ কেহ আমাদিগকে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের অভিযোগেও অভিযুক্ত করিতেছেন। আজ আমাদিগকে তাহারই কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে। সর্ব্ব সাধারণের জানা উচিত যে, "আলোচনা" কোন সম্প্রদায় বিশেষের কাগজ নহে;—ইহাতে হিন্দু ব্রাহ্ম, খৃষ্টান মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকে স্ব স্ব ধর্ম্মমত লইয়া আলোচনা করিতে পারেন। সুতরাং কেহ যদি সুরুচির সীমা অতিক্রম না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কোন কথা লেখেন, তাহা প্রকাশ করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। এতদ্ব্যতীত যিনি সেই প্রবন্ধের লেখক, তিনি একজন সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত প্রবীণ ও সুলেখক। আমাদের বিশ্বাস, তিনি তাঁহার বন্ধুর পত্র হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা অবশ্য বিশেষ বিবেচনা ও অনুসন্ধানের পর উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন; অথচ তাহাতে এমন দু একটী কথাও প্রকাশিত হইয়াছে—"ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী নহেন," "আমি চারি দণ্ডের মধ্যে একজন পাপীকেও ঈশ্বর দর্শন করাইতে পারি"—যাহা গোস্বামী মহাশয় বলিতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস করিতে এখন প্রবৃত্তি হয় না। এই আন্দোলনের সময় চারি দিকের কাগজে গোস্বামী মহাশয়ের সম্বন্ধে নানা কথা প্রকাশিত হইতেছে এবং তৎ সমুদয়ে যে সকল ভ্রান্ত বিবরণ প্রচারিত হইতেছে, গোস্বামী মহাশয় স্বয়ং তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন দেখিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, এই যোগশাস্ত্রের প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে যদি কোন ভ্রান্ত কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে তিনি তাহারও প্রতিবাদ করিয়া সাধারণের ভ্রম দূর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; তদ্দ্বারা তাঁহার কার্য্য প্রণালী, মতামত এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের মনে যে কুসংস্কার ও সন্দেহ জন্মিতেছে, তাহাও দূর হইবে। তাঁহার নামে কুৎসা রটনা করা বা তাঁহার বিরুদ্ধে লোকের মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না বা নাই;—আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, আমাদের শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয়েরও এরূপ উদ্দেশ্য নহে। সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয়ের যাহা বক্তব্য আছে, আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব।

সমালোচনা।

বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা,—শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু অনেক শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত কি না প্রথমে তাহাই দেখাইয়াছেন, তৎপরে যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া ইহার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে; এবং গ্রন্থকার যে এ বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা সায় দিতে পারিলাম না। "ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মও নহে, ব্রহ্মচর্য্য নিষ্কামও নহে; প্রত্যুত ঘোরতর অধর্ম্ম" এ কথা আমরা বলিতে পারি না। শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যে লক্ষণই থাক্, ব্রহ্মচর্য্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ব্রহ্মচর্য্যের যে আদর্শ আমাদিগের মনে আছে, তাহা অতি উচ্চ, অতি মহৎ, অতি পবিত্র। দেবেন্দ্র বাবু মহর্ষি পরাশরের "মৃত ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।

সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণ॥"

শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যের শাস্ত্রোক্ত বিধিতে স্বর্গ লাভের প্রলোভন দেখান হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই কামনার বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত করিয়া দেওয়া হইতেছে; সুতরাং ইহা আর কি প্রকারে নিষ্কাম রহিল? ইহা তবে সম্পূর্ণ সকাম। শ্লোকটীর অর্থ এভাবে গ্রহণ না করিলে দেবেন্দ্র বাবু এ ভ্রমটুকুতে পড়িতেন না। শাস্ত্রকার যে প্রলোভন দেখাইয়া বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, এরূপ মনে না করিলেই হইত। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে কি ফল হয়, তাহাই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। মনে করুন—আমি জানি পবিত্রচেতা, প্রার্থনাশীল হইলে ঈশ্বর দর্শন লাভ করা যায়; এখন আমি এইটী জানি বলিয়া আর আমি পবিত্র বা প্রার্থনাশীল হইতে পারিতেছি না? কারণ, আমি জানি যে ইহার ফল ঈশ্বর দর্শন, সুতরাং পবিত্রচিত্ত বা প্রার্থনাশীল হইতে চেষ্টা করিলেই, তাহা

সকাম হইয়া গেল। তখন আর তাহার কোন মূল্য রহিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে প্রার্থনাদি পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা অসম্ভব। কি ফল হয় তাহা আমরা দেখিব না, আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়া যাইব, ফল যাহাই হউক। নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, নিষ্কাম হইয়া; শাস্ত্রকার যে প্রলোভনই কেন দেখান না, তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিবেন না। যে রমণী এই প্রকার নিষ্কাম হইয়া—সেই আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থা হন, তিনি সমস্ত জগতের পূজার পাত্রী। তাঁহার দর্শনেও পুণ্য আছে। কিন্তু এরূপ ব্রহ্মচারিণী জগতে কয়টী দেখিতে পাওয়া যায়? সকলেই কি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থা হয়? তুমি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিতেছ, "প্রবৃত্তিরেষা নারীনাং নিবৃত্তস্তু মহাফলা।" বেশ বুঝিলাম, "নিবৃত্তস্তু মহাফলা"; কিন্তু তাহা কেবল নারীর পক্ষেই কেন হইবে, পুরুষের পক্ষেই বা কেন "নিবৃত্তস্তু মহাফলা" হয় না? আমিও তোমার ন্যায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলি—

"বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপিকর্ষতি।"

মনুই বলিতেছেন ইন্দ্রিয়গণ একান্ত বলবান্, ইহারা জ্ঞানীগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণ সম্যকরূপে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ মানব জগতে কয় জন আছেন? তোমরা বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতেছ, নানা জ্ঞান ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছ, তোমরাই যখন ৫০।৬০ বৎসরের সময়ও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে গোঁপে কলপ দিয়া ৮।৯ বৎসরের বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হও না, এক স্ত্রী গৃহে থাকিতে আর এক স্ত্রী গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ কর না; তখন "প্রবৃত্তিরেষা নারীনাং নিবৃত্তস্তু মহাফলা" এ কথা তোমাদের মুখে ভাল দেখায় কি? ব্রহ্মচর্য্যের ভারটা যে কেবল অবলার উপরেই পড়িবে, ইহা কখনও হইতে পারে না। আমরা বলি যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন, তাঁহারা তাহাই করুন; কিন্তু যে হতভাগিনী বালবিধবা তাহাতে না সমর্থা হয়, তাহাকে, হে সমাজপতি, তুমি "নিবৃত্তস্তু মহাফলা" এ কথা শুনাইও না। যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে না পারেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে দাও, ইহার প্রতিবন্ধক হইও

না, ইহাতে বাধা দিও না; বাধা দিলে দেশ পাপ-স্রোতে ভাসিতেছে, ভাসিবে।

স্থানাভাব বশতঃ আমরা ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না। তবে দুই এক স্থানে আমাদিগের সহিত মতের মিল না থাকিলেও পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে।

একটী নিবেদন।

মেয়েরা ঘাটে জল আনিতে গিয়া যে সকল আশ্চর্য্য গল্প ও গ্রামস্থ লোকদিগের সম্বন্ধে কত কথা কত আলোচনা করে, তাহা এত দিন বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসেই পড়িয়া আসিতাম। দুঃখের বিষয় যে, সেই সকল খোস গল্প ও ঘাটের ঘোঁট আজ কাল আমাদের আদরের পত্রিকাতেও স্থান পাইতেছে। কোন ভদ্র লোকের সম্বন্ধে একটা কথা মুখে বলাই, অপর কাহারও পক্ষে বিশেষ না জানিয়া উচিত নহে। আর সেদিন "আলোচনাতে" গোবিন্দ বাবু যে সাধু ভাব পূর্ণ প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্রাহ্ম ও অপর সাধারণ সকলের পরম শ্রদ্ধা ভাজন পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নামে যে সকল ঘোরতর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় ছাপা হইয়া শত শত লোকের সম্মুখে প্রচারিত হইল, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতেছি না; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমাদের মত সামান্য লোকের সম্বন্ধেও যদি কেহ কোন কথা প্রচার করিতে চাহেন, তাহা হইলে আমি যেমন ইচ্ছা করি যে, তিনি আমাকে ঐ বিষয়ে প্রথমে না জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকাশ না করেন,—তেমন অধিকার, সেই সভ্য ও ভদ্র সমাজে প্রচলিত সাধারণ অধিকার কি বিজয় বাবুর মত লোকের নাই? যদি থাকে, তবে সে কথা কি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে একটী বার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল? আমি জানি, হয় নাই। এই জন্য দুঃখিত হইয়াছি। কোথায় কে উড়ো কথায় যা ইচ্ছা তাই লিখিল, আমি অমনি "যোগতত্ত্বের" কামানে মাছি মারিবার ইচ্ছায় "আলোচনায়" পাঠাইলাম, আলোচনাও (কি অভিপ্রায়ে জানি না) অবিকল ছাপাইয়া পাঠকগণের পরম মঙ্গল সাধন করিলেন!! আমাদের

ন্যায় পাঠকগণের কিন্তু যথার্থই বড় ক্লেশ হইয়াছে। কেন না, দেশের মধ্যে শ্রদ্ধেয় লোকের সংখ্যা বড় কম, তাহাতে বিজয় বাবুর মত লোকের বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা কথা প্রচার হইয়া তাঁহাকে আমাদের আত্মার চক্ষে ছোট করিয়া দেয়, তাহা হইলে প্রাণে বড়ই লাগে। এই রূপে যদি পৃথিবীর সমস্ত সৎ ও মহৎ লোকেদের নামে আমার এক জন বন্ধুর পত্র হইতে যা ইচ্ছা তাই উদ্ধৃত করিয়া আলোচনায় ছাপাইবার জন্য পাঠাই, আর তিনি তাহা ছাপান, তাহা হইলে পত্রিকার সম্মান ও মূল্য বৃদ্ধি হয় কি না, সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে যে সুরুচিযুক্ত পাঠকের কখনই পাঠ যোগ্য হইবে না, সে কথা নিশ্চয়। দারুণ ক্লেশে হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। আর অধিক লিখিতে পারি না।

তবে একটা উপায় আছে। আমাদের প্রাণের শান্তি বিনষ্ট না হইবার একটী উপায় আছে। যখন কোন বিশেষ আন্দোলন উঠে, তখন সকলেরই উচিত যে, সে বিষয়ের তিল মাত্র কথা বলিবার সময় যার পর নাই সাবধান হন। আর সকলেরই উচিত যে, সেই সম্বন্ধে তিল মাত্র গুজব যারপর নাই সতর্কতা ও পরীক্ষার পর বিশ্বাস করেন। তাই বলি, ভাই পাঠকগণ! যদি সত্যানুসন্ধান তোমাদের উদ্দেশ্য হয়, যদি বিজয় বাবুর মত মহৎ লোকের বিরুদ্ধে অন্যায়, অসত্য, কুসংস্কার পোষণ করা উদ্দেশ্য না হয়,—তবে ভাই! তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলি—যে লেখকের যাহা ইচ্ছা হয় লিখুন এবং সম্পাদক মহাশয়েরও সে সম্বন্ধে যাহা উচিত বোধ হয় করুন——আমরা যেন **বিজয় বাবুর নিজের স্বাক্ষরিত কথা ভিন্ন কি ভাল কি মন্দ কোন কথা কদাচ বিশ্বাস না করি।** সত্যের দোহাই! মানব মাত্রেরই প্রতি কর্ত্তব্যের দোহাই! সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মগত-প্রাণ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রচারক বিজয় বাবুর প্রতি যে কর্ত্তব্য সূত্রে আমরা চিরবদ্ধ, তাহার দোহাই—কেহই যেন অন্য কোনও প্রকার কথা কখন বিশ্বাস করিয়া ভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হই।

শ্রীমঃ——জনৈক পাঠক।

যোগ-তত্ত্ব।

ব্রাহ্মসমাজে যে যোগ সাধন এই নূতন প্রচলিত হইতেছে, তাহা নহে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পথ প্রথমে প্রদর্শন করেন। তাঁহার প্রণীত ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতিতে তিনি যে ধ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহা আমাদের উপাসনার একটী অঙ্গরূপে চিরকাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এক প্রকার যোগ। এই যোগের প্রণালী তাঁহার সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। যথা—

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়ানি মনসা সন্নিবেশ্য"—
ইত্যাদি।

বক্ষ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নত করিয়া, শরীরকে সমভাবে স্থির রাখিয়া এবং মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে হৃদয়ে সন্নিবেশ করিয়া—ইত্যাদি।

কিরূপ স্থানে বসিয়া এই যোগাভ্যাস করা উচিত, তাহাও এস্থলে বর্ণিত হইয়াছে।

সমে শুচৌ শর্করা বহ্নি বালুকা বিবর্জ্জিতে শব্দ জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোনুকূলে নতু চক্ষুপীড়নে গুহা নিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ।'

সমান ও শুচিদেশে, কঙ্কর ও উত্তপ্ত বালুকা বর্জ্জিত স্থানে, বিহঙ্গাদি কুজিত শব্দ, জল ও আশ্রয়মণ্ডপাদি দ্বারা মনোরম স্থানে, প্রতিবাতীর অনভিমুখে, গুহা অথবা বিরল স্থানে, প্রচণ্ড বায়ুবর্জ্জিত দেশে চিত্তসমাধান করিবেক।

স্থান এবং শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা। পরে কিরূপে যোগ করিতে হইবে তাহা কথিত হইতেছে;—

"প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।"

প্রণব ধনুঃ স্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ, পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ। অপ্রমত্তচিত্তে প্রণব ধনুর সাহায্যে জীবাত্মারূপ শর দ্বারা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিবে এবং শর যেমন লক্ষ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ পরব্রহ্মেতে প্রবিষ্ট হইবে অর্থাৎ তন্ময় হইবে।

মহর্ষিকে যাঁহারা ধ্যানস্থ দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, তিনি কিরূপ

নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মধ্যান করেন। তিনি ভূতশুদ্ধি অথবা আসন শুদ্ধির পথ দিয়া যোগ সাধন আরম্ভ করেন নাই এবং প্রাণায়ামাদিও করেন নাই। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, তাঁহার পক্ষে উহা অনাবশ্যক, একাগ্রতা নিবন্ধন তাঁহার চিত্ত পরব্রহ্মে সহজেই নিমগ্ন হইয়া যায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনও ত্রিবিধ যোগ অভ্যাস করিতেন—বহির্যোগ, অন্তর্যোগ ও ভক্তিযোগ, অর্থাৎ জড়জগতে ঈশ্বর দর্শন, আত্মাতে ঈশ্বর দর্শন এবং ইতিহাসে ঈশ্বর দর্শন। তিনি এই যোগ সাধনের দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, প্রথমতঃ জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বিতীয়তঃ ধ্যান ও চিন্তা। তিনি এই উপায় অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের সহিত এরূপ যোগ করিতেন যে, তাঁহার আদেশ বাক্য আত্মাতে সুস্পষ্ট শ্রবণ করিতেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রচারক পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, যে যোগপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রাগুক্ত প্রকার নহে; তাঁহার সাধন প্রক্রিয়া প্রাণায়াম। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, প্রাণায়ামকে সাধন বলে না, ইহা বাহিরের অবলম্বন মাত্র। "যেমন খোল, করতাল, সংগীত, স্তব, স্তুতি প্রভৃতি বাহিরের অবলম্বন দ্বারা সাধনের কিঞ্চিৎ সাহায্য হয়, প্রাণায়ামেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে সাধকের শরীর সুস্থ ও নিষ্পাপ আছে, সেখানে প্রাণায়ামের প্রয়োজন নাই।"—যোগ সাধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর নামক গ্রন্থ, ৮ম পৃষ্ঠা।

কিন্তু আমরা তাঁহার সহিত এ স্থলে ঐক্য হইতে পারিতেছি না। সংগীত ও স্তবস্তুতি দ্বারা যে প্রকার আধ্যাত্মিক ফল লাভ হয়, প্রাণায়াম দ্বারা তাদৃশ হয় না। ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন একেবারে আত্মাকে স্পর্শ করে, উহার ফল আত্মাতে উপলব্ধি হয়; কিন্তু প্রাণায়ামের ফল শারীরিক, উহা শরীরের শিরা ধমণীর উপর কার্য্য করে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন স্বাভাবিক কার্য্য, কিন্তু প্রাণায়াম অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র। প্রথমোক্ত প্রকার সাধনার উদ্দেশ্য পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা, দ্বিতীয় জাতীয় সাধন প্রণালীর তাহা উদ্দেশ্য নহে। যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামাদির ফল এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা;—অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, যত্রকামাবসায়িত্ব। ইহাদিগকে অষ্ট মহাসিদ্ধি বলে। পাঠকদিগকে এই অষ্ট মহাসিদ্ধির ব্যাখ্যা না করিলে বুঝিতে পারিবেন না, এই জন্য এস্থলে তাহাদিগের তাৎপর্য্য কথিত হইতেছে।

অণিমা—সংযম বলে অণু অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম হইবার শক্তি।

লঘিমা—সংযম বলে লঘু হইবার সামর্থ্য।

মহিমা—ক্ষুদ্র হইয়াও পর্ব্বতাদি প্রমাণ মহৎ হইবার শক্তি।

প্রাপ্তি—ইচ্ছামাত্র দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থ করিবার শক্তি।

প্রাকাম্য—ইচ্ছার কোন ব্যাঘাত না থাকা, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে ভূমি-গর্ত্তে বা শূন্যে যাইতে পারা।

বশিত্ব—ভূত সকল বশীভূত করিবার শক্তি।

ঈশিত্ব—ভৌতিক পদার্থকে যেরূপে ইচ্ছা রাখিতে পারা।

যত্রকামাবসায়িত্ব—ভৌতিক পদার্থকে যেরূপ শক্তি দিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহারা সেইরূপ শক্তি বিশিষ্ট হওয়া—যথা, মৃতকে জীবিত করা, বিষকে অমৃত করা এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ জীবিতকে মৃত করা এবং অমৃতকে বিষ করা।

এতদ্ব্যতীত আরও যে কত ফলের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আর কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

"ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ।
চন্দ্রে তারাব্যূহজ্ঞানং।
ধ্রুবে তদ্গতি জ্ঞানং।"

পাতঞ্জলদর্শন—বিভূতিপাদ—২৭, ২৮, ২৯ সূত্র। যোগীরা সূর্য্যমণ্ডলে চিত্ত স্থির করিলে সপ্তলোক ও তদন্তর্গত সমস্ত পদার্থ ও জীব সকল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। চন্দ্রমণ্ডলে চিত্তসংযম করিলে তারকামণ্ডলীর জ্ঞান জন্মে। ধ্রুবতারায় চিত্তসংযম করিলে তারকাগণের গতি জানিতে পারা যায়।

"মূর্দ্ধ জ্যোতিষি সিদ্ধ দর্শনং।" ঐ ৩৩ সূত্র। অর্থাৎ মূর্দ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের জ্যোতিতে সংযম প্রয়োগ করিয়া যোগীরা স্বর্গ ও পৃথিবীর অন্তরালবাসী সিদ্ধ পুরুষদিগকে অর্থাৎ অদৃশ্যচর মহাত্মাদিগকে সন্দর্শন করেন এবং তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনও করেন। অন্যে সেই সকল দিব্য পুরুষদিগকে দেখিতে পায় না, তাহাদের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহে। যোগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইয়া জ্ঞান বিশুদ্ধ ও প্রদীপ্ত হয়, এবং ক্রমে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যোগের আটটী অঙ্গ। যম, নিয়ম

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আট অঙ্গের তাৎপর্য্য এস্থলে প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

যম। অহিংসা, সত্য, অজ্ঞেয় অর্থাৎ অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ এই পাঁচ প্রকার সাধন করা। অপরিগ্রহ শব্দে দেহ রক্ষাতিরিক্ত ভোগ-সাধন না করা।

নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রপাঠ) এবং ঈশ্বর প্রণিধান সাধন করা।

আসন—যোগাভ্যাস কালে স্থিরভাবে এরূপে উপবেশন করা, যদ্দ্বারা শরীর অথবা মনের কোন প্রকার ক্লেশ না হয়। এই আসন যোগীরা চৌরাশী (৮৪) প্রকার বলেন। তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসনকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। পদ্মাসনে বসিবার নিয়ম এই—বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পাদ ও বাম হস্ত চিৎ করিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ ও দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া রাখিবে নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিবে, এবং বক্ষগ্রীবা উন্নত করিয়া উপবেশন করিবে। সিদ্ধাসন এইরূপ—বাম-পাদমূল মলদ্বারে এবং দক্ষিণপাদ বাম উরুতে (অথবা শিশ্নোপরি) রাখিয়া, নাসাগ্রে (কেহ কেহ বলেন ভ্রূমধ্যদেশে) দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সমকায় শিরগ্রীবাবস্থাতে উপবিষ্ট হওয়া। এতদ্ব্যতীত আরও একটী শ্রেষ্ঠ আসন আছে—

অর্দ্ধাসন—অর্থাৎ দক্ষিণ উরুতে বামপাদ ও বাম উরুতে দক্ষিণ পাদ রাখিয়া শরীর ও নেত্রের অবস্থা পূর্ব্বোক্ত প্রকার স্থির করিয়া উপবিষ্ট হওয়া। ইহাকে স্বস্তিকাসনও বলে এবং কেহ কেহ জানু ও উরুর মধ্যে পদতলদ্বয় স্থাপনের ব্যবস্থা দেন। শিবসংহিতায় আর একটী আসনের উল্লেখ আছে—উগ্রাসন। উহা এই প্রকার—পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া পরস্পর অসংযুক্ত রাখিবে এবং করদ্বয় দ্বারা পদদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করতঃ উভয় জানুর উপরে মস্তক স্থাপন করিবে। উপুড় হইয়া এই সাধন করিতে হয়।

প্রণায়াম—নিশ্বাস প্রশ্বাসকে একপ্রকার নিয়মাধীন করা। প্রাণায়াম তিন প্রকার বাহ্যবৃত্তি অর্থাৎ বায়ুকে বাহির করা, ইহার নাম রেচক। দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরবৃত্তি, অর্থাৎ বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে পূর্ণকরা, ইহাকে পূরক বলে। তৃতীয়তঃ স্তম্ভবৃত্তি, অর্থাৎ বায়ুকে শরীরাভ্যন্তরে

রক্ষা করা, ইহাকে কুম্ভক বলে। কিরূপে এই বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগাদি করিতে হইবে, তাহার আবার নিয়ম আছে। যথা—

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকারন্ধ্রকে অবরুদ্ধ করতঃ বাম নাসিকার ইড়া নাড়ীরন্ধ্রে বায়ু পূরণ করিবে এবং মধ্যনাড়ীরন্ধ্রে ঐ পূরিত বায়ুকে রোধ করতঃ অনন্তর দক্ষিণ নাসিকার পিঙ্গলা নাড়ীছিদ্র দিয়া পরিত্যাগ করিবে। পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু পূরণ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা পরিত্যাগ করিবে।

প্রত্যাহার—পূর্ব্বোক্ত প্রকার সাধন করিলে ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়, এইরূপ যোগীরা বলেন এবং তখন চিত্তকে যথা ইচ্ছা তথায় স্থির করা যায়। ইন্দ্রিয় দিগকে এইরূপে বাহ্যবস্তু হইতে প্রত্যাবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার। চিত্ত এইরূপ বশীভূত হইলে ধ্যান ধারণা ও সমাধি করা সহজ হয়।

ধারণা, ধ্যান, সমাধি—কোন একটী বস্তুতে চিত্তকে স্থিরকরা ধারণা, ধারণা যত অবিচ্ছেদ স্থায়ী হয় সেই অবস্থাকে ধ্যান বলে, এবং সেই ধ্যান যখন নিজ অস্তিত্ব বিস্মরণ করাইয়া কেবল ধ্যেয় বস্তুকেই প্রকাশ করিবে তাহাই সমাধি।

যোগতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এখন প্রশ্ন এই, যোগদ্বারা যে সমস্ত ক্ষমতালব্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে, তাহা কতদূর সত্য ও সঙ্গত। সূক্ষ্মকায় ধারণ করিয়া ভূমধ্যে প্রবেশ করা, লঘু হইয়া আকাশে বিচরণ করা, ইচ্ছা-মাত্র দূরস্থ বস্তুকে নিকট করা, মৃতকে জীবিত করা, সৃষ্টবস্তুর গুণাগুণ ও শক্তির অন্যথা করা—এই সমস্ত ক্ষমতার কথা যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগী উপার্জ্জন করিতে পারেন কি না? আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। Miracle অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করা সকল দেশেই শুনা যায়, এবং যেখানে বিজ্ঞানের আলোচনা অল্প এবং বিশ্বাস অন্ধতাতে পরিপূর্ণ, সেই খানেই এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারের কথা শুনা যায়। আমরা যদিও স্বীকার করিয়া লই যে, যোগী এই সকল কার্য্য করিতে পারেন; তাহাতেই বা ধর্ম্মের কি লাভ হইল? মানবাত্মা যদি ভূগর্ভমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারে, কলিকাতায় বসিয়া আমেরিকার সংবাদ জানিতে পারে, মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরদেশে গমনাগমন করিতে পারে, তদ্দ্বারা বিজ্ঞানের প্রচুর লাভ হয় সংশয় কি? তজ্জন্য আমরা যোগীদিগের সাধনার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে পারি। যদি তাঁহারা

রেলরোড ও তাড়িদ্বার্ত্তাবাহকে অতিক্রম করিয়া গমনাগমনের এবং সংবাদ আদান প্রদানের এরূপ আশ্চর্য্য প্রণালী প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে সমস্ত বিজ্ঞান-জগতে তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইবেন। তাহা হইলে আমরা সকলে যোগাভ্যাসে রত হইতে পারি। কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহারা কিছুই দেখাইতে পারেন নাই; শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারেন নাই। রঞ্জিৎসিংহের সময়ে একজন যোগী ভূগর্ত্তমধ্যে বহুকাল অনাহারে ছিলেন শুনা যায় এবং এই রূপ অনশনাবস্থায় অন্যান্য স্থলেও যোগীদিগকে দৃষ্ট হইয়াছে এরূপ কথিত আছে; কিন্তু সেই সমস্ত যোগীরা ধর্ম্মবিষয়ে, ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে কি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলে না, কেহ জানে না। যদি তাহাদের ঈশ্বর সাক্ষাৎ হইয়াছিল স্বীকার করা যায়, আমরা সেরূপ ঈশ্বরসাক্ষাৎকার লাভ প্রার্থনা করি না। যদি সেইরূপ অর্দ্ধজড় অর্দ্ধমৃত অর্দ্ধচেতন অবস্থা না হইলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বিড়ম্বনা, অধ্যাত্মতত্ত্ব মৃত্যুতত্ত্ব সমান। বিজ্ঞানবিদ্গণ কত নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু যোগীরা তৎসম্বন্ধে কি করিয়াছেন? সেই জন্য আমরা বলি, অণিমা লঘিমা শক্তি কেবল শব্দমাত্র। কেহ বলিতে পারেন, অমুক দিন অমুক ব্যক্তি দূর দেশস্থ অমুক কোন সময়ে কি করিতেছিলেন তাহা যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহা পরে প্রমাণ হইয়াছে। সত্যবাদী বলিয়া যদি তাঁহাকে অবিশ্বাস না করা যায়, তবে এরূপ ঘটনাকে একটী আকস্মিক ঘটনাই বলিব, কেবল কল্পনা বলে হঠাৎ একটী ঘটনা অনুমান করা হইয়াছিল বলিব। কেন না যদি এরূপ শক্তি যথার্থ হইত, তাহা হইলে ইহা প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকাশিত হইত। যদি বলা হয় যে, ঐ শক্তি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, তদুত্তরে ইহাই বলিব যে পাতঞ্জলির সময় হইতে যদি ঐ শক্তি বৃদ্ধি না হইল, তাহার প্রতি আস্থা হইতে পারে না। এপর্য্যন্ত যে ঐ শক্তি শাস্ত্রেতেই পর্য্যবসিত আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিজ্ঞানবেত্তারা কত গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কার করিলেন, কত ভৌতিক নিয়ম উদ্ভাবন করিলেন; কিন্তু যোগীরা কি করিয়াছেন? অতএব ভৌতিক রাজ্যে তাঁহারা কিছুই করেন নাই দেখা গেল। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা কি করিয়াছেন? আমরা যোগসাধকদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুরোধ করি। ঈশ্বরের স্বরূপাদি বিষয়ে তাঁহারা কি আবিষ্কার করিয়াছেন,

যাহা অযোগীরা জানিতে পারে নাই? যদি তাঁহারা যোগবলে কিছু অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা জগতে প্রচার করুন। "অপূর্ব্ব বস্তু দেখিতেছি" "আর কোন অভাব নাই" কেবল এ প্রকার অনির্দ্দিষ্ট বাক্য দ্বারা জগতের উপকার হইবে না। আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই প্রকার বোধ হইয়াছে যে, প্রণায়াম করিতে করিতে ভিতরে একপ্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়, নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হয় এবং দৃশ্যও দেখা যায়, তাহা বড় প্রলুব্ধকর এবং তাহার লোভে অনেকে উহা অভ্যাস আরম্ভ করেন।

"মত্তভৃঙ্গ বেণুবীণা সদৃশঃ প্রথমোধ্বনিঃ।
ঘণ্টানাদ সময় পশ্চাধ্বনির্মেঘরবোপমঃ।
তত্রনাদে যদাচিত্তং রমতে যোগিনোভৃশং,
বিস্মৃত্য সকলং বাহ্যং নাদেন সহসাম্যতি॥"

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, হে পার্ব্বতী সিদ্ধাসনের তুল্য আসন নাই, কুম্ভকের সদৃশ বল নাই, খেচরী মুদ্রার সদৃশী আর মুদ্রা নাই এবং নাদের সদৃশ লয় নাই। এই নাদ শ্রবণ করিতে করিতে যোগী চিদাকাশে বিলীন হন।

"শিবঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্যদি,
ভদাজ্যোতিঃ প্রকাশস্যাদ্বিদ্যুতেজঃ সমপ্রভং।
এতচ্চিন্তনমাত্রেণ পাপানাং সংক্ষয়োভবেৎ।
সিদ্ধানাং দর্শনং তস্য ভাষণঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবং॥"

"আত্মকপালে বিবিধ শিবনেত্র চিন্তা করিলে বিদ্যুতের ন্যায় জ্যোতি হৃদাকাশে প্রকাশ হয় এবং ইহার চিন্তামাত্র সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়। সেই জ্যোতিঃ দিবারাত্রি চিন্তা করিলে তাহার মধ্যে সিদ্ধপুরুষদিগের দর্শন হয় এবং তাহাদের সহিত সম্ভাষণও হয়।" যাঁহারা এইরূপ কল্পনাকে চরিতার্থ করিয়া সুখী হইতে চাহেন, তাঁহারা প্রাণায়াম অভ্যাস করুন, ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে প্রাণায়ামের বিশেষ প্রয়োজন নাই। আমার

কথার কেহ ঘৃণাসূচক অভিপ্রায় মনে করিবেন না। হঠ যোগীদিগের শাস্ত্র হইতে আমি এই সমস্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলাম। তাঁহারা যোগের যে সমস্ত নীচ অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলিতেও লজ্জা বোধ হয়; সেই জন্য আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। কোন পাঠক যদি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, শিবসংহিতা নামক গ্রন্থের পঞ্চমপটলের ১৯৭ হইতে ২০২ শ্লোক পাঠ করিবেন। যোগীদিগের অপরাপর সিদ্ধি ও ক্ষমতা বিষয়ে যাহা পাঠ করা যায়, তাহাও ধর্ম্মার্থে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যোগীরা প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলে ভেকের ন্যায় প্লুতগতি বিশিষ্ট হন, এবং অবশেষে ভূতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরবলম্বে শূন্যে ভ্রমণ করিতে পারেন। যোগীরা মৃত্যুঞ্জয়, রোগশূন্য ও দীর্ঘায়ু হয়েন, এবং তাঁহাদের ইচ্ছা-মৃত্যুর ক্ষমতা জন্মে। তাঁহারা দূর শ্রবণ, দূরদর্শন, দূরগমনের ক্ষমতা লাভ করেন। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মার্থীরা কামনা করেন না।

আমরা এই প্রস্তাবের প্রারম্ভে যে যোগের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই ধর্ম্মার্থীর পক্ষে আবশ্যক। সেই যোগের বিষয় ভগবদ্গীতায় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যোগী কামনাশূন্য হইবেন—

"সর্ব্ব সঙ্কল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে!"

তিনি ভূচরী খেচরী সিদ্ধি, যক্ষগন্ধর্ব্ব বশীকরণ প্রভৃতি নীচ কামনা দ্বারা পরিচালিত হয়েন না, কিন্তু কেবল পরমাত্ম জ্ঞানই তাঁহার লক্ষ্য—

"যদাবিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে,
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।"

এই যোগাভ্যাসের জন্য প্রাণায়ামাদি কোন কৃচ্ছ্র করিতে হয় না। কামনা পরিত্যাগ ও মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মনকে আত্ম চিন্তায় নিযুক্ত করিতে হয়। এইরূপ সমাহিত ব্যক্তি ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকেন।

গীতায় প্রাণায়াম প্রভৃতি যজ্ঞকে কর্ম্মজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—অর্থাৎ বাঙ্মনকায়িক; আত্মার সহিত ইহাদিগের কোন সম্পর্ক নাই।

"এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিত্তা ব্রহ্মনোমুখে।
কর্ম্মজ্ঞান বিদ্ধিতান সর্ব্বানেবাং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষয়ে।"

হঠযোগীরা যেরূপ প্রাণায়ামকেই যোগের প্রধান অঙ্গ করিয়াছেন, গীতাতে সে ভাব দৃষ্ট হয় না। গীতায় আসন ও প্রাণায়ামের কথা কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতার সুন্দর সাধন প্রণালীর বিষয়ে পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ।)

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

জীবন বা স্বপ্ন।

জীবনে ও স্বপ্নে প্রভেদ কি? কেহ বলেন জীবন উজ্জ্বলতর, স্বপ্ন ছায়াময় অস্পষ্ট। কথাটা ঠিক নহে। স্বপ্নে স্বপ্ন তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি জীবন্ত, তেমনি প্রাণভরা;—জীবন যেমন উজ্জ্বল, যেমন জীবন্ত, যেমন প্রাণভরা। স্বপ্ন ও জীবনের তুলনা করিবার সময় স্বপ্ন ফুরাইয়াছে, মৃত অদৃশ্য উড়িয়া গিয়াছে, জীবন তখন জীবিত, তখন চোখের সমক্ষে। দিনের বেলায় দিন রাত্রির তুলনা হয় না, রাত্রিকালে রাত্রি দিনের তুলনা হয় না। অতীত বর্ত্তমানের তুলনা অসম্ভব, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের তুলনা অসম্ভব, অতীত ভবিষ্যতের তুলনা শূন্যে শূন্যে সমালোচন। জীবিত ও মৃতের তুলনা যদি সম্ভব হইত, স্বপ্ন ও জীবনের তুলনা করা যাইত। অন্ধ চক্ষুষ্মানকে বুঝে না, অন্ধের হৃদয়ে ছায়ার মধ্যে কত লীলার অভিনয় চক্ষুষ্মান বুঝিবে কি? দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, অন্ধতা অসীম। ক্ষুদ্র রাজ্যের তৃণকণা চক্ষুকে অতিক্রম করিতে পারে না, অনন্তে যাহা কিছু মহান্ শোভন দর্শনীয়, অন্ধের তাহা মুষ্টিমধ্যে। জীবন ও স্বপ্ন দুটিকে যুগপৎ অতিক্রম করিতে পারিলে দুটীর সম্যক সমালোচনা করা যায়, নতুবা জীবনে স্বপ্নের স্বপ্নে জীবনের পূর্ণাস্বাদ ঘটে না। পূর্ব্ব জীবনের কথা এ জীবনে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি, অতীতের উজ্জ্বলতা মলিন হইয়া ছায়ায় পরিণত হইয়াছে, তীব্রতা কোমল হইয়াছে, কোমল কোমলতর হইয়াছে। কমলের সে কণ্টকটী ভুলিয়া গিয়াছি, কমল কুমুদে পরিণত হইয়াছে। সে সৌরভের ছায়ামাত্র কল্পনায় ভাসি-

তেছে। সে মুখখানি, ভাবিয়াছিলাম লৌহ অক্ষরে পাষাণে অঙ্কিত করিয়াছি, কৈ বর্ত্তমানের ধূলায় একেবারে মুছিয়া না যাউক, অংশতঃ ঢাকা পড়িয়াছে; সোজা রেখা বাঁকা হইয়াছে, বাঁকা রেখা সোজা হইয়াছে, সে তিলটী মুছিয়া গিয়াছে, তেমন মনোহর তেমন মোহন হৃদয়ভরা আর নাই। ধরিতে আকুবাঁকু করি ধরিতে পারি না; চিত্রপটে তুলিকা পরাস্ত হইল, তাহার প্রতিকৃতিও তাহাকে তেমনটী দেখাইতে পারে না। সে মাধুরী, সে মনোমোহন মাধুরী, সাধ্য কি প্রতিকৃতি ধরিবে, হৃদয় ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই বিরহে দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিয়োগে স্বপ্নের প্রত্যাশা করি, আকাশ পানে চাহি, আকাশ যদি রাখিয়া থাকে! "কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে।" ঘুমের আবেশে যাহা মোহন, দিব্য, উজ্জ্বল; নিকটে প্রাণের ভিতরে, ঘুম ভাঙ্গিলে ছায়ার সহিত তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, দিবসের আলোককে ঘৃণা করে, ইন্দ্রিয়ের জড়তা তুচ্ছ করে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোমলতা তাহার মনোমত, তাহার অনাবৃত বক্ষে ছায়ার শীতলতায় সে নৃত্য করিতে ভালবাসে। জড়তা তীব্রতা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তর্হিত হয়। সে একাকী একাকিনীর সহিত রমণ করিতে ভালবাসে। সহচরীকেও হৃদয়ের ভালবাসা দেখাইতে চাহে না, প্রতিবেশী চক্ষু কর্ণ উকি মারিলেই সে ঘোমটা টানিয়া কুলবধূর মত মনে মুখে ভিন্ন হইয়া বসে। তার মনের কথা মুখে ফুটে না, সাধ্য কি চোখের কাছে গল্প শুনিয়া তাহার ভালবাসার গাঢ়তা অনুভব করিতে পারিবে। চোখে যাহা ফুটে না, প্রতিকৃতিতে তাহা মিলিবে, মানুষের কি দুরাশা! সুতরাং স্বপ্ন অপেক্ষা জীবন উজ্জ্বলতর বলিয়া একটা খামখেয়ালি রেখা টানা বিজ্ঞান সঙ্গত নহে।

স্বপ্ন অসঙ্গত-জীবন-সঙ্গতি-সম্পন্ন এ কথাই কি সত্য? চোখের কাছে হাতের উপর ধরি ধরি করি ধরিতে পারিনা ত। যখন ভাবি ধরিলাম,হাত খুলিয়া দেখি শূন্য মুষ্টি, হাতের ভিতর কিছুই নাই। নির্দ্দয় হৃদয় কবাটে আবদ্ধ করিলাম, বাতাস হইয়া উড়িয়া গেল। সুন্দর বলিয়া বনে, পথে, মরুপ্রান্তরে অনুসরণ করিলাম, নিকটে যাইয়া দেখি কুরূপা রাক্ষসী। জীবনে সত্য কোথায়? মস্তিষ্কে বুদ্ধি কোথায়? হৃদয়ে শোণিত কোথায়? আর ঐ যে সাঁঝের আকাশে পাখীর স্বপ্নের মত কি একটা স্বর কাণে স্পর্শ করিল, ওটা কি সত্য? ঐ যে ছায়াময়ী দেবতা কল্পনার অতীত,

"তুলিতে তুলিতে নারে" ঐ যে কি যেন কিছু, কথার অতীত কল্পনার অতীত কবিতার অতীত, গানের রাগিণী ফুলের সুষমা, জোছনার ছায়া, সৌরভের প্রাণ ঐ যে কিছু বুকের ভিতর কেমন করিয়া পশিল—স্বপ্নেও যা ভাবি নাই—এও কি সত্য? ইহাও যদি সত্য হয়, জীবন কি স্বপ্ন অপেক্ষা অল্প অসঙ্গত? জাগন্ত চোখে ঘুমের ঘোর, চন্দ্রিকায় বজ্রপাত, পশ্চিমে সূর্য্যোদয় জীবনে কি ঘটে না? ওথেলোর দেসদিমোনা, রাধিকার আয়ান ঘোষ, দরিদ্রের রত্ন লাভ, কৃপণের তুলা দান, কুসুমে কীট, কমলে কণ্টক, চন্দ্রে তাপ, হারে সর্প, অমৃতে গরল, ইহা জীবনের নিত্য ঘটনা। স্বপ্নে অযাচিত রত্ন লাভ, জীবনে অসম্ভব সম্ভাবনা, স্বপ্নে কতবার উঠি কতবার পড়ি, জীবন চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে, যাহা ধরিতে একান্ত বাসনা স্বপ্নে ধরিতে দৌড়াইলে পদে পদে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাই, এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না, জীবনে ধরি ধরি করি ধরা হয় না—মরীচিকার মত উপহাস করিয়া চলিয়া যায়, কত গভীর আশা দীর্ঘনিশ্বাসে পরিণত হইল, আপনার হইয়া আপনার হইল না, নবনীত পাষাণ হইল, কুসুম শুখাইল, হিমাচল টলিল, বজ্র ছারখার হইল। স্বপ্ন বা জীবন, অধিক অসঙ্গত, অধিক অযুক্ত কে? পর আপন হয় আপনার পর হয়, স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। আলো আঁধার, অসম সমবায়—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। পণ্ডিতের মূর্খতা, মূর্খের পাণ্ডিত্য, দরিদ্রের ধন, ধনবানের দুঃখ, অভাগার ভাগ্য, ভাগ্যবানের সর্ব্বনাশ, দূরের নৈকট্য, নিকটের দূরত্ব—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। দেবতার গলায় হাতির মুণ্ড, হরিহর, কৃষ্ণকালী, বামনের চন্দ্র লাভ, চন্দ্রের কলঙ্ক—স্বপ্নেও যেমন জীবনে ও তেমনি। মানুষ দেবতা হয়, দেবতা পশু হয়, বাহিরের যাহা ভিতরে আসে, ভিতরের যাহা উড়িয়া যায়—স্বপ্নেও যেমন জীবনে তেমনি। জীবন দীর্ঘ স্বপ্নমাত্র, স্বপ্ন ক্ষুদ্র জীবন মাত্র।

স্বপ্ন নিদ্রাবস্থায় ঘটে। কিন্তু জীবনে জাগিয়া কয় জন? আলসাঙ্কারের মত সকলেই জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছে, কাচের ঝুড়ি পায়ের কাছে রাখিয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছে, তেলের কলসী মাথায় করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিতেছে, জামাজোড়া পরিয়া যে নিদ্রিত তাহার সঙ্গে যে জাগ্রত তাহার কোন প্রভেদ নাই। সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন ফুটে না, না ঘুম না জাগরণ এমনি গোধূলি ক্ষণে—এমনি তন্দ্রাবস্থায় লোকে স্বপ্ন

দেখে, সকলেরই জীবন এমনি তন্দ্রাগত। এক একবার ধাক্কা খাইলে জাগিয়া উঠে, আবার চোখ চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। সকল অঙ্গ কাহারই খেলে না, সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন কাহারই ঘটে না। একটী জাগিয়া আছে ত, আর একটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জলে ইট পড়িলে যেমন ঢেউ উঠে, এক একবার বাহিরের কোন আকর্ষণ ঘটিলে, আঘাত মিলিলে জীবন জীবন্ত হয়; নতুবা যে নিদ্রা সেই নিদ্রা। জাগ্রত হইলে স্বপ্ন ঘুচিয়া যায়, জাগ্রত হইলে জীবন আর এমনটী থাকে না। তন্দ্রাবস্থায় যখন একটী ইন্দ্রিয় মুদিত আর একটী জাগিয়া থাকে, তখন লোকে স্বপ্ন দেখে, বাহিরের শব্দে বাহিরের আঘাতে স্বপ্নের উদয় হয়। নতুবা জীবনে বুদ্ধি যেমন খেলে, স্বপ্নেও তেমনি খেলে। জীবনে ভাবের প্রাবল্য যেমন, স্বপ্নেও তেমনি। বরং স্বপ্নে যেমন প্রাণ ভরিয়া কাঁদা যায়, দিনের বেলায় লোকের চোখের সামনে তেমন মন খুলিয়া কাঁদিতে পারা যায় না, যেন লজ্জা করে। কাহাকেও দুর্ব্বলতা দেখাইতে কেহ ইচ্ছা করে না, এইটী মানুষের দুর্ব্বলতা। স্বপ্নে মানুষের এই মনুষ্যত্বটুকু ঘুচিয়া যায়। স্বপ্নে কত যন্ত্রণা পাই, কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ফাটিয়া যায়, বিপদ এড়াইয়া পলাইতে পারি না। তবু ঘুম ভাঙ্গে না, আর এক জন আসিয়া ধাক্কা মারিয়া না চিয়াইয়া দিলে জাগি না। এ জীবনের অনন্ত তুষানলে সকলে দগ্ধ হইতেছি, তবু জীবন ছাড়িতে পারি না, আর এক জন আসিয়া না ভাঙ্গাইয়া দিলে এ মোহ ভাঙ্গে না। স্বপ্নের ন্যায় জীবনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পট পরিবর্ত্তন হইতেছে, বালু-ঘড়ির বালুর মত সর সর করিয়া সব সরিয়া যাইতেছে, মোহনভোগ অন্তর্হিত হইল, যাহা কিছু অখাদ্য তাহাই মাত্র পড়িয়া রহিল; তবু মোহ ভাঙ্গিতেছে না, কবে সে আসিবে যে এ মোহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে?

যে জ্ঞানী সেই একমাত্র জাগ্রত। সে স্বপ্ন ও জীবনের অতীত। উভয়কেই মায়ার লীলা বলিয়া সে বুঝিয়াছে, উভয়কেই সে পরিহাস করিয়াছে। সে স্বর্গবাসী।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

আমিষ ভক্ষণ।

(প্রথম প্রস্তাব)

মানব শরীরের পূরণ ও বর্দ্ধনের নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন। শারীরিক বিবিধ প্রকার ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের শরীর নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই ক্ষয়াংশ পূরণের জন্য শোণিতের আবশ্যক, এই শোণিত আবার আহারীয় বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং শরীরের ক্ষতিপূরণের জন্য মূলে খাদ্যেরই প্রয়োজন। আহার্য্য বস্তু একদিকে যেমন দেহের ক্ষয়াংশ পূরণ করে, অপরদিকে সেইরূপ ইহার পরিবর্দ্ধনের পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে। প্রকৃত খাদ্যের দ্বারা আর একটী কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহা দ্বারা মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করে। কিন্তু ইহাতেও মানবীয় খাদ্যের প্রকৃত লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল না, কেননা জড়পরমাণুপুঞ্জে গঠিত ক্ষণবিনাশশীল শরীরেতেই মনুষ্যের পরিসমাপ্তি নহে, শরীর ভিন্নও এমন কতকগুলি উচ্চতর মহত্তর পদার্থ মনুষ্যের আছে, যে সকলের উপরে মনুষ্যের মানুষিকতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তাহা হইলে কেবল শরীরের উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি সাধনই যথেষ্ট নহে। শরীরের বলাধান ও বর্দ্ধন সাধন যেরূপ আবশ্যক, মনের নির্ম্মলতা ও উৎকর্ষ বিধানও সেইরূপ আবশ্যক। এবং শরীর ও মন উভয়ে পরস্পর একটী সূক্ষ্ম অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে নিবদ্ধ, তাহাও বোধ হয়, সকলেই জানেন। তবে এখন পরিষ্কাররূপে প্রতীতি হইতেছে যে, সেই সকল পদার্থ মনুষ্যের যথার্থ ভক্ষ্য পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য, যদ্দ্বারা দেহ মন এ উভয়েরই উন্নতি এবং কল্যাণ বিধান হইতে পারে। মানবীয় খাদ্যের লক্ষণ কি কি তাহা জানা গেল। আমরা এই সকল লক্ষণের ভিতর দিয়া আমিষ ভক্ষণের বৈধতা ও অবৈধতা বিচারে প্রবৃত্ত হইব। আমিষ ভক্ষণের বৈধতাপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, অগ্রে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

১ম—মৎস্য এবং মাংসকে অনেকে বলকর বস্তু বলিয়া উল্লেখ করেন। মৎস্যমাংসে শরীরে বল হয়, অতএব বলসঞ্চারের জন্য ঐ সকল খাওয়া উচিত। মৎস্যমাংসে যে বলকারিতা শক্তি একেবারেই নাই, এ কথা কখন

বলি না। কিন্তু ফল শস্য প্রভৃতি নিরামিষ পদার্থের মধ্যে ঐ শক্তি অধিকতর রূপে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রমাণ নিরামিষভোজীদিগের শরীর। মাংসাহারী সিংহ শার্দ্দূল অপেক্ষা তৃণশস্যভোজী হস্তী এবং গণ্ডারের দৈহিক শক্তি অনেক পরিমাণে অধিক, এ কথা বোধহয় সকলেই স্বীকার করিবেন। তৃণশস্যাহারী অশ্ব গবাদির শারীরিক শক্তিও সামান্য নহে, অনেক মাংসাদ পশু অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক। তারপর মনুষ্যজাতির মধ্যে যদ্যপি অন্বেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় নিরামিষাশী জাতিরাই শক্তি সামর্থ্যে আমিষভোজীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। কে না জানেন যে, মৎস্যপ্রাণ্‌বাঙ্গালীদিগের অপেক্ষা নিরামিষভোজী উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকেরা সামর্থ্যতে অগ্রগণ্য। কেবল সামর্থ্য নহে, সাহসিকতা ও দৃঢ়তা পক্ষেও তাহারা শ্রেষ্ঠ। অনেক আমিষভোজীরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেন, ইংরাজজাতি যে এত বলশালী তাহার কারণ কেবল তাহারা মাংস ভক্ষণ করে, অতএব ভীরুস্বভাব দুর্ব্বল বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে মৎস্যমাংসের প্রচলন না হইলে, এই হতভাগিনী জন্মভূমির উদ্ধারের আর আশা নাই। এ কথা নিতান্ত অসার, কারণ তাহাদিগের দেখা উচিত যে ইংরাজজাতির পার্শ্বস্থিত প্রতিবেশী স্বরূপ আইরিসদিগের অবস্থা কিরূপ। গোলআলু ইহাদিগের প্রধান ভক্ষ্য বস্তু, কিন্তু দৈহিক বলাংশে ইহারা ইংরাজ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে প্রত্যুত শ্রেষ্ঠতর। সামরিক জাতিদিগের মধ্যে যদ্যপি অন্বেষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও এইরূপ দেখা যাইবে। থার্ম্মপলির প্রসিদ্ধ সংগ্রামে যে সকল স্পার্টানেরা লোকাতীত অদ্ভুত বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন দ্বারা জয়লাভ করিয়া ইতিহাসপৃষ্ঠে যশের সুবর্ণময় রেখা সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহা স্থির হইয়াছে যে, সেই সকল বীরাগ্রগণ্য স্পার্টানেরা নিরামিষভোজী ছিলেন। এইরূপ আরও শত শত নিদর্শন প্রদর্শিত হইতে পারে, যদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, আমিষ ভক্ষণ অপেক্ষা নিরামিষ ভোজনে বীর্য্য ও সামর্থ্য বিধান করে। যদ্যপি পরীক্ষা করিয়া জানিতে চাও, তবে দুই জন ব্যক্তির মধ্যে এক জনকে মৎস্যমাংস এবং অপর জনকে ফলশস্য প্রভৃতি নিরামিষ দ্রব্য আহার করিতে দাও এবং উভয়কে নিয়মিত অবস্থায় রাখিয়া দাও, দেখিবে শক্তি সম্বন্ধে কে অগ্রসর হয়। ইহাত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, তৃণশস্যাহারী সামান্য বানর এবং বনমানুষেরা অনেক মাংসাদ প্রকাণ্ড পশু অপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। তবে কিরূপে বলিতে পারেন যে নিরামিষ ভোজনে শক্তি সঞ্চার হয় না?

২য়—কেহ কেহ বলেন আমিষ ভোজন যদ্যপি অস্বাভাবিক হইবে, তবে মৎস্যমাংস আহার করিলে, তাহা পরিপাক হয় কেন? যখন ইহা পরিপাক হইতেছে, তখন ইহা স্বাভাবিক খাদ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহা অভ্যাসগত বলিয়া স্থির হয়। যে পশু তৃণলতাভোজী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিছু দিন তাহাকে মাংস খাইতে দিয়া দেখা গিয়াছে, মাংসই তাহার স্বাভাবিক খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একজন সাহেব একবার একটী বনমানুষ পুষিয়াছিলেন, বনমানুষেরা ফলশস্যাহারী প্রাণী; কিন্তু তাহার প্রভু তাহাকে ফলশস্য খাইতে না দিয়া আপনার খাদ্য মাংস, রুটি ও চা প্রদান করিতেন। সে প্রতিদিন প্রভুর সঙ্গে বসিয়া ঐরূপ আহার করিত, শেষে তাহার স্বভাব এরূপ হইয়া গেল, যে, রুটি এবং মাংস না হইলে কোন রূপেই চলিত না। পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি আছে, যাহারা মনুষ্যের সম্পূর্ণ অভোজ্যস্বরূপ মৃত্তিকা, কীট প্রভৃতি পদার্থ খাইয়া জীবনধারণ করে। তবে কি বলিতে পারেন, যে, মৃত্তিকা এবং কীটই মনুষ্যের প্রকৃত খাদ্য? সুতরাং মাংস পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় বলিয়া তাহা কখন স্বাভাবিক খাদ্য মধ্যে গৃহীত হইতে পারে না।

৩য়—অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, বাঙ্গালীরা যে বুদ্ধিমান্ জাতি, তাহার কারণ তাহারা মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। মৎস্যে ফস্‌ফরস্ আছে এবং ফস্‌ফরসের দ্বারা মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধন হইয়া থাকে। সুতরাং মৎস্যাহার দ্বারা বুদ্ধিশক্তির উন্নতি হওয়া সম্ভব। মৎস্যের মধ্যে যে ফস্‌ফরস্ নাই একথা আমরা বলি না। যদ্যপি কেবল ফস্‌ফরসের অনুরোধেই মৎস্যাহার করা বিধেয় হয়, তবে মৎস্যাহার না করিলেও তাহা হইতে পারে। অনেক শস্যের ভিতরে মস্তিষ্কের এই পুষ্টিসাধক অংশ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। এবং তাহা ভক্ষণ করিলে মস্তিষ্কের এই কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। মস্তিষ্কের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যখন অপরাপর পদার্থ সঞ্চিত রহিয়াছে; তখন সেই সকল পদার্থ দ্বারা বুদ্ধিকে উজ্জ্বল এবং বিকসিত করা উচিত, না একটী হিতের অন্বেষণ করিতে গিয়া, আর পাঁচটী অহিতকে ডাকিয়া আনা উচিত? মৎস্য

ভোজনে মস্তিষ্কের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আরও অনেক অনিষ্ট উপস্থিত হয়; সুতরাং তাহার ব্যবহার অযুক্তিযুক্ত। এখন দেখিতে হইবে আমিষ ভক্ষণে কি কি অপকার উপস্থিত হয়। প্রথম—আমিষ ভক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। মৎস্য মাংস কামোদ্দীপক পদার্থ সেই জন্য বিধবাগণের খাদ্য নির্দ্দেশ স্থলে ইহা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, পাছে কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় তাহাদিগকে ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া দেয়। কেবল কাম রিপু কেন, ইহা দ্বারা মনুষ্যের ক্রোধ, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি অপরাপর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল বলবতী হইয়া উঠে। মাংসাশী জাতির প্রকৃতির সহিত নিরামিষাশীদিগের প্রকৃতির তুলনা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যায়। অসভ্য বর্ব্বর জাতি যে নিরন্তর বিবাদ, বিসম্বাদ ও কলহে প্রবৃত্ত তাহার প্রধান কারণ মাংস ভক্ষণ। শ্মশানবিহারী শৃগাল কুক্কুরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই এ বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। শ্মশানভূমিতে যে সকল শব নিক্ষিপ্ত হয়, এই শৃগাল কুক্কুরেরা তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে, সুতরাং ইহাদিগের প্রকৃতি, গ্রাম্য কুক্কুর শৃগালের প্রকৃতি হইতে অধিকতর উগ্র, হিংস্র এবং কোপন। এই হিংস্রতা ও কোপনস্বভাবের মূল মাংসাহার বই আর কিছুই নহে। ব্যাঘ্র জাতির যে ভয়াবহ হিংস্রতা এবং জিঘাংসুতা তাহারও কারণ কেবল মাংসভোজন। বিলাতে একজন সাহেব একটী ব্যাঘ্রশাবক পুষিয়াছিলেন, তিনি সেই ব্যাঘ্র শিশুটিকে প্রথম হইতে মাংসাহার করিতে না দিয়া কেবল ফলশস্য খাইতে দিতেন। এইরূপে ব্যাঘ্রশাবকটী যখন পূর্ণবয়স্ক হইয়া উঠিল, তখন তাহার প্রভু তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন, সে নিরীহ ও শান্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, অথচ কাহার প্রতি কোনরূপ হিংসাভাব দেখাইত না। তাহার প্রকৃতির এই যে সম্পূর্ণ বিপর্য্যয়ের পরিবর্ত্তনের ভাব কোথা হইতে আসিল? ইহা যখন প্রত্যক্ষ ব্যাপার, তখন মৎস্য মাংসাহার দ্বারা সকল অনর্থ এবং অধোগতির কারণ স্বরূপ কাম, ক্রোধ, হিংসা জিঘাংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি পুঞ্জকে বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত হইতে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ—ইহা দ্বারা চিত্তের চঞ্চলতা এবং অশান্তিভাব উপস্থিত হয়। এরূপ হওয়াইত সম্ভব, কেননা মনের কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত এবং বল-

বতী হইলে কি চিত্ত কখন সুস্থির এবং শান্ত থাকিতে পারে? নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল তেজস্বিনী হইলে মনকে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত ও অস্থির করিয়া তোলে, সুতরাং এরূপ অবস্থায় মনের সংযম এবং বুদ্ধির স্থৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা কোন সূক্ষ্ম গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিতে পারা যায় না। আমিষ ভক্ষণ কামাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উদ্দীপক, সেই জন্যই চিত্তের একাগ্রতা এবং স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে হইলে, সম্পূর্ণরূপে ইহা বর্জ্জন করা বিধেয়। সেই কারণ পিথাগোরস্, সক্রেটিস্, প্লেটো প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাশীল দার্শনিকেরা আমিষ ভোজনে বিরত ছিলেন। মহাত্মা সার আইজক নিউটন বলিয়াছিলেন যে, আমি কোন গুরুতর তত্ত্বের আলোচনার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে চিত্তের স্থিরতার জন্য আমিষাহার পরিত্যাগ করিতাম। বিলাত প্রত্যাগত কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি যে, আধুনিক দর্শনবেত্তা স্পেনসার সাহেবও কোন গভীর বিষয়ে মনোনিবেশের পূর্ব্বে এইরূপ করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশ মধ্যে যদ্যপি অন্বেষণ করি, তাহা হইলেও ইহাই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণ জাতির মস্তিষ্ক ভারতের কি সনাতন ব্রহ্মবিদ্যা, কি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, কি গণিত, কি দর্শন, কি মনোবিজ্ঞান সকল প্রকার জ্ঞানেরই উদ্ভাবক স্বরূপ। মস্তিষ্কের এইরূপ তীক্ষ্ণতা এবং সারবত্তার প্রধান কারণ নিরামিষ ভক্ষণ। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ও ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ ফল, মূল প্রভৃতি সামান্য আহার দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। এইরূপে সকল স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, নিরামিষ ভোজনের দ্বারা ফল, শস্য, আহারের দ্বারা মানসিক বৃত্তি সকল শান্ত ও মাধুর্য্যসম্পন্ন হয়, এবং মনের এইরূপ অবস্থাই জ্ঞান ও ধর্ম্ম পর্য্যালোচনার অনুকূল। অতএব আমিষ ভক্ষণের দ্বারা যদ্যপি অন্তরের দুর্দ্দান্ত রিপু সকলের প্রভাব খর্ব্ব না হইয়া উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং তন্নিবন্ধন জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার ঘোর অন্তরায় স্বরূপ মানসিক অশান্তি এবং অস্থিরতা উপস্থিত হইয়া চিত্তকে অধোগতির দিকে লইয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বর্জ্জন করা কি নিতান্ত কর্ত্তব্য নয়? মৎস্য মাংসাহারে——বিশেষতঃ বাঙ্গালী আমরা যে প্রকার মৎস্য এবং মাংস আহার করিয়া থাকি তাহাতে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হইবার বিশেষ সম্ভবনা। মৎস্য এবং যে সকল পশুর মাংস আমরা ভক্ষণ করি, তাহার যদি কোন প্রকার পীড়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই পীড়া অল্পাধিক

পরিমাণে আমাদের শরীরে অণুপ্রবিষ্ট হইবে। আমিষ ভক্ষণের পূর্ব্বে কেহই কি তাহা উপযুক্তরূপ পরীক্ষা করিয়া থাকেন? মৎস্য অত্যন্ত পচা এবং খাদ্য জন্তু বাহ্যিক রোগা না হইলেই যথেষ্ট। প্রকৃত খাদ্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, আমিষ পদার্থে তাহা নাই; সুতরাং মৎস্য মাংস মানবীয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। *

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতি।

ও প্রকৃতি! সর্ব্বোপরি সিংহাসন তব,
অত্যদ্ভুত! বিছিয়াছ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
নীলীম নভের গায় নক্ষত্র নিকরে,
খচি অতি পরিপাটি করি, মনোহর!
বসিয়াছ তাতে তবে পরিয়া বিবিধ
বরণ রতন ভূষা কৌমুদী আতপ
বিদ্যুত অরুরা আদি অতি সমুজ্জ্বল,
গাঁথি চিত্র মেঘবস্ত্র ধারে থরে থরে
আঁচলে কোণায় মাঝে নানাবর্ণ শোভা
সুমন্দ সমীর ভরে উড়াই' চৌদিক।
দুলিতেছে পদতলে তায় বসুন্ধরা
রোমাইয়া পাতালতা কুসুমের দামে
হরিত মখ্‌মল যেন খচিত কারুতে।
অহ! কি মোহিনী তব অনন্ত মূরতি!
অসীম বসন ভূষা সম্পদ আসন!
মহিয়াছ ছড়াইয়া অগাধ শরীরে
ব্যাপী অনবধি; কোথা ওজস্বী গভীর,
কোথা বা তরল কান্ত, কোথা অতি ভীম
ভয়ানক, কোথা শান্ত, স্নিগ্ধ বা কোথায়,
কোথা বা বলের ভরে প্রকট হইয়া
দেখাইছ অসুরের বীর্য্য, কোন খানে
বিযোজন কাজে হই দুরিত শটিত
প্রকাশিছ বীভৎসের ভাব, কোথা উগ্র
ময়ূখ-মালায় বর্ষি খরতাপ ধারা
প্রচারিছ রৌদ্রমূর্ত্তি তাপাইয়া মরু।
হেরি তোমা যবে অই হিমাদ্রি-মুকুটে
অম্বর চুম্বিত তব তুষার টোপরে
থির অত্যুন্নত, কিম্বা অতি সুবিস্তৃত
অম্বুনিধি বুকে এই লহরী লীলায়
দেখি আঘাতিতে কভু দিগ্বলয় তনু;
হয় এ চঞ্চল মন অমনি নিশ্চল
ওজস্বী প্রভায় তব, স্পর্শি বিশালতা।

* বিষয়টী গুরুতর। অনেক ধার্ম্মিক মহাত্মা আমিষাদি ভক্ষণ করিয়াও ধর্ম্মজগতের উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের মহর্ষিরা আমীষভোজী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। আমিষ ভক্ষণাদির সহিত যে ধর্ম্মের তত গূঢ় সম্বন্ধ আছে; ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে আজও তাহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রমাণিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত আমিষ ভক্ষণে বৈজ্ঞানিক উপকারাপকারিতা ও প্রয়োজনাপ্রয়োজনতা কতদূর আছে না আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ জ্ঞান নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কেহ এ সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিলে, আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।——আ: সং।

আবার যে কালে তোমা নিরখি নিকুঞ্জে
গিরি-কোলে প্রস্রবণ-ধারে সুনিভৃতে
খুলিতে আনন শোভা উজ্জ্বল শ্যামল
আড়ালে লোকের, কিম্বা দেখি বসিবারে
নোয়াই' সে মুখপট প্রতিবিম্বাইয়া
দর্পণ সদৃশ-স্বচ্ছ প্রবাহ স্ফটিকে,
অথবা শুনি এ কাণে শুয়ে তরুতলে
সুমন্দ সমীরে স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায়
তব কণ্ঠ পক্ষিগলে নির্ঝর ঝঙ্কারে
সুকরুণ সুমধুর, যাই তবে গলি
পরশি সে মধুমাখা লাবণ্যের স্রোত।
যাই তবে ভুলি দুঃখ ভাবনা যন্ত্রণা,
ছায় আসি প্রণয়ের মূর্ত্তি কল্পনায়
চারি দিক্ হতে, যেন দেখায় সে মায়া
প্রেমই কেবল সার সব প্রেমময়।
কিন্তু যবে দেখি পুন তোমারে ওনভে
অসংখ্য গ্রহ ও কেতু তারার মালায়
রবি শশি মাঝে, কভু উল্কা-বৃষ্টিরূপ
মহান্ অদ্ভুত কাণ্ডে ঘূর্ণিতে চৌদিক
তাড়াইয়া বিশ্বপুঞ্জ বিশ্বপুঞ্জ পিছে,
রেণু রেণু উড়াইয়া বলের আঘাতে
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ স্ফুলিঙ্গ সমান
সংখ্যাতীত দশদিশি অগাধ অসীমে,
কবলিয়া বিশালতা বৈপুল্য দূরত্বে,
দূরত্বে দূরত্ব পুন, আকাশে আকাশ
অবধিরে অনবধিগ্রাসে, সংখ্যা অসংখ্যায়,
ডুবি যাই তবে আমি হেরি এ সকল
সে অনন্তে সুবিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া
নই মম যতরূপ সুখদুঃখ কথা,
অস্তিত্ব, আলয় এই অবনী কণিকা।
যায় মিশাইয়া সব এ সূর্য্য এ গ্রহ
বুধ চন্দ্র ভৃগু গুরু কুজ শনৈশ্চর
এ সৌরজগৎ লই তার যত কিছু
সে অসীমে তার সেই অনন্ত বিশালে
অগাধে অপরিমেয়ে অসংখ্য সংখ্যায়।
নাহি পড়ে অন্য দৃষ্টি এ চক্ষে তখন।
উড়ি আমি, উড়ে মম এই ধরাতল
লই এর যত কিছু গৌরব সম্ভার
লব লেশ হই সেই অনন্ত বিস্তারে;
যাই হারাইয়া শেষ কোথা যে না জানি।
নিরখি যে দিকে তোমা হেরি সেই দিকে
সেই অংশে সেই অঙ্গে পর্য্যাপ্ত প্রচুর।
হয় যবে তব কোন স্থূল অংশকণা
সুবিভাজ্য এই মম সুদুর্ব্বল করে
কিম্বা মম অপূর্ণ এ শস্ত্র যন্ত্রাঘাতে,
দেখে তোমা তখনো এ অণুবীন মম;
কিন্তু স্থূল অবয়বে। পারে না কর্ত্তিতে
করি ছোট এ কলের বল তারে আর।
যায় এড়াইয়া মম বল কল যত
সে রেণুক; ধরে তারে সংদংশে শিরার
অতি সূক্ষ্ম ঘিলুতন্তু আমার তখন;
লইয়া কল্পনা-রাজ্যে ভাবনা-মূষলে
ভাঙ্গে তারে পুন আরো করি খণ্ড খণ্ড;
লাগায় তাহাতে শেষ আকৃতি বিস্তৃতি
স্থিতি স্থাপকতা আদি যত জড়গুণ;
ভাঙ্গে তারে আরবার সূক্ষ্মভাবনায়,
ভাঙ্গে পুন, তবু দেখে তলা ও উপর
সে পরমাণুতে, তবে চিড়ে মধ্য দিয়া,
চিড়ে তারে আরবার খসাই পড়ল
পাত পাত করি, শেষে যায় সে মিশাই'
সূক্ষ্ম নিরাকার লোকে, এড়াই আমার
এই ভাবনার কল; আর নাহি পারি
ধরিতে তাহারে সেই অস্পৃশ্য জগতে।
কিন্তু যদি কোনবার মিশিতে তাহায়
না দেয় সুসূক্ষ্মতন্ত্র কল্পনার মম
রাখে তারে তথাপিও ধরিয়া আয়াসে,
খসাইতে আরো যত পড়ল তাহার,
ধরে সে অনন্ত মূর্ত্তি খসনে তখন;

খসে সে অনন্তকাল কল্পনার করে
স্তরে স্তরে ক্লান্ত করি, তবু না ফুরায়।
প্রবেশে সে পরমাণু অনন্তেতে শেষ
ধরিয়া অসীমাকৃতি হয় উপনীত
আসি তবে অন্তরস্থ চক্ষুর সম্মুখে।
আহা! যেই দিকে আমি যাই ধরিবারে
কি বৃহতে কিবা ক্ষুদ্রে তোমার শরীর
গ্রাসি আসি সেই দিকে অনন্ত সাগর
নেয় ভাসাইয়া মোরে তাহার তরঙ্গে।
স্থূল ভাবি দৌড়ি পিছু হও সূক্ষ্মে লয়,
সূক্ষ্মের তল্লাসে তোমা দেখি স্থূলময়।
স্থূল সূক্ষ্ম নাম এ যে প্রদত্ত আমারি
উৎপত্তি হইল মনে নাহি জানিবার
আসল তোমার রূপ অবস্থা তোমার।
এই যে চেতনরূপী সূক্ষ্ম বস্তুরাশি
বিভাতিছে জঙ্গমের শরীর আশ্রিয়া—
বিভাতয়ে উত্তেজিত অয়ের শরীরে
ঘর্ষণে মথনে যথা তাপ, তাপে তেজ,
জানি না সে কি পদার্থ। সে কি ভিন্ন কিছু?
অথবা পদার্থগত অবস্থার ভেদ?
অহ! এ চেতনে পুন মনের বিকাশ,
আরো যে জটীল সূক্ষ্ম! চিন্তার অতীত!
এই যে মনের ক্রিয়া এ সকল কথা
বাহিরিছে এই মাত্র মস্তিষ্ক হইতে
পাইয়া চিন্তায় স্পর্শ তোমার তনুর
তৌলিছে সম্বন্ধ যত পদার্থ নিকরে,
কি বিস্ময়কর এর কায়ার কৌশল
থাকে যদি কায়া কোন পৃথক ইহার!।
পাই না যে কোন অংশে তোমারে লাগাল
কোন দিকে, তুমি মোর নও প্রাপনীয়।
তবে যারে কৃপাবলে মস্তিষ্ক শিরায়
প্রের বুদ্ধিবল, দেও দৃষ্টি-খরশাণ
দেখিতে তোমার গায়ে পথছিদ্র যত,
আস তার বশে তুমি অতি সলাকারে।
ধরে সে তখন তোমা অংশে প্রত্যঙ্গেতে,
দেও খুলি তারে তব রত্নের আকর,
কোষগৃহ, চিত্রশালা, ভাণ্ডার আগার,
প্রভূত শকতিরাশি যত সে অংশের।
শোও তার কোলে লই সে প্রভূত বল
শিশু করে অতি শান্ত মেষশিশু যথা।
বিতর তাহারে যত সৌভাগ্য সম্পদ
আরাম আনন্দ যাহা বহে উপভোগে।
সংসারের বস্তুচয় মনুষ্যের লাগি।
থাক সেই ভক্তাধীনে ভৃত্যের সমান
সেবয়ে সে যতকাল যতনে তোমায়,
সাবধানে সমাদরে মনোযোগ সহ;
কিন্তু হলে ত্রুটী কোথা নাহিক মার্জ্জনা
কর তারে সেই বলে বিচূর্ণ অমনি
অসাবধানতা পাপে। আহা! দেও মোরে
ও প্রকৃতি! সেই দৃষ্টি, সরাই আঁধার
এ চক্ষের মম আজি। সাজাও কৃপায়
এ মনের গৃহ তবে সম্পদ রাশিতে,
কিম্বা তব যত অই ক্রিয়া কাণ্ড জাত
দুরায়াত্ত মহামূল্য জ্ঞানের আলোকে।
তোল টানি ঐ আকাশে অদভুত দেশে
ছাড়াইয়া পশু পক্ষী কৃমি কীট তল
আহা! যথা যন্ত্রসম তব এ শরীরে
এ জঙ্গম পালসহ সাধিছি কি কায,
কি যে তার অভিপ্রায় কিছুই না জানি।
তোল টানি অই খানে দেও দেখিবারে
কিরূপ ওলোক সব; আছে কি তথাও
কোনরূপ প্রাণ? সেই প্রাণের যাতনা?
প্রকাশহ মোরে ফাল গতির নিয়ম
দূরত্ব, স্বরূপ, যত জ্যোতিষ্ক পিণ্ডের
দেও শক্তি মাপিবারে ঐ অগাধতম
প্রদীপ্ত বিন্দুতে যাহা বিরল চিহ্নিত।
করি আলো আমার এ তিমিরাঙ্গ পথ
নেও ঐ খনিজস্তরে বসুধার গায়

দিয়া অধিকার ওতে আন পরিচয়ে
উহার রতন-কোষ। করাও প্রবেশ
অবশেষ আমারে ঐ উদ্ভিদ জগতে
প্রফুল্ল সাম্রাজ্যে তার সুরভি বৈভবে
খুলি গুণাগুণ যত নিহিত লুকান
শাখা পত্র মূল গর্ভে রসতন্তু বীজে।
নেও শেষ সর্ব্বোপরি সৃষ্টির সোপানে
অতীব জটীল অই জন্তুরাজ্যে তব।
উচ্চতম তা হতেও দেশে অবশেষে
করাও প্রবেশ সেই মানস জগতে
খুলিয়া বিচিত্র তার চিন্তারঙ্গভূমি
চঞ্চল ভাবনাজাল, কল্পনার পট,
রিপু প্রবৃত্তির যত সুবিমিশ্র কেলি
সুবিরোধী অবিরাম পরিবর্ত্তশীল।
দেখাও তাহাতে যদি থাকে কোন জ্ঞান
শায়িত এরূপ যাতে জানা যায় তব
কিম্বা পড়া যায় এই ব্রহ্মাণ্ড পুথির
নিগূঢ় সমস্ত ভাঙ্গি প্রহেলির কূট।
রাখ খুলি আমার এ অতৃপ্ত নয়ন
স্থূল সূক্ষ্ম লঘু গুরু দীপ্ত তমোময়
তোমার অসীম গূঢ় সমৃদ্ধি নিচয়ে
তল্লাসে যাহার আহা! এ অনন্ত কাল
কিছু নয়! কোথা তবে মানুষের আয়ু?
নয় যদি উপযোগী এ দুর্ব্বল মন
কোন মতে পৌঁছিবারে তথা, কি লভিতে
সেই আকাঙ্ক্ষার ফল উপাদেয় অতি,
দেও স্থান তবে অই প্রচ্ছন্ন ছায়ায়
ঐ নিভৃতে মন্দ ভাগ্য এ মম তনুরে
ও তব আঁধারে আহা! থুইবারে এর,—
অযশে,—অপরিতুষ্ট নষ্ট রজমুঠি।
গাও শেষ সে নিদ্রার স্বপনের কাণে
করি কুল কুল অই প্রবাহ গলায়
অবিরাম সুবিমন্দ বাতে সুমধুর
ধীর ধীর বহি স্রোতে সুখে চিরন্তন।
তোমা হতে আরম্ভন তোমাতে সংস্থিতি
যত সব, হোক মোর এ মনের গাথা
তব অসীমত্বে আজি তোমাতেই শেষ।
যেন কোন কালে তব এ বিশাল ক্রোড়
শীতোষ্ণ কঠিন মৃদু পরশ ইহার
ভুলি কোথা কিম্বা ছাড়ি কোথা নাহি যাই
অন্যত্র কখনো সুখ তল্লাসে জীবনে,
যেন নাহি যায় নাহি যায় ত্যজি তব
এ প্রফুল্ল সুবিচিত্র অনন্ত বাগান
এ মন মধুপ মম অন্য উপবনে॥

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

রাধিকার প্রেম।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজে রাধিকা যেরূপ কলঙ্কিনী, বাস্তবিকই কি তিনি তত কলঙ্কের অধিকারিণী? আর কলঙ্কিনীই হউন আর যাহাই হউন, রাধিকা বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম মণি। রাধিকার প্রেমকাহিনী

বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পত্তি। বাঙ্গালীর দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান কিছুই নাই। তাহার বাহুবল, ধনবল, জ্ঞানবল, কিছুই নাই। কিছুই কখনও ছিল বলিয়াও বোধ হয় না। এ ছার বাঙ্গালী জীবনে যদি গৌরব করিবার কিছু থাকে, পূর্ব্বপুরুষগণের অলৌকিক কীর্ত্তি বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া ভিন্ন দেশীয় নরনারীকে সাহঙ্কারে যদি কিছু দেখাইবার থাকে, তাহা এই কবিত্বপূর্ণ, এই মাধুর্য্যপূর্ণ, এই তরঙ্গপূর্ণ, উন্মাদকারিণী অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনী। কৃষ্ণপ্রেম ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট। এই প্রেম-কাহিনীতে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র বিকসিত হইয়াছে। এই প্রেমে বঙ্গের শিরোরত্ন, বাঙ্গালীধর্ম্মের প্রধান সাধক, বাঙ্গালী-মনুষ্যত্বের প্রধান আদর্শ মহাপ্রভু চৈতন্যের জন্ম ও বৃদ্ধি। এই প্রেমের ছায়াতেই চৈতন্য-ধর্ম্মের শোভা ও মাধুর্য্য।

একদিন এই অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনীতে বাঙ্গালী-হৃদয়ের ধর্ম্মভাব ও ভক্তি-পিপাসা বৃদ্ধি পাইত; আর আজিও ইংরাজি শিক্ষায় যাহাদের স্বভাব-বিপর্য্যয় ঘটে নাই, সেই সকল সরল হৃদয়, কোমলমতি, বালস্বভাব কৃষক মণ্ডলী কৃষ্ণ-প্রেমের বর্ণনায় সরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু এ ভাব আর বেশী দিন থাকিবে না। বঙ্গের ধর্ম্ম বিশ্বাসের ইতিহাসে এক অভিনব পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবন আজ এক অভিনব বিপ্লবতরঙ্গে আন্দোলিত। বাঙ্গালীর নিকটে কৃষ্ণ-প্রেম আর ভগবদ্-প্রেমের আদর্শ হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, মানবসমাজের প্রেমের ইতিহাসে রাধিকার প্রেমের মত এত মধুর, এত সুন্দর প্রেমকাহিনী আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালী বৈষ্ণব-কবিদিগের কবিতায় প্রেমের যে গভীর ভাবোচ্ছাস আছে, কৃষ্ণ-প্রেমে প্রেমতত্ত্বের যে গভীর আলোচনা ও প্রেমের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে, এ জগতের অপর কোনও সাহিত্যে তাহা আছে কি না, বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

রাধিকার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে তাঁহার প্রেম কেবলই ইন্দ্রিয়-বিকার, কেবলই রূপজমোহ, কেবলই মাটির সাধ। কিন্তু রূপজমোহ কাহাকে বলি? আর তাহা কি এতই দূষণীয়? প্রথম দর্শনেই শ্যামের রূপ রাধার প্রাণে অঙ্কিত হইয়া গেল;—

"কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পাতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ॥"

সে ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া রাধা বলিলেন;—

"সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গুড়ি কৈল থেহা।
সে থেহা নিঙ্গুড়ি কেবা, মুখ বানাইল রে;—"

একে কি তুমি ইন্দ্রিয়বিকার বলিবে? ফার্ডিন্যাণ্ডকে প্রথম দেখিয়া মিরাণ্ডাই বা এর কম বলিয়াছিলেন কি?

"I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble."

মূলে সেই এক কথা;—

"এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।"

দুয়ে ভাষার প্রভেদ আছে, বাহিরের আবরণের প্রভেদ আছে; কিন্তু মূল ভাবের প্রভেদ নাই। রাধিকা বাঙ্গালীর মেয়ে, হিন্দু বালিকা; বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালী কবি; তাই মিরাণ্ডার যে চাঁচা ছোলা ভাষা; যে সভ্যতার ও শ্লীলতার আবরণ, রাধার তাহা নাই। শেক্ষপীরের যে বাক্‌চাতুর্য্য, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের তাহা নাই।

আর এ শারীরিক বর্ণনা, শরীরের এ রূপরাশি তো বস্তুতঃ শরীরের নহে। সৌন্দর্য্য মাটির পদার্থ নহে; রক্ত মাংসে তাহার জন্ম হয় না। তাহার জন্ম প্রাণের ভিতরে, প্রেমের সঙ্গে। প্রেম ও সৌন্দর্য্য যমজ ভ্রাতা; আলোক এবং ছায়ার মত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ। প্রেম আগে আগে চলে, সৌন্দর্য্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার কোমল পদানুশরণ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করে। শ্যামের যে এই সুধাময় রূপ, এই যে "ভুবন ভুলনী চাহনি"—ইহা তো শ্যামের শরীরের নহে। গঠন পারিপাট্যে কি আর গোকুল নগরে শ্যাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ ছিল না? রাধিকা তো বহুদিন যমুনার জলে গিয়াছিলেন; গোকুলের অনেক গোপালকেই তো দেখিয়া-

ছিলেন ; কিন্তু কখনও তো তাহাদের রূপে তাঁহার প্রাণে এমন দাগ পড়ে নাই। আজ এমন হইল কেন ? আজ যমুনার কূলে যাইতে তরুমূলে এই ত্রিভঙ্গ মূরতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ বিষম "বাড়ব অনল মাঝারে" আপনাকে ঢালিয়া দিল কেন ? এ গূঢ় রহস্য কে প্রকাশ করিবে ? এ গূঢ় মর্ম্ম কে জানে ? তুমি আমি তো এ গূঢ় রহস্যের কিছুই বুঝি না ; কিছুই ভেদ করিতে পারি না। "কালিয়া বরণে" এমন মাধুরী ; ত্রিভঙ্গ দাঁড়ানে এমন সৌন্দর্য্য, কোথা হইতে আসিল, তুমি আমি কল্পনা করিতে পারি না। রাধিকার চোখ দুটি যদি পাইতাম, তাঁহার প্রাণখানি যদি এ পোড়া প্রাণে একবার ধরিতে পারিতাম, তবে এ গূঢ় রহস্য কথঞ্চিৎ ভেদ করিলেও করিতে পারিতাম। তোমার আমার চোখে সে প্রেমের কাজল কৈ যে, কৃষ্ণের সে ভুবনমোহন রূপ দেখিব ? রাধিকার এ রূপজমোহকে ইন্দ্রিয়-বিকার, মাটির সাধ বলিয়া নিন্দা করিও না। তাঁহার প্রেমকে ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ-লালসা বলিয়া ঘৃণা করিও না। তুমি আমি তাহার মর্ম্ম কি বুঝিব ? দেশ্‌দিমনা ওথেলোর শরীরে কি দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন বুঝিতে পার কি ? ওথেলো কাফ্রি ; তাহার সেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার সেই স্থূল ওষ্ঠ, তাহার সেই কুঞ্চিত কেশ, এ সকলের ভিতরে কি এমন রূপের ছটা ছিল, জান কি ? কিন্তু দেশ্‌দিমনাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে কি মাধুরি ছিল, সেই কুঞ্চিত কেশে কি সৌন্দর্য্য ছিল, সেই স্থূলওষ্ঠে কি অমৃত বর্ষণ করিত !

"To fall in love with what she feared to look on."

এ রহস্য তুমি আমি কি ভেদ করিব ?

"My love doth so approve him

That even his stubbornness, his checks his frowns—

——have grace and favour in them."

ইহার মর্ম্ম তুমি আমি কি বুঝিব ? দেশ্‌দিমনার এ কি রূপ-লালসা ?—এও কি ইন্দ্রিয় বিকার ? দেশ্‌দিমনার প্রেমে যদি ওথোলোর সেই স্থূল ওষ্ঠে, সেই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে এত রূপ, এত মাধুরী ঢালিতে পারিয়াছিল, তবে রাধার প্রেমের গুণেই কৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপের প্রকাশ, ইহা কেন না বলিব ? ইহাকেই বা কেন জঘন্য ইন্দ্রিয়বিকার বলিয়া ঘৃণা করিব ? রাধার প্রাণের মর্ম্মস্থলে বিধাতা আপনার হাতে যে সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিয়া

দিয়াছিলেন, কৃষ্ণের দেহে সেই ছবির ছায়া পড়িয়াছিল ; তাহাতেই রাধার চোখে কৃষ্ণের এ ভুবনমোহন রূপ প্রকাশ পাইল। এ রূপ শরীরের নহে, গঠনপারিপাট্যের নহে ; কিন্তু প্রেমের। প্রাতঃসূর্য্যের পদছায়া অবলম্বনে স্বর্গের আলোক যেমন জগতে পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ রাধার স্বর্গীয় প্রেমের পদছায়া অবলম্বনে এই ভুবনমোহন রূপরাশি কৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা স্বর্গের ; ইহা পুণ্যময়। এ রূপলালসা ঘৃণার বস্তু নহে।

এই প্রথম দর্শনে যে প্রেমের সঞ্চার, সে প্রেমে রাধিকার জীবন ক্রমে কৃষ্ণময়—প্রেমময় হইয়া উঠিল। কৃষ্ণের চোখের চাহনিতে রাধিকার প্রাণ হরিয়া নিল, তাহা নহে ;—কিন্তু সে চাহনির ভিতরে কৃষ্ণের প্রাণের আগ্রহ, হৃদয়ের প্রেম, মরমের উৎসাহ, সব ঢালা ছিল ; তাই প্রাণের টানে প্রাণ আকৃষ্ট হইল ; শ্যামের হৃদয়ের টানে রাধার হৃদয় ওভুবনমোহন রূপে বাঁধা পড়িল। ঐ প্রেমের চাহনিতে জীবনে নূতন প্রাণতার স্রোত বহিল ; হৃদয়ে নূতন ভাব, প্রাণে নূতন উৎসাহ, মরমে নূতন আনন্দ উথলিল। কৃষ্ণদর্শনের পরেই রাধিকা আপনার প্রাণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, সে আর তেমনটী নাই। শ্যামের সে মধুর চাহনি, শ্যামের সে সুধামাখা মুখের সুধামাখা হাসি, প্রাতঃসূর্য্যের প্রাণময় কিরণের মত তাহার ঘুমন্ত প্রাণে উকি মারিয়া চমকিতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল। রাধিকা চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই ভুবনমোহিনী দৃষ্টিতে তাঁহার প্রাণের প্রাচীন জগৎ চূড়মার হইয়া গিয়া তাহার স্থানে এক নূতন জগৎ রচিত হইয়াছে। তাহার প্রাণের প্রাচীন ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া, তথায় এক নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই ধর্ম্মেই রাধিকা বিধর্ম্মিনী ; এই নূতন ধর্ম্মের নূতন উপদেশেই রাধিকা কুলত্যাগিনী, কলঙ্কিনী। প্রকৃত প্রেমে প্রাণ যাহার জাগিয়াছে, তাহার এ দশা সর্ব্বথা ঘটে। প্রেমের ভাষা স্বতন্ত্র, ভাব স্বতন্ত্র, রীতি স্বতন্ত্র, নীতি স্বতন্ত্র। "বুঝিনু পীরিতের হয় স্বতন্ত্র আচার।" সংসারের সঙ্গে তাহার কিছুই মিলে না। সমাজের সঙ্গে তাহার চিরবিরোধ। সমাজ শরীর জানে, প্রাণ জানে না ; প্রেম প্রাণ জানে, শরীর জানে না। সমাজের দৃষ্টি আপনার শান্তির দিকে, পরের সুখের দিকে নহে। প্রেমের দৃষ্টি পরের সুখের দিকে, আপনার শান্তির দিকে নহে।

সমাজ গণিতবিদ্; হিসাব পত্রে পাকা; ত্রৈরাশিক কসিয়া, ক্ষতিলাভ গণনা করিয়া সর্ব্বদা চলে; প্রেম ভাবুক,—একে একে যোগ করিলে কত হয় তাহা সে জানে না; ক্ষতি কিসে হয়, লাভ কিসে হয়, বুঝে না। সমাজের সঙ্গে প্রেমের চিরবিরোধ। প্রাণে প্রকৃত প্রেম জাগ্রত হইলে সমাজের ধর্ম্ম আর থাকে কৈ? তাই রাধিকাও বলিতেছেন—

—"নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতীধরম কৈছে রয়?"

যুবতীধরম কৈছে রয়? সমাজ যাহা যুবতীর ধর্ম্ম বলিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছে, প্রেমের প্রতাপে আর তাহা থাকে কৈ? যে দেশের লোকে প্রেমের একটু অধিক আদর করিতে শিখিয়াছে, যেখানে সমাজ প্রেমের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে;—যেখানে সমাজিক নিয়মের চতুঃসীমার মধ্যে থাকিয়াও প্রেম সম্ভব;—সে দেশে প্রেমের সঙ্গে সামাজিক ধর্ম্মের জাতিগত বৈরিতা না থাকিতেও পারে; কিন্তু যে দেশে তাহা নাই, যেখানে বিবাহের উদ্দেশ্য জীবস্থিতি রক্ষা, যে দেশে "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ধর্ম্মের অনুশাসন, যে দেশে দুগ্ধপোষ্য শিশুগণের বিবাহ হইয়া থাকে, সে দেশে প্রকৃত প্রেমের সঞ্চারে "যুবতী ধরম কৈছে রয়?" জুলিয়েট অবিবাহিতা ছিলেন; তাই ফাদার লরেন্সের আশ্রমে গিয়া রোমিওর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার যুবতি-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। মিরান্দা, দেশ্‌দিমনা, ইহাঁরা সকলেই অনূঢ়া ছিলেন; সমাজিক রীতি অনুসারে পরিণীতা হইবার পূর্ব্বে ইহাঁদের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল; তাই ইহাঁরা প্রেমে মাতিয়াও "যুবতি-ধর্ম্ম" রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রাধিকা বিবাহিতা; শৈশবসীমান্তে উপনীত হইতে না হইতেই হত-ভাগ্য সমাজের জঘন্য রীতি অনুসারে শৃঙ্খলবদ্ধা। পিতামাতা, সমাজ, আত্মীয় স্বজন, যাঁহার গলায় তাঁহাকে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকট শরীর বিক্রী করিয়া, তাঁহাকে শরীরের স্বামী করিয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের পতি করিয়া, তাঁহার পদসেবায় জীবন অতিবাহিত করাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু যে দিন যমুনার জলে যাইতে "চিকণকালার" ভুবনমোহন রূপ তাঁহার

প্রাণে প্রবেশ করিয়া ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইয়া দিল, সেই দিন হইতেই নব অনুরাগের স্রোতে সমাজের এই উর্ণনাভতন্তু অলক্ষিতে ছিঁড়িয়া গেল।

প্রেমের সঞ্চারে প্রাণ জাগিলে এরূপই ঘটিয়া থাকে। সাবিত্রী সতী, কেবল যে সত্যবানকে প্রাণে বরণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যবানকে সামাজিক নিয়মে বিবাহ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া। সীতা সতী, আগে রামের প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন বলিয়া। দময়ন্তী সতী; স্বেচ্ছায়, প্রেমের আগ্রহে, নল রাজাকে হৃদয়ের রাজা করিয়াছিলেন বলিয়া। ইহাঁদের সতীত্ব ঘটনার ফল। সত্যবানকে দেখিয়া তাঁহার পায়ে জীবন যৌবন বিকাইবার পূর্ব্বে সাবিত্রীর বিবাহ হইয়া থাকিলে, হয় তাঁহার প্রেম, না হয় তাঁহার সতীত্ব বিনষ্ট হইত। কিন্তু প্রেম বড়, না, সুনাম বড়? প্রাণ বড় না সমাজ বড়? রাধিকার প্রেম বড় ছিল। রাধিকা প্রেমিকা হইবার পূর্ব্বে হীন সমাজের হীন রীতি অনুসারে পরিণীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু অনুরাগের তরঙ্গে সমাজের স্বহস্ত রচিত বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল; তাঁহার গভীর প্রেমের বেগে সমাজের পচা সূত ছিঁড়িয়া গেল, প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া কৃষ্ণমুখী রাধিকা প্রাণের কৃষ্ণের জন্য কুল, শীল, লাজ সকলে তিলাঞ্জলি দিলেন; সমাজের ভ্রূকুটী, পাড়া পড়শীর কুৎসা, শাশুড়ী ননদীর গঞ্জনা, সমুদয় তুচ্ছ করিয়া "শ্যাম-প্রেমসুখ-সাগরে" ঝাঁপ দিলেন; তাই তিনি কলঙ্কিনী। কিন্তু "বিঘত প্রমাণ, আশু রুচি প্রাণ" লইয়া ঘরকন্না করা; জীব সংস্থিতি রক্ষার্থে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে শুষ্ক প্রাণে শুষ্ক সমাজে বাস করা অপেক্ষা,—প্রাণের টানে, প্রেমের দায়ে সর্ব্বত্যাগিনী কলঙ্কিনী হওয়া শ্রেষ্ঠতর হৃদয়ের কার্য্য কি না জানি না।

রাধিকা কলঙ্কিনী কেন? যাহাকে ভালবাসিয়া ছিলেন, তাঁহার পদানুশারিণী হইয়া। একথাতো বলিতে পার না, রাধা আয়ানকে ভালবাসিলেই তো সব গোল চুকিয়া যাইত; তিনি কৃষ্ণকে ভালবাসিলেন কেন? ভালবাসাতো তোমার ন্যায়-শাস্ত্রের অধীন নহে। আকাশের বিহঙ্গমের মত প্রেম যে স্বাধীন। প্রাণের গূঢ় আকর্ষণে যে প্রেমের উদয় হয়। তাহার গূঢ় রহস্য ভেদ করে কার সাধ্য? বেঁধে ধরে যদি প্রেম হইত, জোর করিয়া যদি কাহাকেও ভালবাসিতে পারা যাইত, তবে আমরাও বলিতাম, রাধিকার আয়ান ঘোষকেই ভালবাসা উচিত ছিল।

কিন্তু তা তো হয় না! প্রেম তো সে কথা শোনে না! তবে আর রাধিকাকে এত দোষে দোষী করিব কেন?

তুমি বলিবে রাধিকার কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা হইয়াছিল, তা হউক; কিন্তু প্রাণে প্রাণে শ্যামকে ভালবাসিয়া—শ্যামকে প্রাণের রাজা ও হৃদয়ের স্বামী করিয়া রাখিয়াও তো রাধিকা সমাজের নিয়ম অনুসারে আয়ানকে শরীরের পতি করিয়া যুবতীর ধর্ম্ম, কুলের মান, সমাজের নিয়ম, সকলই রক্ষা করিতে পারিতেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাধিকার কৃষ্ণাভিসারিণী না হওয়াই উচিত ছিল!

কিন্তু এ কর্ত্তব্যের শৃঙ্খল রাধিকার পায়ে পরাইল কে? সমাজ। সমাজের নিয়ম প্রতিপালন করা, সমাজে থাকিবার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাহাতে কি ধর্ম্ম আছে জানি না। আর সমাজের মুখ চাহিয়া চলা, সমাজের অন্যায় আদেশ প্রতিপালন করাতে মনুষ্যত্ব বেশী, না না করাতে বেশী, তাহাও সন্দেহের স্থল।

কিন্তু সমাজের নিয়ম অগ্রাহ্য করিতে, সমাজের অনুশাসন অমান্য করিতে যে, রাধিকার প্রাণে যে ক্লেশ হয় নাই, তাহাও নহে।

"গোকুল নগর মাঝে,
আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি
যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা?"

কিন্তু পরিণামে প্রেমেরই জয় হইল। সমাজের আদর যত্নে জলাঞ্জলি দিয়া প্রেমময়ী রাধিকা শ্যামপ্রেমসাগরে ঝাঁপ দিলেন!

সাহিত্য-জগতে অনেক নায়িকাই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; প্রেমের অনেক মধুর ছবিই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধিকার প্রেমের মত এমন গভীর প্রেম আর কোথাও বড় দেখা যায় না। উচ্চতম প্রেমে ও ধর্ম্মভাবে কোনও বৈষম্য নাই। রাধিকার প্রেমে প্রকৃত ধর্ম্মভাব ছিল। রাধিকার প্রেমে হৃদয়ের পূজা ছিল। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ়া ভক্তি; কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ়া শ্রদ্ধা, জুলিয়েটে তাহা দেখা যায় না। জুলিয়েট আপনার প্রেমে আপনি গরবিনী;—

"My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee
The more I have, for both are infinite."

আর রাধিকা কৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারেন, এমন প্রেম নাই ভাবিয়া সশঙ্কিতা;—

"না জানি প্রেমরস———
কেমনে মিলিব হাম সুপুরুখ সঙ্গ।"
সোবর নাগর রসিক সুজান,
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান।"

মিরান্দায় ইহার আভাস কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়।

Ferdinand——Wherefore weep thou?
Miranda——At mine unworthiness, that dare not offer,
What I desire to give; and much less take
What I shall die to want.....

রাধিকার প্রেমের মূলেও এই বিনয়, এই আমি-অতি-হীন-ভাব উজ্জ্বল রহিয়াছ।

"বঁধু! তুহুঁ দয়ার সাগর।
হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর!
আহিরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন্ ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পীরিতে তোমার॥
তোহারি গরবে ব্রজে হাম গরবিনী
গহীন পিরীতি তোর আমি কিবা জানি?
আমি লোহা, তুহুঁ বঁধু নিকষ পাষাণ,
পরশে করিলা মোরে হেম নাখবাণ।
সাধ করে সীথাঁয় তোমা সিন্দূর করি ধরি,
হার বনাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথি পরি।
য়ত যত দেখি আঁখি নহে তিরপিত।"

এমন গভীর প্রেমে ও ধর্ম্মভাবে পার্থক্য কোথায় জানি না। এই রূপ প্রেমের বিষয়ই যথার্থ বলা যায়;—

"Our love at its highest flood rushes beyond its object and loses itself in the sense of divine mystery."

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ মহিলা।

এটোয়া।

—এখানে হিন্দু কি মুসলমান জাতি অধিক তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। তবে ভদ্র বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ও রাজপথে কখনই প্রায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশের আচার ব্যবহার এবং পরিচ্ছদাদিও আমাদিগের মত নহে। হিন্দুস্থানী পুরুষগণ ধুতি কি পায়জামা, চাপকান ও টুপি পরে, স্ত্রীলোকেরা "ল্যাংঘা" (ঘাঘরা) আঙ্গ-রাখা ও চাদর ব্যবহার করে। মুসলমান ও ক্ষত্রিয় রমণীগণ জুতা ও খড়ম পরিয়া থাকে। সাধারণতঃ এদেশের লোক সুস্থ, সবল ও কতকটা ফরসা, কিন্তু মুখে প্রায়ই বুদ্ধির তত আভা নাই বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধির প্রতিভাহীন মুখ মণ্ডল নয়ন প্রীতিকর নহে, এবং স্মৃতিতে গভীর রেখা অঙ্কিত করে না। এই কারণেই হউক, কিম্বা কিজন্য ঠিক বলিতে পারি না, আমি এদেশের সুন্দর মুখও দীর্ঘকাল দেখিয়াও স্মৃতিতে রাখিতে পারি নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুস্থকায় বালক বলিকার বুদ্ধিহীন মুখচ্ছবিতে কেমন সুখের সহিত বিষাদ হৃদয়ে ঢালিয়া দিত—তাহাতে কত কি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা, অস্পষ্ট ভাব মনে আসিত।

পশ্চিম অঞ্চলে খাদ্য সামগ্রী অতি সুলভ। দুগ্ধ ও নবনীত অতি উপাদেয়। অন্যান্য দ্রব্যও বেশ পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালার ন্যায় সুস্বাদ, রসনা-মোহন মিষ্টান্ন দুর্ল্লভ; তাই বুঝি রসনা-দাস বাঙ্গালী আজীবন পশ্চিমে বাসে আপনাকে অধিকতর হতভাগ্য মনে করেন? হিন্দু-স্থানীগণ "দাল রুটি" প্রিয়—তাহারা রসনা তৃপ্তি অপেক্ষা শরীর পুষ্টি বোধ হয় অধিক ইচ্ছনীয় বিবেচনা করে। আমি স্পার্টানদিগের "কাল ঝোলের" (black broth) পক্ষপাতী নহি, তথাপি একথা স্বীকার করি, আমাদিগের বাঁধুগণের আহার প্রণালী একটু পরিবর্ত্তন করিলে ক্ষতি নাই। হিন্দুস্থানীরা দিনান্তে কোনদিন একবার অন্নাহার করে, কিন্তু রুটিই ইহা-দিগের প্রধান আহার। এমন কি ভিখারীদিগকে ডাল কিম্বা রুটি ভিক্ষা দিবার প্রথা এদিকে প্রচলিত আছে।

ইহারা আরাম কাহাকে বলে তাহা বড় বুঝে না, বাহিরের আড়ম্বর অধিক ভালবাসে। স্ত্রীলোকদিগের বেশ ভূষার প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, কিন্তু তাহা সুমার্জ্জিত নহে। বঙ্গীয়া ভগিনিগণ ইহাদিগের ন্যায় অলঙ্কার পরিতে আজিও শিখেন নাই। ইহারা এতই অলঙ্কার প্রিয় যে, তাহার অভাবে সর্ব্বাঙ্গ "উলকি" দ্বারা চিত্রিত করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমি যদি চিত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইতাম, তাহা হইলে হিন্দুস্থানী নারীগণের বহুবিধ অলঙ্কার (জোড়া কড়া) পরিশোভিত দেহচ্ছবি চিত্র করিয়া আনিতাম, ও দেশীয়া ভগিনিগণ তাহা দেখিয়া আমোদিতা হইতেন।

এদেশের অবরোধ প্রণালী আমাদিগের দেশের অপেক্ষাও কঠিন-তর, (হয়ত অত্যাচারী মুসলমান বাদসাহদিগের নিকটে বাস বলিয়া পুরাকালে আত্ম সম্মান রক্ষার্থে অন্তঃপুর প্রথা এত অধিক কঠিন করা হইয়া থাকিবে। তবে সময়ে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনসহ তাহার কোন নূতন সংস্কার আর যে করা আবশ্যক, তাহা এখন মনে হয় না) কিন্তু ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বিবাহাদি কোন উৎসবে ভদ্র মহিলাগণ পর্য্যন্ত "মঝৌলীতে" (এক প্রকার গরুর গাড়ী) চাপিয়া আবরণের মধ্য হইতে উচ্চৈঃস্বরে Shelly'র "Skylark" এর মত, অথবা কবি হেমবাবুর "চাতক পক্ষীর" মত লুক্কাইত থাকিয়া,—(যদিও, "সুদূর গগনে উঠি গায় সুখে ছুটি ছুটি" নহে) রাজ পথে গীত গাইতে গাইতে—সঙ্গীত চূর্ণ ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যায়। ঈদৃশ রাজপথে বামা-কণ্ঠ-ঝঙ্কারে কোন লজ্জার বিষয় নাই, কেন না, সেই "রমণী বদন, পুরুষ নয়ন, নাহি দেখিতে পায়"। ইতর লোকের স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে যাওয়া কোন দেশেই দোষাবহ নহে, প্রয়োজনে; তবে এদিকে তাহাদিগের একটু বেশী স্বাধীনতা আছে। সামান্য লোকের স্ত্রী কন্যাগণ প্রকাশ্য ভাবে ঘোঁড়ায় চড়িয়া কুটুম্ববাড়ী যাতায়াত করে। ইংরাজ মহিলাদিগের সম্বন্ধে কবিবর বলিয়াছেন যে "ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিতচিতে, কানন কন্দর উন্নত গিরিতে, অপ্সরা আকৃতি পুরুষ সেবিতা" ইত্যাদি, কিন্তু ইহাদিগের অশ্বারোহণ দেখিয়া কাহারও মনে এ কবিতা মধুরে আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হয় না; কেবল একটা "হাস্যভাজন" ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। বধূ দিব্য সাজে আবৃত মুখে অশ্বারূঢ়া, অনুগত ভৃত্য স্বামী গঙ্গারাম অশ্বরশ্মি সজোরে ধরিয়া চলিয়াছে এবং মৃদুস্বরে উভয়ে মধুরালাপ করিতেছে! এই দম্পতি-

দৃশ্য, অবগুণ্ঠনবতী স্বাধীনতার এবং অশ্বরশ্মির সংলগ্ন প্রেমের মধুর সমাবেশ। ইহা ইউরোপের মধ্য যুগের শিভেল্‌রি (chivalry) হিন্দুস্থানে বিকশিত, তবে কি জানি, দেখে আমার কেমন একটু হাঁসি পায়। চারুহাসিনী ভগিনি পাঠিকে, সহিসরূপী পতি সঙ্গে এইরূপে অশ্বপৃষ্ঠে রাজপথে বিচরণ করিতে সখ যায় কি ?

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হিন্দুস্থানীরা এখনও যেন আদৌ বুঝিতে পারে না। কখন কোন হিন্দুস্থানী বালিকাকে পাঠ করিতে আমি দেখি নাই কিম্বা শুনি নাই। আমি মহারাষ্ট্রীয়া পণ্ডিতা রমাবাইএর দেশের কথা বলিতেছি না, স্মরণ রাখিবেন। গৃহেও তাহাদিগের রীতিমত লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমাদিগের দেশে যদিও স্ত্রীশিক্ষা কেবলমাত্র অঙ্কুরিত হইতেছে, আজও তাহার শুভফল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই; তথাপি ইহার প্রয়োজনীয়তা অনেকে প্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন এবং যাহাতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়, তাহারও কতক চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে সে চেষ্টাও প্রায় কোন খানে দেখি নাই। তাহাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ অজ্ঞানে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। কি এই দেশে, কি বাঙ্গালায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টা আবশ্যক। আমাদিগের দেশে রাজনৈতিক উন্নতির জন্য যে রূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহার অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অধিক চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের দেশের পুরুষগণ নিজের অন্তঃপুরের মূর্খতা, কুসংস্কার এবং অন্ধকার দূর করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া বাহিরে "দেশীয় উন্নতি" "দেশীয় উন্নতি" বলিয়া যে চীৎকার করেন, তাহার জন্য অনেক সাহেব তাঁহাদিগকে ধিক্কার দেন, অনেক সময় দেশীয়গণকে এই ধিক্কারের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বোধ হয়।

হিন্দুস্থানীগণ অধিকাংশ পৌত্তলিক, কিন্তু আমাদিগের দেশের ন্যায় এদিকে প্রতিমা পূজা তত প্রচলিত নাই। মহাদেব কিম্বা অন্য কোন বিগ্রহ যাহা যেখানে আছে, তাহারই মধ্যে মধ্যে পূজা করিয়া থাকে। জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণ মূর্ত্তিবিহীন মন্দিরে উপাসনা করে। অহিংসাই ইহাদের পরম ধর্ম্ম, সেই জন্য ইহাঁরা সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রদীপ জ্বালে না ও কীটাণু সেই দীপে দগ্ধ হইবে আশঙ্কায় অন্ধকারেই আহারাদি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করে। দীন দরিদ্র অতিথিগণ শূন্য হস্তে কখনই ইহাদিগের ঘর

হইতে চলিয়া যায় না, নিজে উপবাস করিয়াও অতিথি সেবা করে। কর্কশ বাক্যে কখন কাহার মনে কষ্ট দেয় না। প্রাণী মাত্রের দুঃখ দূর এবং অহিংসাই যাহাদিগের পরম ধর্ম্ম, তাহারা অবশ্যই আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

আজি কালি আবার বাল্যবিবাহ অনেক ইংরাজি-নবিশ পসন্দ করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহার উপকারিতা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আমার বোধ হয় বঙ্গভূমির অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। সেই বাল্যবিবাহ-স্রোত এদিকে ভীষণবেগে প্রবাহিত দেখিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। মাতৃগর্ভে সন্তান, পিতা মাতা প্রতিশ্রুত হইল; সুতরাং শিশুর জন্মের সহিত বিবাহ লিপি লিখিত হইয়া গেল এবং মাতৃগর্ভ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এই বিবাহ প্রথার মনোহারিত্ব ও উপকারিতা আমার সহজ বুদ্ধিতে কখন অনুভব করিতে পারি না।

বিলাতী সভ্যতার সংস্পর্শে এখনও এদিকে অখাদ্য ভক্ষণাদি প্রচলিত হয় নাই। ধর্ম্ম এবং জাতি অদ্যাপি ইহাদিগের নিকট অতি যত্ন-রক্ষিত পবিত্র সামগ্রী। এমন কি, ইহারা বাঙ্গালীর পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত এবং বাঙ্গালী মাত্রেই "খৃষ্টান" এই এদেশের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস। লালা (কায়স্থ) ভিন্ন ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় এদেশে কখন মদ্যপান করে না। এইটী সুখের বিষয় যে, সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় সমাজের পরিত্যক্ত সন্তান। কিন্তু নীচ জাতীয়দিগের মধ্যে "মৌরা" (একরূপ মদ্য) অথবা "তাড়ি" পানের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।

এদেশে জমিদার অর্থে ধনী ব্যক্তি নহে, যাহার কিছু জমি আছে সেই "জমিদার।" এক বিঘা কি ততোধিক জমি থাকিলেই জমিদার নামে অভিহিত হইতে পারা যায়। কিন্তু ক্ষেত্রে গিয়া দেখিবে যে, জমীদারগণ হলধর; নিজ হস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র অপমানের বিষয় নাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি নিজে কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। দাসত্বের রাজ ভোগে পাদুকা লেহনে জীবন অতিবাহিত না করিয়া এরূপ স্বাধীনতায় কৃষিকার্য্য করার গৌরব, হতবীর্য্য বাঙ্গালী পুরুষগণ অনুভব করিতে পারিবেন না হয়ত। তাহাদিগের কৃষিকার্য্যে লোভনীয় হল লেখনি, এবং বিস্তৃত ক্ষেত্র শাদা কাগজ, এবং প্রতি বৎসরের প্রচুর ফসল অপমান।

ভগিনি পাঠিকে, আমাদিগের স্বামী বা পিতা বা ভাই যখন চাকুরী (দাসত্ব) করিয়া টাকা আনিয়া দেন সে টাকা দিয়া আমরা গহনা ও শাড়ী কিনি, আমরা কি মনে করি তাহা কত অপমানের টাকা? কত অপমান খাইয়া শ্বেতাঙ্গের কত পদাঘাত নিত্য সহ্য করিয়া সেই টাকা আনিতে হইয়াছে? না, আমরা তা ভাবিব কেন, স্বামী বা পিতার অপমানে আমাদের কি?

সাহস, বীরত্ব এবং আত্ম রক্ষার গৌরবে যে ক্ষত্রিয় জাতি জগতের ইতিহাসে আদর্শ স্থানীয়, সেই বীর বংশে দ্বারবানের জন্ম! তাহাদের আজ এই দুর্গতি হেরিয়া অন্তরে বিষাদের সঞ্চার হয় সত্য, তথাপি ব্রাহ্মণ জাতির নীচতায় প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। আর এক কথা বলি, পশ্চিমের সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মণগণ মোট বহে এবং গরুর গাড়ী চালাইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া আমার হৃদয়ে কত আঘাত লাগিত। তারা বড় মূর্খ, যে ব্রাহ্মণ শব্দের সহিত পবিত্র মহত্ত্বের স্মৃতি মিশ্রিত আছে, যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আপনাকে এখনও কথঞ্চিৎ সুখী মনে করি, যাহার গৌরবময় প্রতিভার আলোক অন্ধকারময় শ্মশান ভারতের চারিদিকে অদ্যাপি দেখিতে পাই এবং যাঁহাদিগের বুদ্ধি বিদ্যার অবিনশ্বর অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি ভাবিতেই আহ্লাদে ও ভক্তিতে রোমাঞ্চ হয় এখনও, সেই জাতির এই শোচনীয় পতন কিরূপে সহনীয় হইতে পারে? ধন, মান, কিম্বা বংশ-মর্য্যাদায় মনুষ্যে মনুষ্যে দূরতা কখনই ইচ্ছনীয় নহে, এবং যত শীঘ্র এই জাতিগত বৈষম্য বিদূরিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গল; তবুও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণত্বের মহিমা ভুলিতে পারি না। সুদূর সাগর পারে রহিয়াও বিদেশী পণ্ডিত প্রবর মোক্ষ মূলার যে জাতির গৌরব গীত নিয়ত উচ্চকণ্ঠে গাইতেছেন, যিনি ব্রাহ্মণত্বের উচ্চতা কখন বিস্মৃত হন না, আজি হতভাগ্য হইয়াছি বলিয়া সেই জাতির মহিমাময় পবিত্রতা কি রূপে ভুলিতে পারি?

প্রখর বুদ্ধিবলে বাঙ্গালী সর্ব্বত্র পূজিত। পশ্চিমে বাঙ্গালীদিগের অত্যন্ত সম্মান ও তাহারা নিরীহ হিন্দুস্থানীদিগকে একরূপ চালাইয়া থাকে বলিলেও হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী এদিকে আসিয়া সমাজ ভয় যেন একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, কুৎসিত আমোদ প্রমোদ এবং অসার গল্পে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। সাধারণতঃ উৎসাহ নাই, কার্য্য কিম্বা চিন্তা নাই, কেবল আলস্যে ও তাস পাসায় মূল্যবান সময় ক্ষেপন করিয়া সুখী হয়। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য কি রাজনীতির

অবস্থা কিরূপ তাহা তাহারা অবগত হইতে ইচ্ছা করে না। সংবাদপত্র পড়ে না ও বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর দোষ গুণ কি তাহাও সম্যকরূপে জানিতে চাহে না। অর্থোপার্জ্জনে যে কিসে মস্তিষ্কের পরিচালনা আবশ্যক, দিবাভাগে কোন রূপে তাহাতে ব্যাপৃত থাকিয়া অপরাহ্ণে দশ পাঁচজন একত্র হইয়া অক্ষক্রীড়ায় সেই দিবা ক্লান্তি দূর করিয়া সুখী হয়। শিক্ষা ও জ্ঞানে তাহারা যেন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আর এ জীবনে যেন তাঁহাদিগের কিছু শিখিবার কি জানিবার নাই।

"কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন
কাল গচ্ছতি ধীমতং
ব্যসনেন চ মূর্খানাং
নিদ্রায়া কলহেন চ"

তাহাদিগের সম্বন্ধে একটী বলিতে পারা যায়। যাহা দোষ তাহা বলিলাম, এখন গুণের কথা বলি।

পশ্চিমবাসী বাঙ্গালীরা মুক্ত হৃদয়ে যত্নের সহিত অতিথি সৎকার করিয়া থাকে, সাধ্যমত দান করিতেও তাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে এবং স্বজাতি ও আত্মীয়গণের বিপদে তাহারা নিতান্ত চিন্তার সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক অর্থ সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে বিপদ মুক্ত করিয়া সুখানুভব করে। কত প্রতারক দুঃখের রঞ্জিত ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া অধিকাংশ সময়ই তাহাদিগের নিকট ভুলাইয়া অর্থ লইয়া যায়, কিন্তু তাহারা বারম্বার এ প্রকার প্রতারিত হইয়াও দানে বিমুখ নহে। কোনও আত্মীয় ব্যক্তি পীড়িত হইয়া তাহাদিগের গৃহে আশ্রয় লইলে চিকিৎসকের এবং ঔষধের অর্থ পর্য্যন্ত নিজে দিয়া থাকে ও তাহাতে অণুমাত্র ক্ষতি বোধ করে না। শত অসুবিধা সময় সময় সহ্য করিয়াও পরিচিত অপরিচিত অতিথির সেবা করিতে সতত উৎসুক থাকে। দেশের কাহাকেও দেখিলে যেন চরিতার্থ হইয়া যায়। মার্জ্জিত সহৃদয় ভদ্রতা ও আপ্যায়িত ইহাদিগের নিকট শিক্ষা করা যাইতে পারে বলিলে কিছু বেশী বলা হইবে না। গৃহ বিচ্ছেদ (দলাদলি) ইহাদিগের মধ্যে থাকিলেও ইহারা বান্ধব-প্রিয় এবং দয়ালু।

এটোয়া সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমের অন্যান্য সামান্য যাহা জানিতাম, তাহা বলিয়াছি।

শ্রীমতী নীহারিকা।

ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভবিষ্যৎ।

ব্রাহ্ম-সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ; ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আলোক-মণ্ডিত।

ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রদায়, ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। সম্প্রদায়ের উন্নতি দল বৃদ্ধিতে। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের দল বৃদ্ধি যে আর খুব বেশী হইবে, তাহা বোধ হয় না।

এক সময়ে এই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্যরূপ ছিল। এক সময় শিক্ষিত যুবক মাত্রেই ব্রাহ্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা প্রকাশ করিতেন। এক সময় বৎসর বৎসর কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে অনেক লোক ব্রাহ্মদলভুক্ত হইতেন। আজ আর সে দিন নাই।

ইহার কারণ কি ? আমাদের বোধ হয় হিন্দুসমাজের কতিপয় নীতি-বিরোধিনী সামাজিক কুপ্রথার প্রাবল্যই ব্রাহ্ম সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রধান কারণ ছিল। সেই সকল কুপ্রথা যত হীনবল হইতেছে, ব্রাহ্মদল বৃদ্ধিও তত হ্রাস হইতেছে।

হিন্দুসমাজ ক্রমে উদার হইতেছে। হিন্দুসমাজে ক্রমে অনেক ব্রাহ্ম-সংস্কার প্রবেশ করিতেছে। বাঙ্গালার সভ্যতর স্থান সমূহে জাতিভেদ আজি কালি প্রধানতঃ কেবল বিবাহ ব্যাপারে আবদ্ধ। আপনার বাড়ীতে, দশ জনের সাক্ষাতে, প্রকাশ্য ভাবে জাতিভেদ অমান্য করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিতে এক পাত্রে ভোজনে আর আজ কালি বড় একটা সামাজিক গোল উঠে না। হিন্দুসমাজ ক্রমে ধীরে, অতি ধীরে বাল্য-বিবাহ প্রথার কার্য্যতঃ প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। একটু চেষ্টা করিলেই ষোড়শী কুমারী পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারা যায়। কোনও কোনও স্থলে বাল-বিধবার বিবাহ পর্য্যন্ত চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুসমাজভুক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় অল্পে অল্পে এই সকল সংস্কার সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

শিক্ষিত সমাজে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানেরও হ্রাস হইবার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। আজ কাল না-হিন্দু না-ব্রাহ্ম সামাজিক অনুষ্ঠানের কথা মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সালগ্রাম ঠাকুর ক্রমেই কোণ ঠ্যাসা হইতেছেন। শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারেও আগেকার মত তেমন আটসাট নাই। হিন্দুসমাজ এখন যেন-তেন-প্রকারেণ হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিতেছে। ইহা হইতেই বোধ হয় ইহাদের মৃত্যু দূরে নহে।

এইরূপে হিন্দুসমাজ ক্রমেই ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যে সকল সামাজিক কুপ্রথা বর্জ্জনার্থ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি—যে কারণে ব্রাহ্মগণ হিন্দু সাধারণ হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সকল কুপ্রথা হিন্দুসমাজও ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতেছে। একেবারে পরিত্যাগ করিতে আরো কিছুকাল লাগিবে ; এবং যে দিন হিন্দুসমাজ সেই সকল কুপ্রথা একেবারে বর্জ্জন করিবে, সেই দিন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়েরও বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বিনাশ হইবে। আর আজি কালিও যে পরিমাণে হিন্দুসমাজের ভিতরে জাতিভেদ, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি হ্রাস হইবে, ঠিক সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম-দল বৃদ্ধিহ্রাস পাইবে।

ব্রাহ্মসমাজ-প্রচলিত ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে হিন্দুসমাজের তত বিরোধ নাই। হিন্দুসমাজের বিরোধ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নব প্রবর্ত্তিত সামাজিক প্রথাদির সঙ্গে। এই বিরোধও যখন ক্রমে নষ্ট পাইয়া যাইতেছে ; হিন্দুসমাজে থাকিয়া যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সাধন করা ক্রমে সহজ হইয়া উঠিতেছে, তখন যে ব্রাহ্ম-দল বৃদ্ধি হ্রাস হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

তাহাতেই বলি, ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। আমরা যে স্বতন্ত্র একটী বলবান দল হইব, এ আশা নাই ; এবং তাহা সুখেরই কথা। ব্রাহ্মসমাজ আপনার জীবন-ব্রত শেষ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবে, ইহা কি সুখের কথা নহে ?

ব্রাহ্মধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আলোকময়। ব্রাহ্মধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক ; ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের হীনবলে বা বিনাশে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত ক্ষতি হইবে না। এক দিকে যেমন দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজে লোক সমাগম কমিয়া আসিতেছে ; অপর দিকে সেইরূপ দেখিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সমূহ দেশময় মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণ মালার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ঐ দিকে আর্য্য সমাজ, এই দিকে বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি ইহাঁরা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে ব্রাহ্ম-সত্য প্রচার করিতেছেন। ইঁহারা আমাদের সম্প্রদায়ের বিরোধী হইতে পারেন, কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, ইঁহারা আমাদের ধর্ম্ম বিরোধী তত নহেন।

একদিকে যেমন হিন্দুগণ এইরূপে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, অপরদিকে ঠিক সেইরূপ ব্রাহ্মগণও একটু একটু হিন্দু ধর্ম্মের দিকে যাইতেছেন। হিন্দু সাধন-প্রণালী ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিজয় বাবুকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মগণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু বিজয় বাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণ ব্রাহ্ম সমাজে যে নূতন ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছেন, তাহার সমূল উৎপাটন হইবে না। এই সংকীর্ত্তনে মাতামাতি, এই নাম জপ, এই ভাবুকতা, এই যোগ, ইহার আমূল উৎপাটন বর্ত্তমান অবস্থার অসাধ্য এবং এই সকলেই ব্রাহ্মগণকে অলক্ষিতে হিন্দু ধর্ম্মের দিকে টানিতেছে।

নব্য হিন্দুগণের ও যোগী ব্রাহ্মগণের মিলনে ব্রাহ্ম সত্য দেশে বহুল প্রচার হইবে। এদেশে ক্রমে একদল হিন্দু-ব্রাহ্মের ও একদল ব্রাহ্ম-হিন্দুর সৃষ্টি হইবে। এবং এই উভয় দলের দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্য সমূহ অধিকতর প্রচারিত হইবে। এই উভয় দলের দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধ্যে কিছু কিছু ভ্রান্তি এবং অসত্যও প্রবেশ করিবে সত্য; কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকিতে পারিবে না। জ্ঞান প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে এই সকল ভ্রান্তি ও অসত্য আপনি অপনোদিত হইয়া যাইবে।

প্রতাপ বাবু আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া একদিন আমাদিগের সমক্ষে কথোপকথনচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, "আজ থিওডোর পার্কারের মতের বড় আদর আমেরিকায় দেখিতে পাওয়া যায় না।" দেখিতে পাওয়া যায় না—ইহাই সত্য, কিন্তু পার্কারের মত যে দেশে প্রচলিত হয় নাই, একথা সত্য নহে। তবে পার্কারের মত দেশময় এত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে যে, তাহার বিশেষত্ব আর অনুভব করিতে পারা যায় না।

এদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরও তাহাই ঘটিবে বলিয়া বোধ হয়। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় বর্ত্তমান স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবি হইবেন বোধ হয় না; হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা তাহাও বুঝি না। তবে ব্রাহ্মসত্য ক্রমে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে; ব্রাহ্মধর্ম্ম নামেই হউক কিম্বা অপর কোনও নামেই হউক, ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান ধর্ম্ম, শিক্ষিত জগতের ধর্ম্ম হইবে।

তাই বোধ হয় যে, আমাদের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকার—আর আমাদের ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আলোকিত।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

আদর।

(১)

আদরের বোন মোর স্নেহের পুতুলী,
হাসি হাসি মুখ খানি সোহাগে আগলী;
বনের বিহগী প্রায়,
হাস খেল নাচ গাও,
বিষাদ কাহারে বলে জাননা কখন;
সরল মধুর ভাষে জুড়াও শ্রবণ!

(২)

স্বভাবের শিশু বালা স্বরগের রাণী,
কোমল মধুর আহা পবিত্র চাহনি;
দেখিয়া দেখিয়া তোরে,
ভুলে যাই আপনারে,—
ভুলে যাই জীবনের বিষাদ ভাবনা;
তোর স্নেহে নিরানন্দে আনন্দ ধরেনা।

(৩)

চল বোন তোরে নিয়ে বাগানেতে যাব,
মনসাধে ফুলসাজে আজি তো' সাজাব;
নিশিগন্ধে মালা গাঁথি,
রচিব মোহন সিঁতি,
খোপায় পরাব তোর গোলাপের সার;
উজলিয়া কর্ণমূল শোভিবে টগর।

(৪)

বকুলের হার গাঁথি গলায় পরাব,
মাধবীকঙ্কনে তোর দুবাহু সাজাব;
বাগানের মঞ্চ'পরি
বসাব যতন করি,
ফুলরাণী বেশে তুই অপূর্ব্ব শোভিবে;
মিলে সব বন দেবী উলুধ্বনি দিবে।

শ্রী———ম।

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

আমাদের বউমা বড় বোকাটে গোছের ছিলেন। বাবাজির বুদ্ধির খেলা তিনি সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না; এবং মাঝে মাঝে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ মহা গোল বাঁধাইয়া বসিতেন।

একদিন বাবাজি এক মহা সভায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন। বোকা লোকদিগের মত বউমা বুঝুন আর না বুঝুন সব কথা জানিবার সাধটুকু ছিল। বাবাজিকে বক্তৃতার কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বাবাজি স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন, বক্তৃতার সার মর্ম্ম বউমাকে সবিস্তার বলিলেন। সব কথা শুনিয়া বউমা কি না শেষটা বলিয়া উঠিলেন, "তবে সে দিন আমি জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ভাসানের মিছিল দেখিতে ছিলাম বলিয়া তুমি এত রাগ করিয়া ছিলে কেন?" বাবাজি স্বভাবতঃই বড় বিরক্ত হইলেন। বউমাকে এক ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"তুমি ও সব কথা বুঝিবে কি? স্ত্রী স্বাধীনতার মানে বুঝি ঐ? তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জ্বালায় যে বাঁচিনে।"

আর একদিন বাবাজি একতা সম্বন্ধে একটা দিগ্‌গজ প্রবন্ধ লিখিয়া আপনা আপনি পড়িতেছেন, বাঙ্গালী মান্দ্রাজী সব ভাই হইবে, বন্ধু হইবে, সকলের প্রাণে প্রাণে মিল হইবে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হইবে, ইত্যাদি নানা কথা লিখিয়া পড়িতেছেন। বউমা নিকটে বসিয়া সব, শুনিতে ছিলেন। বাবাজির পড়া শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তুমি তোমার কাগজে তবে প্রতিদিন রামবাবু ও তাহার দলের লোককে এত করে গালাগালি কর কেন? তোমরাতো রামবাবুর দলে আগে ছিলে, তাঁর দল ভেঙ্গে আর একটা দল করিলে কেন? আর বড় ঠাকুরের সঙ্গে মুখ দেখা দেখি নাই, তাতে কি একতার হানি হয় না?" বাবাজি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"ভাল বোকার হাতে পড়েছি; তুমি রাজনীতির কি জান?"

আমাদের বাবাজির একখানি সংবাদ পত্র ছিল। এই পত্রে একদিন এক বিরাট সভার কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইল। বাবাজি ও তাঁহার বন্ধু কেনারাম চাটুর্য্যে এই সভার প্রধান উদ্যোগী। সভাতে কেনারাম বাবাজির দেশ হিতৈষণার ও উৎসাহ উদ্যমের বড় প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; বাবাজিও কেনারামের প্রশংসা করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। বউমা এই কার্য্য-বিবরণ পড়িয়া বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "আচ্ছা দেখ কেনা বাবু যখন তোমার এত প্রশংসা করিলেন ও তুমি যখন ফের কেনা বাবুর এত প্রশংসা করিলে তখন সত্যি

লোকে হাসি থামাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল কেমন করে?" বাবাজি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"আরে সাধে কি তোমায় বোকা বলি? এতে হাসিবার কথা কি আছে? এরূপ করে যদি আমরা পরস্পরের কার্য্য-কারীতা না বাড়াই, দেশ উদ্ধার হবে কি রূপে?"

বাবাজি এক খানি বই লিখিয়াছিলেন। এক দিন বাবাজির সংবাদ পত্রে বউমা সেই পুস্তকের সুদীর্ঘ সমালোচনা দেখিয়া বলিলেন,—"দেখ তোমার আপনার বইএর বড় প্রশংসা তোমার নিজের কাগজে দেখে লোকে বল্‌বে কি?" বাবাজি এবারও বউমার বুদ্ধির দোষ দিয়া বলিলেন; "বই লিখিয়াছি আমি গ্রন্থকার স্বরূপ; সমালোচনা করিয়াছি আমি সম্পাদক স্বরূপ—ইহাতে দোষ কি? আমি গ্রন্থকার ও আমি, সম্পাদক, এ দুই ভিন্ন ব্যক্তি। তোমার বুদ্ধি থাকিলে এ প্রভেদ বুঝিতে পারিতে।"

বাবাজি একবার দেশ উদ্ধারের জন্য চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুরুষ মহলে অনেক বক্তৃতাদি করিয়া, তথা হইতে অনেক টাকা তুলিয়া শেষটা মেয়ে মহলে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। একদিন কুলবধূদিগের এক বিরাট সভা হইল। বউমার এক খণ্ড হাজার টাকার কাগজ ছিল, তিনি সেখানি দান করিয়া আসিলেন। বাবাজি এই কথা শুনিয়া ক্রোধে লাল হইয়া উঠিলেন। বউমা বাবাজিকে বুঝাইয়া বলিলেন;—তিনি স্বেচ্ছায় ঐ টাকা দান করেন নাই; বাবাজি সকল মেয়েদিগকে কাতর ভাবে আপন আপন স্ত্রীধন এই মহৎ কার্য্যে দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন বলিয়াই তিনি আপনার ধন এই মহৎ কার্য্য সাধনার্থ প্রফুল্ল চিত্তে দান করিয়া আসিয়াছেন। এই তর্কে বাবাজির ধৈর্য্য রাখা কঠিন হইল। পূর্ব্ব জন্মের তপস্যাগুণে বউমা এবার বাবাজির লগুড়াঘাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

পর দিবস বাবাজির সংবাদ পত্রে বউমার বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইল। বউমা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি? কার যে জন্য তুমি আমাকে বড় গালাগালি দিয়াছিলে, আজ তারই জন্য আমাকে এত প্রশংসা করিতেছ!" বাবাজি বলিলেন,—"ঘরের কথা কি সংবাদ পত্রে লেখা যায়?" বউমা বলিলেন,—"কেন? রাম বাবু তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, একথা লইয়া তো তোমার তোমাদের কাগজে কত গালাগালি দিয়াছিলে? এওতো ঘরের কথা ছিল?" বাবাজির আর ধৈর্য্য রহিল না। ক্রোধ-বেগে বলিতে লাগিলেন,—"সাধে কি বলে "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী?"

যোগসাধন।

এখন যোগের প্রতি অনেকের দৃষ্টিপাত হইয়াছে; কেহ ইহার সপক্ষ, কেহ ইহার বিপক্ষ; কাহারও বা ইহার প্রতি অতি শ্রদ্ধা, কাহারও বা যথোচিত শ্রদ্ধা, কাহারও বা অশ্রদ্ধা; কেহ ইহাকে এক প্রকার মনে করেন, কেহ অন্য প্রকার ভাবেন, অথচ প্রকৃত যোগতত্ত্বজ্ঞ অতি বিরল। জ্যৈষ্ঠ মাসের "আলোচনা"তে বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের লিখিত যোগ সাধনের উপহাস ও বিকৃত ভাব এবং পরে মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্ম্মমত বিষয়েও তত্ত্বকৌমুদীতে পাঠ করিয়াছি। যোগ সাধনের অতি মাহাত্ম্য ও তাহার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মের অন্য সাধনকে অবহেলা করা যেমন মূর্খতা, যোগতত্ত্ব কিছু না বুঝিয়া যোগসাধন বা প্রকৃত যোগীকে উপহাস করাও তেমনই অন্যায়। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে এ বিষয়ে যখন অনেক মত ভেদ হইয়াছে, তখন লেখকের যোগতত্ত্ব বিষয়ে যাহা পরীক্ষা ও জ্ঞান, তাহা প্রকাশ করিলে (যদিও তাহার বিদ্যা বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র) এ পত্রিকার পাঠক বর্গের কিছু উপকার হইতে পারে, এই ভাবিয়া এবং কর্ত্তব্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম।

ধর্ম্মের চারি পা, হিন্দু শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু উক্ত শাস্ত্রকারেরা যে পায়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। আমি নিম্নলিখিত চারি পা গ্রহণ করিয়া থাকি—(১) চিত্ত শুদ্ধি বা নিষ্পাপ হওয়া, (২) ভক্তি যোগ, (৩) জ্ঞান (বা সত্য গ্রহণ), এবং (৪) কর্ম্ম (অর্থাৎ পরোপকারাদি)। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যে সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, তাহাতে ধর্ম্মের প্রথমোক্ত দুই পদ প্রবল হইবে, এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান নেতাগণ যে ভাবে যাইতেছেন, তাহাতে শেষোক্ত দুই পদ প্রাবল্য লাভ করিবে। ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য চারি পদেরই সমান গতি আবশ্যক। এখানে আমার কথার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, গোস্বামী মহাশয় জ্ঞান ও কর্ম্ম হীন, বা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ যোগ ও চিত্ত-শুদ্ধি-রহিত। আমার বক্তব্য এই মাত্র যে, প্রথমোক্তের

দৃষ্টি ধর্ম্মের প্রথম দুই পায়ের দিকে যত, শেষ দুই পায়ের দিকে তত নহে; এবং শেষোক্তদিগের দৃষ্টি যত শেষ দুই পায়ের দিকে, প্রথম দুই পায়ের দিকে তত নহে। নতুবা গোস্বামী মহাশয় বা মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের আচরণে তাঁহারা এত দোষ দেখিতেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেকে এই অভাব দেখিতেছেন যে, ইহা কেবল যুক্তির ধর্ম্ম,ইহাতে সিদ্ধ পুরুষ নাই; কিন্তু মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন, মহাত্মা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন; ইহাতে আমি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপার নিদর্শনই দেখিতেছি। প্রথমোক্ত দুই মহাত্মার ধর্ম্ম মত বিষয়ে এস্থলে আমি কিছু বলিতে চাহি না, কিন্তু যোগতত্ত্ব বর্ণনের সহিত শেষোক্ত মহাত্মার নূতন মত সম্বন্ধে কিছু বলিব।

যোগের প্রকার ভেদ এত যে, তাহা বর্ণন করিতে গেলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হয়। উপনিষদের যোগাপেক্ষা পাতঞ্জল-যোগ কিছু বিভিন্ন প্রকারের; তন্ত্রের ষটচক্রভেদ নামক যোগ এক প্রকার, বুদ্ধের 'আস্ফানক ধ্যান' নামক যোগ অন্য প্রকার; ঈশা ও মহম্মদের যোগ আর এক প্রকার। গোরক্ষনাথের হঠযোগ এক প্রকার; মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কেশবচন্দ্র সেনের, এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ব্রাহ্মযোগ অন্য প্রকার; দেবদর্শক (Spiritualist) দিগের Clairvoyance নামক যোগ আর এক প্রকার। কিন্তু যোগতত্ত্ব সকল যোগের মধ্যে একই। এস্থলে বাবু গোবিন্দ চন্দ্র রায়ের যোগ ব্যাখ্যাকে আমি যোগের প্রকার ভেদ বলিতে পারি না, যেহেতু তাহা যোগতত্ত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে। অনেক যোগীরা ভাবেন যে,তিনি যে প্রকার যোগপ্রণালী (Arts) শিক্ষা করিয়াছেন তাহাই যথার্থ যোগ, অন্য সকল প্রণালী ভ্রম মাত্র; কিন্তু ইহা যোগতত্ত্ব (Science) না বুঝিবার ফল। যোগ শাস্ত্রকার যোগের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাই অল্পাক্ষরে যোগের সমীচীন বর্ণন। তিনি বলিয়াছেন"যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ" চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তি নিরোধের তাৎপর্য্য কি? ধ্যেয় বস্তু ভিন্ন যে কোন বস্তুতে চিত্ত যায়, তাহা হইতে চিত্তকে নিরুদ্ধ করা। ধ্যেয় বস্তু সকল যোগীর এক নহে। কিন্তু ধ্যেয় ভেদে যোগ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে; সাবলম্ব যোগ এবং নিরবলম্ব যোগ। সাবলম্ব যোগে ধ্যেয় পদার্থ-বিশেষ থাকে, নিরবলম্ব যোগে ধ্যেয় পদার্থ স্বাত্ম চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধের যোগ এই প্রকার নিরবলম্ব যোগ ছিল। পৌরাণিক দিগের যোগে ধ্যেয় কল্পিত সাকার বস্তু বিশেষ,

অতএব তাহা সাবলম্ব যোগ। কেশব বাবু বা বিজয় বাবুর যোগে ধ্যেয় যদিও নিরাকার, তথাপি তাঁহাদিগের যোগ সাবলম্ব; যেহেতু আত্মচৈতন্যের আলোতে তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের ভাবনা করেন। ফলতঃ সাবলম্ব যোগ objective এবং নিরবলম্ব যোগ Subjective; কিন্তু যোগ যাহাই হউক, তাহাতে লাভ কি? জড়বাদী (Materialists) বা হিতবাদীরা (Utilitarians) জিজ্ঞাসা করিবেন Cui bono যোগের ফল কি? শরীর মনকে অস্বাভাবিক ভাবে নিযুক্ত করিবার ফল কি? যাঁহারা বিভূতি বা সিদ্ধি (Miracle) ভাল বাসেন, তাঁহারা উত্তর দিবেন, যোগের ফল অলৌকিক শক্তি লাভ করা; কিন্তু বৈজ্ঞানিক (Scientist) গণ এ উত্তরে তৃপ্ত হইবেন না, যেহেতু তাঁহারা কোন মনুষ্যে অলৌকিক শক্তি দেখিতে পান না। উপাসক ভক্তেরা বলিবেন যে, যোগের প্রয়োজন ঈশ্বরে মন সমাধান মাত্র; কিন্তু অন্য বিশ্বাসীরা বলিবেন তাতেই বা যোগের প্রয়োজন কি? বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই ত হইল? অন্য জ্ঞানাভিমানীরা বলেন যে, প্রার্থনারই বা আবশ্যকতা কি? যাহা আমাদের প্রয়োজনীয়, না চাহিতেই তাহা তিনি দিতেছেন। যোগ ও উপাসনার ফল বিষয়ে এই সকল মত ভেদ রহিয়াছে। এক্ষণে এবিষয়ে যোগতত্ত্ববিদ্‌দিগের সমাধান কি, তাহা ক্রমে বলিতেছি। অনেক যোগীরা ভাবেন যে, যোগের দ্বারা নিজ বলে বা সাধনে তাঁহারা অলৌকিক শক্তি অথবা ঈশ্বর দর্শন লাভ করিবেন, কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি। ভক্তেরা এ বিষয়ে বেশ বলিয়াছেন; যথা ভাগবত গ্রন্থে—

"পানেন তে দেব কথা সুধামাঃ
প্রবৃদ্ধ ভক্ত্যা বিষদাশয়া যে
বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্নীযুর কুণ্ঠ ধিষ্ণ্যং।
তথাপরে চাত্ম সমাধিযোগা
বলেন তীর্ত্বা প্রকৃতিং বলিষ্ঠাং,
ত্বামেব ধীরা পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমস্যান্নতু সেবযাতে।"

"হে দেব! তোমার কথা রূপ অমৃত পান করিয়া ভক্তি প্রবৃদ্ধ হইলে যাঁহাদিগের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তাঁহারা বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে অকুণ্ঠপদ (মুক্তি) লাভ করেন। তথা অপর সাধকেরা আত্মসমাধি রূপ যোগ বলের দ্বারা বলিষ্ঠ প্রকৃতি (শ্রোত) উত্তীর্ণ হইয়া তোমাতেই প্রবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগের (বড়) শ্রম হয়; কিন্তু তোমার সেবার দ্বারা যাঁহারা তোমাকে পাইতে যত্ন করেন তাঁহাদিগের কোন শ্রম হয় না (তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবে তোমাকে পান)"।

"যেঽন্যের বিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিনঃ
ত্বয্যস্ত ভাবাদ বিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ,
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোনাদৃত যুষ্মদংঘ্রয়ঃ।"

"হে অরবিন্দাক্ষ! যাঁহারা মুক্তাভিমানী, তোমাতে ভক্তিভাব না থাকাতে তাঁহাদিগের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ, তাঁহারা অতি কষ্টে (যোগ সমাধি প্রভৃতি সাধনে) পরং পদে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে পতিত হয়েন, যেহেতু তাঁহারা তোমার চরণারবিন্দের আদর করেন নাই।"

বস্তুতঃ মনুষ্য কেবল নিজ যত্নে যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করিতে পারে না। যেমন ভিক্ষুক দাতার দ্বারে ভিক্ষার নিমিত্ত যায়, সেইরূপ যোগের দ্বারা মনুষ্য কেবল ঈশ্বরের সন্নিধানে বা অধ্যাত্ম লোকে উপনীত হয়; আবার দান যেমন দাতার ইচ্ছাধীন, সেইরূপ যোগসিদ্ধি ঈশ্বরের কৃপাধীন। কিন্তু যোগসিদ্ধিটি কি? একটি মনুষ্যের মনঃ কল্পিত, অন্যটি বাস্তবিক। যে সিদ্ধি বুদ্ধিযুক্ত প্রকাশ্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাই বাস্তবিক; যাহা বুদ্ধির প্রমাণে সিদ্ধ না হয় তাহা কল্পিত; তাহা যোগীর মানসিক ভ্রম মাত্র। ঈশ্বর প্রাপ্তি বা মুক্তি যোগাধীন নহে, তাহা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিলেই হইতে পারে। কিন্তু যদিও ঈশ্বর কৃপায় বিনা যোগ সাধনেও দিব্য দৃষ্টি হইতে পারে; তথাপি দিব্য দৃষ্টি বা অলৌকিক শক্তি লাভে যোগ সাধন উপায় এবং ঈশ্বর কৃপা তাহার হেতু।

অলৌকিক শক্তির প্রমাণ কি? সকল জাতীয়, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতাদিগের সাক্ষ্য, এবং অধুনাতন সময়ের Clairvoyant and cumberlant প্রভৃতি মনশ্চিন্তাবেদক দিগের প্রদর্শিত শত শত পরীক্ষা। ইহার মধ্যে

যদিও অনেক স্থলে প্রবঞ্চনা হইয়াছে, তথাপি ইহারও উত্তম প্রমাণ আছে যে, অনেক সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রকার শক্তির কোন কোন যথার্থ দৃষ্টান্তও পাইয়াছেন।

যোগের প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষেপে এই যে, অন্য সমস্ত চিন্তা নিবৃত্তি করিয়া আত্মা যখন কেবল ব্রহ্মচৈতন্যে মনকে সমাধান করিয়া থাকে, তখন সে অধ্যাত্ম লোকে বা ব্রহ্মসন্নিধানে উপনীত হয়। কিন্তু সেখানে উপনীত হইয়াই যে সমস্ত দেখিতে পায়, তাহা নহে। অনেক কাল এই প্রকার আত্ম সমাধান অভ্যাস করিলে, প্রাকৃত বিষয়জ্ঞান তাহার সমাধি অবস্থায় ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে এবং দিব্য চক্ষু উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে; তখন ঈশ্বর কৃপায় সে অনেক অলৌকিক শক্তি ও সত্য লাভ করে এবং ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক দর্শন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ সাধনে একটি মহা বিঘ্নও আছে; যাঁহারা ঈশ্বর-কৃপার উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে না পারেন, তাঁহাদিগের মন সমাধি অবস্থায় চোরের ন্যায় অলক্ষিত ভাবে শৃঙ্খল ছাড়াইয়া ইতস্ততঃ পালায়, এবং নানা প্রকার কল্পিত বস্তু দর্শন করিয়া তাহাকে সত্যভাবে গ্রহণ করে এবং তাহাই জাগ্রদবস্থায় জনসমাজে স্বীয় দেবদৃষ্টি (revelation) বলিয়া প্রকাশ করে।

উক্ত তত্ত্বানুসারে প্রত্যেক মহাত্মার কথিত প্রত্যাদেশ (revelation) সত্য হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, এবং সত্যমিথ্যা জড়িতও হইতে পারে। এই ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট প্রত্যাদেশের মধ্যে কোন্ প্রত্যাদেশ কি প্রকার, ইহা যদি জানিতে হয়, তবে তাহার বুদ্ধিযুক্ত বাহ্য পরীক্ষা আবশ্যক। যেহেতু মহাত্মাদিগের দ্বারাই কথিত হইয়াছে যে, ভাল মন্দ গাছ "(ফলেন পরিচীয়তে)" ফলের দ্বারাই চেনা যায়। * এখন গোস্বামী মহাশয়ের প্রত্যাদেশ বাস্তবিক কি তাঁহার মনঃ কল্পনা মাত্র, ইহার পরীক্ষা না করিয়া যদি আমরা তাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করি, তবে উভয়তঃই আমরা অন্যায় দোষে লিপ্ত হইব। তাঁহার বর্ত্তমান ধর্ম্মমত বিষয়ে যাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ রূপে উদারচিত্ত মনুষ্যদিগের সম্মতি যোগ্য। তাহাতে বক্তব্য কেবল এই হইতে পারে যে, সকল ধর্ম্মসমাজে এবং ধর্ম্মব্যবহারে

* Revelatien অর্থে প্রত্যাদেশ শব্দ কিয়ৎকালাবধি ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই জন্য আমিও সেই অর্থে এ শব্দ গ্রহণ করিলাম, যদিও শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা এ অর্থ প্রতীত হয় না। ইহা অপেক্ষা দেব-প্রকাশ শব্দ শ্রেষ্ঠ বোধ হয়।

সারগ্রাহী হইয়া আমরা যেমন যোগ দিতে পারি, তেমনই সত্যের অনুরোধে তন্মধ্যে যাহা কিছু অসত্য, যাহা ভ্রান্তি, যাহা কুসংস্কার, তাহা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হওয়াও আমাদের উচিত নহে। গোস্বামী মহাশয়ের উপদেশে (যেমন সকল ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের উপদেশে হইয়া থাকে) কোনটা মুখ্য (essential) এবং কোনটা গৌণ (non-essential) থাকিতে পারে। যদি গৌণকে মুখ্য রূপে তিনি উপদেশ দেন, তবেই তিনি সাম্প্রদায়িকতা প্রচার দোষ দোষী হইতে পারেন, নচেৎ তাঁহার মহোদার মতকে সাম্প্রদায়িক বলা অন্যায়। *

শ্রীনবীনচন্দ্র রায়।

আনন্দ মঠ।

"Man can not escape from himself, even when he soars beyond the empyrean, beyond the highest heaven and pants and prays for what can not be altered by human lips. Idealize as we may we are still creatures of flesh and blood. Alike into the mystic's glowing vision and into the horrible mortifications with which the devotee torments himself, the human element forces its way."

* এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা "তত্ত্বকৌমুদীতে" পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মতাদির সমালোচনা করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার প্রতিবাদ বলিয়া আমরা লেখক মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে পরিত্যাগ করিলাম। কারণ, যে কাগজের প্রতিবাদ তাহা সেই কাগজে প্রকাশিত হওয়াই রীতিসঙ্গত।

আং—সং।

মানুষ দেবতা, না মানুষ মানুষ? মানুষ দেবতাও বটে, মানুষও বটে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে, মর্ত্ত্যে নরকে সম্বন্ধ আছে। যখন পরের জন্য মানুষ আপনাকে বলি দেয়, দেব সেবা গুরু সেবা মাতৃ সেবা সন্তান সেবা করিতে দেহ প্রাণ উৎসর্গ করে, তখন মানুষ দেবতা। যখন স্নেহ বাৎসল্য প্রীতির কঠোর গ্রন্থি উচ্ছিন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ তলে সকলই সমর্পণ করিয়া বলে, যেখানে রাখিবে সেখানে থাকিব, যে কাজে লাগাইবে সে কাজে লাগিব, তোমার কাজ শেষ হইলে তোমার কোলে গিয়া বসিব, তখন মানুষ দেবতা। যখন ব্রতের কঠোরতা স্মরণ করিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, প্রিয়তমার মুখচ্ছবি হৃদয় হইতে সাধ করিয়া সরাইয়া দিতে হয়, যাহা অতি যতনে পুষিয়াছিলাম পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া তাহাকে আকাশের বিশাল প্রান্তরে ছাড়িয়া দিতে হয়, আর "আম্রকাণ্ডে মাথা রখিয়া" কাঁদিতে হয়, তখন মানুষ মানুষ মাত্র। দেবতার কাজে স্বামীকে প্রবৃত্ত করিতে স্ত্রী যখন বিষ পান করে, তখন সে দেবতা; আর স্ত্রী পুত্রের জন্য স্বামী যখন দেববাক্য অবহেলা করে, তখন সে মানুষ।

কতকগুলি কাজ আছে, যা দৈবত বা মানুষী নির্ণয় করা সহজ নহে। মনুষ্যত্বের আরম্ভ ও দেবত্বের শেষ বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত। কিন্তু কোথায় মনুষ্যত্বের শেষ ও দেবত্বের আরম্ভ, নিরূপণ করা সাধ্যাতীত। একটী আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে উচ্চ হইয়া আর একটীর এমনি সমকক্ষ হইয়াছে, দুটীর অঙ্গে এমনি মিশ খাইয়াছে যে, একটী হইতে অন্যটীকে প্রভেদ করা যায় না। একই কার্য্য কখন দৈবত, কখন মানুষী বলিয়া ঘোষিত হয়। কতকগুলি কায মানুষে করে, দেবতা করে না; কতকগুলি কাজ দেবতা করে, মানুষে করে না; আর কতকগুলি কাজ দেবতা ও মানুষ উভয়েই করে। আয়েসা দেবতা, ভ্রমর মানুষ; কিন্তু কপালকুণ্ডলা দেবী না মানবী? যখন নিমি বামনীর দাওয়ায় বসিয়া জীব গোঁসাই চরকা খানা ঘেনর ঘেনর করিয়াছিলেন, সেটা দেবতার কি মানুষের কাজ করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না। আনন্দমঠ মানব-দর্শন। সিদ্ধার্থ মানুষকে দেবতা করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। পঞ্চ-ছ-বর্গীয়েরা তাহার প্রমাণ। সত্যানন্দ উদ্দেশ্য-বিশেষ সাধন করিবার জন্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইয়াছিলেন। সত্যানন্দের সন্তান-ধর্ম্ম টেকে নাই, মানুষে মানুষী প্রকৃতি দৈবতপ্রকৃতি অপেক্ষা বলবতী। যে আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভয়াবহ পরধর্ম্ম প্রয়াস করে, সে বিদ্রোহী। "বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।" সুতরাং

সিদ্ধার্থের ন্যায় যে কেহ মানুষকে দেবতা করিতে চেষ্টা করেন, মনুষ্যত্বের হীনতা ঘোষণা করিয়া তাঁহারা মানব সমাজের পীড়ন করেন। বঙ্কিম বাবু নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া বিড়ম্বনা করিতেছেন, আনন্দমঠে বঙ্কিম বাবু এই কথাই বলিয়াছেন। মানুষ নূতন জন্ম পাইয়া মনে করে, সমুদয় সৌরমণ্ডল উদরসাৎ করিলেও বুঝি তাহার ক্ষুধার তৃপ্তি হইবে না, বুঝি বাহুবলে হিমাচল উন্মূল করিয়া সাগরের অতলগর্ভে ডুবাইয়া দিতে পারে, স্বর্গবাসী দেবলোকের সহিত পরীক্ষায় বিজয় লাভ করিতে পারে, মায়ার বন্ধন কাটাইয়া নিষ্কাম হইতে পারে! মল্লভূমে উপস্থিত হইলে সে দর্প চূর্ণ হয়, চোখে সে দেখে না, কাণে সে শুনে না, হাতে একগাছি লাঠি ধরিতে পারে না, পায়ে এক পদ চলিতে পারে না; হৃদয় অবসন্ন হয়, মস্তক ঘুরিতে থাকে। এক সময় বিশাল বিশ্ব গোষ্পদের ন্যায় ক্ষুদ্র পরিমিত রুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইত, পরীক্ষাক্ষেত্রে ঘৃণিত কীট-গহ্বর বিশাল বিশ্বাপেক্ষা বিশালতর প্রতীয়মান হয়। হরিণ-শিশু ঋষির দেবতা হয়, কদর্য্য কু-সন্তান স্কন্ধে করিয়া নারদ মুনি লোকের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা যাচঞা করেন!

এক দিন দেবতা ও মানবে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। জীবানন্দ মানুষ, মানুষের শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতবীর, নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধক, সত্যানন্দের প্রধান শিষ্য। শান্তি দেবী তাঁহার পত্নী। পূর্ণ যৌবনে পতি-বিরহে সে বিরহিনী হইলেও বিরহ-কাতরা নহে, স্বামীর ধর্ম্মচ্যুতি ভয়ে কাতরা। নিমাই ঠাকুরাণী দুজনের সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন। তাঁহারা সুখী হইবেন, নিমাইয়ের সেই সুখ। সেই সুখের লোভে সে দাদার কাছে কিল খাইতেও চাহিয়াছিল। দেবতা বলিতেছেন——"আমার জন্য কাঁদিও না, তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।" মনুষ্য বলিতেছে—"একদিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ জগৎ সংসার, এক দিকে ব্রত হোম যজ্ঞ; সবই এক দিকে, আর এক দিকে তুমি, আমি সকল সময় বুঝিতে পারি না কোন্ দিকে ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে, তোমায় লইয়া স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ! যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল, তাহা অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শত-গ্রন্থী বস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা দেশে আতুর আর কে আছে? আমার

সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি। সে ধর্ম্ম যে ত্যাগ করিল তাহার কাছে আবার সনাতন ধর্ম্ম কি? তুমি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই, আর ফিরিব না।" সাধনায় এই পর্য্যন্ত হয়। শান্তি কর্ম্মবৃক্ষের অপূর্ব্ব ফল। পলাতক স্বামীকে স্বধর্ম্মে প্রণোদিত করিবার জন্য সে আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া বলিল "ছি, তুমি বীর! আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীর-পত্নী; তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীর-ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না, আমি সে সুখ চাহি না; কিন্তু তুমি তোমার বীর-ধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না"। শিক্ষা বা সাধনায় প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। কর্ম্ম-ফল অতিক্রম করে সাধ্য কার? যে দেবতা হইয়া জন্মিয়াছে, সে দেবতাই থাকিবে; তাহার নিকট শিক্ষা অনাবশ্যক। যে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছে, সে মনুষ্যই থাকিবে।

সন্তান-ধর্ম্ম মনুষ্যের জন্য নহে। কেবল প্রায়শ্চিত্তে বাধ্য করিয়া প্রাণান্ত ঘটায়, নিরাশার গরলে মানুষের জীবন বিষময় করিয়া তুলে। বঙ্কিম বাবু দেখাইতে গিয়াছিলেন যে "বাঙ্গালির স্ত্রী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালির প্রধান সহায়," কিন্তু আরও কিছু দেখাইয়া ফেলিয়াছেন। "সন্তান-ধর্ম্ম যে গ্রহণ করে, ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা স্বজন কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে নাই। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে।" "যে সর্ব্বত্যাগী সে ভিন্ন অপর কেহ সন্তানের কার্য্যের উপযুক্ত নহে। মায়া-রজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।" "সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত ও অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী"। ক্ষুদ্র দরের সন্তান। "যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী; তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা।"

শান্তি বেটী কিন্তু মানুষ। শান্তি নর-দেবতা। শান্তি স্বামীর ব্রত রক্ষা করিবার জন্য একদিন আপন সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিল। পরদিন তাহার মনুষ্যত্ব প্রবল হইল, সে যুক্তি দিয়া মনটাকে কোন প্রকারে বুঝাইয়া লইল যে, এমন কৌশল করা যাইতে পারে যে, স্বামীরও ব্রত রক্ষা হয়, আপনারও স্বামি-সঙ্গ লাভ হয়। সে সত্যানন্দকে বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার প্রণীত উদাসীন ধর্ম্ম মনুষ্যের অনাচরণীয়, অসম্ভব। দীক্ষা-রাত্রে স্বামীকে লইয়া সে যে কাণ্ডটা করিল, তাহাতে দেখাইল যে, সে

মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিতে পারে নাই। মানুষ দেবতা হইতে পারে না; তাহার দেবত্বের সঙ্গে মনুষ্যত্বের মিশাল থাকিবেই থাকিবে। কখন আলোকে, কখন আঁধারে, কখন আলো-আঁধারে মানুষ ঘুরে। তাহার আলো আঁধার ছাড়া নয়, ঘোর আঁধারের মধ্যেও জোনাকীর মতন একটু আলো টিপটিপ করেই। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় ছায়ার নিশানা পাওয়া যায়। বনচারী ব্রহ্মচারী মানব-প্রকৃতি বুঝেন না। মহান্ মহীরুহেরও যে অনাবৃষ্টির ভয় হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের সম্ভব গোচর হয় না। তাই তাঁহারা মানুষের জন্য অতি-মানুষী ব্যবস্থা করেন, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ঘুচাইতে প্রয়াস পান। দড়ির জোর না বুঝিয়া টান দিলে দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। সত্যানন্দ মানব-প্রকৃতি বুঝেন নাই। জীবানন্দের আচরণে আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়াছি।

সন্তান-নায়কত্রয়ের তৃতীয় ভবানন্দ। ইনি প্রথম পরীক্ষাতেই পরাস্ত হইয়াছিলেন। যে দিন তিনি কল্যাণীকে প্রাণ দান করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাহার পাদমূলে বিক্রীত হইয়াছিলেন। অন্যে যখন শাস্ত্র বা কর্ত্তব্যের আলোচনা করিত, তিনি তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া এক খানা মুখ ভাবিতেন। মুখখানা বড় সুন্দর। কৃষ্ণকুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারি ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। কল্যাণীর রূপে তাঁহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল। তাহাকে পাইবার জন্য তিনি সন্তান ধর্ম্ম, পরকাল, মহাব্রত, ভবানন্দ নাম পর্য্যন্ত অতল জলে ডুবাইতে চাহিয়াছিলেন। কল্যাণীর মত রূপরাশি জগতে আছে জানিলে, তিনি সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন না। পৃথিবীতে সুখ নাই দেখিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। যত দিন পরীক্ষায় পড়েন নাই, মল্লভূমে নামেন নাই, ততদিন বাহুবলের অহঙ্কার করিতেন। পরীক্ষায় পড়িবামাত্র তাঁহার ধর্ম্ম পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ক্ষীণস্বরে কাতর-কণ্ঠে মানব প্রকৃতির প্রবলতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

"যততোঽপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ
ইন্দ্রিয়ানি প্রমাথীনি হরন্তি প্রযতং মনঃ"

"মনুষ্য হউন ঋষি হউন দেবতা হউন চিত্ত অবশ।" একমাত্র মহেন্দ্র সিংহ ব্রত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; তিনি জানিতেন, বিষ পানে

কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছে। ব্রত ভঙ্গ করিবার তাহার কোন কারণ ঘটে নাই। ভবানন্দ যখন বুঝিলেন, কল্যাণীকে পাইবার তাঁহার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনিও কর্ত্তব্যের মহত্ত্বতা স্মরণ করিলেন। শিক্ষার গুণ দেখা দিল। ক্ষণকালের জন্য ক্ষুদ্র গজদেহ ভাগিরথী-জলস্রোতে প্রতিরোধ করিল। ভালবাসিতে পারা, প্রাণ দিতে পারার অপেক্ষা হীনতর কেন, বুঝিলাম না। ভক্তির অনুশীলন ভালবাসার অনুশীলন অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ? দুইটী বৃত্তিইত একজনের। অবশিষ্ট সন্তান গুরু স্বয়ং সত্যানন্দ। তিনি ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলনে নিয়তেন্দ্রিয়, মহাকর্ত্তব্যের সাধনে একান্ত-প্রাণ। বনচারী ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকের মর্ম্ম ভাল রূপ বুঝিতে পারেন নাই, তথাপি বুড়া বয়সেও কণ্ঠের স্বর ও চোখের চাহনি বুঝিবার ক্ষমতা রাখিতেন, এবং রমণী কটাক্ষে কখন কখন বিদ্যুৎ দেখিতেন! তিনিও মায়ার রজ্জু কাটিতে পারেন নাই। জীবানন্দকে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে স্মরণ করিয়া চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিয়াছিলেন। সকল শিষ্যের মধ্যে তাঁহাকে বিশেষ রূপে প্রীতি করিতেন। তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। মায়ায় পড়িয়া শান্তিকে সদুপদেশ দিতেও ত্রুটি করেন নাই।

বস্তুতঃ যার বুকে কাদাপোরা কলসী বাঁধা, সে কি ভব-সমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল, সে কি দৌড়ায়? সত্যানন্দ প্রেমকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান-ধর্ম্ম আধখানা ধর্ম্ম। সে আধখানা ধর্ম্মও কেহ পালন করিতে পারিল না, কেহ পারিবে না। আনন্দমঠ মনুষ্যত্বের শ্মশান-ভস্মে পরিপূর্ণ। মনুষ্য দেবতা হইতে পারে না, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ঘুচে না, শিক্ষা বা সাধনা কর্ম্মফলের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। সত্যানন্দ উদ্দেশ্য-বিশেষ সাধনার জন্য সন্তান-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য-বিশেষ সাধনার জন্য নিষ্কাম-ধর্ম্ম প্রচার করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে নিষ্কাম-ধর্ম্মের ভিন্নরূপ নামকরণ করিতে হয়। যিনি প্রথম নিষ্কাম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি একজন সাধক। দূর হইতে ঘন বনরাজি মধ্যে সুন্দর প্রাসাদ দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র, প্রবেশ করিতে পারেন নাই, মুক্ত হন নাই। মুক্ত হইলে তিনি নিষ্কাম-ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন না।

মানুষের মনুষ্যত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা করিয়া এপর্য্যন্ত কেহ সফল হন নাই। কেহ কখন সফল হইবেন না। পরন্তু বৃথা চেষ্টা করিয়া মানব জীবনকে অনন্ত তুষানল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। স্বীকার করিতে কষ্ট হইলেও, স্বীকার করিবার ফল আশঙ্কাজনক হইলেও, কর্ম্ম ফলের অকাট্যতা কাহাকেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মনুষ্যত্বের উপর যাহারা মস্তাকাঘাত করিবেন, তাঁহাদেরই মস্তক চূর্ণিত হইবে। অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা হইবে, ওজন না বুঝিয়া মানদণ্ডে তুলিত হইতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা মাত্র। সত্যানন্দের মনস্কাম কখন পূর্ণ হইবে না, সন্তান-ধর্ম্ম অতলজলে ডুবাইয়া দাও। অমৃত সিঞ্চনে বিষের ক্ষয় হয় না। জ্ঞান ও ভক্তির অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, একবার প্রেমের পরীক্ষা করিয়া দেখা ভাল। মনুষ্যত্ব দেবত্ব অপেক্ষা হীনতর নহে, দেবত্বের প্রয়াসী না হইয়া মনুষ্য মনুষ্যত্বের অনুশীলন করিলে এতদিনে দেবতা হইত। মনুষ্যত্বই মনুষ্যের পূর্ণ আদর্শ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

বালক ও বালা।

সংসারের এই গভীর গহনে
উচুতে শোভে যে ডালা।
মুকুলিত তায় কলিকা যুগল
বিমল বালক বালা ॥১

মানুষের কলি জন্তুর জঙ্গলে
বিকশি আগায় যার।
ছড়াবে আপন মহত্ব আসন
এই সে আশয় তার ॥২

এই সে আশয়ে হয় মুকুলিত
কলিতে বালক বালা।
হইয়া অঙ্কুরে শকতিনিকর
মনের পাকড়ী মালা ॥৩

বালক যেমন তরুণ অরুণ,
বালা শশিকলা প্রায়।
বালক প্রচণ্ড প্রখর, বালিকা
মৃদুল মধুরতায় ॥৪

অথবা বালক মানব-ফুলের
করকশ ছাল কাটি।
বালিকা তাহার স্থিতিস্থাপকতা
কোমলতা পরিপাটি ॥৫

তপত শীতল কঠিন কোমল
শুকনা ভিজা যেমন।
বালক বালিকা সংসার বাগানে
শোভয়ে দোঁহে তেমন ॥৬

লাগে আধ আধ এক বিনা আর
নাহি শোভা পায় লোকে।
দুরবহ যথা যামিনী বিহনে
বসুমতি দিবালোকে ॥৭

না থাকিলে দিন জমি যায় সব
নিশির শীতল বাতে।
না রহিলে নিশি পুড়ি যায় লোক
দারুণ রবির তাতে ॥৮

গুণে কি গৌরবে দিবা রাতি যেন
কেহ না কা'হতে বড়।
কেহনা কা'হতে উচু কিবা নীচু
কাজের অধিকতর ॥৯

এভাবে ভবিষ্য মানব-মুকুল
বালক বালা যতেক।
আধ আধ হয়ে বেড়ায় এ ভবে
দু আধখানিতে এক ॥১০

বাঁধা গায় গায় প্রণয়-বোঁটায়
দু কলিতে এক ফুল।
বিকাশ যাহার আকাশে, যদিও
জন্তুর জঙ্গলে মূল ॥১১

জন্তুর জঙ্গলে বিচরে শিকড়ে
আহার বিহার তরে।
কিন্তু রয় ফুটি নিরখি গগন
সুরভি-পোরা অন্তরে ॥১২

ছড়ায় সুগন্ধ বিতরয়ে সুধা
খুলিয়া জ্ঞানের কোটা।
বিছায় ভূতলে ছায়া ও আশ্রয়
মেলি নানা রঙে ছটা ॥১৩

মনের লতায় প্রকৃতির গায়
বায় সে দুকলি নিতি।
আশ্রিয়া তাহার সম্পদ সম্ভার
সুখে করে দোঁহে স্থিতি ॥১৪

যথা যাহা পায় তল্লাসে সুন্দর
পরীক্ষিত তত্ত্বরাশি।
পিয়া বিন্দু বিন্দু সে সত্য শিশির
বাড়ে দোঁহে দিবানিশি ॥১৫

গলে চারি দিশি কাদা পাঁকমাটি
দুরিত শটিত কত।
সব হতে সার তোলয়ে তাহার
জ্ঞান বুদ্ধি শিরা যত ॥১৬

না লাগে দুর্গন্ধ না লাগে সে পাঁক
না লাগে সে মলা তারে।
রহে পুষ্পপ্রায় বিরাজি উচায়
প্রফুল্ল পবিত্রাকারে ॥১৭

মানুষের কলি জন্তুর জঙ্গলে
ফোটে সদা এই ভাবে।
রহে যবে তার অবিকৃত সব
সুন্দর সুখ স্বভাবে ॥১৮

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রায়।

খাদ্য।

খাদ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই। লোকে যাহা ভোজ্য বলিয়া আহার করিয়া থাকে, তাহাকেই খাদ্য বলিতেছি। বাষ্পীয় কলে কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রদানের জন্য যেমন ইন্ধনের আবশ্যক, এবং নিয়ত চালনায় ক্ষয়াংশ পূরণের জন্য যেমন ধাতুর (materials) আবশ্যক; সেইরূপ জন্তুর শরীরে বলাধানের নিমিত্ত ইন্ধনের (fuel) এবং শারীরিক বা মানসিক পরিচালনায়-ক্ষয়-প্রাপ্ত অংশ পরিপূরণের জন্য তদোপযোগী দ্রব্যের আবশ্যক। যে দ্রব্যে বা দ্রব্য সমূহে এই কার্য্য সমাধা হইতে পারে, তাহাই সম্পূর্ণ খাদ্য (perfect food)। দুগ্ধ এবং ডিম্বে এই দুই কার্য্য যথোচিত সম্পন্ন হয়। দুগ্ধ ডিম্বে যে যে যৌগিক পদার্থ যে পরিমাণে আছে, সেই সকল পদার্থ যদি অন্যত্র হইতে সেই পরিমাণে আহরণ করিয়া লই, তবে তাহাও শরীরের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে। এই সকল পদার্থ আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। মানবীয় খাদ্য নিম্ন লিখিত কয় ভাগে বিভক্ত হইতে পারে,—

১। নাইট্রোজিনাস্ বা প্রোটিড্স্।

২। (ক) হাইড্রো কার্ব্বন বা চর্ব্বি (fats)।
   (খ) কার্ব্বহাইড্রেট্স্ বা এরারুটাদি (starches)

৩। ধাতব (inorganic or mineral)

শরীরের অধিকাংশই প্রোটিড্স্। শরীরের অর্দ্ধেকই রক্ত ও মাংস। সুতরাং খাদ্যে প্রোটিড্সের অধিকাংশ আবশ্যক। এই প্রোটিড্স্ আমিষ ও নিরামিষ উভয় পদার্থ হইতেই পাওয়া যায়; কিন্তু আমিষ অপেক্ষা নিরামিষে অধিক পাওয়া যায় একথা ঠিক নহে। সমান সমান ভাগে নিরামিষ (আলু, যব, গম, মটর ইত্যাদি) অপেক্ষা আমিষ পদার্থে বরং অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। ছাগ মাংসে শতকরা ১৫ ভাগ প্রোটিড্স্, মৎস্যে ১৮ ভাগ, গমে ১১ ভাগ, চাউলে ৫ ভাগ, আলুতে ১½ ভাগ।

প্রোটিড্স্ আমাদের শরীরের ক্ষয়াংশ পূরণ করে। চর্ব্বিতে শরীরে উত্তাপ ও কার্য্যকরী শক্তি প্রদান করে। ষ্টার্চ্চেও শরীরে উত্তাপ ও

কার্য্যকরী ক্ষমতা প্রদান করে। ছাগ মাংসে শতকরা ৯হইতে ৩০ভাগ চর্ব্বি, মৎস্যে ৩ ভাগ, গমে ২ ভাগ,চাউলে ⅝ ভাগ,দুগ্ধে ৩ ভাগ,মাখনে ৯১ভাগ।

শরীর রক্ষার্থে চারি প্রকার খাদ্যেরই প্রয়োজন। শুদ্ধ প্রথম প্রকার খাদ্যে যেমন শরীর রক্ষা পায় না; তেমনি কেবল দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রকার খাদ্যেও জীবন ধারণ করা যায় না। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকেরা এবিষয়ে বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। শরীর হইতে প্রত্যহ ৪৫০০ গ্রেণ (প্রায় আড়াই ছটাক) অঙ্গারক (Carbon) ও ৩০০ গ্রেণ যবক্ষারজন (Nitrogen) নির্গত হয়। খাদ্য হইতে এই ক্ষয়াংশ পরিপূরিত হয়। মাংসে ১০ ভাগ কার্ব্বন্ ও ৩ ভাগ নাইট্রোজন্। সুতরাং মাংস খাইয়া শরীরের কার্ব্বন্ পূরাইতে হইলে (মাংসে কার্ব্বন্ ৪৫০০ গ্রেণ, নাইট্রোজন্ ১৩৫০ গ্রেণ) ক্ষয়াংশ পরিপূরণের জন্য যতটা আবশ্যক, তদপেক্ষা ১০৫০ গ্রেণ অধিক নাইট্রোজন্ ভক্ষণ করা হয়; তদ্দ্বারা শরীরের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। রুটিতে ৩০ ভাগ কার্ব্বন্, ১ ভাগ নাইট্রোজন্। কেবল রুটি খাইয়া যদি নাইট্রোজন্ পূরাইতে হয়, তবে ৪৫০০ গ্রেণ অধিক কার্ব্বন্ খাইতে হয়; তদ্দ্বারাও আবার রোগ জন্মানের আশঙ্কা। কার্ব্বন্ পূরণোপযোগী রুটি খাইতে হইলে নাইট্রোজন্ অভাবে মরিতে হয়। কিন্তু রুটিমাংস দুই মিশাইয়া খাইলে একের অভাব অপরে পূরণ করে; সুতরাং ইহাই উপযুক্ত খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

শরীর ধারণোপযোগী সমস্ত পদার্থই উদ্ভিদ জগৎ হইতে পাওয়া যায়, নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহা তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা দ্বারা বাছিয়া লইতে হয়। কেবল "আলু ভাতে ভাত" দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না; বরং অধিক কাল ব্যবহার করিলে পীড়া হয়। মটর, ছোলা, অরহর, প্রভৃতি অন্যান্য শস্যেরও আবশ্যক। ইহাতেও সকল সময়ে সম্পূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় না; সেই জন্য অর্দ্ধামিষ দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক। প্রকৃত নিরামিষ ধরিতে গেলে দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি জান্তব খাদ্য মাত্রেই আমিষ মধ্যে গণ্য করা উচিত। এখন দেখা গেল, নিরামিষ এবং নিরামিষ-আমিষ উভয়ই শারীরিক পুষ্টি সাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

অনেকে বলেন, আমিষ ভক্ষণে অনেক দোষ জন্মে; ভাল করিতে যাইয়া অনেক মন্দ করিয়া ফেলি। তবে এখন আমিষ ও নিরামিষের

দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কেহ কেহ বলেন, মাংসাশী সিংহ, শার্দ্দূল অপেক্ষা হস্তী ও গণ্ডারের দৈহিক শক্তি অনেক পরিমাণে অধিক্। মানুষের মধ্যেও আমিষভোজী বাঙ্গালি অপেক্ষা নিরামিষভোজী হিন্দুস্থানীরা সামর্থ্য, সাহস ও দৃঢ়তায় শ্রেষ্ঠ। ইহাতেই প্রমাণ হয় ফল শস্যের গুণ অধিক; মৎস্য মাংস অপেক্ষা ইহাতে বলকর শক্তি অধি পরিমাণে বিদ্যমান! আমাদের নিকট এ যুক্তি কিন্তু তত সঙ্গত বলি মনে হয় না। বিষয় গুলি যে প্রকৃত নহে, তাহা বলিতেছি না। ঝি সিংহ অপেক্ষা হস্তীর বল অধিক, ইহাতে কি কিছু প্রমাণ হয়? যদি ঝি হয়, তাহা আমিষভোজীদিগের পক্ষেই বরং দাঁড়ায়। সিংহ ও হ তুলনীয় নহে, শারীর গত প্রভেদ অত্যন্ত। সিংহ যদি হস্তীর শ শরীর বিশিষ্ট হইত, তবেই এ যুক্তির বল কিছু থাকিত। অথবা এক মাংসাদ সিংহ যদি একটা শস্যাদ সিংহ হইতে কম বলবান হইত, অ না হয় বুঝিতাম শস্যের গুণ অধিক। বাঙ্গালির সহিত হিন্দুস্থানীর তুলনা, ইহা পূর্ব্বযুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; কিন্তু ইহাতেও যে বি প্রমাণ হয়, এরূপ মনে হয় না। আমি মাছ-খোর, সুতরাং আমি হী বল; রাম বাবু চারি-পুরুষে নিরামিষভোজী, তবে কেন তুলসী পাঁ তাঁহার অপেক্ষা অধিক বলবান? তবে যদি বেশি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক তবে ইহার উত্তর এই হইতে পারে যে, ওটা বংশপরম্পরাগত (Hirid দোষ, মাছ খাইয়া খাইয়া বাঙ্গালী জাতির শরীর এইরূপ হইয়াছে ইহা তিন চারি পুরুষে শুধ্‌রাইবার নহে। আচ্ছা, হিন্দুস্থানীর প্রতিবে আখ্‌গানীকে দেখ! ইহারা চিরকাল আমিষভোজী,——গো-খাদকে জাত। ইহারাত সামর্থ্য, সাহসিকতা ও দৃঢ়তায় হিন্দুস্থানী অপেক্ষা কে অংশেই নিকৃষ্ট নহে। এটা কি শুদ্ধ আমিষের গুণ? ফল শস্যে য এতই গুণ থাকে, তবে মৎস্য-প্রাণ বাঙ্গালী অপেক্ষা শাক-প্রাণ বাঙ্গা কেন অধিক বলবান নহে? নদীয়া ও মুরশিদাবাদ বৈষ্ণব প্রধান প্রদে এখানে অর্দ্ধেকের অধিক নিরামিষ ভোজী। ঐ সকল স্থানের লোকগু ভাব অন্যান্য জেলার লোক অপেক্ষা অধিক বলবান হওয়া উচিত; কি তাহাই কি? পক্ষান্তরে বরং দুর্ব্বল ও রুগ্ন। অনেক নিরামিষভো আখ্‌ড়াধারী বৈষ্ণবকে মাংসাদ জাতভায়া হইতে মোটা-ভোড়ী দেখা য বটে, কিন্তু শারীরিক বল মোটা-ভোড়ীর উপর নির্ভর করে না। বাঙ্গা

হিন্দুস্থানীর বলের প্রভেদ কি কেবল আমিষ ও নিরামিষ ভক্ষণে? ঙ্গালী যদি মাছ মাংস খাওয়া পরিত্যাগ করে, তবে কি কোন ালে ইহাদের শরীর নূতন উপাদানে গঠিত হইয়া হিন্দুস্থানীর মত ইবে? তাহা যদি হয়, তবে নিরামিষ-ভোজন প্রচারে আমিও একজন দ্রী হইতে রাজি আছি। কেবল খাদ্যই শরীরগত প্রভেদের নিয়ামক হেন দেশের জল বায়ু, সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতি অনেক পরোক্ষ অপরোক্ষ কারণ মানব শরীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আমিষভোজী নিরামিষভোজীই হউক, সমতলবাসী অপেক্ষা পর্ব্বত ও উপত্যকাবাসী ধিকতর বলবান হইবেই হইবে।

গোলআলু আইরিস্‌দিগের প্রধান খাদ্য। ইহারা মাংসাদ-প্রধান রেজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, এই যুক্তি দ্বারা আলুর একমাত্র ণ প্রকাশ করিতেছে না। একজন ইংরেজ প্রত্যহ দেড় সের মাংস খায়, ার, একজন আইরিস্ প্রত্যহ ৫ পাঁচ সের আলু খায়, ইহার সহিত বেকন ার হেরিঙও যথেষ্ট পরিমাণে খাইয়া থাকে; সুধু আলু খায় না। সুতরাং হাতে নিরামিষের প্রাধান্য কি হইল? নিরামিষ ভক্ষণে শক্তি সঞ্চার য় না, একথা বলিতেছি না; কিন্তু তাহার বিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করিতে রি না। বরং শরীর রক্ষার্থ আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ পদার্থ ৪।৫ গুণ ধিক উদরসাৎ করিতে হয়। ইহার কারণ, একই পরিমাণের আমিষ পেক্ষা নিরামিষে সার ভাগ কম।

কেহ কেহ বলেন,—আমিষ ভক্ষণে মনুষ্যের কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত ; ক্রোধ, হিংসা, জিঘাংসা প্রভৃতি অপরাপর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল বল- তী হইয়া উঠে। কামেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইবে বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে বিধবাগণের নিরামিষ ভক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যাঘ্র প্রভৃতির হিংস্রতার কারণ মাংস ভোজন। বর্ব্বর জাতি মাংস খায় বলিয়া নিরন্তর বিবাদ করে ইত্যাদি। এরূপ বলিবার তাঁহাদের গুরুতর যুক্তি বা প্রমাণ আছে কি না, জানি না। নিরামিষ-ভোজীদিগের কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি যদি অত্যল্প হইত, তবে বুঝিতাম ইহা আমিষের দোষ। কিন্তু হিন্দুস্থানীরা নিরামিষভোজী, অথচ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ বিষয়ে বাঙ্গালী অপেক্ষা বরং অনেক অংশে জঘন্য ও হীন। যাঁহারা অধিক দিন পশ্চিমে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই একথার যাথার্থ্য প্রমাণ করিবেন। তার পর বৈষ্ণব-

প্রধান প্রদেশে নিরামিষভোজীদিগের অশ্লীষ কাণ্ডের অভাবও বড় অধিক নহে। নিরামিষ ভক্ষণের আড্ডা "আখ্‌ড়ায়" যে সকল জঘন্য অভিনয় অভিনীত হয়, তাহা অনেকেরই অবিদিত নহে। নবীন এলোকেশীর ঘটনা আজও বাঙ্গালীর স্মৃতিপট হইতে অপসৃত হয় নাই। নিরামিষ ভক্ষণ করেন বলিয়া কি হিন্দু বিধবাদিগের ঐ বৃত্তি লোপ পাইয়াছে? ভ্রূণ হত্যার তালিকা (statastics) দেখিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। বিধবাদিগের কি অধিকাংশেরই ক্রোধ হিংসার অভাব? আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ত ওরূপ বোধ হয় না।

"ব্যাঘ্রজাতির হিংস্রতা যদি মাংস ভোজন জন্য" হয়, তবে নিরামিষভোজী জন্তুদিগকে তদপেক্ষা হিংস্র দেখা যায় কেন? প্রাণিবৃত্তান্তের পুস্তক পড়িতেছিলাম, তাহাতে হরিণের বিষয় একস্থানে লিখিত আছে—"He (the Elk) is a furious animal and often becomes seized with a violent excitement, that finds vent in fighting with every living creature that may cross his hath" (J. G. wood's Natural History. Chap.Deer.) হরিণ তৃণ শস্য ভোজী, ইহার এ দুর্দ্দশা কেন? তারপর বানরের বিষয় পড়িলাম। অনেক প্রকার বানর আছে, যাহারা অত্যন্ত হিংস্র ও কোপনস্বভাব। একটার নমুনা দিতেছি—Of all the Baboon, the Mandrill appears to be the most hopelessly savage—mercy it has none. They are ferocious and generally untameable. Ibid—Chap. Baboons.) বানরেরাও নিরামিষভোজী!! মহিষ জাতির হিংস্রতার কথা সকলেই অবগত আছেন। তবেই ব্যাঘ্রের হিংস্রতা কেবল মাংস ভক্ষণের দোষেই নহে। সিংহও ত মাংস খায়, অথচ ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র ও জিঘাংসু নহে। তবেই দেখা যাইতেছে, মাংস ব্যাঘ্রের উপর যে কাজ করিল সিংহের উপর সে কাজ করিল না। গ্রাম্য শৃগাল কুকুর অপেক্ষা শ্মশানবাসী শৃগাল কুকুরের অধিক হিংস্রতার কারণ মাংস ভক্ষণ নহে,—পচা ও রোগা মাংস ভক্ষণই তাহার একমাত্র কারণ। বিলাতের কোন্ সাহেব নাকি একটী ব্যাঘ্রশাবককে ফলমূল ভক্ষণ করাইয়া তাহাকে নিরামিষভোজী করিয়াছিলেন, এবং তাহার হিংস্র প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছিলেন। একথা সত্য হইতে পারে। তাই বলিয়া আহারকেই প্রকৃতি পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করিলে চলিবে না, তৎসঙ্গে সঙ্গে সংসর্গ,

অভ্যাস ও অপরাপর আরও অনেক কারণ রহিয়াছে। Wounderful Adventure নামক পুস্তকে দেখা গিয়াছে—এক সাহেব একটী ভালুক পুষিয়াছিলেন, সে নৈশবিহারে বৃক্ষাদিতে চড়িয়া পক্ষী প্রভৃতির মাংস খাইত, অথচ কেহ কখন তাহার হিংস্র প্রকৃতি উত্তেজিত হইতে দেখে নাই।

বর্ব্বর জাতির নিরন্তর বিবাদ মাংসভক্ষণ জন্য নহে; ইহার প্রধান কারণ খাদ্যের অপ্রাচুর্য্য। বর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতে জানে না; নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ভাগ্যক্রমে যদি বনের পশু বধ করিতে পারিল, তবেই তাহার উদর পূর্ত্তি হইল; বৃক্ষে যদি ফল পায় তবেই খাইতে পাইল—তারপর কেবল মানুষই তাহার ভাগদার নহে, অনেক বন্যজন্তুও ফলশস্যের ভাগী। স্বাধিকারে আহারীয় কুলায় না বলিয়া পরাধিকারে আহারীয় অন্বেষণ করিতে হয়; সুতরাং কলহে প্রবৃত্ত হইতে হয়। স্ত্রীলাভ করিবার জন্যও বর্ব্বরের নিরন্তর বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। আরও নানা কারণ আছে, তাহা এখানে বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে মাংসভক্ষণই যে তাহাদের বিবাদের কারণ, তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নাই।

হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীরা নিরামিষভোজী হইলেও অতি অল্পেতেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কথায় কথায় অসি নিষ্কাষিত করে। আর বাঙ্গালিকে শত পাদুকাঘাতেও কুপিত বা উত্তেজিত হইতে দেখা যায় না! আমরা অনেক মাংসাহারী মুসলমান মৌলবিকে জানি; তাঁহাদের লেশমাত্রও ক্রোধ নাই, তাঁহারা অতিশয় শান্তপ্রকৃতি ও মিষ্টভাষী; দেখিলে চরণধূলি লইতে ইচ্ছা হয়। তাঁহারা অনেক নিরামিষভোজী ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মযাজক হইতে উন্নত। মাংসাহারী খৃষ্ট কি নিরামিষভোজী বুদ্ধ অপেক্ষা হীন? তৌলদণ্ডে ওজন করিতে গেলে কে বড় কে ছোট, ঠিক করা বোধ হয় তত সহজ নহে। ভারতের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ঋষিদিগের ন্যায় প্রাচীন মৈশরীয়, চৈনিক ও আরবদেশীয় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ জ্ঞানগরিমায়, দর্শনবিজ্ঞানে কোন অংশে বোধ হয় হীন ছিলেন না; অথচ তাঁহারা আমিষভোজী ছিলেন। তারপর যে সময়ে এদেশে বেদবেদাঙ্গ জ্যোতিষ দর্শন প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন এদেশের পূজ্যপাদ ঋষিগণ যে আমিষভোজী ছিলেন, তাহারই বরং প্রমাণাদি

হিন্দুশাস্ত্রে ও কাব্যগ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা যে নিরামিষভোজী ছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু নাই। ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণ তখন অতিথি সৎকারের জন্য গোবৎস পর্য্যন্ত বধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, অপরাপর জীবজন্তুর ত কথাই নাই। যে কুক্কুটমাংস আজ কাল হিন্দুর অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত, শুশ্রুতে তাহারও কত ব্যাখ্যা দেখা যায়; বন্যকুক্কুট ভক্ষণের ব্যবস্থাত আজিও আছে। বিদ্যাবুদ্ধি বা ধর্ম্মজ্ঞান যে দিক দিয়াই দেখনা কেন, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাজর্ষি মহর্ষিদিগকে যদি তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান, তবে আমিষভক্ষণের উপর তত দোষারোপ করিতে পার না। আমিষ ভোজনে ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না, গভীর বিষয়ে মনঃসংযম করা যায় না, একথা বলা ঠিক হয় না। অন্ততঃ অতীত ইতিহাস তাহা প্রমাণ করে না।

"মৎস্য ও যে সকল পশুর মাংস আমরা ভক্ষণ করি, তাহার যদি কোন পীড়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই পীড়া অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইবে।"—এই বলিয়া কেহ কেহ মৎস্য মাংস খাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু সে ভয়ত ফল শস্যেও আছে। যেস্থানে টাইফয়েড রোগের বীজ থাকে, সে স্থানে যে সকল শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা ভক্ষণ করিলে টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হইতে হয়। জেলখানা ও পাগলাগারদে উৎপন্ন যে সকল শাক সবজি বিক্রয় হয়, তাহা আহার করিয়া অনেক সময় লোক রোগাক্রান্ত হয়। রোগীর বিষ্ঠা দ্বারা গাছে সার দেওয়া হয় বলিয়া গাছগুলিতে রোগের বীজ প্রবিষ্ট হয়। সেই রোগবীজ মনুষ্যদেহে গিয়া রোগোৎপাদন করে, Dr. Kiu'gs Manrual of Hygien (Chap.—Food) নামক পুস্তকে আছে—বেরিবেরি নামক রোগ এতদ্দেশীয় রুগ্ন তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং মান্দ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার খুব প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এবং ডাক্তার কিং ইহাও বলেন যে, বহুমূত্র রোগ আমিষভোজীদিগের হইতে নিরামিষভোজীদিগের মধ্যে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। তাই বোধ হয় ডাক্তারগণ বহুমূত্ররোগীকে প্রধানতঃ মাংস আহারের ব্যবস্থা করেন।

শরীরের উন্নতির জন্য আমিষ ও নিরামিষ একত্রে বা পৃথক্ ভাবে উভয়ই উপযোগী। শরীর রক্ষার্থে কি কি আবশ্যক, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে; সেই সকল পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে যে পদার্থ হইতে হউক সংগ্রহ করিলেই হইল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আমিষ নিরামিষ কোনরূপ খাদ্যেরই

প্রাধান্য নাই। বরং উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু দুগ্ধ ঘৃত জান্তব খাদ্য বলিয়া আমিষ মধ্যে গণ্য করিলে, নিরামিষ বেছারা নিতান্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন আমিষেরই প্রাধান্য দাঁড়ায়। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমরা আমিষ ভক্ষণের কোন দোষ দেখিতে পাই না। যাঁহারা নিরামিষের প্রাধান্য কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি যুক্তির ভাণ মাত্র। তাঁহাদেরপ্রায়ই Analogy, Comparison বা Generalisation এর ভুল হইয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক বিচারে আমিষ ভক্ষণে দোষ নাই বটে; কিন্তু ভাবুকতার দিক দিয়া দেখিলে ইহার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু সকল সময় এই ভাবুকতা পালনীয় কিনা, বিবেচ্য বিষয়। আমাদের বিবেচনায় ইহা স্বদেশের ক্রিয়া। যাঁহার প্রাণে লাগে, তাঁহার পক্ষে আমিষ ভক্ষণ না করাই শ্রেয়ঃ; কিন্তু কাহার যদি তাহাতে ধর্ম্মভাব স্ফূরণে বিঘ্ন বোধ না হয়, তবে তাঁহাকে একমাত্র আমিষভোজী বলিয়া নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রবণ ও অধার্ম্মিক মনে করা অযৌক্তিক ও অন্যায়। তুমি যত কেন জঘন্য প্রকৃতির লোক না হও, যদি তুমি নিরামিষভোজী, গৈরিক-বস্ত্রধারী ভাবপ্রধান লোক হও, সংকীর্ত্তনে মাতিয়া মূর্চ্ছা যাইতে পার, তবেই তুমি এদেশের জনসাধারণের কাছে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারিবে। আর একজন যদি আমিষভোজী হইয়াও ধর্ম্মপরায়ণ সাধু হন, তথাপি লোকে তাঁহার সমালোচনা করিতে যাইয়া একটী "কিন্তু"র হুল না ফুটাইয়া ছাড়িবে না। এ কুসংস্কারের ভাব যত শীঘ্র এদেশের লোকের মন হইতে দূরীভূত হয়, ততই বাঞ্ছনীয়। আমরা ভাবুকতার ধর্ম্ম চাই না, জীবনপ্রদ ধর্ম্ম চাই।

রাধিকার প্রেম।

(শেষ প্রস্তাব।)

রাধিকার প্রেমের গভীরতা আমরা সকল সময়ে ধারণা করিয়া উঠিত পারি না। জুলিয়েট প্রেমার্থে জীবন-বিসর্জ্জনী, শকুন্তলা বনবাসিনী, লিয়াণ্ডার হিরোর আলো দেখিয়া প্রেমের জোরে বিস্তীর্ণ উত্তাল তরঙ্গায়িত সাগর অতিক্রম, মিরান্থা সরলা বালিকা—ফার্ডিনেণ্ডের ক্লেশভার লঘু করিবার জন্য প্রয়াসী, তাহার কোমল স্কন্ধে দুর্ব্বহ কাষ্ঠ ফলক বহনে উদ্যতা, জেকব রেকেলের জন্য সপ্ত বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ;—এই সকল প্রেমের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু রাধিকার প্রেম ইহাঁদের কাহারো প্রেম অপেক্ষা গভীরতায় কিম্বা উচ্ছ্বাসে কোনও অংশে হীন নহে। নিশি অবসান প্রায় ; নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত রোমিও প্রেমপ্রতিমা জুলিয়েটকে এখনই পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। সেক্ষপীরের এই দৃশ্যটী পড়িয়া আমরা রোমিও জুলিয়েটের কত না প্রশংসা করি। রোমিও নির্ব্বাসিত; কতদিনে জুলিয়েট প্রিয়তমের দর্শন সুখ উপভোগ করিবেন, তাহার স্থিরতা নাই ; কে জানে যে জীবনে এই শেষ দেখা নহে ; তাই এই দৃশ্যে তাঁহার এরূপ প্রেমোচ্ছ্বাস। রোমিওকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া জুলিয়েট প্রেমের উচ্ছ্বাসে বলিলেন ;—

'Then window let light in and let life out :

এই একটী পংক্তিতে কত ভাব, কত প্রেম, কত মাধুর্য্য, কত বিষাদ ঢালা আছে। বাঙ্গালী কবির সেক্ষপীরের বাক্‌পটুতা নাই ; বালিকা বঙ্গভাষার সে চাতুরী করিবার ক্ষমতা নাই ; কিন্তু রাধিকারও ভাবের গভীরতা অল্প নহে ;—

"এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥

রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥"

"দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।"

Let light in and let life out

দুই এক ভাব, একইরূপ গভীর, একইরূপ মধুর। কিন্তু বেশ কম একটু আছে। জুলিয়েট রোমিওকে অনিশ্চিত কালের জন্য বিদায় দিয়া বলিলেন,—Let light in and let life out, রাধিকা কৃষ্ণকেএকটী ক্ষুদ্র দিবসের জন্য বিদায় দিয়া ভাবিলেন ;—"দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়।" আবার নিশি সমাগমে প্রিয়তমের প্রেমমুখ দেখিতে পাইবেন ; কিন্তু তাঁহার প্রেম এত,হৃদয়ের আশঙ্কা এত যে "নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।" আর জুলিয়েট যখন একটী ক্ষুদ্র দিবসের জন্য রোমিওকে বিদায় দিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ;—

"Good night, good night, parting is such good sorrow,
That I will say good night, till it be tomorrow."

কিন্তু নিশি অবশেষ দেখিয়া রাধিকা কৃষ্ণকে কহিতেছেন ;—

"অহে নাথ করি পরিহার।
সখীগণ ইঙ্গিত, গমন বিচার॥
বিশেষ অবোধ নিশি বোধ না মান।
কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে।
বিরষ বদন নহ কহিনু তোমারে॥"

"Look, love, what envious streaks
Do lace the severing clouds in yonder east."

মূলতঃ ভাব একইশ্রেণীর—"কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ!"

রাধিকা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিলে, কৃষ্ণ বলিলেন ;—

"সুন্দরি না কর গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা, আনে কি জানয়ে ব্যথা,
ভালে হর ভেল আধ অঙ্গ॥
তুহুঁ হাম তনু ভিন, শ্রবণে জীবনে ক্ষীণ,
কেমনে ধরিব আমি বুক ?

হাসিতে মোহিত মন, কি মোহিনী তুমি জান,
বিরমহ হেরি চাঁদ মুখ ॥
না দেখিলে কিবা হয়, পলক অলপ নয়,
ইথে আঁখি অধির্ক তিয়াষ।
পরাণ কেমন করে, মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ ॥
পরশে লাগিয়া তোর, হিয়া কাঁপে থর থর,
নিমেষের ডরে আঁখি ঝরে।
রায় বসন্ত ভণি, অবনতমুখ ধনী,
জড়মতি ভেল প্রেমভরে ॥"

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেমোচ্ছ্বাসে কি আর প্রেমময়ী রাধিকার প্রাণ শান্ত থাকিতে পারে? তিনি প্রেমে বিভোর হইয়া কুলশীল মান ভয় সমুদায়ে তিলাঞ্জলী দান করিয়া শ্যামের প্রেমে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইলেন:—

"প্রাণনাথ! তোমারে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুল শীল লাজে তিলাঞ্জলি দিনু ॥
* * * * * *
শুন মাধব কি কহব আন।
আমার কে আছে আর তোমার সমান ॥
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদ মুখ।
পরাণের সনে পুড়ি, বড় পাই দুখ ॥
* * * *
ওহে নাথ কি বলিব আর।
তনু মন ধন তুমি পরাণ আমার ॥
গুরুজন ভয়ে দিনু তিলাঞ্জলিদান।
জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান ॥
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার।
তোমা বিনা এই মোর দেহ লাগে ভার।
তুমি সে জীবন গতি স্বরূপ বিচার ॥
শ্যাম বঁধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউক ছারে খার ॥

না যাইব ঘরে বঁধু, রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদী বচনে ॥
তুয়া পায় সুঁপিয়াছি তনুমনপ্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনু নাহি আন ॥
অন্তরে বাহিরে বঁধু তুমি কেবল সার।
এই দেখ তোমারে করিব গলার হার ॥"

জীবন দিয়া প্রেমের দক্ষিণাত এজগতে অনেকেই দিয়াছে। কিন্তু জীবন অপেক্ষাও কুল শীল মান বড়। রাধিকা এই কুল শীল মান দিয়া আজীবন কলঙ্কিনী হইয়া কৃষ্ণ-প্রেমের দক্ষিণা দিলেন! ইহা অপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার কি আছে? "না যাইব ঘরে বঁধু রহিব কাননে" এ মনোরথ যদি সফল করিতে পারিতেন, কুলত্যাগিনী হইয়া যদি শ্যামকে লইয়া বনচারিণী বনবাসিনী হইতে পারিতেন, আর্কেডিয়ার কৃষাণ কৃষাণী হইয়া যদি জীবন আপনার করিতে পারিতেন, তবুও তাঁহার দুঃখের লাঘব হইত। কিন্তু তাহা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। ঘরে থাকিয়া আজীবন গুরুর গঞ্জনা, পাড়া প্রতিবাসীর কুৎসা রটনা; এ সকলই সহ্য করিতে হইল। এ সকলে তাঁহার প্রাণে যে গভীর যাতনা হইত, মধ্যে মধ্যে তাহা কৃষ্ণ-সম্বোধনে প্রকাশ হইয়া পড়িত;—

"এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা।
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরম-বেদনা ॥
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিঁধে ঘুণে ॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ, কি করি উপায় ॥"

কিন্তু প্রেমময়ী রাধিকার অতুল প্রেমগুণে তাঁহার প্রাণে এ সকল দুঃখ যাতনা বসিতে পারিত না!

"বঁধু কি আর বলিব আমি!
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জান হে তুমি ॥

* * * *

সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি।"

আবার——

"বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥

* * * * *

পীরিতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।"

"সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি।" এমন মধুর আস্থা! এমন মধুর নির্ভর! এমন মধুর প্রেমোচ্ছ্বাস আর কোথা আছে? "সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত"—প্রেমতত্ত্বের মূল সত্য এই কটি কথায়। সমাজ যাহাকে সতী বলে, তুমি প্রেমিক, তুমি জান সে সতীত্বের মূল্য কত? তুমি জান সে সতীত্ব কেমন নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, কেবল শরীরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক। প্রেম কাহাকে বলে, তাহা না জানিয়াও ত এ ভারতে কত শত শত রমণী স্বামীর ঘর করিতেছে; তাহাদের প্রাণে ভাব নাই, হৃদয়ে প্রেম নাই, মর্ম্মস্থলে অনন্ত আশার তরঙ্গ অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস নাই। তাহারা জীবস্থিতি-রক্ষা করিবার কল মাত্র; পুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র; তাহারাও কিন্তু সতী! সমাজের চক্ষে তাহারাও কিন্তু ভাল! লোকের মুখে তাহারাও কিন্তু প্রশংসার পাত্রী! কিন্তু তুমিত সমাজের মত প্রাণহীন, প্রেমহীন নহ। তুমি প্রেমে পণ্ডিত, তুমি জান প্রকৃত সতী কে,

প্রকৃত সতীত্ব কি? তুমি জান, যাহাতে যার প্রেম হয়, সেই তার দেহ মন প্রাণের স্বামী। তুমি জান প্রকৃত প্রেমের উৎসাহে, প্রেমপাত্রের পায়ে যে দেহ মন প্রাণ সঁপিতে পারে;—সদা মীনের মতন সাঁতার ভুলে তাঁহার প্রেমে যে ডুবিতে পারে, সেই সতী, সে ই সাধ্বী! তোমার প্রেমে আমি ডুবিয়াছি; শয়নে স্বপনে তোমার ঐ চাঁদমুখ আমি ভাবিতেছি। তুমি জান,—

"অহে নাথ (আমি) কিছুই নাজানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলি তুমি জীবনের সখী॥
অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন॥"

তুমি জান;—

"তোমা বিনে ত্রিজগতে কেহ নাই আপন।
তোমার লাগিয়ে মোর জীবন যৌবন॥"

তুমি জান;—

"তোমাকে না দেখিলে মরিয়ে কেবল তনুভিন
পরাণে মরয়ে যেন জল বিনু মীন।
তোমার পীরিতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি?"

তুমিই জান,—আর কে তাহা জানিবে, আর কে তাহা বুঝিবে?—আর, আর কেহ বুঝিল বা না বুঝিল, জানিল বা না জানিল, তাহাতেই আমার কিবা আসে যায়;—তুমি যখন জান—আমি সতী কি অসতী। যখন আমি

"সতী কি অসতী, তোমাতে বিদিত";—

আমি তার ভাল মন্দ কি বুঝিব; আমি তার

"ভাল মন্দ নাহি জানি।"

জুলিয়েটের প্রেমে এবং রাধিকার প্রেমের তুলনা হয় না। রাধিকা এত গুরুগঞ্জনা, এত কুৎসা রটনা, এত ননদীর শাসন, এমন কি প্রণয়-পাত্রের এত তাচ্ছিল্য সহ্য করিয়াও কখনও তিলেকের জন্য একথা ভাবেন

নাই—একথা মুখে আনেন নাই যে, কৃষ্ণ মরিয়া গিয়া তাহার প্রেম ও প্রাণ মুক্ত হইলে ভাল হইত। কিন্তু জুলিয়েটের মনে সে ভাব উঠিয়াছিল। জুলিয়েট সমাজের দাসী; প্রেমিকা হইয়াও সমাজের মুখাপ্রেক্ষিণী। পারিসের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব হইলে তিনি যখন বিষম ফাঁপরে পড়িলেন, একদিকে পিতামাতার আদেশ ও অপর দিকে রোমিওর প্রেম, এই বিরুদ্ধ স্রোত-মুখে যখন পড়িলেন, তখন আইকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বিষম বিপদের কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন;—

"O God, O nurse, how can this be prevented ?
My husband is on earth, my faith in heaven ;
How shall that faith return again to earth
Unless that husband send it me from heaven
By leaving earth ?"————

রোমিও জীবিত না থাকিলে সম্ভবতঃ জুলিয়েট পারিসকে বরণ করিতেন। কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া কৃষ্ণ সম্বোধনে বলিতেছেন;—

"বঁধু কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
জাতি কুল শীল, সকল মজাঞা
হইনু তোমার দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ওদুটী কমল পায়॥

না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর।"

লিয়াণ্ডারের প্রেমের বড় প্রশংসা, তিনি সাগর সন্তরণে প্রিয়তমার সম্ভাষণে যাইতেন বলিয়া। কিন্তু রাধিকার যে উঠান-সমুদ্র;—

"একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।"

কিন্তু "এত পরমাদেও" রাধিকার প্রাণ কৃষ্ণবিমুখী হইত না। এই মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াও রাধিকা প্রতিদিন কৃষ্ণাভিসারিণী হইতেন। রোমিও প্রেমের পাখায় নির্ভর করিয়া জুলিয়েটের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন;—

"With love's light wings did I o'erperch these walls ;
For stony limits cannot hold love out."

রাধিকাও সেইরূপ প্রেমের বলে বলবতী হইয়া অসংখ্য বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণাভিসারিণী হইতেন,—

"নব অনুরাগিণী রাধা,
কিছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথে হেরি উজিয়ার॥
বিঘিনি বিথারিত বাট।
প্রেমুক আয়ুধে কাট॥"

রোমিওর মত রাধিকাও ঘন অন্ধকার যামিনী প্রেমালোকে উজ্জ্বল দেখিয়া, পথিমধ্যে বিস্তৃত বিঘ্নরাশিকে প্রেমের আয়ুধে কাটিয়া আপনার প্রেমপাত্রের নিকটে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমের গভীরতা বা উচ্ছ্বাস রোমিও বা লিয়াণ্ডারের প্রেমের গভীরতা বা উচ্ছ্বাস অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে।

বরং অনেক অংশে বেশী। বিচ্ছেদে প্রেমের পরীক্ষা হয়। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মসংস্কারক থিওডোর পার্কারের সহধর্ম্মিণী স্বামীর মৃত্যুর পরে আজীবন স্বামীর চিন্তা স্বামীর স্মৃতি অন্তরে বাহিরে উজ্জ্বল রাখিয়া দিন যাপন করিয়াছিলেন। মরা মানুষের স্মৃতি জীবিতেরা গৃহ হইতে ও দৈনন্দিন কার্য্যক্ষেত্র হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। তাহার যাহা কিছু থাকে, তাহা চোখের আড়াল করিয়া রাখে; কিন্তু পার্কারজায়া স্বামীর দোয়াতটী, কলমটী, বইগুলি, টেবিলখানি, আসনখানি, সমুদায় স্বামীর জীবদ্দশায় যে রূপ সজ্জিত ছিল, আপনার মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত সেইরূপ সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। একেই ত বলি প্রেম। একেই ত বলি প্রকৃত বৈধব্য; প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য! পার্কারের বিচ্ছেদেই পার্কার জায়ার প্রেমের এই উজ্জ্বল পরীক্ষা হইয়াছে। রাধিকার প্রেমও কৃষ্ণ বিচ্ছেদে পরীক্ষিত হইয়া উজ্জ্বলতর রূপ ধারণ করিয়াছিল। মৃত্যু অপেক্ষা বিস্মৃতি বেশী; ফলতঃ প্রিয়জনের স্মৃতি হইতে তাড়িত হওয়া, প্রেম পাত্রের হৃদয় হইতে চ্যুত হওয়াই প্রকৃত মৃত্যু; মৃত্যু অপেক্ষা আরো ভীষণ। রাধিকা এই মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও আপনার প্রেমকে বাঁচাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ-প্রেম বিচ্ছেদে দগ্ধ হইয়া রাধিকার উজ্জ্বল প্রেমমণি আরো উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

বিরহ-যাতনা প্রেমের সহচরী। নায়ক নায়িকা মাত্রেই এই দুর্ব্বিসহ যাতনা অল্লাধিক ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাধিকার বিরহে আর অপর নায়িকাগণের বিরহে অনেক তারতম্য আছে। রাধিকার বিরহ কেবল কৃষ্ণের অনুপস্থিতি নহে; কৃষ্ণের বিস্মৃতি। কৃষ্ণ মথুরায় কুব্জার প্রেমে বদ্ধ; রাধিকার স্থান কুব্জা অধিকার করিয়া আছে; রাধিকা সে সংবাদ রাখেন, সে কথা জানেন; অথচ ইহা জানিয়া শুনিয়াও তিনি কৃষ্ণ-গত-প্রাণা। এখানেই বৈষ্ণব কবিদিগের প্রাধান্য। এখানেই রাধিকার প্রেমের মাহাত্ম্য।

"যাক বিরহ ভয়ে উর হার না দেলা।
সো অব নদীগিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহাকে না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া যদি বিছুরল, কি আর জীবনে॥

আন অনুরাগে পিয়া আনসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥

এযে যাতনা, এ যাতনার তুলনা হয় না। রাধিকা এ যাতনা সহ্য করিয়াও কৃষ্ণপ্রাণা; ইহা কি সামান্য কথা? রাধিকা যদি কেবলই ইন্দ্রিয়-পরায়ণা হইতেন, তাঁহার প্রেম যদি কেবলই ইন্দ্রিয় বিকার হইত; তবে ত কৃষ্ণ বিচ্ছেদে তাঁহার এত কষ্ট হইবার কথা ছিল না। তিনি "কুলটা ও কলঙ্কিনী", তিনি স্বয়ংওতো 'আন অনুরাগে আনসে' যাইতে পারিতেন। কিন্তু রাধা কলঙ্কিনী হউন আর যাহাই হউন, তাঁহার প্রেম অতীন্দ্রিয়, তাঁহার অনুরাগ স্বর্গীয়। বিচ্ছেদে রাধা মৃত প্রায়; যাতনায় ছট্‌ফট করিতেছেন; কিন্তু তথাপি বলিতেছেন—

"মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সো পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহিলেক দুঃখ।
মরণ সময় পিয়ার না দেখুনি মুখ॥"

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধিকা মরণোন্মুখী;—কৃষ্ণ তো "আন অনুরাগে আনসে" গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি রাধিকার প্রাণের প্রেমের বেগ বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। অসহ্য বিরহ যাতনা সহিতে না পারিয়া মরণোদ্যতা রাধিকা কিন্তু তখনও কৃষ্ণ-প্রাণা; তখনও তাঁহার প্রাণের সাধ:——

"যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখহ মোর নাম দুই চারি॥
দিনে এক বেরি পিয়া লৈয়ে মোর নাম।
অরুণ দুর্ল্লভ করে দেয় জল দান॥
এই সব আভরণ দিয় পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥"

সেক্‌সপিয়ারের একটী মাত্র চরিত্রে রাধিকার বিরহের কথঞ্চিৎ আভাস রহিয়াছে। সেটী Two gentlemen of Verona তে জুলিয়ার চিত্র। প্রেম পাত্র প্রোটিয়াস্ জুলিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলে, জুলিয়ার প্রাণে বড় ক্লেশ হইয়াছিল; প্রিয়তমের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া

তিনিও প্রেমের আয়ুধে "বিঘ্নবিথারিত" পথ কাটিয়া প্রিয়তমের প্রেমমুখ দেখিতে বিদেশ যাত্রা করিলেন; কলঙ্কের ভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের বেশে প্রাণের উৎসাহে প্রোটিয়াসাভিসারিণী হইলেন। প্রোটিয়াসের প্রেমে তাঁহার অটল বিশ্বাস, প্রোটিয়াসের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম, প্রোটিয়াসের প্রত্যাগমনাপেক্ষায় তিনি গৃহে থাকিতে পারিলেন না।

Lucetta :——Alas ! The way is wearysome and long.

Julia :——A true devoted pilgrim is not weary
To measure kingdoms with his feeble step :
Much less shall she that hath love's wings to fly ;
And when the flight is made to one so dear,
Of such divine perfection as Sir Proteus.

Luc :——Better forbear till Proteus return.

Julia :——O ! Knowest thou not his looks are my soul's food ?
Pity the dearth that I have pined in,
By longing for that food so long a time.
Didst thou but know the inly touch of love
Thou wouldst as soon go kindle fire with snow
As seek to quench the fire of love with words.

* * * * *

Then let me go and hinder not my course
I will be as patient as a gentle stream
And make a pastime of each weary step
Till the last step have brought me to my love ;
And there I'll rest as after much turmoil
A blessed soul doeth in Elysium.

লুকেটা জুলিয়ার গভীর প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া তাঁহাকে এই সঙ্কটপূর্ণ সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার উদ্দেশে পুরুষের প্রেমে অস্থিরতার ঈঙ্গিত করিল। জুলিয়ার তাহা সহ্য হইল না, প্রেমের রাজ্যে সন্দেহ নাই। তিনি প্রেমের আবেগে বলিলেন :——

His words are bonds, his oaths are oracles
His love sincere, his thoughts immaculate
His tears pure messengers sent from his heart,
His heart as far from fraud as heaven from earth.

কিন্তু প্রোটিয়াস বিদেশে "আন অনুরাগে" অনুরাগী হইয়াছেন, জুলিয়াকে ভুলিয়া সিল্‌ভিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। জুলিয়া তাঁহাকে সিল্‌ভিয়ার দ্বারে প্রেম-ভিখারী দেখিয়া কি বিষম দুঃখে ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়। কিন্তু জুলিয়া তথাপি প্রোটিয়াসকে হৃদয় হইতে তাড়াইতে পারিলেন না। পুরুষ বেশে প্রোটিয়াসের ভৃত্য হইয়া তাঁহার কাছেই রহিলেন। প্রভুর প্রেম-দৌত্যে নিযুক্ত হইয়া প্রোটিয়াসের জন্য সিল্‌ভিয়ার প্রেম ভিক্ষা করিতে লাগিলেন! কিন্তু এ যাতনাতেও তাঁহার প্রাণের প্রেম বিনষ্ট হইল না। সেক্‌সপিয়ারের নায়িকাগণের মধ্যে জুলিয়া অপেক্ষাকৃত অপরিচিতা হইলেও প্রেমমাধুর্য্য হীনা নহেন, কিন্তু এই জুলিয়াও রাধিকার নিকট প্রেম শিক্ষা করিতে পারেন। মিলন হইলে জুলিয়া প্রোটিয়াসকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন :——

Behold her that gave aim to all thy oaths
And entertain them deeply in her heart
How oft hast thou with purjury clept the root,
O Proteus ! let this habit make thee blush ;
Be then ashamed that I have took upon me
Such are immodest raiment.—if shame live
In a disguise of love.
This the lesser blot modesty finds
Women to change their shapes than men their mind.

কিন্তু রাধিকা মিলনে কৃষ্ণের সমুদয় অপরাধ বিস্মৃতা। মুহূর্ত্তের তরেও এই মিলনের পর কৃষ্ণকে একটী কটু কথা বলেন নাই। তিনি জানিতেন, তাঁহার এমন গুণ ছিলনা, যাহাতে তিনি কৃষ্ণকে চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহার প্রেম তাঁহার হৃদয়ের পূজা ছিল, শরীরের উপভোগ্য বস্তু ছিল না। সতী সীতার প্রাণে কেবল মাত্র একবার একমুহূর্ত্ত কালের জন্য রামের প্রেমে সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই ইহাতে

সীতার প্রাণে কি গভীর যাতনা হইয়াছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, একথা শুনিবা মাত্রই সীতা মূর্চ্ছিতা হইলেন, এবং মূর্চ্ছাবসানে রামের প্রতি দুই তিনটী কঠোর কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার সন্দেহ যদি দূরীকৃত না হইত, তবে আরও কঠোরতর ভাষা ব্যবহার করিতেন কিনা জানিনা। কিন্তু স্বর্ণ সীতা নির্ম্মাণের বার্ত্তা শুনিয়া সীতার প্রাণ তখনই পুনরায় আনন্দ সাগরে ভাসিল। তবে সেই মুহূর্ত্তের সন্দেহে তিনি যে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই মনে হয়, রাধিকা যে কঠোর পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন, সেই কঠোর পরীক্ষায় পড়িলে সীতার প্রেমের সেই কোমলতা থাকিত কিনা সন্দেহের বিষয়।

রাধিকা তাঁহার নিদারুণ বিচ্ছেদের পরে যখন সখী-মুখে কৃষ্ণের আশু আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, তখন আর রাধিকার সুখের উচ্ছ্বাস ও প্রেমের তরঙ্গ দেখে কে? সে সুখ কল্পনায় রাধিকা তখন প্রেমোন্মাদিনী

"যব্ হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে বাজাব জয় তুর॥
* * * *
অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া
পালটী চলব হাম হাসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম, যতন তুঁলু করবে॥
* * * *
হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান॥"

এইরূপ কত সুখের কল্পনায় রাধিকার প্রেম উথলিয়া পড়িতে লাগিল। তার পর যখন কৃষ্ণের সহিত মিলন হইল, তখন আর তাঁহার আনন্দ রাখিবার স্থান নাই।

"আজু রজনী হাম, ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানমু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল, অব লাখ ডাকউ
লাখ, উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব, লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহ মন্দা॥"

সখী সম্বোধনে প্রাণের গভীর আনন্দ ও গভীরতর প্রেম তরঙ্গ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়ণী পিয়া, গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥"

বলিতে বলিতে ভাবে বিভোর হইয়া বলিলেন—

"সখিরে কি পুছকি স অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণহি শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া যুড়ন না গেল॥"

প্রেমের এমন মধুর উচ্ছ্বাস, গভীর তরঙ্গ আর কোথাও আছে কিনা আমরা জানিনা।

রাধিকার গভীর নিঃস্বার্থ প্রেমকাহিনী পড়িয়া অনেক সময় অবাক হইতে হয়। এমন প্রেম মানুষ হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে কি না, এ বিষয়ে সময়ে সময়ে সন্দেহ জন্মে।

বিচ্ছেদের পর মিলন হইল, রাধিকার এখন আর মান নাই; কৃষ্ণের মুখ দেখিয়া সকল কষ্ট, সকল অভিমান দূর হইয়া গিয়াছে; মধুর প্রেমতরঙ্গে তাঁহার প্রাণ মন ভাসিতেছে। তাঁহার চক্ষে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে এক অবিচ্ছিন্ন সুখ তরঙ্গ, এক অক্ষুণ্ণ প্রেমতরঙ্গ বহিতেছে। রাধিকা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"মাধব এক নিবেদন তোয়,
মরম না জানিয়ে, মানে তোহে দগধিনু
মাপ কর সব মোয়।
তুহুঁ যদি লাখ, গোপী সনে বিলহ
তাহে মুঞি পাই আনন্দ।
সো মঝু অন্তরে, কোটী সুখ হোয়ত
ইথে নাহিক কিছু মন্দ॥
অকপট এক, বাত মুঝে বলবি,
না করবি চিত কি ভীত।
চন্দ্রাবলী তোহেঁ, কতহু সমাদরে,
কৈছন প্রেম কি রীত॥
সো যদি নিগূঢ়, প্রেম দেই পদযুগে,
কৈছে করব যতন এব।"

এই প্রেমকে যদি ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় কর; আমাদের কিন্তু এমন নিঃস্বার্থ, এমন স্বর্গীয় প্রেমকে মাথায় রাখিয়া পূজা করিতে সাধ যায়। রাধিকার প্রেমের চিত্রে বৈষ্ণব কবিগণ নির্ম্মল স্বর্গীয় প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অনেক অশ্লীল ভাব ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের কথা। কিন্তু তাহার সম্যক সমালোচনা সুবিধা হইলে বারান্তরে করিতে ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

ব্রাহ্মসমাজের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবস্থা।

ভবিষ্যতের অঙ্কপাত করা বড় কঠিন কার্য্য। যাহা তাহা একটা বলিলে চিন্তাশীল বুধমণ্ডলী তাহা কোন দিন গ্রহণ করেন নাই, এবং কোনদিন করিবেনও না। বিশেষতঃ আমরা ঈশ্বরবাদী লোক হইয়া ঈশ্বরের পূর্ণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিয়া পরে এমন একটা কথা বলা উচিত মনে করি না, যাহা অনিশ্চয়তার পশ্চাতে সন্দেহের অন্ধকারে লুক্কাইত! ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ গণনা করিতে তাঁহারাই বিশেষভাবে উপযুক্ত, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়কাল হইতে ইহার সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। আমরা এ চিত্র অঙ্কিত করিবার উপযুক্ত পাত্র কি না তাহা ঠিক জানি না, তবে কোন প্রশ্ন উঠিলে সে বিষয়ে চিন্তা করা এবং যথাসাধ্য তাহার মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য কার্য্য।

আলাপ ও আলোচনা দ্বারা জানাগিয়াছে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ব্রাহ্মগণের মধ্যে তিন প্রকারের চিন্তা স্থান পাইতেছে। ১ম পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজ অধিক পরিমাণে কার্য্য করিতেছেন। ২য়, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যাহাতে "ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, ব্রাহ্মধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আলোক-মণ্ডিত।" অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম চিরদিন ধর্ম্মজগতে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় আলোক বিতরণ করিবে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কালের অনন্ত ক্রোড়ে ডুবিয়া যাইবে, ইহার অস্তিত্ব থাকিবে না। ৩য়, ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমানাপেক্ষাপূর্ব্বে অনেক অধিক কার্য্য করিয়াছেন; এক্ষণে ইহার অবস্থা বড় ভাল নহে। ভারতের জল বায়ুর দোষে ইহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক হইতে না হইতে বার্দ্ধক্যের শীর্ণতা ও শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

এই ত্রিবিধ ধারণাই গুরুতর বিবেচ্য বিষয়। ইহাদের মীমাংসার উপর ইহার ভাবী মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যখন এই তিনেরই উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎদৃষ্টি, তখন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা আবশ্যক। অতীতের কথা স্মরণ হইলেই সর্ব্বাগ্রে আদি-ব্রাহ্মসমাজ ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের কথা চিন্তা-পথে উদিত হয়। যে সময়ে তিনি সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, সে সময়ে এদেশের অবস্থা যে কি ভয়ানক ছিল তাহা কোন লিপিকুশল লেখক ভাষায় প্রকাশ করিয়া লোককে বুঝাইতে পারিবেন না। কেবল যাঁহারা চিন্তা করিতে পারেন তাঁহারাই সংগৃহীত ও যত্নে-রক্ষিত ঘটনানিচয় দ্বারা মনে

মনে সেই অমানিশা-পরাজিত ঘোর অন্ধকার এবং শাস্ত্র ও ধর্ম্মবর্জ্জিত স্বেচ্ছাচারের প্রকৃত ছবি চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে পারেন। সেই সত্যের সহিত অসত্যের প্রতিযোগীতা, সেই আলোকের সহিত অন্ধকারের প্রতিদ্বন্দীতা, সেই অমৃতে গরল মিশাইয়া দিবার চেষ্টা, কল্পনায় অননুভূত। এমন দিনে তিনি একাকী শরীরের শোণিত বিন্দু বিন্দু করিয়া দান করত, উপার্জ্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করত এবং সমস্ত বুদ্ধি ও অর্জ্জিত জ্ঞানকে নিয়োগ করত, এই আশায় বুক বাঁধিয়া খাটিয়াছেন যে, তাঁহার প্রচারিত সত্য একদিন তাহারাই গ্রহণ করিবে যাহাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি তাঁহার পরম শত্রুতাচরণ করিয়াছে। পাঠক! নূন্যাধিক আঠার কোটি লোকের মধ্যে এক ব্যক্তিকে একাকী যুদ্ধে জয়ী হইবার আকাঙ্ক্ষায় দণ্ডায়মান দেখিলে তোমার মনে কি ভাবের উদয় হয়? তাহাই উন্নতির দিন, না অদ্যকার এই মুষ্টিমেয় মৃত ব্রাহ্মের চীৎকার ও আস্ফালনকে উন্নতির লক্ষণ বলিয়া মনে করিবে? তৎপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কথা আপনাপনি প্রাণে উদয় হয়। যখন পরিচালকের অভাবে "ধর্ম্মসভার" সহিত ব্রাহ্মসাজের অস্তিত্ব লুপ্ত হইবার আয়োজন হইতেছিল, সেই নিরাশার অন্ধকারে ভগবান স্বয়ং এই মহাত্মাকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের দ্বার দেখাইয়া দেন। সেই শুভদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল সাধনের ভার তাঁহারই স্কন্ধে ন্যস্ত হইল। তিনি যে বিবিধ প্রকারে ত্যাগস্বীকার করত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়ীত্ব সাধনোদ্দেশে ও উৎকৃষ্টতর রূপে প্রচারাকাঙ্ক্ষায় যে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ধর্ম্মপুস্তক সকল প্রণয়ণ করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্ম মাত্রেই বিদিত আছেন। বিগত বৎসর যখন আমরা কএকটি বন্ধু একত্র হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই, তখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার স্বরচিত জীবন চরিত হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন; স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রার্থনার একাগ্রতা, চিন্তার গভীরতা, চিত্তের স্থিরতা ও প্রসন্নতা এবং কার্য্য করিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার একটি মনোহর ছবি তাহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের আদরের গ্রন্থ "ব্রাহ্মধর্ম্ম" তাঁহার সেই প্রার্থনার ফল। জিজ্ঞাসা করি, কত পরিশ্রম, কত ত্যাগস্বীকার ও কত সাধন ভজন করিলে আত্মা এরূপ অমল সুখসাগরে নিয়ত ভাসমান থাকে? এইরূপ পবিত্র প্রেমের আকরে প্রাণকে ডুবাইবার জন্য মহর্ষির যে প্রথম উদ্যম ও আয়োজন হইয়াছিল, তাহারই তিল তিল পাইয়া কত ব্রাহ্ম জীবনে কৃতার্থ হইয়াছেন। বোধ হয় একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে, সেই সাধন ভজনের স্রোতে ভাসিয়া বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় প্রভৃতি জীবনে পরমোকার লাভ করিয়াছেন। সেই কর্ম্মশীল যোগীবরের ধর্ম্মজীবনাকাশে ঈশ্বরের সত্তা যখন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আভা প্রকাশ করিয়াছে, সেই উন্নতির দিন, না অদ্যকার এই সার্দ্ধ-ত্রিদল বিভক্ত এবং নানামত ও বিবিধ ভাব বিশিষ্ট বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপনীত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কলাপকে

উন্নতি বলিয়া স্বীকার করিব? চিন্তাশীল পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন উন্নতি কোথায়, অতীতের স্মৃতিপটে না বর্ত্তমানের মনোমোহন মানচিত্রে? ইহার পর বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কিছুকাল ব্রাহ্মসমাজের ভাগ্যচক্র ঘুরাইয়াছেন। যখন ইনি নূতন উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, তখন সেই বাগ্মীবরের অগ্নিময় উৎসাহবচন ভারতে ও ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল, সেই আন্দোলনের তরঙ্গে পড়িয়া সমগ্র দেশ আন্দোলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এমন নগর অতি অল্পছিল, যেখানে ব্রহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সে সময়ে শিক্ষিত এমন যুবক অতি অল্পছিলেন, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই। কলিকাতার ও মফস্বলস্থ শিক্ষিতও চিন্তাশীল লোক মাত্রেই ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ রাখিয়া চলিতেন। সত্য কথা এই যে, এই সময়েই ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃতপক্ষে সমাজ নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ততা লাভ করে। এই সময়ে ভারতের ভাবী কল্যাণকর সামাজিক অনুষ্ঠান সকল প্রথম আরম্ভ হয়। তখন ইহার অধিনায়কত্বে এমন এক দল লোক প্রস্তুত হইয়াছিলেন, যাঁহারা আজও বঙ্গের সাহিত্য জগতের অগ্রণীগণের মধ্যে পরিগণিত। বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত ব্রাহ্মগণের একত্র হইয়া ধর্ম্মসাধন করার প্রথা ইনিই প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। এইরূপ সাধন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কতকগুলি লোকের মধ্যে এমন আত্মীয়তার ভাব জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে আজিও তাহা ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। সেই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকগণ গভীর তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হইয়া সাধন ভজন করিতে শিক্ষা করেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচারকেরা জলন্ত ত্যাগস্বীকার ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করত দয়াময় নাম প্রচার করিতে দেশ বিদেশ যাত্রা করেন। কেহ কেহ একাহারে, অনাহারে এবং প্রহারেও প্রচার করিয়াছেন! কুচবিহার বিবাহের পূর্ব্বে আমরা নিজেরাই যে উন্নতির স্রোতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে প্লাবিত হইতে দেখিয়াছি তাহাই কখন বিস্মৃত হইবার নহে। শত তর্কে ও শত প্রতিবাদে সে সত্যকথা যাহা প্রাণে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা ভুলিবার নহে, হৃদয় হইতে দূর করিবার নহে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে সেই উন্নতির স্রোত যাহা ভারতের সমগ্র স্থান প্লাবিত করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় তরঙ্গায়িত হইয়াছিল, তাহাকেই উন্নতি বলিব, না এই তৈলবিহীন প্রদীপের নির্ব্বাণোন্মুখ শিখা প্রদত্ত ক্ষীণালোককে জীবন এবং উন্নতি বলিয়া মনে করিব?

মহাত্মা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়গণের অধ্যবসায় পরিশ্রম ও প্রতিজ্ঞার বল ব্রাহ্মসমাজে যে জীবন্ত ভাব আনিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে আমার মতে "মৃত্যু" বলিলেই ঠিক বলা হইল মনে করি!! কেন, ব্রাহ্মসমাজে কি লোক নাই? ব্রাহ্মসমাজে অশিক্ষিত মূর্খ হইতে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বিচরণ করিতেছেন, দেখিতে পাইতেছি

তবে কি ব্রাহ্মসমাজে ধনবল নাই ? তাহাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করি। যখন ধনী, মানী, পদস্থ লোক চক্ষের সমক্ষে বিচরণ করিতেছেন তখন কেমন করিয়া অন্যবিধ ভাবিব ? তবে ব্রাহ্মসমাজে কিসের অভাব দেখিতে পাওয়া যায় ? ব্রাহ্মসমাজে একমাত্র প্রাণের অভাব অনুভূত হইতেছে। যদি ইহা প্রাণ হীন কলেবর মাত্রে পরিণত হইবার আয়োজন না করিবে, তাহা হইলে কি দেখিতাম ? দেখিতাম একদল লোক বিশ্বাসীর ন্যায় ঈশ্বর প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশের ও জগতের হিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, দেখিতাম অপ্রেম ও অনাত্মীয়তা তাঁহাদের মধ্য হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে, দেখিতাম মহাত্মা ঈশা, বুদ্ধ বা চৈতন্যের বিশ্বজনীন প্রেমের কথা কল্পনার রাজ্য অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের নিত্যজীবনে পরিণত হইয়াছে, অন্ততঃ মহাত্মা জন হাউয়ার্ডের মহাপ্রাণতা ও লোকানুরাগ ত দেখিতে পাইতাম ; কিন্তু আজ এই শতাধিক সমাজ দ্বারা পরিপুষ্ট ব্রাহ্ম সমাজে সে স্বর্গীয় প্রেমের, সে লোকাতীত অনুরাগের, সে অবিশ্বাসীর চিত্তবিকলকারী ঈশ্বর-বিশ্বাস ও নিষ্ঠার জীবন্ত ভাব দেখিতে পাই না; সে বিশ্ববিজয়ী বিশ্বাস, প্রেম ও অনুরাগের সমাবেশ কল্পনার অন্তরালে চিরলুক্কাইত রহিল ! তবুও কি বলিতে হইবে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বেশ কাজ করিতেছেন ? সকলে বলেন বলুন, আমিত বলি না। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ যে তিন দলে বিভক্ত, সেই তিন দলের কাহারও কার্য্যকারিতা শক্তির প্রতি অবজ্ঞা না করিয়া বরং তাঁহাদের সাধু চেষ্টাকে ও লোকানুরাগকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়াও সত্যের অনুরোধে, এই বলিব যে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শক্তি টুকুকে একত্র করিলেও ইংলণ্ডীয় মহিলা কুমারী কলেট, কুমারী কব, পরলোকগতা কুমারী কার্পেণ্টার কিম্বা ভগিনী ডোরা ইহাঁদের একজনের মহত্ত্বের সহিত তুলনা হয় না !! সে প্রাণ কই, যে প্রাণ পাইয়া কুমারী কলেট অদ্য বার্দ্ধক্যের সকল ক্লেশ সহ্য করিয়াও ব্রাহ্মসমাজের জন্য খাটিতেছেন, সে প্রাণ কই যে প্রাণ পাইয়া কুমারী কব পতিতা স্ত্রীলোকগণের উদ্ধার সাধনে নিয়ত চিন্তিত, সেই প্রাণ কই যে প্রাণ পাইয়া কুমারী কার্পেণ্টার ভারত ললনাগণের দুঃখ দুর্দ্দশা শ্রবণ করত এদেশে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের হিতের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিয়াছেন,—সে মহাপ্রাণ কই, যাহা পাইয়া ভগিনী ডোরা সংসারের সকল সুখাশা বিসর্জ্জন দিয়া ভগিনীদল ভুক্ত হন এবং আসন্নকালাপন্ন বসন্তরোগীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ও জননীর ন্যায় স্নেহভরে সেই বসন্ত ক্ষতপূর্ণ মুখে বারংবার চুম্বন দিতেছেন !!। যিনি আমার উপর বিরক্ত হইবার হউন, আমি কিন্তু বলিব আমাদের ভিতর সে লোকানুরাগ, সে প্রেম ও সে বিশ্বাসের সঞ্চার হয় নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে গ্রীষ্মের আতপ তাপোত্তপ্ত বৃক্ষপত্রের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের লোকদের প্রাণ মুহ্যমান হইয়া

মৃত্যু।

"For when men lose the joys that sweeten.
I can not count this living, rather deem life.
As of a breathing corpse"

Sophocles.

মৃত্যু কি ভয়ানক ? তবে লোকে মৃত্যুকে ভয় করে কেন ? আত্মার অমরত্বে যাহার বিশ্বাস আছে, মৃত্যু ত তাহার কাছে অবস্থা পরিবর্ত্তন, একটা ব্যাধি মাত্র। তাহার ত মৃত্যুকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। আত্মার অমরত্বে যাহার বিশ্বাস নাই, পরকালে দণ্ড পাইবার যাহার ভয় নাই, সে মৃত্যুকে ভয় করে কেন। আস্তিক বা নাস্তিক মৃত্যুকে ভয় করিবার কোন কারণ দেখি না। ইহ সংসার যতই সুখের হউক পরকাল অধিকতর সুখদায়ক, সূর্য্যের কিরণ ইহা অপেক্ষা মনোরম, চন্দ্রের জ্যোতি ইহা অপেক্ষা কোমল ও উজ্জ্বল, পাখীর গান ইহা অপেক্ষা মিষ্ট, কুসুমের সুষমা ইহা অপেক্ষা,—আকাশে মেঘের খেলা ইহা অপেক্ষা মোহকর, সেখানে প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাই, স্নেহে দাহ নাই, ভক্তিতে মত্ততা নাই, প্রেমের নিত্য মহোৎসব। সেখানে শত্রু নাই, সেখানে নিন্দা নাই, সেখানে শোক নাই, সেখানে মোহ নাই, ভয় ভাবনা বিড়ম্বনা নাই, লজ্জা সঙ্কোচ সন্দেহ নাই, হিংসা তাপ গ্লানি নাই, তৃপ্তি পূর্ত্তি স্বপ্ন নাই। চন্দ্রে কলঙ্ক নাই, কমলে কণ্টক নাই, নীল জলে লবণ নাই, নীলাম্বরে বজ্র নাই, জীবনে মৃত্যু নাই। তবে কেন আস্তিকগণ মরিতে ভয় করে ? মৃত্যু পিপাসা তৃপ্ত করে ; তুষানল নির্ব্বাণ করে, মায়া খণ্ডন করে, কল্পনা বিচ্ছিন্ন করে, হিংসা শান্তি করে, ব্যাধি ঘুচায়, বিরহ ঘুচায়, দারিদ্র্য ঘুচায়, কলঙ্ক ঘুচায়, ভাবনা ঘুচায়, ভরসা ঘুচায় ; তবে কেন নাস্তিক মরিতে ভয় করে ? পৃথিবী ব্যাধি-মন্দির, দেহ কৃমি-নিবাস, মন যাতনার উৎস, প্রাণ গর্ব্বিতের পাদ-প্রক্ষিপ্ত মৃৎবর্ত্তুল ; আকাশ শূন্য, পৃথিবী শূন্য, হৃদয় শূন্য, ভস্মপূর্ণ শ্মশান, বায়ুপূর্ণ সাহারা, মরীচিপূর্ণ প্রান্তর কেবল হু হু ধূ ধূ করে, মৃত্যুর অন্ধকারে পৃথিবীর অনাবৃত কঠোরতা আচ্ছাদিত হয়, শত্রুর মুখে কালি

পড়ে, কলঙ্কের দাগ মিশাইয়া যায়, ভাবনা নিদ্রিত হয়, অশান্তি দুর্ব্বলতা যাতনা হতাশা হতমান কেহ দেখে না, মৃত্যুর অন্ধকারে দৃপ্ত প্রভু, গর্ব্বিত রাজা, ধনবান প্রতিবেশী, পরাক্রান্ত সহযোগী, প্রাসাদ কুটীর, সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ ঐশ্বর্য্য দারিদ্র্য সকলই একসঙ্গে একই সঙ্কীর্ণ গুহায় আশ্রয় লয়; তবে নাস্তিক মরিতে ভয় করে কেন?

বোধ হয় মানুষমাত্রেই কাপুরুষ, তাই মরিতে ভয় করে। যে বীরপুরুষ সমরক্ষেত্রে কামানের অনলোদ্গার অগ্রাহ্য করেন, তিনিও কাপুরুষতার অতীত নহেন! যিনি ডাক্তার, সূক্ষ্ম সূচিকা দেখিয়া তিনিও ভয়ে কাঁপিতে থাকেন। কাপুরুষের দল বুদ্ধির দোহাই দেয়। তাই যে প্রকৃত সাহসী আত্মহত্যা করিয়া সংসার ও মৃত্যু, দেবতা ও অসুর সকলকে উপহাস করেন; কাপুরুষ বুদ্ধিমানেরা তাহাকে উন্মাদ বলিয়া ঘোষণা করে। উন্মত্ততা না জন্মিলে কেহ আত্মহত্যা করে না, ইহাই তাহাদের দর্শন। এ সংসারে যে আমার, সে আমার হইল না, হইবে না; পরলোকে তাহাকে পাইব, তবে মরিব না কেন? যদি স্বার্থপরতার তুলাদণ্ডে ভালমন্দের বিচার কর, তবে সে মূর্খ বা পাপিষ্ঠ, যে কোহিনূর পাইবার লোভে সাগর পার হইতে চায় না। কাপুরুষ গ্রামে বসিয়া মুষ্টি ভিক্ষায় দিনপাত করে। পরকাল যদি না মানি, তাহাকে ত ইহজন্মের মত হারাইয়াছি, খালিবুকে শূন্যদেহে দরিদ্রতার পল্লবে কাহার জন্য পড়িয়া থাকিব? প্রতিবেশীর ইঙ্গিত, শত্রুর ভ্রূকুটী, পরিজনের পরিহাস, এতই কি মধুর? দিবসের জ্যোতি এতই কি শীতল? শিমূলে এতই কি সৌরভ? বায়সের কণ্ঠে এতই কি মধু? আমি কি রাজার এমনই ভক্ত যে, তাঁহার সেবা করিবার জন্য পাদদলিত দেহ টানিয়া টানিয়া বহিয়া বেড়াইব? সহৃদয়তার এতই কি উচ্ছ্বাস যে, বজ্রাহত বৃক্ষের কি দুর্দ্দশা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অন্যকে সাবধান করিবার জন্য প্রান্তরে দাঁড়াইয়া থাকিব, আর প্রত্যেক বায়ুতরঙ্গ ঝলকে ঝলকে আমার ভস্মকণা উড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে পরিচয় দিবে?

"Man's happiest lot is not to be:
Most blessed are they, who earliest free.
Descend to death's eternal sleep."

মিসর দেশে মরা মানুষকে 'মমি' করিত। ঔষধযোগে জীবন্তের মত সাজাইয়া রাখিত। তেমনি হাত পা, তেমনি বর্ণ, তেমনি কান্তি, তেমনি

বেশ ভূষা। চোখে চাহিত, কিন্তু কাহারও রূপ প্রতিবিম্বিত হইত না; কাণে শব্দ প্রবেশ করিত, কিন্তু বাজিত না। ঐ এক রকম জীবন-মৃত্যু। কতকগুলি কাপুরুষ মৃত্যু অপেক্ষা এরূপ জীবন সহজসাধ্য বলিয়া গ্রহণ করে। তাহাদের নাম সন্ন্যাসী। তাহারা সংসারের ভিতর বসিয়া উচ্চ গবাক্ষ হইতে সংসারের লীলা নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করিতে ভালবাসে। যে সংসারে নিজেরা নিষ্পেষিত হয়, সেই সংসারে অন্যদের দুরবস্থা দেখিতে তাহাদের আমোদ! সংসারে নিষ্পেষিত সকলকে হইতে হইবে। মানুষের দুইটীভাব একপথে চলে না। এক জন একদিকে আর এক জন অন্য দিকে লইয়া যায়। স্ত্রী চাহিলে বন্ধু পাইবে না, বন্ধু চাহিলে স্ত্রী পাইবে না। পুস্তক চাহিলে সমাজ পাইবে না, সমাজ চাহিলে ধর্ম্ম পাইবে না, ধর্ম্ম চাহিলে সংসার পাইবে না। সহস্র সহস্র বৎসরে মানুষ ইহাদিগের সামঞ্জস্য করিতে পারিল না। আধখানা মন কাহাকেও দেওয়া যায় না, হৃদয়ের ভগ্নাংশ লইয়া মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। যাহাকে ভালবাসি সে ভালবাসে না, যে ভালবাসে তাহাকে ভালবাসা দিতে পারি না। যাহাকে ভালবাসি, সে ভালবাসে না, তাহাতেও দুঃখ, তবে সে কষ্ট তত বেশী নহে! যে ভাল বাসে, তাহাকে যে ভালবাসিতে পারি না, এবড় দুঃখ! মা বউকে দেখিতে পারে না, বউ মাকে দেখিতে পারে না, সবাই মনের সমস্তটা চায়; কিন্তু আমার অতিথি সহস্র জন! সহস্রজনকে প্রত্যাখ্যান করিয়া একজনকে লইয়া ভাসিতে হইলে কোমলতা প্রতিবাদী হয়, সহস্রজনকে ভাগ করিয়া দিতে হইলে নিজেও সুখী হই না, যাহারা পায় তাহারাও কেহ সুখী হয় না। তাই বলি সংসারে সকলকেই নিষ্পেষিত হইতে হয়, গাছ পাথর ভিন্ন মানব জীবনের এদুর্দ্দশা সকলেই বুঝে। যে অন্যের দুর্দ্দশা দেখিতে ভাল বাসে, সে গাছ পাথর অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। সন্ন্যাসী রাক্ষস। যে বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাইতে চায়, সে রাক্ষস হইতেও অধম। কর্ম্মফল এড়াইবার একমাত্র উপায় মৃত্যু। যে দাঁড়াইয়া কর্ম্মফল সহ্য করে, সে বীর, তাহার সাহস রাক্ষসের সাহস। যে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া মৃত্যু অবলম্বন করে, সেও বীর, তাহার সাহস মানুষোচিত। যে সহ্যও করে না, পলাইতেও চায় না, সে বাতুল বা পাথর, হৃদয় শূন্য পশু, গোলামীর জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া কারিকর যে ছাঁচে ইচ্ছা গড়িতে পারে।

ভুলিয়া থাকে। ইহারা বলে বিবাহে সুখ, সন্তানে সুখ, কবিতায় সুখ। বর্ত্তমানে যাহা আছে, তাহাতেই সুখ অথবা এক আধটু ছাটিয়া লইলে সকলই সুখের মত করিয়া লওয়া যায়। ইহারাই মরিতে ভয় পায়। ইহারা আস্তিকও নহে, নাস্তিকও নহে। বিশ্বাস করে যে, পরলোকে বিশ্বাস আছে, কিন্তু সেটা তাহাদের ভ্রম।

সংসারে অন্ধ হইয়া ঘুরিতে হয়। কে ঘুরায় জানি না, কেন ঘুরি জানি না, আমার স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র নাই। নাকে দড়ি দিয়া ঘুরায় আর প্রহার করে। অতীত বিস্মৃতি-গহ্বরে, ভবিষ্যৎ যবনিকার অন্তরালে। অন্যের তামাসার উপলক্ষ ক্রীড়ার পুত্তলি-আবর্ত্তে তৃণ হইয়া কে বাঁচিতে চায়? যেখানে আমার কিছুই নয়, আমি কিছুই নই, ধনবানের পারিষদ, সুলতানের কৃত দাস, সেখানে আমার সার্থকতা কি? যাহারা বিলাসের পল্বলে শুইয়া নিদ্রা যাইতে ভালবাসে, প্রত্যেক অপরিচিত পথিকের যথেচ্ছ পদাঘাতে যাহাদের অসম্মান হয় না, যাহাদের মস্তিষ্কে বুদ্ধি নাই, হৃদয়ে রুচি নাই, মনে তেজ নাই, সে সারমেয়গণ লাঙ্গুল নাড়িয়া প্রভুর দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারে। আমার স্বাধীনতা আমার জীবন, যথেচ্ছাচার পরাধীনতা; যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে জীবন নাই। আপন বুদ্ধিতে অকূল সাগরে বিনা দিগ্‌দর্শনে নৌকা চালাইয়া অতলস্পর্শে ডুবাইলেও সুখ আছে। সুখের জন্যই জীবন। ছার ধন মান প্রাণ সম্পদে, যদি সুখকর না হইয়া তাহারা কেবল ভয় ভাবনা যাতনার কারণ হয়। ছার পুত্রকলত্রপরিজনে, যদি তাহারা আমার স্বাধীনতা খর্ব্ব করে, প্রাণ বিষময় করিয়া তুলে।"

জ্ঞানে কি হইবে? জ্ঞান অপেক্ষা প্রাণ বড়। জ্ঞানে দেবতা শুষ্ক, মনুষ্যের অতীত, প্রাণে দেবতা আমার দেবতা। প্রাণে দেবতা কবিতা, কাননের কুসুম, কুসুমের সুরভি, সুরভির ভ্রমর। প্রাণের উচ্ছ্বাস জ্ঞানের গভীরতা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। সত্যও ক্লীব, জ্ঞানও ক্লীব। ঘড়ির কল। কেবল "তৎ।" What best corresponds in man to the life of God? The passions of man, his richest, fireiest energies. To exalt pure reason at the expense of life is to dwarf and paralyse man and to deaden God down to a meaningless word."

জ্ঞানে সুখের ছায়া অপহরণ করে, শীতলতা উত্তাপিত করে, চন্দনকে [illegible] সঙ্কুচিত করে।

জ্ঞানে প্রাণের অভাব মিটে না, বরং বৃদ্ধি করে। সংসারের কণ্টক-বনে জ্ঞান কণ্টকের উগ্রতা তীক্ষ্ণ করে। জ্ঞান লইয়া সংসারে তৃপ্ত হওয়া যায় না। মৃত্যুতে জ্ঞান নাই, আলোক নাই, সকলই অন্ধকার। অন্ধকারেই প্রাণ। মৃত্যু প্রাণের পূর্ণতা। সংসারের সাহারায় জ্ঞানে নরকঙ্কাল ও সমাধিমন্দির দেখাইয়া দেয়। মৃত্যুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করে। মশাল জ্বালিয়া প্রাণের পথ দেখাইয়া দেয়।

আমি মৃত্যুকে বড় ভাল বাসি।

"মরণ——রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,—
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান!
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।

মরণ——রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম!
আকুল রাধা রিঝ অতি জর জর,
ঝরই নয়ন দউ অনুক্ষণ ঝর ঝর
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও!
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখি পাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নদী ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ ন বিসরবি, তুঁহুঁ না ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,

হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।”

মরিবার সুখ অনেক, কষ্ট একটী। যাহারা আমাকে ভালবাসিল না, আর যাহারা আমাকে ভালবাসিল, তাহাদের সকলকে আমি ভালবাসি। আমি মরিয়া যাইলে তাহাদের যদি কষ্ট হয়, কে তাহার মোচন করিবে? আমার মায়ের চোখের জল কে মুছাইবে? বুড়া বয়সে কাঙ্গালিনীকে কে চারিটী খাইতে দিবে? আমার শিশু সন্তান গুলি—তাহারাও অনাথ হইবে, সংসারে আনিয়া তাহাদিগকে অকূল পাথারে ভাসাইব? তাহারা লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবে, শত্রুর আনন্দের কারণ হইবে? নীচ-জনের অঙ্গুলীর লক্ষ্য হইবে? মিডিয়া মিডিয়া—কে বলে তুমি রাক্ষসী! রাক্ষস সে, যে তোমাকে বাধ্য করিয়াছিল, স্বহস্তে সন্তানের বক্ষে ছুরিকা আঘাত করিতে। তোমার হৃদয় কুসুম সুকুমার।

মৃত্যুর কষ্ট এইটী। পক্ষান্তে লাভ সহস্র। আবার তাহারা যখন বলে যে, আমার সাহায্য তাহারা অপেক্ষা করে না, আমি মরিলে তাহাদের কষ্ট হইবে না বলিয়া ভরসা দেয়, তখন সে বাধাও থাকে না। মরিবার জন্যই আমরা জন্মিয়াছি, লাভ লোকসান হিসাব করিয়া ফল নাই। মরিতেইত হইবে—দুদিন অগ্রে বা পশ্চাতে। দেবতার সংসার চক্র চলিবে না, যদি মাছি হইয়া আমরা তাহার তলে নিষ্পেষিত হইয়া চক্রের তৈল সঞ্চারণ না করি। আমাদিগকে সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় এই মাত্র। জ্ঞানীর কার্য্য অজ্ঞানের মত, দয়ালের কর্ম্ম নির্দ্দয়ের মত, কে বিশ্বাস করিবে? মনুষ্য-সৃষ্টি জগতের জন্য, জগতের সৃষ্টি মনুষ্যের জন্য নহে। অতিথি আত্মীয় প্রতিপালনের জন্য লোক ছাগল কুক্কুট পুষিয়া থাকে। আমরা দেবতার পোষা পশু। আমার মৃত দেহের উপর দাঁড়াইয়া অন্যে বড় লোক হইবে। মানুষের চর্ব্বিতে সংসার-চক্রের গতিশীলতা সম্পাদিত হয়। যখন, চক্রতলে নিষ্পেষিত হইতেই হইবে, তবে ক্ষতির সহিত অবমান সহ্য করিব কেন? মৃত্যুতেও অবমান স্বীকার করিতে নাই। ছাগলের মত ধরিয়া হাড়ীকাটে ফেলিয়া কাটিবে কেন, স্বইচ্ছায় জগন্নাথের রথচক্রের নীচে প্রাণ আহুতি দিলে জন্মান্তরে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

রাত্রির নীরব অন্ধকারের মধ্যে সহসা জাগ্রত হইলে প্রাণের ভিতর হইতে ষ্টি-পূর্ব্ব সরসতার সজীবতার আভা আসে, অন্যদিকে মৃত্যুর দুর্গন্ধ স্পষ্ট র পাওয়া যায়। জঘন্য কীট পতঙ্গ মনুষ্যের মৃত দেহ ভক্ষণ করিতেছে, শরীরে কেহ হা হু করিতেছে, কেহ লাক টাকার আনন্দে পিশাচের হাস্য করিতেছে! পেটের ভিতর নরক পচিতেছে, মুখ দিয়া তাহার র্গন্ধ বাহির হইতেছে। মনের বন্ধনী কাটিয়া গিয়াছে, এক একটা বৃত্তি অন্ধকারে চোরের মত ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানির ফাক্টরদিগের মত পন আপন কার্য্যসিদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছে। এমনি নিশীথে প্রভু সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ মোহ কাটিয়া মনুষ্যকে ষ্যত্ব দিতে সমর্থ একা মৃত্যু। একটী সরল প্রাণ শিশু কাঁদিতেছে, সার যত কসিয়া বাঁধিতেছে, তাহার কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগিতেছে, মায়ের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে, মায়ের কোলে যাইতে চাহি-ছে। কোন্ শাস্ত্রে এখানে আসিলাম ভাবিতেছে আর বলিতেছে—

“কেন এ সংসারে, পাঠালে আমারে, তুমিই জান তা’ প্রভুগো।”

আবার প্রভাত হইবে, একটা মশা একটা ছারপোকার অনুসরণে ষ্য ধাবিত হইবে! আবার ব্যবসাদারী আরম্ভ হইবে! সবাই কানের পাটা সাজাইবে। যে জিনিশপত্রগুলা রাত্রি বেলা এক াণে লুকান ছিল, সে গুলাকে ভাল করিয়া সাজাইয়া লোকের মন াইবার চেষ্টা হইবে! প্রতারণার ব্যবসা, সবাই সবাইকে ঠকাইতে চেষ্টা রিবে ও সবাই ঠকিবে! কাহারও আসলটা কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ন সাজ সজ্জায় তুমি তোমাকেই চিনিতে পারিবে না। একটু উচাল গায় দাঁড়াইলেই মনুষ্যত্বের ঘৃণ্যতা বুঝাযায়। আর প্রাচীন প্রমিথিউসের হিত কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতে হয় “Burn me with fire, or bury me erth, or give me for food to the monsters of the deep; and dge me not these prayers, o king.”

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

পাতা মুড়িবেন না

"কে তুমি আমার ?"

(১)

"কে তুমি আমার" ?—হৃদয়ের রাণী,
নয়নের মণি, জীবনের সখী,
নিরাশার আশা, হৃদয়ের ভাষা,
এ মৃত পরাণে তুমি মৃত-সঞ্জীবনী।

(২)

প্রভাত জীবনে অরুণ কিরণ,
শ্রবণ-রঞ্জন, নয়ন অঞ্জন,
কৃপণের ধন,— কণ্ঠের ভূষণ,
তোমার করুণা' পরে জীবন মরণ।

(৩)

জীবন-মরুতে তুমি "ওয়েসিস্",
তোমার প্রেমের শীতল ছায়ায়
ক্ষণেকে তাপিত হৃদয় যুড়ায়,
তোমা হারা হলে দেখি শূন্য দশদিশ্।

(৪)

হৃদয়-আকাশে শারদ পূর্ণিমা,
জীবন-বসন্তে মলয় পবন ;
দগধ পরাণে চন্দনালেপন—
হৃদয় উপরে, সখি, ধরি যবে তোমা !

(৫)

রোগের ঔষধ—শান্তির আধার,
জাগ্রতে জীবন, শয়নে স্বপন,
সংসার-সাগরে বিষাদ-তুফানে
জীবন-তরীর মম তুমি কর্ণধার।

(৬)

মধুর মধুর অতি সুমধুর
পীযূষ-পূরিত তব প্রিয় নাম
লইতে লইতে চাহিতে চাহিতে
ভাবে মন প্রাণ, সখি, হয় ভরপূর।

(৭)

একদিন—
আলু-থালু-বেশে মাথা রাখি বুকে
সুধামাখা হাসি হেসে হাসিমুখে,—
আশা সঞ্চারিয়ে নিরাশ জীবনে
তাড়িত-প্রবাহ নয়নের কোণে
ছুটায়ে, সলাজে সুধাইয়াছিলে—
"কে তুমি আমার,--আমি কে তোমার
"হৃদয়ের রাণী"--তুমি গো আমার!
আমি কে তোমার ?—আমিত জানিনে

শ্রীনিরানন্দ গোস্বামী।

পাতা মুড়িবেন না

বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন, যে, অসৎ কর্ম্ম করিলেও যে পাপীর মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না, তাহার কারণ অভ্যাস। অভ্যাস বশতঃ বিবেক মলিন হইয়া যায়, সুতরাং অসৎ কার্য্য করিলেও আর বিবেক বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। প্রথমতঃ বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, কিন্তু বিবেককে একবার পদদলিত করিলে তাহার উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ এইরূপে বিবেককে পদদলিত করিলে বিবেক এতদূর বিকৃত হয় যে, আর ইহা মানবকে সৎপথে রাখিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। দুইটী যুক্তি দ্বারা এই আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর দুটি লোক তাহাদের জীবনে সর্ব্ব প্রথম বিবেকবিরুদ্ধ অর্থাৎ অসৎ জানিয়াও কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। উভয় ব্যক্তিরই মনে অবশ্যই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। ইহা অবশ্য কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, আত্মগ্লানি, আত্মপীড়ক এবং যাহা কিছু আত্মপীড়ক তাহা হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছাও মানবের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং আত্মগ্লানির অবশ্যম্ভাবী ফল ভবিষ্যতে সেরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার ইচ্ছা। যাহার আত্মগ্লানি যত অধিক, তাহার এই ইচ্ছাও তত বলবতী অথবা যাহার এই ইচ্ছা যত বলবতী, তাহার আত্মগ্লানিও তত অধিক হইয়াছে, ইহাও অনুমানসিদ্ধ। সমান শক্তির কার্য্যও সমান। এখন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন আত্মগ্লানির ভয় না করিয়াও পুনরায় তদ্রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। অপর সেরূপ কার্য্য হইতে বিরত রহিল। ইহার অন্য অর্থ যে, এই দুই ব্যক্তির সমান পরিমাণ আত্মগ্লানি হয় নাই—যাহার আত্মগ্লানি অধিক হইয়াছিল সে সে-কার্য্য হইতে বিরত হইল ; কিন্তু যাহার আত্মগ্লানি বেশী তীব্র হয় নাই, সে পুনরায় সে-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। কার্য্য কারণের অবিচ্ছিন্নতা এবং শক্তির পরিমাণ ও কার্য্যের পরিমাণের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী ও চিরসম্বন্ধ স্বীকার করিলে এই মীমাংসা স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহার আত্মগ্লানি যত অধিক, সে তত অধিক বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে অর্থাৎ সে তত অধিক পাপী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মগ্লানির কষাঘাতে ভবিষ্যতে সেরূপ কার্য্য হইতে বিরত হইল, সে অপর ব্যক্তি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মগ্লানিকে উপেক্ষা করিয়া পুনরায় অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল) অপেক্ষা অধিকতর পাপী। এখানেও সেই যুক্তি-বিপর্য্যয়। এই প্রথম বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্যকালে উভয়েরই বিবেক তুল্যরূপ উজ্জ্বল ছিল, না হয় তুল্যরূপ উজ্জ্বল ছিল না। যদি উভয়েরই বিবেক তুল্যরূপ উজ্জ্বল থাকে, তবে উভয়েরই আত্মগ্লানি সমান হইবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে সেরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার বাসনা তুল্য রূপ প্রবল হইবে। সুতরাং এক অবস্থায় উভয়ের কার্য্যও এক প্রকার হইবে। এখন দুই ব্যক্তির স্থানে কোন বিশেষ অসৎ কার্য্যের অসারতা অনুষ্ঠাতাগণের সকলকে গ্রহণ করিলে এই মতের (absurdity) আরও স্পষ্ট হইবে। অন্য লক্ষ (অর্থাৎ যদি তাহাদের বিবেক তুল্যরূপ উজ্জ্বল না হয়) গ্রহণ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাদের এই বিবেকের ঔজ্জ্বল্যবৈষম্য তাহাদের এই জীবনের কোন কার্য্যের ফলাফল নহে, তাহারা এই বৈষম্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ হয় ইহা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কর্ম্মের ফলাফল, না হয় তাহার নিজেরই জন্মান্তরীয় কর্ম্মফল।

অপর যুক্তিটী এইরূপ। এই শ্রেণীর বিবেকবাদিগণ যাহাকে বিবেক বলেন, অভ্যাসবশতঃ তাহার মালিন্য সম্ভবপর কি না। কোন বিশেষ কার্য্যের সদসদত্ব বিচার বিবেকের কার্য্য নহে, তাহা বুদ্ধিরই কার্য্য। বুদ্ধিকৃত বিচারের উপর দাঁড়াইয়া অসৎত্যাগ করিয়া সৎকে কার্য্যে পরিণত করা বা না করা বিবেকের কার্য্য। অভ্যাস বশতঃ এ বিবেকের মালিন্য সম্ভবপর নহে, সদসদ্ বিচার মলিন হইতে পারে বটে। অভ্যাস বশতঃ সৎকার্য্যকে আর সৎ বলিয়া বোধ হয় না, অসৎ কার্য্যকে আর অসৎ বলিয়া বিবেচনা হয় না; কিন্তু ইহা বুদ্ধির বিচার, বিবেকের আদেশ নহে। এই যুক্তিটি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, এই বিবেকবাদীদের বিবেকের একটি কাল্পনিক অস্তিত্ব ভিন্ন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। বিবেক বুদ্ধিরই ছায়া। বিবেক ও বুদ্ধির বস্তুগত একত্ব আমরা ক্রমশ আলোচনা করিব।

বিবর্ত্তনবাদীদের মতে বিবেক একটি অর্জ্জিত সংস্কার। তবে এই সংস্কারটি কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা বা বহুজ্ঞারফল নহে। বহু যুগ যুগান্তের বহুজ্ঞতার (experience) ফল পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে সমাগত হইয়া (Organic) প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, একটি স্বতন্ত্র সংস্কাররূপে পরিণত হইয়াছে। সংস্কারের উৎপত্তি কি রূপে হয়, একবার দেখা যাউক। একটি কার্য্য একবার করিলে পুনরায় সে কার্য্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আইসে, একথা সকলেই স্বীকার করেন এবং কোনও কার্য্য পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিলে পুনরায় সে রূপ কার্য্য করিবার জন্য মন স্বতঃই উন্মুখ হইয়া পড়ে। বহুদিন কোন কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে ক্রমে সে অভ্যাস সংস্কার রূপে পরিণত হয় অর্থাৎ তখন সে কার্য্য করা অনেক পরিমাণে বিচার নিরপেক্ষ হইয়া পড়ে ও তাহা না করিতে পারিলে কষ্ট হইয়া থাকে। বহুকালের অভ্যাসে যখন এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন বুদ্ধি এই সংস্কারানুযায়ী কার্য্যকে অসৎ বা অমঙ্গলজনক বলিয়া স্থির করিলেও সংস্কার বা অভ্যাস বিরুদ্ধকার্য্য করা অত্যন্ত অসাধ্য, কষ্টদায়ক হইয়া থাকে ও অনেক স্থলে এ রোগ বলিয়াই বোধ হয়। অভ্যাস বা সংস্কারের এই অনমনীয়তার ভূয়ো দর্শনের ফল Habit is second nature প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। সংস্কার ও বুদ্ধির বিচার যখন বিপরীত-মুখী হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি রূপে মানবান্তরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যখন সংস্কারে ও বুদ্ধির বিচারে কোন বিরোধ না ঘটে, তখন সে সংস্কার নৈতিক সংস্কার বলিয়া পরিগণিত হয় ও তখন সেরূপ লোকের পক্ষে সেই পুণ্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এইরূপ কার্য্যগত সংস্কারের আধার মন, এবং মনের আধার শরীরও তাহার ফলভাগী। কোন কার্য্য দ্বারা যেমন মনের সংস্কার পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইতে থাকে, তেমনই শরীরের গঠনও অন্যরূপ হইয়া যায়। যেমন মানসিক কর্ম্মের ফল শরীর ভোগ করিয়া থাকে, তেমনই শরীরের কর্ম্মের ফলও মন ভোগ করিয়া থাকে। কার্য্যগত সংস্কারের আধার দুইটি; শরীর ও মন। এই সংস্কারাধার শরীর হইতে উৎপন্ন শরীরও তাহার সেই সংস্কারভাগী হইবে, ইহা apriors যুক্তিসিদ্ধ এবং সন্তান যে পিতামাতার সংস্কারের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে ইহাও a posteriori অভিজ্ঞতা নিত্যই প্রমাণিত করিতেছে। কোনও ব্যক্তি যে কেবল তাহার

স্বকৃত কর্ম্মের ফলভাগী তাহা নহে, তাহাকে পূর্ব্ব পুরুষগণের কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইতেছে। এইরূপে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মকালে কতকগুলি সংস্কার লইয়া সংসারে প্রবেশ করে। এবং এই জন্মকালীন সংস্কার দ্বারা তাহাদের ভাবী জীবনের সমস্ত কার্য্য বহুল পরিমাণে নিয়মিত হইয়া থাকে। জন্মকালীন এই সংস্কারগত বৈষম্য স্বীকার করিলে মানবের চরিত্র ও কার্য্য-বৈচিত্র্যের জটিলতা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া যাইবে।

সংস্কার যে কেবল কার্য্য-জনিত তাহা নহে, চিন্তা জনিতও বটে। কোন কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিলে যেমন সে কার্য্য করিবার জন্য একটী সংস্কার জন্মে, সেইরূপ কোন চিন্তা পুনঃ পুনঃ করিলে তাহারও একটী সংস্কার জন্মিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি বিচার করিয়া কোন একটি বিশেষ কার্য্যকে সৎ বা অসৎ বলিয়া স্থির করিল; পুনর্ব্বার বিচারেও যদি সে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তবে তাহার পূর্ব্বের বিচার দৃঢ়তর হইল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিচারেও যদি সেই একই সিদ্ধান্ত হয় এবং বহুকাল ব্যাপিয়া যদি এইরূপ বিচার হইতে থাকে, তবে তাহা ক্রমে সংস্কার রূপে পরিণত হইয়া যায়। * যখন এইরূপ চিন্তাজনিত কোন সংস্কার কার্য্যজনিত কোন সংস্কারের প্রতিকুলগামী হয়, তখন প্রথমোক্ত নিবৃত্তিরূপে ও শেষোক্তটি প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশ পায়। প্রথম প্রস্তাবে জ্ঞানকৃত বিচারকে নিবৃত্তির কারণ রূপে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু সকল সময় নিবৃত্তি বিচাররূপে প্রকাশিত হয় না—সংস্কাররূপে প্রকাশ পায়। এই যুক্তি পূর্ব্বোক্ত যুক্তিকে পূর্ণাঙ্গ করিতেছে। চিন্তাজনিত সংস্কার ও জ্ঞানকৃত চিন্তা উভয়ে মিলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তির মূল নির্দ্দেশ করিতেছে। যেমন কার্য্যজনিত সংস্কার দেহ আশ্রয় করিয়া পিতা মাতা হইতে সন্তানে সমাগত হয়, তদ্রূপ চিন্তাজনিত সংস্কারও রক্তের সহিত সন্তানে বর্ত্তিতে পারে, কিন্তু চিন্তাজনিত সংস্কার এত সূক্ষ্ম ও ইহার সহিত দেহের সম্বন্ধ এত দূরসমাগত (Farfetched) যে, এই সিদ্ধান্তের উপর আমরা বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

*তখন এই সদসৎ বিচার একপ্রকার বিচার নিরপেক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। তখন সেরূপ কার্য্যকে স্বতঃই সৎ বা অসৎ বলিয়া বোধ হয়, বিচার বিরহিত Intuitive knowledge রূপ প্রাপ্ত ইহার কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই চিন্তাজনিত সংস্কারের মূল অন্যত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না, আমরা পরে দেখিব।

সংস্কারের উৎপত্তির নিয়ম আমি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু কতকগুলি সংস্কারকে সৎ, কতকগুলিকে অসৎ বলিয়া স্থির করিবার কারণ কি, তাহাদের উৎপত্তি কি রূপে হইল দেখা যাউক।

যদি মানুষকে কখনও অপর কোন মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিতে না হইত, যদি মানুষকে এমন কোন কার্য্য বা চিন্তা করিতে না হইত যাহাতে অন্য কোন ব্যক্তি সংসৃষ্ট, তাহা হইলে নীতি কথাটি বোধ হয় কখনই শ্রুত হইত না, সদসদ্ জ্ঞান কখনই মানবপ্রাণে উদিত হইত না। সমাজের সহিতই নীতির উৎপত্তি, সমাজের সহিতই ইহার বিনাশ। সুতরাং নীতির উৎপত্তি স্থান বিবেকের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে সমাজের মূলে যাইতে হইবে। যেখানে মানবের সহিত মানবের ব্যবহার, সে খানেই ভালমন্দ বিচার আসিয়া উপস্থিত হইল। মানব স্বীয় স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহের পরিচালনের জন্যই কার্য্য করে। একজন স্বীয় বৃত্তি পরিচালন করিতে গিয়া যদি অপরের বৃত্তি পরিচালনের ব্যাঘাত উৎপাদন করে, তবেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই সংঘর্ষের অপর নাম বিবাদ, বিসম্বাদ, যুদ্ধ। যদি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া মানবের বৃত্তি পরিচালনের অধিকতর সুবিধা না হইত, তাহা হইলে মানবের পরস্পরের মধ্যে সমরস্রোত অবিরাম অবিশ্রাম গতিতেই প্রবাহিত থাকিত, সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব হইত। যখন মানব অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীয় শক্তির সীমা দেখিতে পাইল, যখন বুঝিতে পারিল যে কোন কাম্য বস্তু লাভের পক্ষে নিজের শক্তি যথেষ্ট নহে, আরও শক্তির প্রয়োজন, তখন সাধারণ স্বার্থ সাধনের জন্য মনুষ্য পরস্পরের সহিত মিলিত হইল। ইহাকেই বলে সমাজ। পরস্পরের সাহায্যে স্বার্থসাধিত হইলে পর তাহাদের মধ্যেই সেই কাম্য বস্তু বিভাগের সময় বিবাদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সকলেই স্বীয় স্বীয় বৃত্তি পরিচালনের জন্যই ব্যস্ত—অপরের দিকে দৃষ্টি নাই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে স্বার্থ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবারই কথা। দুই একবার এরূপ বিবাদ হইলে মানব দেখিতে পাইল যে, পুনরায় সাধারণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরূপ ভাবে মিলিত হওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—বুঝিতে পারিল যে স্বার্থের পূর্ণ সিদ্ধির আশা করিতে গিয়া মূলেই গোল বাঁধিয়াছে।

তখন অভিজ্ঞতার কষাঘাতে মানব বুঝিতে পারিল যে, স্বার্থ সিদ্ধির জন্য স্বার্থের কথঞ্চিৎ সঙ্কোচন আবশ্যক, অপরের বৃত্তি পরিচালনে ব্যাঘাত করিলে নিজের স্বার্থেরই ব্যাঘাত হইবে। এই সময় মানব স্বীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য অপরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, ইহাতেই তাহাদের মধ্যে একটি নীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মানবের অতি আদিম অবস্থায় আহারের জন্য পশু হননাদিও হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষার জন্যই বোধহয় এরূপ মিলন আবশ্যক হইয়াছিল। ক্রমে যত মানুষ যত অধিক উদ্দেশ্যে মিলিত হইতে আরম্ভ করিল, ততই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধও নানাবিধ হইতে লাগিল। এই স্বার্থের সম্বন্ধের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে নৈতিক সম্বন্ধও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। * নীতির মূল স্বার্থে স্থাপিত হইলেও স্বার্থেই ইহার পরিণতি নহে। বরং স্বার্থ নাশই উচ্চ নীতির আদেশ। এখন নীতির মূল-স্বার্থ—কিরূপে ইহার পরিণতিতে অর্থাৎ স্বার্থনাশে পরিণত হইল দেখাইতে পারিলে, বিবর্ত্তনবাদীর কার্য্য শেষ হয়। নীতির মূল ক্ষতিলাভ গণনায়; কিন্তু ক্ষতিলাভ গণনা, ভালমন্দ বিচার চিরকাল বিচাররূপে থাকিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ কোনও এক প্রকার চিন্তা ও তদনুযায়ী কার্য্য করাতে তাহা ক্রমে সংস্কারে পরিণত হয়। যখন একবার সংস্কারে পরিণত হয়, তখন তাহা আর বিচার প্রসূত বলিয়া বোধ হয় না, তাহার মূল অদৃশ্য হইয়া যায়, তখন ইহা Instinct রূপেই ব্যক্ত হয়। কাল সহকারে এই নৈতিক সংস্কার এত দৃঢ়বদ্ধ হইতে পারে যে, এরূপ সংস্কার-সম্পন্ন লোকের পক্ষে স্বার্থ ত্যাগ করা, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করাও এরূপ সংস্কার বিরুদ্ধ কার্য্য করা অপেক্ষা সহজ।

নীতির এই চরিত্রগত পরিবর্ত্তনের অপর একটি কারণ সহানুভূতি। আমরা যখন যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, আমরা যখন যে কোন বিষয়ে চিন্তা করি, আমরা অন্ততঃ তখন কতক পরিমাণে তাহাই হইয়া যাই, ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। আমরা যাহার সহিত একাত্মভাবাপন্ন হইতে

* একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে এরূপ বহু বিস্তৃত বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব। আমাকে স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে ইহার কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইল। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে তাঁহারা সমাজ বিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ (যেমন Herbert Spencer on sociology) পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

না পারি, তাহা কখনও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। সহানুভূতি এই সাধারণ নিয়মের একটি শাখা। আমরা যখন যে মানুষের সংসর্গে আসি, সহানুভূতি প্রভাবে আমরা তখন তাহার সহিত একাত্ম ভাবাপন্ন হইয়া যাই—তাহার সুখ দুঃখ আমাদের সুখ দুঃখ হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহার দুঃখ বিমোচন, সুখ বর্দ্ধন নিজের দুঃখ বিমোচন ও সুখ বর্দ্ধনের আকার ধারণ করে। পরিচালন দ্বারা ক্রমে এই বৃত্তির উজ্জলতা এতদূর বৃদ্ধি পায় ও ইহা এত বেগবতী হয় যে, কাহার ইহার প্রতিকূলগামী অন্যান্য বৃত্তিগুলি একেবারেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় এই সংস্কারগুলিও পুরুষ-পরম্পরা-ক্রমে সমাগত হইয়া Moral Instinct হইয়া যায়।

আধুনিক বিবর্ত্তনবাদীদের কথা বলিতে যাইয়া আমাদের ভারতীয় আর্য্য-ঋষিদের কথা স্মরণ হয়। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদীরা যেরূপে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বিবেক ও নীতির উৎপত্তি ও পরিণাম নির্ণয় করিয়াছেন, আর্য্য-ঋষিদের নিকট তাহা অবিদিত ছিল না। কর্ম্মফল কিরূপে সংস্কারে পতিত হইয়া মানব প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে, কর্ম্ম কিরূপে মানবকে উন্নতি বা অবনতির সোপানে আরূঢ় করিয়া কাহাকে বা ধার্ম্মিক, কাহাকেও বা অধার্ম্মিক করিয়া তুলে, তাহা তাঁহারাই বিশিষ্টরূপ অবগত ছিলেন। আমি এপর্য্যন্ত বিবর্ত্তনবাদীদের কর্ম্মফল ও সংস্কারবাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, ভারতীয় আর্য্য-ঋষিদের দ্বারা সেই মতই বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক বিবর্ত্তনবাদীদের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ জন্মান্তর বাদ লইয়া। বিবর্ত্তনবাদ দেহকেই সংস্কারের আধার বলিয়া স্থির করেন। এক দেহে সঞ্চিত সংস্কার তদুৎপন্ন দেহ পরম্পরায় সংক্রামিত ও সঞ্চিত হইতে থাকে, ক্রমে বহুযুগযুগান্তের সংস্কার রাজি পুরুষ পরম্পরায় সমাগত হইয়া বর্ত্তমান মানবকে গঠিত করিয়াছে। ইহাঁদের অনেকেই মানবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং মানবের যাবতীয় সংস্কারের একমাত্র আধার দেহ। যাঁহারা বা মানবাত্মায় বিশ্বাস করেন, তাঁহারাও জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতেও দেহই একমাত্র সংস্কারের আধার। ইহাঁরা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাঁদিগকে হয় জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিতে হইবে, না হয় মানবাত্মাকে দেহজ বলিয়া জড়বাদী হইতে হইবে। মনুষ্য যে

সমস্ত সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার অধিকাংশই মানসিক অর্থাৎ সে সমস্তই মানবাত্মার সংস্কার। সংস্কারবিবর্জ্জিত মানবাত্মা আমাদের নিকট গুণ বিবর্জ্জিত বস্তুর ন্যায় একটি খ-পুষ্প ভিন্ন আর কিছুই নহে। সংস্কারবিবর্জ্জিত মানবাত্মায় পিতৃমাতৃদেহস্থিত সংস্কার রাজি সংক্রামিত হইয়া শিশুর দেহ মন গঠন করিয়াছে বলা অপেক্ষা মানবাত্মা পিতৃমাতৃ দেহজ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আমার এই সকল সদসদ্ গুণ পিতৃমাতৃদেহজ বলা আর আমি জড় বলা একই কথা। জন্মান্তরবাদী হিন্দু জীবের সূক্ষ্ম দেহকে (অর্থাৎ যে মনোময় দেহ স্থূল দেহের বিনাশের পরও বিদ্যমান্ থাকিবে) সংস্কারের প্রধান আধার বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার লইয়াই মানবাত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ইহাঁরা স্থূল দেহকেও সংস্কার বিবর্জ্জিত মনে করেন না—পিতামাতার দেহস্থিত সংস্কার সন্তানদেহে সংক্রামিত হয়। সুতরাং আধুনিক বিবর্ত্তন-বাদীদের সহিত ইহাঁদের কোনও বিরোধ নাই। একটি আপত্তি উঠিতে পারে—যদি জন্মান্তরীয় সংস্কার লইয়াই জীব জন্মগ্রহণ করে, তবে পিতা-মাতার মানসিক অবস্থার সহিত সন্তানের মানসিক অবস্থার এত সৌসাদৃশ্য দৃষ্টি হয় কেন? এ আপত্তি নিরাসন করা নিতান্তই সহজ। যে মোহিনী-শক্তি প্রভাবে (natural affinity) সমভাবাপন্ন লোক দেশ দেশান্তর হইতেও আসিয়া এক কেন্দ্রীভূত দলে মিশিয়া বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ হয়, সেই স্বাভাবিক নিয়মে জীবাত্মাও আত্মানুরূপ ক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়া স্থূল দেহ গ্রহণ করে। মন যেমন দেহের উপর কার্য্য করে, দেহও তেমনি মনের উপর কার্য্য করে। জীবাত্মার পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার ও পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত সংস্কার উভয়ে মিশিয়া একটু নূতন করিয়া জীবকে গঠিত করে।

আমি ইতি পূর্ব্বে কাম্য ও ভালকে একই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। আমাদের সকল কার্য্যের মূলে হয় সুখান্বেষণ, না হয় দুঃখ পরিহার। মূলে এরূপ সুখদুঃখ বিচার থাকিলেও পরে সেরূপ থাকে না। যখন সংস্কার একবার গঠিত হয়, তখন মানুষ সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করে—সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলে সুখ—তদ্বিপরীত হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সাধারণ হিতবাদের (Utilitarianism) সহিত এখানেই ইহার প্রভেদ। হিতবাদ সুখদুঃখ গণনাকেই সকল কার্য্যের নিয়ন্তা বলিয়া নির্ণয় করে—সকল কার্য্যেই সুখই হিতবাদের লক্ষ্য। কিন্তু

সংস্কারবাদীরা বৃত্তির পরিচালনাই সকল কার্য্যের মুখ্য কারণ বলিয়া স্থির করেন—বৃত্তি পরিচালনের চিরসঙ্গী সুখ। ইহাঁরা সুখকে লক্ষ্যস্থানে রাখা দূরে থাক্ সুখকে লক্ষ্যের বহির্ভূত রাখাই সুখলাভের সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া মনে করেন। সুখ এমন কোমল পদার্থ যাহার দিকে দৃষ্টি করিলে আর দেখা যায় না, কিন্তু যাহাকে মন হইতে দূরে রাখিলে সে আপনি আসিয়া মনোরঞ্জন করিবে। সাধারণ হিতবাদ বিবেকের আদেশে যে অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব রহিয়াছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারে না। সাধারণ হিতবাদ উচ্চনীতির পরমবন্ধু। জনসাধারণের হিতের জন্য আত্মসুখ বলি দেওয়া হিতবাদীর সর্ব্বপ্রধান নীতি। কিন্তু অপরের সুখের জন্য আত্মসুখ বলি দিব কেন? অপরের দুঃখ হইলে আমার কি? সুখদুঃখ বিচারকারী হিতবাদী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। সংস্কারবাদী বলিবেন—তোমার যাহা করিবার তাহা তোমাকে অবশ্যই করিতে হইবে, তুমি তোমার স্বভাবের প্রতিকূলে যাইতে পার না। তোমাতে যদি দয়ার সংস্কার থাকে তবে দয়ার পাত্র দেখিলে তুমি দয়া না করিয়া পার না ইত্যাদি।

হয়ত এখনও' কেহ কেহ আপত্তি করিবেন যে বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান ঈশ্বরের বাণী না হইলে লোক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে—আর নীতির শাসন থাকিবে না। তাঁহাদের প্রতিও আমদের ঐ একই উত্তর। যাঁহার সাধুসংস্কার হইয়াছে তাঁহার পক্ষে সাধুকার্য্যই স্বাভাবিক—সাধু-কার্য্যে তাঁহার সুখ, তিনি অসাধু কার্য্য করিতে যাইবেন না—পারিবেনও না। আর যাহার সংস্কার অসাধু—তাহাকে অসাধু কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার পক্ষে ঈশ্বরের অপ্রীতির ভয় দূরে থাকুক্, অনন্তকাল স্থায়ী বিষম নরকাগ্নির ভয়ও বিশেষ কার্য্যকারী নহে। এরূপ লোকের পক্ষে ঈশ্বরের অপ্রীতির ভয় অপেক্ষা সমাজশাসনের ভয় ও রাজদণ্ডের ভয় অধিকতর কার্য্যকারী। *

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

---

* লেখকের সকল মতের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। যদি কোন দার্শনিক সুলেখক ইহার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন; তবে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

সেণ্ট্ পলের নবজীবন লাভ।

জন্মভূমিতে কিছু দিন অবস্থানের পর, পল জেরুসালেমে আগমন করেন; কি জন্য জেরুসালেমে আসিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণে মহাত্মা খৃষ্ট এবং তৎশিষ্যদিগের প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। কেন তিনি ধর্ম্মপরায়ণ নিরীহ খৃষ্টশিষ্যদলের প্রতি আন্তরিক গভীর বিদ্বেষের ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা যায় না। বোধ হয় প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপরীত মত প্রচার করার জন্যই খৃষ্টশিষ্যরা পলের নিকটে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন; কেবল পলের নিকট কেন, সমগ্রদেশবাসী লোকেরাও তাহাদিগকে অবিমিশ্র ঘৃণা ও ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত। যাহাহউক তিনি জেরুসালেমে উপস্থিত হইয়া খৃষ্টশিষ্যদিগের প্রতি বিশেষরূপে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। পলের উৎপীড়নে শিষ্যেরা নিতান্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। ষ্টিফেনকে হত্যা করার পর ইহার অত্যাচার দিন দিন আরও প্রবলতর হইতে লাগিল। খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের হয়ত জানা আছে যে, ধর্ম্মাত্মা ষ্টিফেনকে হত্যা করার প্রধান উদ্যোগীপুরুষ পল। ষ্টিফেনের মৃত্যুতে খৃষ্টসমাজ একান্ত শোকাভিভূত ও বিচ্ছিন্ন-প্রায় হইয়াছিল, তাহার উপর পলের প্রবল উৎপীড়নে তাহারা আরও বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। ইহার অত্যাচার ক্রমে সীমা ও পরিমাণ অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইতে লাগিল। খৃষ্টজগতে এক সুদূর বিস্তীর্ণ গভীর কালমেঘের সঞ্চার হইল। জেরুসালেম নগর পলের উপদ্রবে কম্পিত হইয়া উঠিল। অনেকে নগর পরিত্যাগ করিয়া দূরতর প্রদেশে চলিয়া গেলেন। নাগরিকদিগকে বিবিধ প্রকারে ইহাদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। প্রত্যেক খৃষ্টশিষ্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার ও প্রহার এবং বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়া কারাগারে বন্দীকৃত করিতে লাগিল। কেবল পুরুষদিগের প্রতি নয়, অবলা রমণীদিগের প্রতিও এইরূপ নির্ম্মম ব্যবহার হইতে লাগিল। কখন বা ক্রোধাবেশে একেবারে উন্মত্ত হইয়া শিষ্যদিগের গৃহে প্রবেশ করত তাহাদিগের পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি তীব্র কশাঘাত

তাহাদিগের নিন্দা ও দোষোদ্ঘোষণ পলের একটি পরম প্রিয়ব্রত হইয়া উঠিল। এই অচিন্তনীয় নিপীড়নের নিবারণ বা প্রতিবিধানের উপায় ছিল না; কারণ, দেশীয় সমাজ ও বিচারালয় সকল ইহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ধর্ম্মাধিকরণের দ্বার এই অত্যাচারনিপীড়িত অসহায় শিষ্যদলের নিকট লৌহঅর্গলে আবদ্ধ, সুতরাং পৃথিবীতে তাহাদিগের আর প্রতিবিধানের আশা কোথায়? কেন এই দুর্ব্বিসহ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা খৃষ্টসমাজের প্রতি হইতে লাগিল! ইহার কি কোন নিগূঢ় কারণ নাই, নিশ্চয়ই আছে; পরম মঙ্গলসঙ্কল্প পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা এই ঘটনাবলীর পশ্চাতে নিয়োজিত রহিয়াছে। কেবল কি পলের অত্যাচার? এতদ্ভিন্ন অন্যান্য লোকের অজস্র উৎপীড়নও তাহারা সহ্য করিতেছিল। তাহাদের চারিদিকই বিপদের ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদের নরনারী সকলেই দুস্তর বিপর্ণবে নিমগ্ন। বিধাতার নিকটে তাহাদিগের কাতরতাপূর্ণ হৃদয় হইতে ঘন ঘন এই প্রার্থনাধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল যে, "হে ভগবান! এই বিপদ-রজনীর কি অবসান হইবে না?" আহা! সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখিলে ইহারা কি হতভাগ্য দুর্দ্দশাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্টি অসম্পূর্ণ, ইহাতে ঠিক দেখা যায় না। সংসারের অতীত আর এক দৃষ্টি আছে; তদ্দ্বারা দেখিলে ইহাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক ইহসংসারে তাহারাই প্রকৃত সৌভাগ্যশালী, যথার্থ ভাগ্যবন্ত, যাহারা ধর্ম্মের জন্য—সত্যের জন্য মানবসমাজে নিপীড়িত। এই জন্যই মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "ধর্ম্মের জন্য তাড়িত লোকেরা ধন্য।" প্রার্থনা করি, যেন আমাদের মধ্যে এই দুর্ব্বিষহ উৎপীড়নের ভাব উপস্থিত হয়। তাহা হইলে আমরাও ধন্য হইয়া যাইব। পল যে একেবারে এক জন অত্যাচারপরায়ণ ধর্ম্মভাববিহীন পাষণ্ড লোক ছিলেন তা নয়। তিনি একজন সরলবিশ্বাসী ঈশ্বরোপাসক ছিলেন। তাঁহার নিজের উক্তিতেই বোধ হয়, তিনি যে এই খৃষ্টীয় সমাজের প্রতি যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন করিতেন, তাহা ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ প্রণোদিত ভাবে নয়। কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাহাদিগকে উৎপীড়িত করা তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুমোদিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি তিনি মনে করিতেন, খৃষ্টের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে পীড়ন করিতে পারিলেই পরমেশ্বরের নিকট প্রিয়পাত্র হওয়া যায়। মানবজাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল

বিষয়ের প্রলোভন অপেক্ষা ধর্ম্মের প্রলোভন অধিকতর আকর্ষক এবং মুগ্ধকর। ইহা মানবহৃদয়ে প্রবল আশা ও উত্তেজনার বহ্নি বর্ষণ করে, ইহার নামে মনুষ্যের অকরণীয় কার্য্য কিছুই নাই; সন্তানবৎসলা জননী সদ্যোজাত নয়নানন্দকর শিশুসন্তানকে আনায়াসে সাগর বক্ষে ভাসাইয়া দিতে পারেন, ইহার নামে মনুষ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আপনার সুকোমল জীবন্ত দেহকে ভস্মীভূত করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। পল এই উন্মাদকর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াই খৃষ্টসমাজের প্রতি অচিন্তনীয় নির্য্যাতন করিতেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই নিরাশ্রয় শিষ্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে পারিলে পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। পলের দুর্দ্দমনীয় নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ইতিপূর্ব্বে কতকগুলি শিষ্য ডামস্কাস্ নগরে গমন করিয়াছিলেন। এই সংবাদ পলের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। খৃষ্টানুচরদিগকে বিনষ্ট করাই যাহার পক্ষে পরম প্রিয়ব্রত, সে কি আর এ সমাচার শুনিয়া স্থির থাকিতে পারে? কিরূপে ডামস্কাস্-বাসী শিষ্যদিগকে পর্য্যুদস্ত করিবেন, ইহাই পলের একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল। পল চিন্তা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া তাহাদিগের প্রতি উৎপীড়ন করা, তত সুবিধাজনক নয় এবং উহা আমার ক্ষমতারও একরূপ বাহিরে; কিন্তু যদ্যপি প্রধান যাজকের নিকট হইতে আদেশপত্র লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে। এই স্থির করিয়া পল জেরুসালেম নগরস্থ থিওফিলাস্ নামক প্রধান যাজকের নিকট গমন করিলেন। সময়ে সময়ে এক একজন ব্যক্তি প্রধান যাজক শ্রেণীতে নির্দ্দিষ্ট থাকিত। ইহার পূর্ব্বে জেনোথান ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পলের প্রার্থনানুসারে থিওফিলাস্ তাঁহাকে এক আদেশপত্র দিলেন এবং সেই পত্রে ডামস্কস্ নগরবাসী য়িহুদী সমাজকে লিখিলেন যে, "তোমাদের নগরস্থ খৃষ্টমতাবলম্বী নরনারী সকলকে বাঁধিয়া এই ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করত জেরুসালেমের বন্দীশালায় পাঠাইয়া দাও।" পলের মনোভিলাষ সিদ্ধ হইল, তিনি মহোল্লাস করিতে করিতে অনুচরগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে ডামস্কাস্ নগরে যাত্রা করিলেন। পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন, এ যাত্রার উদ্দেশ্য একদিকে কি ভীষণ, অপরদিকে কি ঘৃণার্হ। পলের চরিতাখ্যায়কেরা বলেন, খৃষ্টীয়শকের ৩৭ সাঁইত্রিশ

বৎসরে নবেম্বর মাসে অথবা ষ্টিফেনের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে পল ডামস্কাস্ যাত্রা করেন। তখন পলের বয়ঃক্রম বোধ হয় ৩৪।৩৫ চোত্রিশ অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। পল খৃষ্টের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। ডামস্কাস্ নগর সিরিয়া দেশের রাজধানী, জেরুসালেম হইতে ১৩৬ একশত ছত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী। যাত্রীরা সপ্তাহমধ্য জেরুসালেম হইতে ডামস্কাসে গমন করিত। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছিবার জন্য পল অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন, সঙ্গীরা কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, কেহ পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। জেরুসালেম হইতে ডামস্কাসে যাইবার নিমিত্ত কয়েকটী পথ ছিল, তন্মধ্যে ইহাঁরা যে পথে যাত্রা করিলেন, সেই সুদীর্ঘ রাজপথ রোমীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নির্ম্মিত এবং সুদৃঢ় প্রস্তরমালায় নিবদ্ধ। এই সুপ্রশস্ত রাজমার্গের উভয়পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, কোথায়ও বা রমণীয় লতাপুষ্পপরিশোভিত কুঞ্জবন; কোথাও বা বহুকালের পুরাতন সুদীর্ঘ বৃক্ষবল্লী, কোন স্থানে বা গগনভেদী শৈল-শ্রেণী বিদ্যমান থাকিয়া, দূর হইতে পথশ্রান্ত পান্থজনের নয়নাকর্ষণ করিতেছে। এই অশেষশোভাকর রাজবর্ত্মে পল সঙ্গীদলে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে এই পথ অন্যান্য পথের ন্যায় সামান্য পথমাত্র। কিন্তু ইহা সামান্য পথ নয়, পাপীজনের নবজীবন-প্রসঙ্গে এ পথের মাহাত্ম্য যুগে যুগে নর নারীর কণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, নবজীবনের পবিত্র ইতিহাসে এ পথ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দুর্বৃত্ত পল তুমি এই পথে কোথায় যাইতেছ? নিরাশ্রয় শিষ্যদলকে আক্রমণ করিতে? আমরা বলি না, তা নয়। এই প্রহেলিকাপরিপূর্ণ সংসারে কোন্ বিষয়ের পশ্চাতে কি ন্যস্ত থাকে, তাহা কে বলিতে পারে? দুর্ব্বিষহ ভীষণ শীত ঋতুর মধ্যে সুমধুর সুখদ বসন্ত সমীরণ লুক্কায়িত থাকে, তাহা কে জানিতে পারে? দুর্ভেদ্য প্রস্তরমালার গর্ভে সুশীতল বারিধারা নিহিত আছে, তাহাই বা কে জানিত? ডামস্কাস্ যাত্রার পশ্চাতে কি মহদ্ব্যাপার লুক্কায়িত আছে, পল তুমিও তাহা জান না। চল, আরও কিছুদূর অগ্রসর হও, আজ বিধাতা তোমার মনোরথ ব্যর্থ করিবেন, তোমার হৃদয়রোপিত বহুদিনের আশাবল্লী তিনি আজ চিরদিনের জন্য নির্ম্মূল করিবেন। যাত্রীদল ডামস্কাস্ নগরের অদূরবর্ত্তী হইয়াছে, আর প্রায় এক মাইল পথ অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ

এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল। মেঘপরিশূন্য নির্ম্মল মধ্যাহ্নাকাশ হইতে এক প্রখর দীপ্তিমান্ আলোক রশ্মি ক্রমে ক্রমে অবতরণ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে আসিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে যাত্রীদলের গতিরোধ হইল। সকলে পথিমধ্যে নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সেই জ্যোতির প্রখর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলে নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকিল; এই অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক ব্যাপারে সকলেরই হৃদয় কম্পমান হইতে লাগিল। তখন সেই আলোকস্তম্ভের মধ্য হইতে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিতে লাগিলেন "সল সল † কেন তুমি আমাকে উৎপীড়ন করিতেছ?" পল অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অথচ সেই সকল কথা বজ্রধ্বনিতে তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি ভীতিবিহ্বল চিত্তে নতজানু হইয়া বলিলেন "প্রভু তুমি কে?" তখন ধীর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন "আমি খৃষ্ট, যাহাকে তুমি নির্য্যাতন করিতেছ।" পল তখন বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু আমাকে কি করিতে হইবে?" উত্তর আসিল, "তুমি উত্থিত হইয়া নগরে প্রবেশ কর, সেই স্থানে তোমায় বলিয়া দেওয়া হইবে" এই বলিতে বলিতে সেই তেজোময় আলোকস্তম্ভ অনন্ত আকাশ গর্ভে মিশাইয়া গেল। পূর্ব্বে সূর্য্যকিরণ সমুজ্জলিত যে মধ্যাহ্নাকাশ ছিল, এখনও সেই মধ্যাহ্নাকাশ বিরাজিত রহিয়াছে। তাহারা সকলে নেত্র উন্মীলিত করিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অনন্তর শূন্যমণ্ডল হইতে কে কথা বলিল, এই ভাবিয়া তাহাদের হৃদয়ে আশঙ্কা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। কিন্তু পল পুনর্জন্ম লাভ করিলেন, জীবনের ভাবী-মহত্ত্বের উৎস এই স্থান হইতে খুলিল, যে নন্দনকাননজাত স্বর্গীয় কুসুমের সৌরভে জগৎ আমোদিত হইবে,—মানবমন বিমোহিত হইয়া থাকিবে,—খৃষ্ট ধর্ম্মরূপ সুরম্য উদ্যান চিরদিনের জন্য জগতে গৌরবান্বিত হইবে, আজ তাহা কোরক হইতে কুসুমে বিকশিত হইল। যে আলোকে পলের আজ নবজীবনের সঞ্চার হইল, সে আলোক ভৌতিক নয়, বাহিরের আলোক নয়। সে জ্যোতির বিকাশ চর্ম্মচক্ষে উপলব্ধি হয় না, তাহার বিকাশ হৃদয়ের নিভৃততম স্থানে, সে জ্যোতিঃ বিধাতা প্রেরিত-আত্ম-জ্যোতিঃ। এই জ্যোতির একবার বিকাশ হইলে, মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি খুলিয়া যায়।" এই জ্যোতির সাহায্যেই

† বলা বাহুল্য যে, পলের প্রথম নাম সল ছিল।

পৃথিবীর সাধুরা হৃদয় ভাণ্ডার নিহিত স্বর্গীয় রত্ন সকল সন্দর্শন করিয়াছেন, ধর্ম্ম-রূপ মহার্হর ধনাগারের চাবি এই জ্যোতির হস্তে। বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনায় এই আলোকের উন্মেষ হয় না, পাণ্ডিত্য বা বহুদর্শনের দ্বারাও ইহা উপার্জ্জন করিতে পারা যায় না। পলের বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্যের ত কিছুমাত্র অভাব ছিল না, তবে তিনি এই আলোক হইতে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন কেন? এই নবজীবনসঞ্চারিণী জ্যোতিঃ তবে কিসে লাভ করা যায়? ধর্ম্মতীর্থের যাত্রীরা পথ পরিদর্শনের জন্য বহুকাল হইতে আকুল হইয়া এই জ্যোতির জন্য ফিরিতেছেন। ব্রহ্মের কৃপাসূর্য্য এই জ্যোতির উৎপত্তি-স্থল;—ব্রহ্মকৃপায় এই আলোকের জন্ম। পরমেশ্বরের করুণা যখন আবির্ভূত হয়, তখন এই জ্যোতিঃ মানব-হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকে। ভগবানের কৃপা না হইলে এই পরম জ্যোতির প্রকাশ হয় না। পরমেশ্বরের দয়া তবে অবতীর্ণ হয় কখন? যখন পাপী পাপের আপাতমধুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া, অবশেষে নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যায়, যখন পাপী আপনার জীবনকে শতসহস্র ধিক্কার প্রদান করিয়া গতানুশোচনা ও অনুতাপের দুর্ব্বিষহ অনলে পুড়িতে পুড়িতে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হয়, তখন; আর কখন? যখন সুখান্বেষী মনুষ্য-হৃদয় সংসারারণ্যে সুখের আশায় হা হা করিয়া ঘুরিয়া আবার অবশেষে ভগবানের দ্বারে শরণাপন্ন হয়, যখন মানুষ আপনাকে অকিঞ্চিৎকর অসার জ্ঞানে ঈশ্বরদয়াকেই সার এবং সর্ব্বস্ব বোধ করিয়া তাহার জন্য একান্তহৃদয়ে ব্যাকুলিত মনে ভগবানে দ্বারে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন; কি মানবজীবনে—কি মানবসমাজে, যখনই দুর্গতির অমানিশার আবির্ভাব হইতে দেখা গিয়াছে, তখনই ভগবানের বিশ্ব-বিজয়িনীকৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে। মোহভ্রান্ত মানুষ! যদ্যপি আপনার হৃদয়ে ব্রহ্মের কৃপা-জ্যোতিঃ লাভ করিতে চাও, তবে তাঁহার জন্য ভিখারী হও। পলের বহুদিনের তিমিরাচ্ছন্ন সুষুপ্ত-হৃদয়ে এই স্বর্গীয় আলোক প্রতিভাসিত হইল। এই জ্যোতির মধ্যদিয়া দিব্যজ্ঞান পলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া বলিতে লাগিল "কেন তুমি খৃষ্টকে অর্থাৎ খৃষ্টশিষ্যদিগকে বার বার নির্য্যাতন করিতেছ?" বিনয়ের সুখস্পর্শী সুকোমল আলিঙ্গনে পলের গর্ব্বিত ও উদ্ধত হৃদয় আজ তৃণের ন্যায় দীনভাব ধারণ করিল; অহঙ্কারদৃপ্ত উন্নত মস্তক প্রেমের দুর্ব্বহভারে অবনত হইয়া নব নারীর চরণে বিলুণ্ঠনের জন্য যেন উদ্যত হইতে লাগিল। পলের হৃদয়মনদেহের

আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন, সম্পূর্ণ যুগান্তর। কিছুক্ষণপরে পল ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন, অনুচরেরা তাঁহার হস্ত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি নগরে প্রবিষ্ট হইয়া জুডাসের গৃহে গমন করিলেন। জুডাসের গৃহ নগরের মধ্যস্থিত 'সরলমার্গ' নামক পথের পার্শ্বোপরি। নির্ব্বোধ মনুষ্য! চিন্তা করিয়া দেখ, পল কি উদ্দেশ্যে ডামস্কাস্ যাত্রা করিয়াছিল, আর কি ভাব লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। তাই আবার বলি, কোন্ বিষয়ের পশ্চাতে কি ব্যাপার ন্যস্ত থাকে, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ তুমি কিরূপে তাহা বলিতে পার? হে সংশয়ি! ভগবানে কি এখনও অবিশ্বাস কর? পরমেশ্বরের মুক্তিপ্রদ হস্ত কি পরিত্রাণের জন্য তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে নিরন্তর ফিরিতেছে না? জুডাসের বাটীতে পল তিন দিবস নিরশনে যাপন করিলেন। উপাসনা, প্রার্থনা ও আত্মচিন্তায় এই তিনদিবস অতিবাহিত হইল। অনন্যমনা হইয়া এই দিবসত্রয় তিনি ঈশ্বরের চরণালিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। করুণাসিন্ধু পরমেশ্বর সন্তানকে কত উপদেশ, কত সত্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সন্তানের বাহিরের ক্ষুধাতৃষ্ণা চলিয়া গেল, বিমনা হইয়া সেই সকল অমূল্যতত্ত্ব শুনিতে লাগিলেন। এখন অভিষেকের সময় উপস্থিত হইল। ও দিকে অ্যানেনিয়স্ নামক জনৈক ধর্ম্মানুরাগী শিষ্যের নিকট, আদেশ প্রেরিত হইয়াছে যে, "জুডাসের গৃহে টার্সস নগরের সল্ নামক এক জন ব্যক্তির অন্বেষণ কর, সে প্রার্থনা করিতেছে; সে আমার একজন মনোনীত পাত্র; তুমি গিয়া তাহাকে অভিষিক্ত কর।" বিধাতার নিদেশানুসারে অ্যানেনিয়স্ জুডাসের গৃহে গিয়া ঠিক তাহাই দেখিলেন। পল অ্যানেনিয়সের নিকট অভিষিক্ত হইলেন। বাইবেলে উল্লিখিত আছে, এই সময়ে পলের চক্ষু হইতে শল্কের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ বাহির হইয়া পড়িল। সত্য সত্যই তাঁহার দৃষ্টির আবরণ খসিয়া পড়িল। তাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষু জ্যোতিষ্মান্ ও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার পুণ্যবারিধিধৌত আত্মা এক অদৃষ্টপূর্ব্ব সুরম্য রাজ্যে পরমসুখে বিচরণ করিতে লাগিল। পল উত্থিত হইয়া পান ভোজনাদি করিলেন এবং যাহাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, এখন তাহাদিগকেই পরমবন্ধু বোধে প্রীতিভরে তাহাদিগের সহিত পবিত্র ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। পরমেশ্বর! ধন্য তোমার পতিতোদ্ধারিণী শক্তি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বিলাপ।

নামে চির পরিচিত ছিলে রে মুঙ্গের!
লোক মুখে তব যশ শুনেছিনু ঢের!
দেখা হলো, কিন্তু দেখা হলো যে কুক্ষণে,
বহু আশা প্রাণে ধ'রে মানব যৌবনে
পশে যথা, আমি তথা কত আশা ধরি
উঠেছিনু বাষ্পযানে। সংসার-উদ্যানে
ফুটিল যে কটী ফুল পরিপূর্ণ প্রাণে
ডালা সাজাইয়া আমি হাসিতে হাসিতে,
আনন্দ-তরঙ্গে যেন ভাসিতে ভাসিতে,
উতরিনু তব পাশে; দেখিনু বিচিত্র
গিরি রাজি, উপত্যকা কি সুন্দর চিত্র!
দেখিলাম প্রবাহিণী সুদূর বিস্তৃত,
গভীর নীরবে ধীরে মৃদু প্রবাহিত;
দেখিলাম দুর্গ তব বেষ্টিত প্রকারে;
দেখিলাম তরুরাজি নবপত্র ভারে
শোভাময়; নব তৃণে শ্যামল প্রান্তর;
দেখিলে উথলে যাহা কবির অন্তর।
দেখিলাম এসকলি; কিন্তু রে হৃদয়ে
ছিল আশা, ভিক্ষু যথা ধনীর আলয়ে
যজ্ঞদিনে, শেষ হলে ব্রাহ্মণ-ভোজন,
পাতের প্রসাদ লোভে করে আগমন,
ছিল আশা, সেই রূপ ভক্তের প্রসাদ
যাহা কিছু পড়ে আছে, মিটাইয়ে সাধ

লব তাহা ; আশা ছিল বন্ধুগণ সনে
করিব ব্রহ্মের পূজা উদ্যানে, কাননে,
গিরিপৃষ্ঠে, নদীতটে ; কিন্তু সে বাসনা,
সে বাসনা হায় মোর সফল হ'লো না ;
আমার ফুলের ডালা অকালে আঁধার
করি, কাল তুলে নিল ফুলটী আমার !
তখন আমিত নিজ আঁখিরে বুঝায়ে
রেখেছিনু ; অশ্রু মোর রাখিনু লুকায়ে ;
কিন্তু প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি মুঙ্গের !
হায় ! হায় ! কারে বলি, আমার প্রাণের
কি যে প্রিয় কন্যাগুলি ! বর্ণি তা কেমনে ?
সুখে ভাসি দেখে হাসি তাদের বদনে।
বহু পাপ বহু কষ্ট আমার সংসারে,
বহু অনুতাপ, তাই ঈশ্বর আমারে
ভুলাইতে নিষ্কলঙ্ক প্রসন্ন সরল
সঙ্গীগুলি চারিদিকে দিলেন ঘেরিয়া।
হারাব সে ধনে আমি এমন করিয়া,
কে জানিত ! চারি দন্তে আধ আধ হাসি,
আধ ভাষা, বর্ণে বর্ণে যেন সুধা রাশি,
কে জানিত "সরোজিনী" এমন মৃণালে
বাঁধা ছিল, কাল যাহা ছিঁড়িবে অকালে।
লইয়া শাবক কুলে পাখী গ্রামান্তরে
উড়ে গেল ; উড়ে উড়ে তরুর শিখরে
বসি, সবে দুই দণ্ড করিছে বিশ্রাম,
হেনকালে একি কাণ্ড, একি বিধি বাম !
কোমল শাবকে ব্যাধ সহসা মারিল ;
বিহঙ্গ-সংসারে ঘোর ক্রন্দন উঠিল ;

বিহঙ্গিনী কেঁদে কেঁদে বুলিছে আকাশে ;
ছানা গুলি, পিতৃক্রোড়ে লুকায় সত্রাসে।
কে জানিত এ দুর্দ্দশা ঘটিবে আমার
কে জানিত তব নেত্রে বহিবেরে ধার !
আমি কি প্রতিমা খানি গঙ্গার পুলিনে
ভাসাইতে গিয়াছিনু ? যা হোক কাঁদিনি
যখন সে দিন আমি, আর কাঁদিব না।
মুঙ্গের ! তুমিও ক্ষোভ আর করিওনা।
তব দয়া তব স্নেহ তব ভালবাসা
ভুলিব না, এত দিবে ছিলনা ত আশা।
কি বলিব প্রিয়পুরী করি এ প্রার্থনা
ঈশ্বর করুন পূর্ণ তোমার কামনা।
সুখে থাক, কর সুখী রোগী শোকী জনে ;
এ হতে কি আছে সুখ এছার ভুবনে।*

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

---

* লেখক মহাশয় যখন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুঙ্গেরে বাস করিতেছিলেন, তখন গৃহের ছাদ হইতে পড়িয়া তাঁহার সরোজিনী নাম্নী একটী কন্যা মারা যায়, সেই সময়ে এই কবিতাটী মুঙ্গের নগর উদ্দেশ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। তাং সং।

ধর্ম্মের হুজুগ।

আজি কালি যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনের কথা শ্রুতিগোচর হয়। নষ্টপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য নানা দিকে নানা চেষ্টা হইতেছে। এই সকল চেষ্টা ঠিক্ পথে পরিচালিত হইতেছে কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মের সহিত সমাজের শুভাশুভ অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ। এই জন্য ধর্ম্মবিষয়ক আন্দোলনের স্রোত কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সমাজহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। কোনও বিশেষ ধর্ম্মমত সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহার সহিত ভ্রম থাকুক আর নাই থাকুক, যদি সরলভাবে সত্যলাভের জন্য তাহা লইয়া আন্দোলন করা যায়, তাহাতে শুভ ভিন্ন অশুভ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত সত্যানুরাগ ও সরল বিশ্বাসের সহিত যদি কেহ অপরকে আপনার মতে আনিবার চেষ্টা করে, তাহাতে আপাততঃ একটু আধটু সামান্য অনিষ্ট হইলেও, তাহার ভবিষ্যৎ ফল প্রায়ই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি মনে মনে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর না, যদি তাহা সত্য বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা কর, অথবা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর, কথায় বা কার্য্যে তাহার বিপরীত ভাব প্রকাশ কর, তাহাতে কখনও সমাজের মঙ্গল হইতে পারে না। প্রত্যেক দেশেই এমন একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা সকল কার্য্যেই দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া চলেন। তাঁহারা যাহা ভাল বা উচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহা যদি সাধারণ মতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের বিশ্বাস গোপন করিয়া তদ্বিপরীত পথে চলিয়া থাকেন। সমাজের মধ্যে যাহারা উন্নতিশীল দল বলিয়া পরিচিত তাহাদের মতের সহিত আপনাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য সত্ত্বেও তাঁহারা মনে করেন তাহারা উৎসাহের স্রোতে পড়িয়া না জানি কি একটা বিপরীত কাণ্ড করিয়া সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিবে; এবং এই ভাবিয়া তাঁহারা আপনাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ পথে চলা আবশ্যক মনে করেন। কেহ কেহ বা উন্নতিশীলদলস্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ক্রোধ বা ঈর্ষা অথবা অন্য কোনও নীচ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত দলের বিরোধী

হইয়া পড়েন এবং নিজের বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তাহা গোপন করিয়া কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ভাব দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং অপকারই হইয়া থাকে।

"The affairs of the universe are not carried on after a system of benign double-dealing. In nature's doings all things show their true qualities——exert whatsoever of influence is really in them. It is manifest that a globe built up partly of semblances instead of facts, would not be long on this side chaos. And it is certain that a community composed of men whose acts are not in harmony with their innermost beliefs, will be equally unstable. To know in our hearts that some proposed measure is essentially right, and yet to say by our deeds that it is not right, will never prove really beneficial. Society cannot prosper by lies."

——*Herbert Spencer.*

ইহার ভাবার্থ এই যে—'জগতের ক্রিয়াকাণ্ড কপটতাদ্বারা নিয়মিত হয় না। প্রকৃতির কার্য্য প্রণালী এরূপ যে, প্রত্যেক পদার্থই আপনার প্রকৃত গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে—যাহার ঠিক্ যে পরিমাণ শক্তি আছে, সে সেই শক্তির প্রভাবই বিস্তার করিয়া থাকে। প্রকৃত বস্তুর পরিবর্ত্তে, কেবল বস্তুবৎ প্রতীয়মান কিছু দ্বারা আংশিক ভাবে যদি কোনও জগৎ গঠিত হয় তবে তাহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। এবং যে সমাজের অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণের কার্য্য তাঁহাদের আন্তরিক বিশ্বাসের অনুযায়ী নহে, সে সমাজও নিশ্চয় সেইরূপ অস্থায়ী হইবে। কোনও কার্য্যকে হৃদয়ে ভাল বলিয়া অনুভব করা অথচ কার্য্যদ্বারা তাহা ভাল নহে বলিয়া প্রকাশ করা কখনই প্রকৃত মঙ্গলজনক হয় না। মিথ্যাদ্বারা কখনও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।'

আজি কালি 'হিন্দুধর্ম্ম!' 'হিন্দুধর্ম্ম!' করিয়া যে মহা কোলাহল উত্থাপিত হইয়াছে তাহা যদি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত আস্থা ও সরল বিশ্বাস হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে তবে তাহাতে সমাজের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল হইবে না। সবল ধর্ম্ম বিশ্বাস যতই বর্দ্ধিত হইবে, ধর্ম্মের প্রতি লোকের

প্রকৃত আস্থা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, ব্রাহ্মই হউন আর খৃষ্টীয়ানই হউন, তিনি সমাজের মিত্র ভিন্ন শত্রু নহেন। সরল, সত্যপরায়ণ, পরোপকারী, ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি নিজেও অপরকে তাহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে দেখিলে কখনও তাহার প্রতি ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশ করেন না। যেখানে প্রকৃত ধর্ম্মের অভাব, যেখানে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমের অভাব, যেখানে কেবল ধর্ম্মের খোসা লইয়া টানাটানি, সেই খানেই যত ঘৃণা, যত বিবাদ ও যত গোঁড়ামি।

সমাজের প্রকৃত শত্রু কে? যাহাদের মনে একরূপ মুখে এক্করূপ, যাহারা গোপনে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না অথচ সংবাদপত্রে বা বক্তৃতায় "ধর্ম্ম!" "ধর্ম্ম!" করিয়া চীৎকার করিতে পটু, যাহাদের ঈশ্বরে ভক্তি নাই, সত্যে নিষ্ঠা নাই, ব্যবহারে সরলতা নাই, যাহারা দিনান্তে একবার ভক্তিভাবে ভগবানের নাম করে না, অথচ পশার জাঁকাইবার জন্য ধর্ম্মের নামে জয়ঢক্কা নিনাদিত করিয়া আকাশ পাতাল কম্পিত করিতে পারে, যাহারা পরোপকারের ফাঁদ পাতিয়া স্বার্থসাধনের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকে, স্বার্থের জন্য যাহারা সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, নির্দ্দোষী ব্যক্তির চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে পারে, এবং দেশের নীতি দূষিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারে, প্রকাশ্যভাবে লোককে কপটতা শিক্ষা দিতে যাহারা কুণ্ঠিত হয় না, যাহারা কোন ধর্ম্মই মানে না অথচ সামাজিক উৎপীড়নের হাত এড়াইবার জন্য অথবা সামাজিকতা রক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডে যোগ দেয়, যাহারা আপনাদের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নাস্তিকতা, সংশয়বাদ অথবা সুখবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহারা আপনাদের বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহে অথচ অপর কাহাকেও নিজের বিশ্বাসমত চলিতে দেখিলে তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হয়, এরূপ লোকেরা এবং তাহাদিগকে যাহারা বাক্য বা কার্য্যদ্বারা সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করে, তাহারাই সমাজের প্রকৃত শত্রু। নতুবা যাঁহারা আপনাদের সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে চান, যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে আপনাদের ও অপরের চরিত্র উন্নত করিবার জন্য উৎসুক, যাঁহাদের ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং

নরনারী ও জীবজন্তুর প্রতি দয়া আছে, এরূপ বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, ভগদ্ভক্ত ও পরোপকারী ব্যক্তিগণ সত্যের অনুরোধে, নিজের বিশ্বাসের অনুরোধে কোনও সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিলে বা কোনও প্রকার সামাজিক শাসনকে তুচ্ছ করিতে বাধ্য হইলে তাঁহাদিগকে কখনই সমাজের শত্রু বলা যায় না। পরন্তু তাঁহারা যে সত্যনিষ্ঠার ও ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত দেখান তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সমাজের মিত্র বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

আজি কালি যাঁহারা চতুর্দ্দিকে হিন্দুধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। এই যে 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়া এতদিন কাগজে লেখালিখি, পথে ঘাটে বকাবকি হইল, বলি, তাহার ফল কি হইয়াছে দেখাও ত ভাই! কয়জন লোকের চরিত্র তোমরা ভাল করিতে পারিয়াছ বল ত! কয়জন লোকের মন নাস্তিকতা বা ঔদাসীন্যের পথ হইতে ভগবানের দিকে ফিরাইতে পারিয়াছ বল ত! তাহা যদি না পারিয়া থাক তবে আর এত গোলযোগ করিয়া ফল হইল কি? আর তাই কি তোমাদের উদ্দেশ্য? কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া সেরূপ ত বোধ হয় না। স্বদেশবাসীর চরিত্র উন্নত করিবার জন্য, লোকের মনে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তি উত্তেজিত করিয়া দিবার জন্য তোমরা এ পর্য্যন্ত কিছু করিয়াছ বলিয়া ত দেখিতে পাই না। তাহা যদি করিতে তাহা হইলে তোমাদিগকে সমাজের উপকারী বলিয়া, প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতাম। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষকে অপদস্থ করিতেই তোমরা প্রধানতঃ ব্যস্ত, যখন দেখিতে পাই ব্যক্তিবিশেষের প্রায়শ্চিত্ত ঠিক্ হইয়াছে কিনা ইহা লইয়াই তোমাদের যত মাথাব্যথা, যখন দেখিতে পাই যে দেশব্যাপী পাপস্রোত কিসে দূর হইবে, লোকের চরিত্র কিসে ভাল হইবে সে দিকে তোমরা একবার দৃক্‌পাতও কর না, তখন তোমাদের ধর্ম্মান্দোলনকে হুজুগ বলিব না ত আর কি বলিব?

হক্ কথা।

অনন্ত দুঃখ।

More pain than pleasure is occasioned us by others—banish others, and you are necessarily the gainer.

Lytton.

যদি জানিতে আমার বুকে কি দারুণ শেল বিঁধিয়াছে,—আমার হৃদয় কি দারুণ যন্ত্রণার তুষানলে দিবানিশি জ্বলিতেছে,—কোন্ কালসর্প হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আমার রক্ত শোষণ করিতেছে—এবং পলে পলে আমার জীবনী শক্তি ধ্বংস করিতেছে,—তাহা হইলে আমি কেন কাঁদি তাহা আর জিজ্ঞাসা করিতে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—দেখিতে দেখিতে কত বৎসর চলিয়া গেল!—কৈ আমার বুকের শেল বিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ত উদ্ধার হইল না!—যে তুষাণল জ্বলিতেছিল তাহা ত নিভিল না! যত দিন যাইতেছে, যন্ত্রণা যে আরও বাড়িতেছে। ভাবিয়াছিলাম বুঝি একদিন এ যন্ত্রণা ফুরাইবে—বুঝি একদিন এ দুঃখের আঁধার বিদূরিত হইয়া সুখসূর্য্য উদিত হইবে—কিন্তু কৈ তাহা ত হইল না—প্রাণের এ হাহাকার ত মিটিল না?

সুখও চাই না দুঃখও চাই না,—চাই একটু শান্তি; কিন্তু কৈ তাহাও ত পাইলাম না? চিরজীবন কেবল দুঃখভোগেই অবসান হইল! জীবনাকাশ দুঃখ শোকের ঘন আঁধারেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল, মুহূর্ত্তের জন্যও সুখের খনিক আলোক দেখিতে পাইলাম না! আমার হৃদয় দুর্ব্বল—আমার হৃদয় কোমল, তাই আমার এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা, তাহা আমি জানি! এ সংসারে যাহার হৃদয় কোমল,—যে হৃদয় পাষাণে বাঁধিতে পারে নাই, যে কঠোরতার পরিবর্ত্তে কঠোরতা, ভ্রূকুটীর পরিবর্ত্তে ভ্রূকুটী, তাচ্ছিল্যের পরিবর্ত্তে তাচ্ছিল্য, ঘৃণার পরিবর্ত্তে ঘৃণা প্রদর্শন করিতে শিখে নাই, যে কঠোরতা দেখিলে কোমল হইয়া পড়ে, ভ্রূকুটী দেখিলে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে,—তাচ্ছিল্য দেখিলে মরমে মরিয়া যায়—এ সংসার তাহার জন্য নহে। যে কপটতা জানে না, ক্ষতিলাভ গণনা করিতে শিখে নাই, ফলাফল চিন্তা করিতে জানে না—কেবল আপনা ভুলিয়া অন্যকে ভাল বাসিতে জানে, এ সংসার তাহার জন্য নহে। ভাল বাসিয়া যে আত্মহারা

হইবে—এ সংসারে আর তাহার স্থান হইবে না; ভাল বাসিতে হয় একটু আধটু—পোষাকি রকম ভালবাসা লইয়া থাক—আত্মহারা হইও না। এ নিষ্ঠুর জগতে মানুষ যে দিন ভালবাসিয়া আত্মহারা হইয়াছে, সেইদিন হইতেই সে তাহার চিরজীবন দুঃখ যন্ত্রণার দারুণ অনলে আহুতি দিয়াছে। সেইদিন হইতেই তাহার দুঃখের জীবন আরম্ভ হইয়াছে।

জ্ঞানীরা বলেন দুঃখ মানুষকে শিক্ষা দেয়;—এ কথা একেবারেই অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু এ শিক্ষা কিসের জন্য? কঠিনতর দুঃখ সহ্য করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য! হৃদয় ক্রমাগত দুঃখের বিষময় দংশনে ক্ষত বিক্ষত হইতেছে—যন্ত্রণার তুষাণলে পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। একটি যায় আর একটি আসে—এ অবস্থায় কি ই বা শিখিব, আর হৃদয়ে কি সামর্থ্যই বা লাভ করিব? যে দুঃখ কি জানে না, যাহার জীবনতরী সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে; দুঃখ ঘটনায় তাহার শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু যাহার জীবন চিরদুঃখময় চিরঅন্ধকারময়, যাহার ক্ষুদ্র জীবনতরী তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে কূলকিনারা না পাইয়া অতল জলে ডুবিতে বসিয়াছে,—তাহার শিক্ষাইবা কি—আর সে শিখিয়াই বা কি করিবে? শিক্ষা দূরে থাক—দুঃখের তাড়নে হতাশ হইয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয়, জীবন ভারবহ হইয়া উঠে, জীবনে বিতৃষ্ণা জন্মায়। তবে কিসের জন্য এ সংসার, কিসের জন্য এ সৃষ্টি! এ জগতে ত সুখ অপেক্ষা দুঃখ অনেক অধিক—অসীম সাগরে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গ! তবে কিসের আশায় মুগ্ধ হইয়া এ সংসারে ফিরিতেছি কোন সুখের আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া আছি? কেবল দুঃখ শোক—কেবল বিষাদ—কেবল যন্ত্রণা আর নৈরাশ্য! ইহারই জন্য কি সংসারে আসিয়াছিলাম।

কিন্তু কৈ বুঝিয়াও ত বুঝি না! এ সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ যে অনেক অধিক, তাহা ত প্রতিপদে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তবুও ত জ্ঞান হয় না? আশা কুহকিনীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ক্রমাগত চলিতেছি—চলিতে চলিতে এক একবার মুমূর্ষু হইয়া পড়ি, আবার সেই নিরাশার অন্ধকার মধ্যে কুহকিনীর অঙ্গুলী সংকেত দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে থাকি! কিন্তু যাহা চাই, তাহা পাই কৈ? আমি যতই অগ্রসর হই, আমার লক্ষ্য—আমার ঈপ্সীত পদার্থ যেন ততই দূরে চলিয়া যায়! কোথায়

গিয়া আমি তাহা পাইব—কেমন করিয়া আমি তাহা লাভ করিব? তুমি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বিজ্ঞতার সহিত বলিতেছ—আমি কল্পনা প্রিয়—আমি দুর্ব্বল। তুমি হৃদয় বিহীন তাই এমন কথা তোমার মুখে শোভা পায়। যদি তোমার হৃদয় থাকিত, তবে কখনই তুমি এমন কথা বলিতে পারিতে না। আমি দুর্ব্বল—মানিলাম। কিন্তু বল দেখি, সংসারে কয়জন লোক এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে? কয়জন লোক এ মোহ ছিন্ন করিয়া অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইয়াছে? আমি আজ তোমার কাছে হৃদয়ের আবেগে প্রাণের মর্ম্মকথা বলিয়া ফেলিলাম, তাই তুমি আমাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া মুখ ফিরাইয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছ। কিন্তু সংসারে কয়জন লোকের হৃদয়ে তুমি প্রবেশ করিয়াছ—কয়জন লোকের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র তুমি দেখিয়াছ? অনেকের হৃদয় যে শ্মশান হইয়া গিয়াছে—অনেকে যে এ সংসারেই সন্ন্যাসী হইয়া রহিয়াছে,—তাহা কি তুমি জান? তোমার হৃদয়ই কি তুমি জান? তবে হৃদয়বিহীন লোকেরও সংসারে অভাব নাই—আর এই হৃদয় বিহীনতা সংসারে অনেক দুঃখ কষ্ট আনিয়াছে। সংসারের লোক যদি সমস্তই হৃদয়বিহীন হইত, তবে কি সুখের হইত? হৃদয়বান লোক সংসারে আছে, তাই সংসারে এত দুঃখ। এ সংসারে যাহার হৃদয় আছে, সেই কাঁদে—যাহার হৃদয় নাই, সেই হাসে;—অন্যের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া উপহাস করে।

আর এই সংসারবন্ধনইত সকল অনর্থের মূল! লোকে বলে এ সংসারে যদি প্রেমের বন্ধন না থাকিত—স্নেহ ভালবাসা না থাকিত, তবে এ সংসার ছারখার হইয়া যাইত—ইহা শ্মশানে পরিণত হইত। হইতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই প্রেমের বন্ধন—এই স্নেহ ভালবাসার বন্ধনই মানুষের দুঃখের আদি কারণ। ভালবাসাই জগৎ হাহাকারে পূর্ণ করিয়াছে, ভালবাসাই জগৎ অশ্রুজলে ভাসাইয়াছে! তবে কেন এ প্রেমের বন্ধন? তবে কেন জগৎ হইতে এই স্নেহ ভালবাসা বিলুপ্ত হইয়া যায় না! আমি মনে করি, মানুষ যতই সংসার হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিবে, ততই মানুষের দুঃখভার হ্রাস হইবে—সুখ বৃদ্ধি পাইবে। এসংসারে যে কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতে পারে বুঝি তাহার মত সুখী আর নাই। এ স্বার্থপরের কথা হইতে পারে। কিন্তু এ সংসারই ত স্বার্থপর!

কেন আমি অন্যের সহিত আমার হৃদয়টা বাঁধিয়া দিব? কেন আমি আর এক জনের হাতে আমার সুখ দুঃখ সঁপিয়া দিব? যদি বুঝিতাম সে আমার সুখে সুখী হইবে, দুঃখে দুঃখী হইবে—আমার শোকের অশ্রু স্নেহের অঞ্চলে মুছাইয়া দিবে, আমার যন্ত্রণায় স্নেহবাক্যে সান্ত্বনা দিবে, তবে তাহার কাছে আমিও আত্ম বিক্রয় করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা করিতাম না। কিন্তু যে আমার যন্ত্রণা দেখিয়া হাসিবে—আমার অশ্রুজল দেখিয়া বিদ্রূপ করিবে—আমায় ভালবাসার, তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা প্রতিদান দিবে—কেন আমি তাহাকে আত্ম বিক্রয় করিব? যে মুহূর্ত্তে আমি অন্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিলাম সেই মুহূর্ত্ত হইতেই আমার জীবনের আশা ভরসা—সুখ দুঃখ—সকলই তার হাতে। তাহার অনুগ্রহের উপর আমার জীবন মরণ!

তবে কেন মানুষ বুঝিয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে শত বাঁধনে জড়িত করে, কেন অন্যের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন গ্রথিত করিয়া দেয়, স্নেহ ভালবাসার বন্ধন বৃদ্ধি করিয়া কেন আপনাকে সহায়হীন সম্বলহীন করিয়া ফেলে! কেন এ মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিজের দুঃখভার বৃদ্ধি করে?—হৃদয়ের মর্ম্ম স্থানে যে অনন্ত আশা—অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য?—ভ্রান্ত মানুষ—এ সংসারে যে তাহা হইবার নহে! তবে কেন এ মায়ার বন্ধন—কেন এ স্নেহ ভালবাসা? বড় ইচ্ছা করে এ বন্ধন ছিন্ন করিয়া—এ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া আকাশের বিশাল প্রান্তরে সেই উন্মুক্ত বায়ুতে একবার প্রাণ ভরিয়া বিচরণ করি,—এ সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা—শোক মলিনতা অতিক্রম করিয়া নবশরতের নির্ম্মল শান্তিপ্রদ স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় তপ্ত হৃদয় শান্ত করি। কিন্তু তাহাত পারিলাম না? এই ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ন্যায় হৃদয় যে কুলে কুলে পরিপূর্ণ,—ইহাকে ত আয়ত্ত করিতে পারিলাম না! বুঝিতেছি এ প্রেমের বন্ধন—এ স্নেহ ভালবাসার বন্ধন যদি না থাকিত, তবে সংসারের অনেক দুঃখ কষ্ট—অনেক হাহাকার—অনেক অশ্রুজল কমিয়া যাইত! কিন্তু তবুও ত এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছি না! একে একে ত সকলেই চলিয়া যাইতেছে—আমার গৃহ—আমার হৃদয় মন্দির শূন্য প্রায় হইয়াছে, তবুও ত এ মোহ কাটিতেছে না! মানুষ যায়, স্মৃতি পড়িয়া থাকে;—সকলই যায়—স্মৃতি যায় না কেন? আজ আমার গৃহ আমার হৃদয়মন্দির শূন্য করিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু

বিজয়ার দিনে শূন্য গৃহে ক্ষীণ দীপালোকের ন্যায় ঐ দেখ আমার হৃদয়ে স্মৃতি মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। যদি ঐ ক্ষীণালোক নিভিয়া যাইত—যদি উহাকে নিভাইতে পারিতাম, তবে শূন্যগৃহের এ ভীষণ শ্মশানদৃশ্য ত আর দেখিতে হইত না!

সমালোচন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য, শ্রীমৎ আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামিকৃত টীকা এবং বঙ্গানুবাদ সমেত শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই সারগর্ভ বিস্তীর্ণ গ্রন্থের সমালোচনা খুব দীর্ঘ এবং ব্যাপক হওয়া আবশ্যক, কিন্তু আমাদের পত্রিকার সেরূপ অবসর নয়। সুতরাং যথাশক্তি—সেই অনুসারে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতের জ্ঞানবৃদ্ধ প্রাচীন ঋষিরা অশেষ চিন্তা ও পরিশ্রম বলে যে সকল রত্ন সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাহাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বলতর মহার্হ রত্ন। এই মহামূল্য রত্নের আকর্ষণ শক্তি এতদূর যে, ইংরেজ জর্ম্মাণ প্রভৃতি পৃথিবীর বিবিধ ভাষাবলম্বী জাতিরা নিজ নিজ ভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া লইয়াছেন। কি অধ্যাত্মতত্ত্ব, কি মনোবিজ্ঞান, কি ব্রহ্মবিদ্যা ইহা সকল প্রকার জ্ঞানেরই একরূপ খনিস্বরূপ। মানবচিত্ত নিবিষ্টভাবে ইহার মধ্যে একবার অবতরণ করিলে নানা রত্ন সমাহরণ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের অংশবিশেষ। যখন কুরুক্ষেত্রের বিশাল সমরাঙ্গনে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের মিলিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উচ্ছলিত প্রলয়কর সাগরবারির ন্যায় বিরাজ করিতেছিল; তখন শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়শোভী ধনঞ্জয়ের যুদ্ধরথ সমরক্ষেত্রে উপনীত হইল, সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রস্তুত হইতে আহ্বান করিলেন। অব্যর্থসন্ধান পার্থ গাণ্ডীব উত্তলোন করিয়া দেখেন, চারিদিকেই তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, গুরুলোকেরা সমবেত রহিয়াছেন, দেখিয়া অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন হইল "আমি কি সম্পদ বা রাজ্য লাভের জন্য এতগুলি বন্ধুবান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্বকে হত্যা করিব? ধিক্ রাজ্য লাভে, আমি তাহার জন্য এই গুরুতর মহাপাতকের ভার মস্তকে লইতে পারি না।" এই বলিয়া গাণ্ডীব ত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে অর্জ্জুন

রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। অর্জ্জুনকে এইরূপে যুদ্ধে বিরত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন। তখন মহামনা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পুনঃপ্রবৃত্ত করাইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই স্থলেই গীতার উৎপত্তি। উপদেশচ্ছলে আত্মার অনশ্বরত্ব জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ প্রভৃতি যোগের তত্ত্ব, ইন্দ্রিয় সংযমন, নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই গ্রন্থের ভাষ্যকার, এবং আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামী ইহার টীকা প্রণয়ন করেন। টীকা ব্যতীত পরিষ্কাররূপে এই গ্রন্থের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা যাইতে পারে না। এই টীকা দ্বয়ের মধ্যে স্বামিকৃত টীকাই অপেক্ষাকৃত সরল ও সুবোধ্য। কৈলাসবাবু বঙ্গানুবাদের সহিত এই গ্রন্থ প্রচার করিয়া এদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পরলোকগত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে একবার ভগবদ্গীতা বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হয়। আমরা সে অনুবাদ পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। কৈলাস বাবুর অনুবাদ তাহা অপেক্ষা সরল এবং প্রাঞ্জল। এতদ্ভিন্ন কৈলাস বাবু এই গ্রন্থ মধ্যে শঙ্করাচার্য্য আনন্দগিরি এবং শ্রীধর স্বামী এই তিন মহাপণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকটন করিয়া ইহাকে অনেক গুণে মূল্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন। অধুনা আরও অনেক স্থলে ভগবদ্গীতা সানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোন খানিই ইহার সমতুল্য নয়। কৈলাস বাবু বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত ইহার সম্পাদন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই প্রকাণ্ড সারবান্ গ্রন্থকে অল্প মূল্যে প্রদান করিয়া পাঠকদিগের পক্ষে সুবিধা করিয়াছেন। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই এই মহামূল্য গ্রন্থ এক একবার পাঠ করা উচিত। ইহাতে অতি সুন্দর রূপে জড় হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতা এবং অবিনাশিতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। যথা

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

অর্থাৎ মানবগণ যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র গ্রহণ করে; সেই প্রকার দেহী অর্থাৎ আত্মা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ পরিগ্রহ করে। অস্ত্র দ্বারা আত্মাকে ছেদন করা যায় না, ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না, জলে কর্দ্দমিত হয় না, বায়ুতে শুষ্ক হয় না।

রিপু সকল যে মনুষ্যের ধর্ম্মপথের ঘোর অন্তরায় এবং রিপুর উত্তেজনা যে মানবচিত্তকে প্রমত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তোলে, তাহা ইহাতে বিশদ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। কিরূপে মনুষ্য রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, তাহা গীতাকার এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

অর্থাৎ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের আসক্তি জন্মে আসক্তি হইতে অভিলাষ এবং অভিলাষ হইতে ক্রোধ সঞ্জাত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়। অনেক ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি কর্ম্মকে অতি নিকৃষ্ট স্থান প্রদান করেন, আবার অনেকে কর্ম্মকে অধোগতির হেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমেশ্বরে ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ এতদুভয় সমর্পণ না করিলে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ যাজনা হয় না। এ সম্বন্ধে গীতা অতি সুন্দর কথা বলিতেছে। যথা

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিগণ তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া চলে। সুতরাং কর্ম্ম একান্ত অনুষ্ঠেয়। এইরূপ গীতায় অনেক স্থলে অতি সারগর্ভ মহামূল্য উপদেশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ঐতিহাসিক রহস্য দ্বিতীয় ভাগ—ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত। এ পুস্তকখানি অনেক দিন হইতে আমাদের হস্তগত হইয়াছে,—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সমালোচিত হয় নাই, সে জন্য গ্রন্থকার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গ্রন্থকারকে আর বিশেষরূপে পরিচিত করিতে হইবে না, ইনি একজন

বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ যশোভাজন লেখক। এই পুস্তকে গ্রন্থকার ভারতের পুরাতত্ত্ব ঘটিত অনেক প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সারবান্ গ্রন্থের প্রচারে রামদাস বাবু বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তবে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সকলের মনোরঞ্জন হয় না, কারণ ও সকল বিষয়ে লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত। সকল অংশের সহিত আমাদের মত না মিলিলেও এই গ্রন্থে অনেক শিখিবার ও জানিবার কথা আছে।

বাঙ্গালীর ইয়োরোপ দর্শন—গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু পুস্তকপাঠে বুঝিতে পারা যায় যে গ্রন্থকার একজন বিচক্ষণ ও সুলেখক ব্যক্তি। ইনি স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া—ইয়োরোপের যে সকল দেশ ভ্রমণ করেন, এই সকল দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমুদ্র, অর্ণবপোত, সুয়েজ-ক্যানেল, পারিস, লণ্ডন, রোম ইংরাজ ও ফরাসিজাতির সামাজিক আচার, ইতালীয় লোকদিগের রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উজ্জ্বল হৃদয়াকর্ষক ছবি ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে আনুসঙ্গিক আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে অন্তঃকরণ কৌতূহল ও আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। পুস্তকখানি এক একবার পাঠ করিয়া সকলেরই কৌতূহল চরিতার্থ করা উচিত বোধ হয়।

পাপীর নবজীবন লাভ—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দুষ্প্রবৃত্তিসক্ত পাপাচারী পুরুষ পাপের আপাত-মধুর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কিরূপ দুর্গতির মধ্যে জীবনযাপন করে এবং বিধাতার কৃপা অকস্মাৎ তাহার উপর অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাকে উদ্ধার করে, গ্রন্থকার তাহা নানা জনের জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যে কয়েকজন পাপীর নবজীবন লাভের কথা লিখিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সকলেরই ব্রাহ্মসমাজ অথবা তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তির সংসর্গে পড়িয়া এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নয়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে লিপিচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়। সকলেরই এই গ্রন্থখানি এক একবার পাঠ করা উচিত, মনে করি।

মহম্মদ চরিত—সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, প্রণীত। আজকাল অনেকেই অনেক মহাত্মার জীবনচরিত লিখিতে

আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গভাষাতে আমরা যতখানা জীবন চরিত পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে "বুদ্ধদেব চরিত" ও "মহম্মদ চরিত" আমাদের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যখন "বুদ্ধদেব চরিত" আমরা পাঠ করি, তখনই আমাদের এই ধারণা হইয়াছিল, কৃষ্ণবাবু বঙ্গসাহিত্য সংসারে জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বলিয়া পরিগণিত হইবেন, মহম্মদ চরিতে আমাদের সেই ধারণা আরও সুদৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। তাঁহার সুমার্জ্জিত ওজস্বিনী ভাষা গভীর চিন্তা ও গবেষণা শক্তি এরূপ বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। মহাত্মা মহম্মদের নবজীবন লাভের অধ্যায় পড়িতে পড়িতে আমাদের মত লোকেরও নিদ্রিত প্রাণ জাগ্রত হইয়া উঠে, নিরাশাভগ্ন প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। ক্ষুদ্র দুর্ব্বল মানব প্রাণে প্রার্থনা ও ব্যাকুলতার বলে কি করিয়া মহান্ ঈশ্বরের করুণা শক্তি অবতীর্ণ হয়, জীবন্ত বিশ্বাসের বলে কিরূপে মানবজীবন সংশয় বিপদ হইতে উদ্ধার পায়, কৃষ্ণবাবু হৃদয় মুগ্ধকর ভাষায় তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। মহাত্মা মহম্মদকে নিষ্ঠুর ও নররক্ত-পিপাসু ধর্ম্মবীর বলিয়া আমাদের এতদিন ধারণা ও বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থ পড়িয়া আমাদের সেই ধারণা ও বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে,—মহম্মদের সম্বন্ধে আমাদের অনেক কুসংস্কার দুরীভূত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। কিন্তু এখানে একটী কথা বলিবার আছে। লেখক মহম্মদের বহু বিবাহের দোষ ক্ষাপনের জন্য দেশপ্রচলিত রীতির ও অসহায়া রমণীদিগের প্রতি তৎকালিক অমানুষিক অত্যাচারের যে দোহাই দিয়াছেন, তাহাতে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তাঁহার ন্যায় সংস্কারকের জীবনে ইহা গভীর কালিমা। এতদ্ব্যতীত একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন পৌত্তলিক দেশে সমরসজ্জা, তাঁহার জীবনের আর একটী কলঙ্ক। ইহা জীবনচরিত লেখকের দোষ নহে, মহম্মদের জীবনের দুটী কলঙ্ক। তবে এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি,—বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে নাটক উপন্যাসের সংখ্যা না বাড়িয়া, এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন যত বাড়ে, দেশের ও সমাজের ততই মঙ্গল। আমরা অনুরোধ করি, কৃষ্ণবাবু প্রতি বৎসর আমাদিগকে এরূপ এক একখানি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়া বঙ্গভাষার কলেবর প্রশস্ত করুন।